সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ইংরেজি আত্মজীবনী

ভেরিয়ার এল্যুইন-এর

আদিবাসী জগৎ

অনুবাদ

মহাশ্বেতা দেবী

পৃথ্বীশ সাহা

সাহিত্য অকাদেমি

Verrier Elwin-er Adivasi Jagat : Bengali translation by Mahasweta Devi and Prithwis Saha of an Akademi award-winning English autobiography entitled *The Tribal World of Verrier Elwin*. Sahitya Akademi, New Delhi

BCSC ...blic library
... No. 10.091
... M.R. No 32430

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ্ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
বিক্রয় কেন্দ্র : স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
জীবনতারা, ২৩এ/৪৪এক্স্, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
গুণভবন, তৃতীয় তল, ৩০৪-৩০৫ আন্না সলাই, তেয়নামপেট, চেন্নাই ৬০০ ০১৮
১৭২ মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪
সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী বিল্ডিং, ড. আম্বেদকর ভীথি, বেঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

অক্ষরবিন্যাস : রিপ্রোকান, ২৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : বসু মুদ্রণ, ১৯-এ সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

ছেলেবেলার দুই সাথি
এলডাইথ ও বাসিলকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শামরাও হিভালে রচিত গ্রন্থ *স্কলার জিপসি* থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ; অল ইন্ডিয়া রেডিও সম্প্রচারিত আমার *প্যাটেল স্মারক বক্তৃতা*'র অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করেছি—সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থে তাছাড়া ব্যবহার বা উদ্ধৃত করেছি 'জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন', 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান', 'ইলাস্‌ট্রেডেড্ উইকলি' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা থেকে, এবং আমার পূর্বপ্রকাশিত কিছু বই থেকে।

বিশেষভাবে আমি ঋণী আমার কিছু বন্ধুর কাছে; পাণ্ডুলিপি অবস্থায় এ গ্রন্থটি তাঁরা পড়েছেন, সমালোচনা করেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন; এঁদের মধ্যে রয়েছেন এন. কে. রুস্তমজি, বি. দাস শাস্ত্রী, পি. এইচ. ত্রিবেদী, মারগট গিলকে, জুলিয়ানা ক্যাডলোস্কভস্কি ও আমার বোন এলডাইথ। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রতিটি বন্ধুকে। বইয়ের নামকরণটি পুত্র বসন্তের।

ভূমিকা

যে মানুষ বহু বছর ধরে ব্রিটেন ও ভারত, এই দুই জগতে বাস করেছে, আর এটা অতিশয়োক্তি নয়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছে, যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য একই হৃদয়ের পর্যাবৃত্তিক হৃৎস্পন্দন,'—এ কাহিনী তারই। অত্যন্ত ধার্মিক এক এভাঞ্জেলিক পরিবার থেকে আধুনিক, উদারমনা অক্সফোর্ডে আমার যাত্রা। তারপর গান্ধীর সবরমতি আশ্রম থেকে ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছনো,—এতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু পরিবর্তন ঘটে, জীবনধারাও বদলে যায়। অক্সফোর্ডে আমি এক অ্যাংলিকান ধর্মযাজক হিসেবে নিযুক্ত হই। অধ্যাপকের জীবনে বেশ গুছিয়ে বসেছিলাম প্রায়, সে সময়ে ভারত আমার কল্পনাকে কব্জা করল, আমাকে নিয়ে এল আরেক গোলার্ধে। ক'বছর কঠিন চেষ্টার পর চার্চ ত্যাগ করলাম। অবশ্য বিদ্যাচর্চা থেকে কখনো মুখ ফিরাই নি। গান্ধীর সংস্পর্শে এসে ভারতের সঙ্গে আমার অঙ্গাঙ্গি বন্ধন গড়ে উঠল। আজ আমি ভারতের নাগরিক। মহান ও প্রাচীন নগরগুলিকে ভালবাসতাম, আজও ভালবাসি। তবু ইচ্ছে করেই বাস করতাম সুদূর, আদিম সব গ্রামে। বিয়ে করেছি আদিবাসী সমাজে, ভালোবাসা পেয়েছি সেখানে। ভারতে একাধারে পেয়েছি দুঃখ ও আনন্দ, নৈরাশ্য ও পরিপূর্ণতা। সব চেয়ে বেশি পেয়েছি বাস্তব সত্যের অভিজ্ঞতা। যেন তা আমার সেই প্রার্থনাই উত্তর : 'অপ্রাকৃত থেকে আমাকে প্রাকৃতে নিয়ে যাও।'

এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও দেখতে পাই, আমার জীবনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গতির ধারা, এক অন্তর্লীন চিরপ্রবহমান জীবনদর্শন। প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস হারাবার পরেও যা বেঁচে আছে। শৈশবে আমার মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে ইহলোকে কোনো স্থায়ী বাসস্থান নেই। পার্থিব সকল পুরস্কারের উর্ধে আছে এক মায়াময় ঐশ্বর্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থ দেখিয়েছিলেন যে গ্রামাঞ্চলে, গরিবের মধ্যেই আছে প্রকৃত গুণমান, এবং স্কুলেই আমি ওঁকে ভালবাসতে শিখি। অক্সফোর্ডে নিও-প্লাতোনিক, নিষ্কাম ভালবাসার পথে চিন্তা গড়ে তুললাম। এর দ্বারা অন্তর্শক্তি গড়ে তোলা যায়, বাইরের পরিস্থিতি তাকে হেলাতে দোলাতে পারে না। এটি না থাকলে গ্রামজীবনের বিচ্ছিন্ন অবস্থিতি ও ট্র্যাজিডি সইতে পারতাম বলে মনে হয় না। ভারতে আমার প্রথম বৎসরগুলি, বিশেষ করে গান্ধীর আশ্রমগুলিতে—তা ছিল অতীব কঠোর ও কঠিন, অতীব মূল্যবান এক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রাক্-প্রশিক্ষণ। আজও আমার অধিকাংশ সময় ও ভাবনা কাটে আদিবাসী মানুষজনের মধ্যে। বাসস্থান যদিও এখন আমার গ্রামে নয়।

ভারত নিয়ে, ভারতীয় হয়েছি বলে আমার বিশাল গর্ব। তবে যে ব্রিটেনের সংস্কৃতিতে আমার উদ্ভব ও সূচনা, তাকে নিয়েও আমি গর্বিত। ডঃ রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন, 'ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর, মানবেতিহাসে মিলনসাধনের মহত্তম কাজগুলির একটি।' প্রাচীন শত্রুতাগুলির কিছু প্রমাণ আছে এ বইয়ের প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে। যেভাবে সেগুলির সমাধান হয়েছে, তার চেয়ে সুখের বিষয় আর হয় না। এ কথা বলতে গিয়ে আমি বিগত দুঃখজনক স্মৃতিগুলি উজ্জীবিত করতে চাই না। তবে ব্রিটিশ আমলের ঘটনাগুলি, আমার জীবন কাহিনী প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ, এবং কিছু কিছু লিখতেই হয়েছে। আর্থার কোয়েসলার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিষয়ে বলেছেন, 'অতীত দিনে প্রতিটি বিশাল সাম্রাজ্যের পতনই ছিল কুৎসিত ও সর্বনাশা। ইতিহাসে এই প্রথম দেখছি। একটি সাম্রাজ্য বিলীন হচ্ছে আত্মমর্যাদা ও শোভনতা বজায় রেখে। এই সাম্রাজ্যের উত্তান কোনো গৌরবকাহিনী নয়। এর পতন কিন্তু তাই,'—এ উক্তির সঙ্গে আমি একমত।

ইউরোপ আমার অস্থিমজ্জায় তবে ভারত এখন তার চেয়েও গভীরে প্রোথিত। এ বই লিখতে বসেই আমি তা উপলব্ধি করি। অধিকাংশই তো ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা,—অধিকাংশ চরিত্রই ভারতীয়। স্ত্রী ও পরিবার ভারতীয়। আগ্রহ ভারতে। অধিকাংশ বন্ধু ভারতীয়, সর্বোপরি ভারতীয় অধিবাসীদের প্রতি আমার ওতপ্রোত, উদ্বিগ্ন ভালবাসা, —অন্য কিছু তো হতে পারত না।

এক ধরনের অভিজ্ঞতার ফলে, আমি যেমন, তেমনটি যে হয়ে উঠলাম। যেমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখি, মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়, তারই সামান্য কিছু বলতে চেয়েছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পাঠকদের।

জীবনকে এক সমগ্রতায় দেখাতে চেষ্টা করেছি। যা যা এ জীবনে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। আদ্যোপান্ত সব কিছু লিখিনি। ইদানীং এক আলোচনায় *টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট*-এ বলা হয়েছে প্রতি আত্মজীবনীই অবশ্যম্ভাবী ভাবে সব-না-বলার রীতি মেনে চলে। আধুনিক পাঠক কিন্তু নিজেকে এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব করে তোলা জীবনী পড়ে খুশ নন। 'সত্য কথন থেকে খুব সরে যাওয়া নয়। তবে দোহাই, খুব খুলেমেলে বলাও নয়'—এমনটি আর নয়। পাঠক পুরো মানুষটাকে জানতে চান। প্রকৃতঅর্থে পাপের স্বীকৃতি, যেই সম্পূর্ণ ডায়েরি, যার কিছু বাদ দেওয়া হয় নি, তাই আজকের চাহিদা। এক জীবনকালের চিত্র যত কালো হবে, তা তত জোর হাততালি পাবে, এমনটাই ঘটছে। সমস্যা এই, যা সাদা নয়, কালো, সে প্রসঙ্গে ও কী যে গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিষয়ে লেখক ও পাঠকবর্গের ধারণায় গভীর পার্থক্য থাকতে পারে।

আমার পথ মাঝেমাঝেই মেঘচ্ছায়ায় আঁধার হয়েছে। এই লেখায় সে বিষয়ে উল্লেখও করেছি। তবে সে সব প্রসঙ্গ খুব বিশদ লিখিনি। মনে করিনি সেগুলো খুব

গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে কিছু লেখক হয়তো ঈর্ষা করবেন, নয়তো বাহবা দেবেন, —অন্যেরা নিন্দা করবেন। তবে সে আমার ব্যাপার। আর আধুনিক প্রবণতা যাই হোক,—আত্মজীবনী লেখার সময়ে,—যা তার প্রাত্যহিক কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শোভন সংযমের সীমারেখা মুছে দেওয়া উচিত, আমি তা মনে করি না। মোটামুটি বলতে পারি, বলব না আমার জীবন খুব সাফাল্যপূর্ণ (কেননা সাফল্যের কথা কখনো মনে রাখিনি), তবে তা খুবই তৃপ্তিদায়ক। অন্তরস্থ আনন্দের ছবিকে ব্যক্তিত্ব-প্রতীক বা 'পারসোনা' বলা চলে না। বাস্তবিকই সেটিই হ'ল সম্পূর্ণ ব্যক্তি।

মেনে নিচ্ছি, আমি সব কথা লিখি নি। সব মানুষকেও এতে ঢোকাই নি। আমার মতে আমি এক বন্ধুত্বপূর্ণ, স্নেহপ্রবণ মানুষ। অনেকে আমার বন্ধু হয়েছেন। তবে আত্মজীবনী তো ক্যাটালগ নয়। বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে যাঁদের দাম তখন বেশি ছিল, তেমন বহুজনের নাম করতে পারি নি। আশা করি তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন। মনে করবেন না আমি তাঁদের ভুলে গেছি। বুঝবেন, যে এমনটি ঘটার কারণ মাত্র একটি। কোনো গ্রন্থকার যদি চান, তাঁর বইটি মানুষ পড়ুক,—বইটা বেজায় মোটা যেন না করে ফেলেন।

শিলং, জুলাই ১৯৬৩ — ভেরিয়ার এল্যুইন

সূচিপত্র

দিব্য শৈশব	১
হ্লাদিত যৌবন	১৮
সন্ত ও সত্যাগ্রহী	৪০
বিশপ ও অস্ত্রবল	৮৯
চাঁদের মতো প্রিয়	১০৫
লোকহিতবিদ্যা	১৪৭
পৃথিবীটা গোল	২১১
নেফা যাত্রা	২৩৩
নেফা পর্বতাঞ্চল ভ্রমণ	২৫৯
একটি দর্শন-এর পরিণত হয়ে ওঠা	২৮৬
চূড়ান্ত উচ্চাশা	৩০২
অধরা মাধুরী	৩১৯
নির্ঘন্ট	৩৪৪

চিত্রতালিকা

লেখক, ১৯৫৩-এ; (ফোটো : সুনীল জানা)

(ক) বাচ্চা অবস্থায় লেখক; (খ) বোন এলড়াইথ ও ভাই বাসিলের সঙ্গে, গ) পিতামাতার সঙ্গে দু বছর বয়সে

ছাত্রাবস্থায় লেখক : ক) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, ১৯১৯; (খ) অক্সফোর্ডে তরুণ শিক্ষক হিসেবে লেখক, ১৯২৭; (গ) শিলংয়ে, নিজ লাইব্রেরিতে লেখক, ১৯৬১

লেখক (ক) গান্ধীজির সঙ্গে হাঁটছেন; এবং খ) সবরমতি আশ্রমে মীরাবেনের সঙ্গে কথা বলছেন, ১৯৩১

লেখক (ক) গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলছেন ১৯৩১; (খ) ধুলিয়া জেলে গিয়ে যমনালাল বাজাজ এবং গান্ধীজির সচিব প্যারেলালের সঙ্গে কথা বলছেন, ১৯৩২

১৯৪২এ লেখক (মেইড উড-এর আঁকা প্রতিকৃতি)

গোণ্ড ও পরধান শিশুদের সঙ্গে লেখক, ১৯৪৪

১৯৫০-এ সিংহলে ভেড্ডাদের সঙ্গে লেখক (ফোটো : আর. এল. স্পিটেল)

বণ্ডো পাহাড়ে; ক) শামরাও ও কুসুম হিভালে ১৯৪৬; খ) ভিক্টর স্যাসুন, ১৯৪৭

এক আগারিয়া খনি থেকে আকর লোহা তুলে আনছে (ফোটো : লেখক)

বাস্তারের মুরিয়া চেলিকরা (ফোটো : লেখক)

বাস্তারের বাইসন-হর্ন মারিয়া মেয়ে (ফোটো : লেখক)

সাওরা যুবকরা (ফোটো : ডি. ভি. স্যাসুন)

বণ্ডো মেয়ে রেড়ি শস্যের দানা পাড়ছে (ফোটো : লেখক)

নাচের পোশাকে পাহাড়ি মারিয়া ছেলেরা (ফোটো : লেখক)

নেফা সফরে ক) ১৯৫৬ সালের মে মাসে তাওআং যাত্রাপথে লেখক ও তাঁর স্ত্রী লীলা আপ্যায়িত (ফোটো : আর. এস. নাগ); সুউচ্চ খামলাং উপত্যকায় মিশমি মেয়েদের সঙ্গে লীলা এল্যুইন, নভেম্বর, ১৯৫৭ (ফোটো : লেখক)

নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ারের আদিবাসী মানুষ (ফোটো : লেখক); ক) উত্তর সুবর্নসিরির এক তাগান; কোনিয়াক দলপতির ছেলে; দিগারু মিশমি মেয়ে; তাপাংটাকি, এক মিনিয়ং আবোর

১৯৬৩ সালে লীলা এল্যুইন (ফোটো : সুনীল জানা)

তিব্বতীয় ফ্রন্টিয়ারে কুমার (জে. এল্যুইন), ১৯৫৮ (ফোটো : লেখক)

অশোক ও রানি, ১৯৬১ (ফোটো : পি. পাল)

১৯৬২ সালের এক পার্টিতে নকুল, অশোক ও বসন্ত (ফোটো : পি. পাল)

সিয়াং নদী (ফোটো : লেখক)

প্রথম অধ্যায়

দিব্য শৈশব

১৯০২-এর ২৯ আগস্ট খুব ভোরে ইংল্যান্ডের কেন্ট ডোভারে আমার জন্ম; চার্চের কাছে দিনটি পরিচিত জন দ্য ব্যাপটিস্টের শিরশ্ছেদের তারিখ হিসেবে। আবার রাজা হেরডের জন্মও এই তারিখে। তাঁর জন্মদিনটি পালিত হত বিচিত্রভাবে,— আজকের আদিবাসী নৃত্যের মতো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, এক সুবিদিত পিউরিটান সংস্কারকের বিরোধিতায় তার জন্মতারিখের নাটকীয় উদ্‌যাপনের দিনেই পৃথিবীতে আমার আগমন।

তিন ভাইবোনের মধ্যে আমিই বড়, বোন এলডাইথ দুবছরের এবং ভাই বাসিল আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট ছিল।

কমপক্ষে তিনজন বিশপ আমাকে হ্যারি ভেরিয়ার হলম্যান এল্যুইন নামে দীক্ষিত করেছিলেন। বহুদিন বাদে তাঁদেরই একজন আমাকে বলেছিলেন : 'তোমার মাথা থেকে শয়তান তাড়াতে আমরা তিনজন মিলে চেষ্টা করলাম। তেমন কাজ হল না।'

আমার বাবা এডমন্ড হেনরি এল্যুইন নিজেও ছিলেন অ্যাংলিক্যান বিশপ; তাঁর দায়িত্বে ছিল সিয়েরা লিওন; ব্রিস্টলের বিশপের পদে তাঁকে উন্নীত করা হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডে ফিরে কার্যভার গ্রহণের পূর্বেই অকস্মাৎ পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান; তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ। আমি তখন সাত বছরের। বাবা মার্টনে ছিলেন, পরে সেখানকার কলেজে আমিও পড়েছি। অক্সফোর্ডে সহকারী যাজকের পদে কাজ করার পর তিনি মিশনারি হয়ে চলে যান পশ্চিম আফ্রিকায়। প্রথমে তিনি ওখানকার ফৌরা বে কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হয়েছিলেন চার্চ অফ ইংল্যান্ডের তরুণতম বিশপ।

শতাব্দীর সূচনালগ্নে পশ্চিম আফ্রিকা ছিল নৃতাত্ত্বিকদের কাছে আগ্রহ ও কৌতূহলের ক্ষেত্র। আমাদের বাড়িটা ছিল দুষ্প্রাপ্য বস্তুসামগ্রীতে ঠাসা। মায়ের সুবোধ অমায়িক অভ্যাস ছিল, যে কোনো অ-ক্রিশ্চিয়ানদের মন্দিরে ঢুকে পড়া, আর সেখান থেকে মূর্তি নিয়ে আসা, ওগুলো চলে আসত বাড়িতে। আফশোস হয়, সেগুলোর কয়েকটাও যদি আজ আমার কাছে থাকত! পশ্চিম আফ্রিকা তখন এক দারুণ ব্যাপার। পরিবার একটা কাহিনী প্রচলিত ছিল : এখানে-সেখানে ঘুরতে ঘুরতে মা নাকি একদিন চলে যান নরমাংসখাদকদের এক গ্রামে। মাকে খেয়ে ফেলার তোড়জোড় যখন চলছে বাবা ঠিক সেই সময়েই উদ্ধারকারী দল নিয়ে সেখানে পৌঁছান, এবং হাঁড়িতে চাপানোর মুহূর্তে মাকে উদ্ধার করেন।

বাবার দেখা মিলত কচিৎ। প্রায় সব সময়েই তিনি আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াতেন। দুবার বাবার হাতে পিটুনি খেয়েছিলাম দুষ্টুমি করার জন্যে—এর বেশি কিছু তেমন নেই স্মৃতির ভাণ্ডারে। তার একবারের কথা আজো স্পষ্ট মনে আছে। বাবার বারণ অমান্য করে ছ'বছর বয়সে আমি রেলওয়ে স্টেশনে ছুটে গিয়েছিলাম মাকে বিদায় জানাতে, মা কোথায় যেন যাচ্ছিলেন।

মা ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও কল্পনাপ্রবণ। তাঁর রসবোধ ছিল, পড়াশুনাও ছিল। কবিতা, সংগীত, চিত্রকলা, যে-সবে সারবস্তু রয়েছে সবই তাঁকে আকৃষ্ট করত। দুর্ভাগ্যক্রমে, মায়ের মূল কৌতূহল ছিল যে-ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেখানে এ সবই অবাঞ্ছিত-নঞর্থক। বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, ব্রিস্টলের অনিন্দ্যসুন্দর ক্যাথেড্রেল ক্লোজ-এ আমরা যদি সম্ভ্রমে সঙ্গে ও আর্থিক সচ্ছলতায় জীবন অতিবাহিত করতে পারতাম তাহলে মায়ের জীবনটাও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হত। কিন্তু বাস্তবে ঘটল বিপরীত, বাবার মৃত্যুতে এক অপূরণীয় শূন্যতা দেখা দিল; সেই শূন্যতাপূরণের উপায় হিসেবে মা আরো তীব্র আবেগে সন্তানদের আঁকড়ে ধরলেন, আর ঠিক সেই ভাবাবেগেই ঝুঁকে পড়লেন ধর্মাচরণে। অর্থ-সম্পদ প্রায় ছিলই না। একঘেয়েমির ক্লান্তিকে মা সারাজীবন ভয় পেতেন। আবার সন্তানদের বৃত্তের বাইরে গিয়ে তাঁর কিছু করারও ছিল না। অ্যাপার্টমেন্টে আসবাবসহ একটা 'ঘর' নিয়ে থাকতাম; সাধারণত থাকত একটা শোবার ঘর আর বসবার ঘর; অন্য ভাড়াটেদেরে সঙ্গেই ভাগাভাগি করে বাথরুম ব্যবহার করতে হত। মা হামেশা বাসা বদলাতেন। কোনো বাড়িঅলির সঙ্গেই তাঁর বনিবনাও হত না। ওইসব জাঁদরেল মহিলা আর তাদের সঙ্গে ভয়ংকর ঝগড়াঝাটির পরিবেশেই আমরা বড় হয়েছি। ফলে ছোটবেলায় আমাদের বন্ধুবান্ধব কমই ছিল— খেলাধূলার মতো জায়গা ছিল না, নিরিবিলি একান্ত কোনো স্থান তো নয়ই। আমরা হয় যততত্র ঘুরছি, না হয় বাসা বদল করছি।

মা চিরকালই ধর্মপরায়ণা। হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করতে, জীবনের প্রতি আগ্রহ ফেরাতে মা যিশুর আশ্রয় নিলেন। এভাঞ্জেলিক্যাল অ্যাংলিকানইজম অথবা 'লো চার্চ' (চার্চ অফ ইংল্যান্ডের যে অংশটি পুরোহিতদের মানে না—অনুবাদক) হল খ্রিস্টধর্মাচরণের একটি শাখা, বাবা সেই শাখার অনুগামী ছিলেন। সেটি বস্তুত পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্প্রাণ শুষ্ক ধর্মব্যবস্থা। ফলে তাতে মায়ের মন ভরত না। চার্চের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও মা তাই সান্ত্বনা খুঁজতে শুরু করলেন পুনরুত্থানের মধ্যে। কয়েকটি এভাঞ্জেলিক্যাল গোষ্ঠীর ছিল এই বৈশিষ্ট্য। পুনরুত্থানের ব্যাপারটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর : কারো ধ্যানাবেশ হত, কেউ কথা বলতেন, 'হোলি টেবিলে'র সামনে কেউ নাচতেন। মাও চেষ্টা করতেন, অতটা পারেন নি। আমিও পারিনি। আমি তখন খুবই ছোট, প্রত্যাশা নিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতাম। আশা ছিল, সর্বোত্তম কিছু ঘটবে।

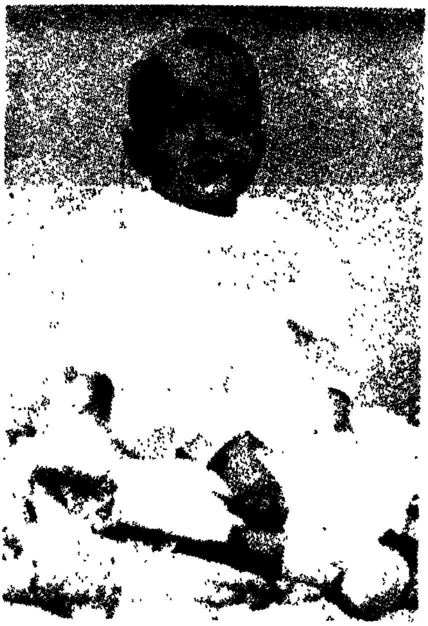

বাচ্চা অবস্থায় লেখক

বোন এলডাইথ ও ভাই বাসিলের সঙ্গে

পিতামাতার সঙ্গে দু বছর বয়সে

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, ১৯১৯

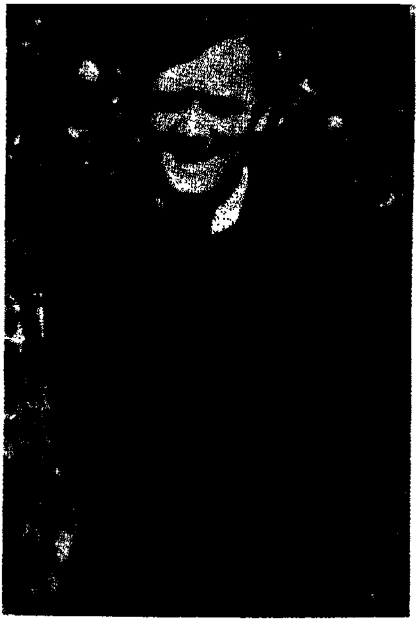

অক্সফোর্ডে তরুণ শিক্ষক হিসেবে লেখক, ১৯২৭

শিলংয়ে, নিজ লাইব্রেরিতে লেখক, ১৯৬১

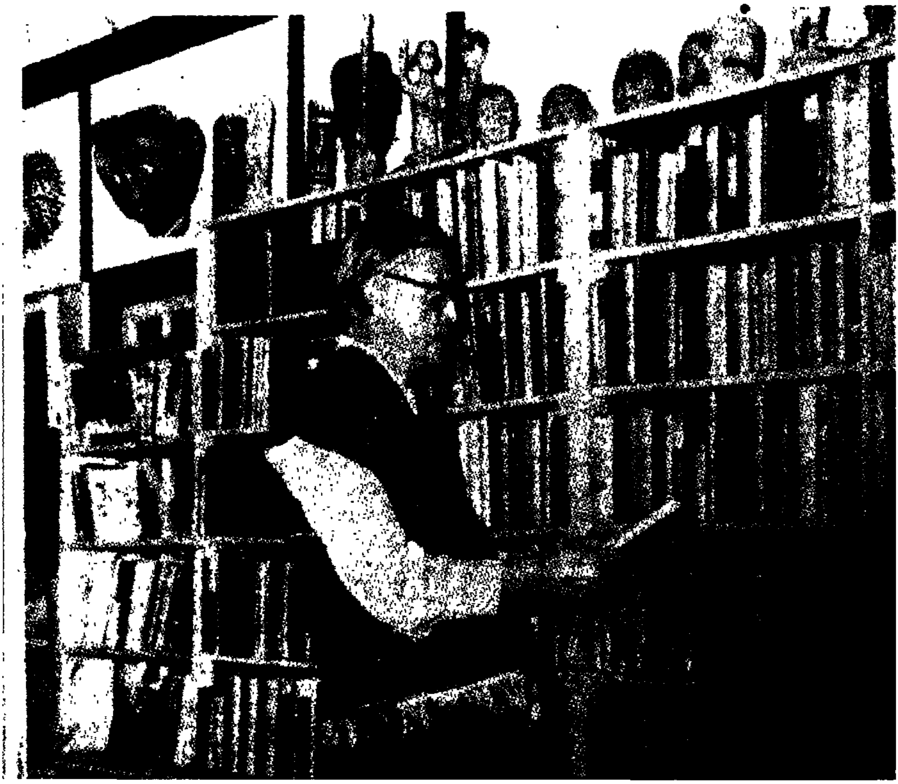

কিন্তু বড় বড় তিনটে ব্যাপার ছিল আমাদের চর্চায়। ঈশ্বরের প্রেরণাদীপ্ত বাণী সংবলিত বাইবেলের প্রতি ছিল অকাট্য প্রশ্নাতীত বিশ্বাস। বাইবেল যেন এক জাদুগ্রন্থ—'প্রেরণা' লাভের জন্যে যে কোনো একটি পৃষ্ঠা খুলে নিতাম আমরা। দ্বিতীয়ত বিশ্বাস ছিল, যে কোনো মুহূর্তে মহামহিম রহস্যময়তায় যিশু আবার আবির্ভূত হবেন; যারা তাঁকে বিশ্বাস করেন তাদের তুলে নেবেন শূন্যে; পুরনো মন্দ পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে অধিকতর ভাল এক পৃথিবী আবার গড়বেন যিশু।

তৃতীয়ত, অটুট বিশ্বাস ছিল, অনতিকালের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাঁর ভর হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের।

এসব বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিক্রিয়াও ছিল। সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাসের মতো কোনো প্রমোদস্থানে আমরা কোনোদিন যেতে পারিনি; প্রোগাম চলার মাঝখানেই হঠাৎ যিশু যদি আবির্ভূত হয়ে পড়েন তাহলে কি না বিপত্তি ঘটবে! মনে পড়ছে, একটা ভাড়া বাড়িতে মায়ের শোবার ঘরের ওপরেই ছিল আমার ঘর। প্রায় প্রতিরাত্রেই গুটি গুটি পায়ে নেমে এসে মায়ের ঘরের দরজায় কান পেতে থাকতাম : মায়ের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কি না—বলা তো যায় না, বিছানার শোবার পরেই হয়তো মা শূন্যে উঠে গেছেন! কখনো সংশয় জাগেনি, এমতো সম্মানলাভের মতো আমি যথেষ্ট যোগ্য কিনা। মায়ের অকস্মাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আমার সুখ ও আনন্দকে সর্বদা মলিন ছায়াচ্ছন্ন করে রাখত।

এরকমই এক পরিবেশে আমি বড় হয়েছি। আত্মার বৈভব-মূল্য একটি শিশুর মনে দেগে দেবার এ ছিল এক সুচিন্তিত বন্দোবস্ত। আমাদের জীবনে কোনো ঐহিক বৈভব ছিল না; সহজ বিশ্বাস ছিল, কোনো শহরই আমাদের জন্যে স্থায়ী বা নির্দিষ্ট নয়; আমরা তো সর্বদাই ভ্রাম্যমান।

এর অর্থ, একটি ছোট বালক হিসেবে নিজেক আনন্দমগ্ন রাখার উপায় আমাকেই খুঁজে নিতে হয়েছিল। দাঁতের ডাক্তারের কাছে পাপমোচন-পর্বে বাগানের পাঁচিলের গর্তটর্ত বোজাতাম অনেকটা সময় নিয়ে। নিজে-নিজে বানাতাম দাঁত-পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, ড্রিল-মেসিন। একটা বিশ্বভাষাও আবিষ্কার করি; তার মূল বাক্যটি ছিল : 'উ লাভো নিসিয়া এইয়া'—'আমি তোমাকে ভালবাসি'। বড় বড় কাগজে নিজের স্ট্যাম্প আঁকতাম। পরে এমনও জিনিস বানিয়েছিলাম যে আজ থাকলে তা বেশ দামি সংগ্রহ হয়ে যেত। ঘটনাটা হল, ভাঙাচোরা বাক্সে মজুত পুরনো চিঠিপত্রের বাণ্ডিলে অনেক দুষ্প্রাপ্য ভারতীয় ডাকটিকিট আমি খুঁজে পাই। ভারতযাত্রার আগে বোকার মতো ওগুলো মাত্র পাঁচ পাউণ্ডে আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্সে বেচে দিই (টিকিট নম্বর ৩৭১৭৬)।

পড়ার মতো বই না পাওয়াটাই ছিল ওই সময়ের বড় অভাব। বই কিনবার সাধ্য আমাদের ছিল না (শস্তা পেপারব্যাক বেরুনোর আগের কথা)। বাড়িতে-এনে-

বইপড়ার লাইব্রেরির সন্ধানও অনেক পরে পেয়েছি। তবু হাতখরচের সামান্য টাকা থেকে 'বয়েজ ওন' পেপারটা আমি প্রতি সপ্তাহে কিনতাম। কি উত্তেজনায় পত্রিকাটির জন্যে দিন গুনতাম! পত্রিকাটি এসে গেলে একটু একটু করে—বরাদ্দমতো পড়া, একটা গল্প একদিনে,—যতটা সময় নেওয়া যায়।

কেমন করে পারতেন জানি না, তবে প্রতিবছরই মা আমাদের নিয়ে ছুটিতে বাইরে যেতেন। নিশ্চয়ই এর জন্যে মাকে নতুন পোশাক বা টুপি কেনা বন্ধ রাখতে হত, ট্যাক্সির বদলে বাসে চড়তে হত, লিঁয়তে চা খাবার সময়ে কেক বর্জনের মতো কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতে হত। ছোটদের এসব বোধগম্য হবার কথা নয়। একবার যাই ক্রোয়ার-এ, আরেকবার কোর্ফ কাসেল-এ; পরে ইস্টবার্ন সোয়ানেজ এবং নর্থ ওয়েলস-এও যাই। এগুলোই আমাদের বাল্যের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত।

আত্মীয়স্বজনরা ছিলেন এই সময়ে আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয়দের সংখ্যাও অনেক। প্রথমে বলা যাক মাতৃকুলের আত্মীয়দের কথা, কারণ তাঁদেরই দেখতাম বেশি, তাঁদের সঙ্গেই আমাদের ভাব ছিল বেশি। মায়ের বিবাহপূর্ব পদবী ছিল হলম্যান। বংশধারা হিসেবে হলম্যানরা ছিল উদারমনা, সজ্জনপ্রকৃতির। এদের কুলতালিকা তেমন সযত্নে লিখিত নেই। আমাদের প্রমাতামহী—দিদার দিদিমার নাম ছিল আগাস্টা অ্যান্ডারসন, তাঁর জন্ম কুইন্সটাউনে। বিপরীতে তাঁর মা ছিলেন মেলভিল, বিয়ে করেন ডাবলিনের অ্যান্ডারসনকে। ১৮২৬-এর এপ্রিলে সতের বছর বয়সে অগাস্টা বিয়ে করেন জেমস ক্যাম্পবেল নামক এক সৈনিককে। তাঁর পরিবারটি ছিল পাইসলে-শাল কারখানার সঙ্গে যুক্ত। এবং এই ক্যাম্পবেলই সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতে যান। এদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। এঁদেরই এক মেয়ে ফ্লোরা ক্যাম্পবেল আমাদের দিদা।

তাঁর এক বোন, আমাদের খুড়তুতো-দিদিমা জেন আঠেরো বছর বয়সে বিয়ে করেন স্লেনকে। সম্ভবত স্লেন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। দিদা বিয়ের এক বছর বাদে মারা যান; আর তাঁর স্বামী স্লেনকে মিউটিনির সময়ে কানপুরে কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়।

আমাদের মাতামহ উইলিয়াম লেবান হলম্যান বাড়ি থেকে পালিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ দেন। অবিভক্ত ভারতে মুরিগামী পথ নির্মাণকার্যে তিনি সহায়তা করেছিলেন। ওই মনোরম পার্বত্য শহরটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও উনি। আমার মায়ের জন্ম ওই মুরিতেই।

নিঃসন্দেহে মাতৃকুলে স্কটল্যান্ডের রক্ত বেশ ভাল মাত্রায় ছিল। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে যোগ থাকায় সম্ভবত আইরিশ রক্তেরও কিছুটা মিশ্রণ ঘটেছিল।

পূর্বপুরুষদের রক্তধারায় স্কটিশ, বিশেষত আইরিশ উপাদান থাকায় হলম্যানদের—আমার মাকেও করে তুলেছিল জীবনের প্রতি মানবিক, কৌতূহলী ও উৎসাহী। ধর্মের ব্যাপারে তাঁরা তেমন আগ্রহী ছিলেন না। যেমন, সাধারণ এক

ধর্মযাজকের সঙ্গে মেয়ে মিনির বিয়েতে দিদা ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন; কিন্তু পরে জামাইটি বিশপ হয়ে গেলে তিনি অনেকটাই বিগলিত হয়ে যান। তিনি কখনো গির্জায় যেতেন না, বাইবেলও পড়তেন না। আমাদের ছোটদের কাছে দিদার একটি গোপন অপরাধ ছিল রোমাঞ্চকর ব্যাপার; উনি লুকিয়ে মদ্যপান করতেন। বেচারি বৃদ্ধা কখনোই বেশি খেতেন বলে মনে হয় না, তবে ওয়ার্ডরোবের কালো জামার স্তূপের আড়ালে এক বোতল ব্রাণ্ডি সবসময়েই লুকনো থাকত। ক্লান্তি বা অবসাদ বোধে দিদা কয়েক চুমুক পান করতেন।

এলডাইথ ও বাসিলের সঙ্গে আমার নিবিষ্ট আলোচনার একটি বিষয় ছিল : 'দিদা কি নরকে যাবেন?' আমাদের বিচারে সেটা ঘটাই ছিল অনিবার্য—কারণ দিদার পাপের কোনো পরিত্রাণ নেই। কিন্তু যাঁকে এতটা ভালবাসি, যিনি এত উদার—যাঁর সামান্য উপার্জন থেকেও আমরা ধরাবাঁধা হাফ-ক্রাউন (আড়াই শিলিং) বা হাফ-সভরেন (দশ শিলিং) পাচ্ছি—কখনো-কখনো সোনার সভরেনও (এক পাউন্ড) জুটে যায় আমাদের—তাঁর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে কীভাবে? তাছাড়া এখনো তিনি যেমন সুন্দরী (অনেক কাল আগে ভারতে তাঁর পরিচয় ছিল পাঞ্জাব-সুন্দরী হিসেবে; তিনি যখন ঘোড়া চালিয়ে যেতেন তাঁকে তখন এক ঝলক দেখার জন্যে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত।) তাঁর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটবে কিভাবে? সর্বগ্রাসী নরকের আগুন চিরতরে তাঁর অলোকসুন্দর মুখখানা গ্রাস করে নিচ্ছে, ভেবেই আমরা শিউরে উঠতাম। মাকে এই সাংঘাতিক প্রশ্নটি করলে তিনিও এড়িয়ে যেতেন। আভাস দিতেন, মৃত্যুর পর ওঁর জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা হতে পারে।

তাঁর দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। দুই মামাই ছিলেন বিষয়ী। তাঁদের আমরা খুবই ভালবাসতাম। ফ্রেড-মামা ছিলেন ডাক্তার। স্কটল্যান্ডের কোনো সুরম্য কেল্লায় বসবাসকারী এক খেতাবধারী পরিবারের তিনি গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। মাঝে মাঝেই তিনি আমাদের নীরেস জীবনকে বর্ণময় করে তুলতেন। ফ্রেড মামা ছিলেন দরাজ-দিলের মানুষ। বছরে দু-একবার আমাদের ভাড়াটে বাড়ির ঠিকানায় চলে আসত কয়েক ঝুড়ি ফিজেন্ট ও গ্রাউজ (দুটোই সুখাদ্য পাখি—অনুবাদক), স্যমন মাছ, টুটিফ্রুটি ও আরো অনেক সুখাদ্য। মা দারুণ রাঁধুনী ছিলেন—নানা উপচার সমেত ওগুলো, রাঁধতেন।

ফ্রেড-মামা ছিলেন স্পোর্টস্‌ম্যান। মাছ ধরতেন, শিকার করতেন, প্রমোদতরী চালাতেন; মনে হত, ওঁর টাকাপয়সার কোনো অকুলান নেই। ঢালাই সিসের তৈরি সৈনিক ও কামান আমাদের জন্যে নিয়ে আসতেন বাক্স-বাক্স। সেসব নিয়ে আমরা খুব খেলতাম।

হারবার্ট-মামা ছিলেন সৈনিক। তিনি আরো জমাটি মানুষ। তাঁর জীবনটাই ছিল অ্যাডভ্যাঞ্চারের। রুশ, ফরাসি, ও জার্মান ভাষার উচ্চমানের দোভাষী ছিলেন। ফলে

বিশেষ-বিশেষ দায়িত্বে তাঁকে দুনিয়ার এখানে সেখানে পাঠান হত। গত শতকের শেষদিকে বক্সারদের দমনের জন্য চাইনিজ এক্সপিডিশনারি ফোর্সের সঙ্গেও তাঁকে পাঠান হয়। তার কয়েক বছর বাদেই তাঁকে পাঠান হল মাঞ্চুরিয়া। রুশবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি রুশ-জাপান যুদ্ধও কিছুটা প্রত্যক্ষ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কৃতিত্ব পূর্ণ কাজের স্বীকৃতিতে ১৯১৯-এ দক্ষিণ রাশিয়ার ব্রিটিশ মিশনের প্রধান মনোনীত হন। সেখানকার বলশেভিকরা ঘোষণা করেছিলেন, ধরতে পারলে ওঁকে মাথা-নিচে পা-উপরে করে ক্রুশে বেঁধা হবে।

আমরা অক্সফোর্ডে যাবার বছরেই উনি ফিরে এলেন ভারতে। বহু বছর আগে ভারতে তিনি ১৬ নং বেঙ্গল লেনসার বাহিনীতে ছিলেন। প্রথমে সিন্ধ্-রাজপুতানা এবং পরে মাউ-এ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমলাতান্ত্রিক লাল-ফিতে ব্যবস্থার ওপর তাঁর ছিল তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণা। সিমলাতে দলিলপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেবার পর (দুর্ভাগ্যবশত তার মধ্যে এমন কিছু জমির দলিল ছিল যার কোনো নকলও নেই) তাঁর নাম হয় 'ফাইল-জ্বালানো হলম্যান'। পদোন্নতির চূড়ান্তে তিনি হন লেফটেনেন্ট জেনারেল। ১৯২৮-এ তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন; নামের পেছনে তখন খেতাবের পর খেতাব, কে. সি. বি., সি. এম. জি., ডি. এস ও। বিশ বছরের অধিক কাল ধরে তিনি ছিলেন কন্‌ট্-এর ষষ্ঠ ডিউকের 'ওন লেনসার' (ওয়াটসন হর্স)-এর কর্নেল। ওঁর সান্নিধ্যে থেকে আমাদের মনে হত এক বৃহত্তর জগতের স্পর্শ পাচ্ছি— এক বিশেষ সম্মাননার উষ্ণ সংস্পর্শে এসেছি।

মাসিদের মধ্যে পলি-মাসি ছিলেন আমাদের সবারই খুব প্রিয়। অধিকারকামী মায়েদের জন্যে যেসব মেয়েকে সবকিছু আহুতি দিতে হয়, পলিমাসি সেই হতভাগ্য নারীদেরই একজন। তিনি বিয়ে করেননি, বিয়ে করতে তাঁকে দেওয়া হয়নি; দিদাকে দেখভাল করতে হবে, এই কারণে। আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর, সম্ভবত তিনিই ছিলেন মায়ের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। খুবই নির্দোষ, বুদ্ধিমতী, চমৎকার মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর বাবার খুব আদরের মেয়ে ছিলেন বলেই তাঁর বাবা, আমাদের দাদু তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়ে মাসি ওয়ারদিং-এ একটা ছোট বাড়ি কেনেন। সেখানে তিনি একা থাকতেন বলেই মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে মাসির ওখানে থাকতাম। একটি ছোট বালক হিসেবে ওই শহরে স্যার আলফ্রেড ডগলাসকে ঘুরতে-ফিরতে দেখেছি। তবে ওঁর সেই বিখ্যাত ছোট বালকদের চায়ের আসরে আমি কোনোদিন আমন্ত্রণ পাইনি। সম্ভবত সেটা এমনিই। পলি-মাসির ভারতীয়করণ হয়েছিল অন্যদের তুলনায় বেশিই। এখনো মনে পড়ে, প্রায়ই শুনতাম 'ডাক', 'ধোবী'—কখনো-কখনো 'শূয়ার কা বাচ্ছা'র মতো গালাগালও। সুস্বাদু কারি রাঁধতেন পলিমাসি (আমার মাও) আর জিলিপি ভাজতে ছিলেন ওস্তাদ।

আর ছিলেন লুমাসি। মোটাসোটা সাদাসিধে দেখতে। লুমাসি বিয়ে করেছিলেন

শুকনো নীরস এক আর্কিটেক্টকে। তাঁদের ছিল অনেক ছেলে, আমাদের মাসতুতো ভাইসব। তাদের একজন সাবমেরিন-কমাণ্ডার ছিল; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সে ডুবে মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সিঙ্গাপুর হাতছাড়া হবার পর তাঁর আর এক ছেলে মারা যায় জাপানিদের হাতে।

এছাড়াও ছিলেন বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন; তাঁদের কথা সাধারণত চেপে যেতাম। হতভাগিনী লুয়ি আমাদের এক সম্পর্কিত দিদি। রোমান চার্চে যোগ দেবার মতো গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছিলেন তিনি। অস্পষ্ট মনে পড়ে তাঁকে— কোমল, সহৃদয়, ছোটখাটো সেই দিদির গলায় ঝুলন্ত ক্রশ। তবে তাঁর কাছে ঘেঁষবার বিশেষ সুযোগ জোটে নি আমাদের।

আর ছিল হিউ-দাদা। একদিকে তাকে নিয়ে যেমন সবাই হেনস্ত, অন্যদিকে সেই ছিল পারিবারিক সন্তোষের উৎস। হেনস্ত হওয়ার কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকেই তাকে সেনাবাহিনীতে ঢোকানো হয়। 'রং রুট' অফিসাররা তেমন দক্ষ ছিলেন না। শপথ নেবার কয়েক মাসের মধ্যেই দাদা পাগল হয়ে যায়। অন্যদিকে, সে তখন পুরোদস্তুর সৈনিক, তাই গভর্নমেন্টকেই তার বাকি জীবনের দায়িত্ব নিতে হল। ফলে সবারই প্রচুর টাকা বেঁচে যায়। আমার ধারণা, হিউদাদা ছিল নেহাৎ 'সাদাসিধা'। মাঝে মাঝে বাইরে বেরুবার অনুমতি মিলত তার। দাদা এলে আমাদের খুব ভাললাগত। সে আমাদের দুঃখের গাথা গেয়ে শোনাত। দাদার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মা হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভার্জিন মেরি। মাকে দাদা তেমনই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। কিন্তু এই বিশ্বাস অনুযায়ী আমার প্রাপ্য মর্যাদাটা সে কখনো দেয়নি।

বিপরীতে আমার পিতৃকুল, এল্যুইনরা ছিলেন কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ।

এল্যুইনরা ওয়েলশ নয়, এক অ্যাংলো-স্যাক্সন পরিবার। ওয়েলশে এল্যুইন একটি ক্রিশ্চিয়ান নাম, কেন্টে তা একটি পদবি। বার্কে-এর 'ল্যান্ডেড জেনট্রি' গ্রন্থে ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁদের নাম রয়েছে। (খুবই অস্বস্তিকর, ওই উন্নাসিক গ্রন্থে আমার নামটিও অন্তর্ভুক্ত। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, একটি ছ'ফিটের কবর-ভূমির দখলই আমি প্রত্যাশা করি।) পূর্বপুরুষদের কেউই তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে হেনরি এল্যুইন ছিলেন 'নিউ ইন্-এর অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যারিস্টার'। দু'শ বছর বাদে জনৈক মাইকেল এল্যুইনকে নেভির খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বিভাগের অফিসার হিসেবে চোখে পড়ছে। সাধারণভাবে এল্যুইনরা সলিসিটর-অফিস কর্মচারী, আর সাম্প্রতিককালে যাজকই ছিলেন। আমার দুই কাকা আই-সি-এস ছিলেন। মর্লে-মিন্টো সংস্কারকালে তাঁরা চাকরিতে ইস্তফা দেন। ছোটকাকার দুই ছেলে, ডি. এইচ এল্যুইন মাদ্রাজে এবং আর. বি. এল্যুইন পাঞ্জাবে আই-সি-এস ছিলেন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি তারা পদত্যাগ করে দেশ ফিরে যান। সম্ভবত মার্গারেট এল্যুইন বাদে আমিই প্রথম এল্যুইন যে চারশ' বছরের বংশ-ইতিহাসে ধর্ম ও রাজনীতির

গোঁড়া রক্ষণশীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। মার্গারেট এল্যুইনের নামটি কিন্তু বার্কে-এর গ্রন্থে নেই। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে নরফোকের একটি শহরে অগ্নিসংযোগ ও বাত্যা সৃষ্টি করে সেই আগুনকে ছড়িয়ে দেবার অভিযোগে তাঁকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

যতদূর জানি, এল্যুইনরা ছিলেন প্রথাগত রক্ষণশীলতায় একনিষ্ঠ; এবং সেটা নিঃসন্দেহে 'লো চার্চ'-এর ধর্মাচরণে।

অনেক পরে আমার প্রাক্তন আই-সি-এস কাকা এডগার এল্যুইন তাঁর পরিবারের মেয়েদের আমার লেখা বই পড়তে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আত্মীয় না হয়েও আমার গড-ফাদার ছিলেন বিশপ টেলর-স্মিথ; তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সশস্ত্র বাহিনীর চ্যাপলেন-জেনারেল ছিলেন। অ্যাংলিকান যাজকদের ক্রুশ-ধারণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তিনি খুব দুর্নাম কুড়িয়েছিলেন। তাঁর আর একটা বীতরাগের বিষয় ছিল হস্তমৈথুন। এ নিয়ে প্রায়ই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন। বীর্য রক্তের চেয়ে চল্লিশ গুণ দামি, বীর্যশূন্যতায় চোখের কোলে কালি পড়ে, মন অবসাদগ্রস্ত হয়; ধূমপানের চেয়েও বীর্যশূন্যতা কিভাবে শরীরের বাড় কমিয়ে দেয়—এসবই বোঝাতেন।

মনে পড়ছে পরবর্তীকালের একটি মজার ঘটনা। অক্সফোর্ডের 'স্কোয়াস খেলা'র এক জমায়েতে টারজানের মতো বুক চাপড়ে আমার গড-ফাদারটি চিৎকার করে বলেছিলেন : 'জীবনে নারীস্পর্শ করিনি, দেখো আমাকে! দেখো একবার!'

তাঁর শ্রোতারা যেহেতু তখন সমকামিতার (নিঃসন্দেহে সাময়িক) একটি পর্যায় অতিক্রম করছিল তাই ব্যাপারটা উতরে গেল। বাবার অপর এক বন্ধু, টাইনডেন-বিস্‌কো ছিলেন একেবারে ভিন্ন মেরুর। তিনি শুধু বলতেন, পু-রু-ষ হও। কথাটা কানে বাজলে আজো কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি।

আমরা বড় হচ্ছিলাম। এলডাইথ ফুটফুটে সুন্দর এক বালিকা; আমি গাট্টাগোট্টা বাড়বাড়ন্ত চোয়ালে এক বালক। চোয়ালটাকে প্রতি সন্ধ্যায় সাংঘাতিক এক মেসিন লাগিয়ে ভিতরপানে ঠেলতে হত, খুবই কষ্টকর ছিল সেটা। বাসিল ছিল বাড়ির সবার আদুরে। আমি আর এলডাইথ মিলে ওর পিছনে লাগতাম। আমি যখন ছ'বছরের তখন এক গর্ভনেস এলেন। সেন্ট জন্‌স্ গস্‌পলের প্রথম অধ্যায়টি তিনি আমাদের মুখস্থ করালেন। এ হেন উচ্চমার্গীয় অভিজ্ঞতার পরেও দু-এক বছরের মধ্যে আমার মধ্যে দেখা দেয় দুষ্টুমির নানা লক্ষণ। হিতার্থে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল লণ্ডনের এক ছোট আবাসিক স্কুলের ছাত্র হিসেবে। সেখানে সহপাঠী সবাই মেয়ে, তারা দুর্বিষহ করে তুলল আমাকে। আমাকে বেঁধেছেদে টেবিলের তলায় ঢোকায়, পিছনে কিছু ফুঁটিয়ে খোঁচায়। সেখানকার খাবারদাবারও ভাল লাগত না। শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি মা লন্ডনে এলেন (আমরা তখন ওয়েলিংটন নামক একটি ছোট শহরে

থাকি)। মা আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা তারপর রেইগেট-এ চলে যাই। সেখানে একটা গোটা বাড়ি ভাড়া নেয়া হল। সে এক দারুণ মজা। একটা বাগানও ছিল। রান্না মা নিজেই করতেন, চমৎকার সব খাবার হত। একজন কাজের লোক রাখা হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ বাদেই মায়ের জামা-কাপড় পরে শ'খানেক পাউন্ডের ছুরি-কাঁটা-চামচ নিয়ে সে সরে পড়ল। পুলিসি অভিজ্ঞতা সেই প্রথম; দারুণ অভিজ্ঞতা। পলাতকার আঙুলের ছাপসহ এক জোড়া জুতো খুঁজে পেলাম আমি। মনে পড়ে, জীবনে সেই প্রথম আমি আমার সম্বন্ধে প্রশংসা শুনি। মা বলেছিলেন : 'ভেরিয়ার, তুমি এক সাচ্চা ছেলে!' সৌভাগ্য, জিনিসপত্র সবই বিমা করা ছিল, তাই টাকা ফেরত পেয়ে উপকারই হল। আর এই ঘটনার জন্যেই সম্ভবত আমি চিরকাল অপরাধ-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক।

তারপর রেইগেটের একটি ভাল এভাঞ্জেলিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলাম। সেখানকার একটি ঘটনার বেশি আর কিছুই মনে নেই। জুতসই একটা জায়গায় আমরা জনা ছয়েক ছাত্র মিলে একটা ইউনিয়নের মতো বানাই; তারপর দাবি তুললাম : কাজের ঘন্টা কমাও, লাঞ্চে ভাল খাবার দাও। হেডমাস্টারকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন মা। আমি আর হেডমাস্টার, দুজনার মধ্যে সম্ভবত তাঁরই ভোগান্তি হয়েছিল বেশি।

এরপর ইস্টবার্নের এক প্রিপ্যায়রটরি স্কুলে যাই। সেখানকার হেডমাস্টার ছিলেন অতিকায় লালমুখো মিঃ পি.। তিনি এসময়ে এমন কিছু শিখিয়েছিলেন জীবনভর যা মূল্যবান মনে হয়েছে।

এক সহকারী শিক্ষক বাথরুমের কাছে ঘুরঘুর করতেন, ছেলেরা বেরিয়ে এলেই তাদের কাছে অশ্লীল প্রস্তাব রাখতেন। এক সময়ে এই বিকারকামের কথা মিঃ পি-এর কানে পৌঁছায়। তিনি তদন্ত করলেন। সাক্ষী হিসেবে ডাকা হল আমাকে। আমি ভয়ানক বিব্রত, বিচলিত—যৌনতার রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে, অবশ্য তাকে যদি যৌনতা বলা চলে তবে তার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

ফলে জিজ্ঞাসাবাদকালে আমার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে, জিব থেকে কথা বেরোয় না। মিঃ পি. ছিলেন অনেক লম্বা; অনেক উঁচু থেকে অনেকটা যোহ্‌বো'র মতো তিনি সগর্জনে বললেন : 'স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই, এই ছেলে, স্পষ্ট কথা স্পষ্ট বলো।' সেই থেকে চিরকাল, বিশেষত আমার *দি বাইগা* গ্রন্থে সে-চেষ্টাই আমি করেছি।

যখন আমার বয়েস তের তখন পাবলিক স্কুলের সমস্যা দেখা দিল। স্কুল-সন্ধানে আমাদের পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরা সজাগ দুটি বিষয়ে। প্রথমত রোমান চার্চের সংস্পর্শ থেকে আমি যেন দূরে থাকি, দ্বিতীয়ত আধুনিক বিদ্যাচর্চায় বাইবেলের ওপর যে অবিশ্বাস জন্মায় তা থেকে আমাদের মুক্ত রাখতে হবে।

বাবার ইচ্ছে ছিল, আমি ওয়েস্টমিনিস্টার যাব। কিন্তু পরিবারের বিশুদ্ধ ও

পরিত্রাহী দৃষ্টিতে সেখানে আশঙ্কা রয়েছে, রোমান ক্যাথলিক অনাচারের সংস্পর্শে আসার। বাগবি'র কথাও ভেবেছিলেন বাড়ির সবাই, কিন্তু সেই স্কুলের হেডমাস্টার ড. ডেভিড কথায়-কথায় বলেই ফেলেছিলেন জেনোসিস-এর শুধুমাত্র প্রথমাংশকে সত্য বলে মনে হয় তাঁর। তাও প্রতীক হিসেবে। ফলে ওখানে যাওয়া হল না।

শেষে এক মিশনারি সুহৃদের পরামর্শে পশ্চিমের চেলতেনহামের ডিন ক্রোজ স্কুলে পাঠান হল আমাকে। সেই স্কুলটা স্থাপিতই হয়েছিল এভাঞ্জেলিক্যাল ধর্মতন্ত্রের মৌল আদর্শকে তুলে ধরতে। আর সেখানে নিশ্চয়ই থাকবে না সাধারণ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ঈশ্বরলোককে বোঝার অর্থহীন প্রয়াস।

আমার শৈশব ও বাল্য যেমন ধর্মনিয়ন্ত্রিত ছিল তেমনি স্কুলেও ধর্মাচার ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু নিয়মিত প্রার্থনা আর ভজনালয়ের পরিষেবা নয়, ছিল রবিবাসরীয় প্রার্থনাসভার মতো প্রথাও। অতি ধর্মপ্রাণ কয়েকটি ছাত্র (অন্যতম আমি) একটি নির্জন ক্লাসঘরে সমবেত হয়ে একে অপরকে ধর্মোপদেশ দিই। শেষে ছিল তাৎক্ষণিক ভাষণে ঈশ্বরবন্দনা। আমার কাছে সেটা ছিল প্রায় অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া সেখানে ধর্মযুদ্ধের মতো একটা ব্যাপারও ছিল। আপাত ধর্মীয় হলেও পুরোপুরি সেটা পরমার্থিক ছিল না। সেটা শুরু হত খুব ভোরে, প্রাতঃরাশের আগে। এবং শেষত ওখানে ছিল শাস্ত্র-সংসদের মতো সংগঠন। সেই সংগঠনের সদস্যদের আজীবন বাইবেল-পাঠের শপথ নিতে হত। ফলে বাইবেলটা প্রতিবছর বারবার পড়ে ফেলায় ছোটদের কাছে তার অধ্যায়গুলো খুবই প্রাণহীন ঠেকত। বিকল্প কোনো আমোদ-প্রমোদের উপকরণ না থাকায় সেটাই ছিল একমাত্র অবলম্বন।

ডিন ক্রোজ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন ড. ডব্লয়ু. এইচ. ফ্রেকার— জেমস এলরয় ফ্রেকার-এর বাবা। জেমস্ ফ্রেকারকে একজন উচ্চমানের কবি বলে এখনো বিবেচনা করি আমি। আমি যখন ওই স্কুলের ছাত্র তিনি তখন খ্যাতির শীর্ষে; রুপার্ট ব্রুক ও তিনি ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বের জনপ্রিয় কবি। তাঁর কবিতায় সুরারোপ করে আমরা ভজন গাইতাম। তাঁর 'মাস্‌ক্ অব দি মাগি' গানটা ছিল দারুণ; খ্রিস্টমাসের প্রাক্কালে প্রতি ডিসেম্বর সেটা আমরা গাইতাম।

ফ্রেকার-পরিবারের মাত্রাধিক প্রভাব পড়ে গিয়েছিল আমাদের ওপর। তাঁর এক ছোট ছেলে কিছুদিন আমাদের ক্লাসিক পড়িয়েছিলেন, তাঁর এক মেয়ে বিজ্ঞান পড়াতেন, আর বৃদ্ধা শ্রীমতী ফ্রেকার চেষ্টা করেছিলেন আমাকে হিব্রু শেখাতে। অবশ্য নৈশ-তদন্তের জন্যেই তিনি আমাদের জীবনে বেশি ছাপ ফেলেছিলেন। ডাইনিং রুমের এক প্রান্তে দাঁড়াতেন তিনি; নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার নিচের বালকরা সারিবদ্ধভাবে তাঁকে অতিক্রমকালে 'হ্যাঁ (বা না) শ্রীমতী ফ্রেকার, চায়ের সঙ্গে চারটে' (বা যে'কটি) বলতাম। এই 'হ্যাঁ' বা 'না'-টা পাকস্থলীর নড়াচড়ার রিপোর্ট। 'চায়ের সঙ্গে চারটে', মানে চারটে বিস্বাদ রুটি—এটাই ছিল মধ্যদিনের প্রধান আহার্য।

মিঃ ফ্রেকার যে বড় ধরনের মানুষ ছিলেন সে-বিষয়ে আমার সামান্যতম সংশয় নেই। প্রায় দুঃস্থ অবস্থা থেকে তিনি স্কুলটাকে গড়ে তুলেছিলেন; তাঁর নামযশও ছিল, বিশেষত পশ্চিমে। মিঃ ফ্রেকার ছিলেন অসাধারণ ধর্মবক্তা; তাঁর ধর্মোপদেশ শুনবার প্রতীক্ষায় থাকতাম আমরা। তাঁর ভাষণে অন্তর্লীন থাকত সাহিত্যরস। আজো মনে আছে, একদিন তিনি মিলটনের ওপর এক অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল কিছুটা জার্মান রক্ত। যুদ্ধের ঘোর দুর্দিনে সেটাই তার বিরুদ্ধে যায়। ফলে দু-একটি ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছেন তখনই চেলতানহাম-এর তথাকথিত ভালমানুষের দল গির্জা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

সম্ভবত ডিন ক্লোজ খুব ভাল স্কুল ছিল না। কিন্তু সেখানে হরহামেশা কিছু একটা ঘটতই। রোমাঞ্চকর গ্রিন বাইসাইকেল মার্ডারের কথা পরে বলছি। আর একদিনের ঘটনাও ছিল তেমনি উত্তেজনাকর। একদিন হল-এ দাঁড়িয়ে ড. ফ্রেকার বললেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্সে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি একখানা বাইবেল, এক কৌটো সারডিন মাছ, এক প্যাকেট টয়লেট পেপার চুরি করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা ঘটে থাকবে অনাবধানে, অন্যমনস্কতায়। কিন্তু জার্মানবিরোধী মনোভাব তখন এত তুঙ্গে যে পুলিস ঘটনাটিকে কোর্ট অবধি নিয়ে যায়। অবশ্য কোর্টে গিয়ে সেটা খারিজ হয়ে যায়।

আমি ছিলাম তখন বেশ লাজুক প্রকৃতির, অনাকর্ষক, আর খুবই নীতিবাগীশ। মামাদের সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় মন আচ্ছন্ন। মানসে সুগ্রথিত ছিল মায়ের বিশ্বাসটাও : খ্রিস্টের প্রতি অনুগত থাকার পরমানন্দের ঊর্ধ্বে জগৎসংসারে আর কিছু নেই।

একবার সহপাঠী ছাত্রদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালাই। একটি তালিকায় আলাদা-অলাদা ঘর বা কলাম ছিল। পরিত্রাণ পাবার সম্ভাবনা বিচারে রেখে নৈতিকতা, বুদ্ধি, ধর্মবোধ, প্রফুল্লতার ক্ষেত্রে কে কত নম্বর পেতে পারে তা বসিয়েছিলাম। উদ্ভট হোক আর যাই হোক, নৃতত্ত্ববিদের সহজাত প্রবণতা তখন থেকেই বোধহয় আমার মধ্যে সক্রিয় ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই বিচারের নথিটি একদিন ভুলবশত স্কুলের বাথরুমে ফেলে আসি। অশেষ মনস্তাপে পরে দেখি, সেই তালিকার অংশবিশেষ ব্লাকবোর্ডে লিখে রাখা হয়েছে; আর 'প্রফুল্লতা'র কলামে কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্ররা আমাকে শাসাচ্ছে।

সাত বছর থেকে শুরু করে অক্সফোর্ডের তৃতীয়বর্ষ পর্যন্ত আমার জীবনে অন্যতম মুখ্য বিষয় ছিল চিলড্রেন্স স্পেশ্যাল সার্ভিস মিশনের বা সি. এস. এস. এম.-এর কাজ। খুবই উদ্যোগী সংগঠন। এই সংগঠনের ব্যবস্থাপনাতেই অগাস্ট মাসের মনোরম ছুটিতে দেশজুড়ে সমুদ্রপাড়ের বসতিগুলোতে মিশনের কাজ হত। একদল কর্মী নেমে পড়ত ইস্টবার্নে বা লয়েনফেয়ার ফেশনের মতো জায়গায়। তাদের উচ্চাভিলাষী প্রোগ্রামে থাকত আলাপ-আলোচনা, খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ।

সাধারণত মিশনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত। সমুদ্রসৈকতে বালির মঞ্চ গড়ে সেটা

সাজানো হত ঝিনুক আর সমুদ্রগুল্মে। একটা লাল নিশান পুঁতে সেখানে গলা-ছেড়ে গান হত। আর ছিল নানারকম প্রতিযোগিতা, খেলাধূলা; চীনে লণ্ঠন নিয়ে মিছিলের মতো একটা ব্যাপারও ছিল। একটা কোরাস গাইতাম সকলে : 'আই অ্যাম হ্যা-পি।' আর একটা গান ছিল : 'জয় জয় জয়-উইথ জয় মাই হার্ট ইজ রিগিং'। তখনকার অনুভূতি ওই গানেই ধরা পড়ে।

তবে তার দুটো ব্যাপার তেমন ভাল ছিল না। প্রথমত, ধর্মের ব্যাপারে সি. এস. এস. এম বেশ বাধ্যতামূলক অস্বাভাবিক মাত্রায় অকালপক্কতা তৈরি করত। মনে পড়ে, আমি সাত বছরের বালক, সমুদ্রসৈকতে বসে আছি; আর তখন এক নিষ্ঠাবান এভাঞ্জেলিক্যাল যাজক আমাকে অনুপ্রাণিত করতে চাইছেন স্বীকারোক্তিতে : দু-বছর আগেই যিশু সমীপে আমি মনপ্রাণ উৎসর্গ করে ফেলেছি। এবং প্রসন্নচিত্তে আরো বলেছিলাম, এতে আমার কোনো লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই। পরে এই নিয়ে এলডাইথের সঙ্গে আমার ঝগড়া বাঁধে; কারণ সেও ঘোষণা করেছিল, যিশুতেই তার হৃদয় সমর্পিত। আমি তো রেগে আগুন, আমার একচ্ছত্র অধিকারে সে কেন হানা দেবে।

সক্রোধে এলডাইথের মাথায় একটা সেলুলয়েডের পুতুলের বাড়ি মেরে আমি জানাই : 'পরিবারের পক্ষে সেটা একমাত্র আমিই করেছি।' দৈহিক আঘাত খুব না লাগলেও মানসিক আঘাতটা ও খুবই পেয়েছিল। শাস্তি হিসেবে সারাদিন আমাকে শোবার ঘরে বন্দি থাকতে হল, আমার ব্লেজার থেকে স্কুলের ব্রেস্ট খুলে নেওয়া হল। আজ বিস্ময় ও পরিতাপের সঙ্গে ভাবি, আমাদের মধ্যে স্বর্গারোহণের যোগ্যতা তো রয়েছে একমাত্র এলডাইথেরই; নিঃসন্দেহে সেটাই হবে তার যথার্থ পুরস্কার।

উচ্চবর্গের মধ্যে ধর্মাচরণকেই সি. এস. এস. এম. উৎসাহ দিত; পরবর্তীকালে সেটাই বাক্‌ম্যানিজম-এর ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে। সি. এস. এস. এমের ধর্মসভা, আমোদপ্রমোদ সবই সীমাবদ্ধ ছিল বিশেষ 'অভ্যাগত'দের জন্যে— সৌভাগ্যবান তেমন সন্তানদের জন্যেই যাদের পিতামাতারা সৈকাতাবাসে রাখার ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। গ্রামবাসীরা সেখান ঠাঁই পেত না। স্থানীয় মানুষের ছেলেদের তুলনায় অভ্যাগতদের ছেলেপুলেরা তো উঁচুবর্গেরই। বিপরীতে স্থানীয় সান্‌ডে স্কুলের সাদামাটা ব্যবস্থাপনাতেই আত্মিক তৃপ্তি ঘটত গ্রামের ছেলেমেয়েদের। ফলে সি. এস. এস. এম যদিও আমাদের পরিপাটি পোশাকে সজ্জিত করে উচ্চবর্গের কাছে আদরণীয় করে তুলেছিল, কিন্তু একই সঙ্গে গড়ে তুলেছিল অর্থনৈতিক ও শ্রেনীমানগত বৈষম্যের প্রতিবন্ধকতাও। নিঃসন্দেহে সেটা খুবই বেদনাদায়ক। আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়, অথচ সেদিন কিন্তু কারোরই মনে হয় নি, কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা আছে। সি. এস. এস. এম টিকে থাকলে ব্রিটেনের সামাজিক বিপ্লব আজ তার স্বরূপ বদলে দিত। একটা কারণেই এই ধরনের আশা পোষণ করি, ছোটবেলার এই বিষয়টায় আমি বাস্তবিকই নিদারুণ লজ্জিত। তবে কি, ওই ছুটি-

কাটানোটা আমাদের নিরুত্তাপ জীবনে যথেষ্ট উত্তেজনা ও বৈচিত্র আনত।

ডিন ক্লোজ স্কুলে যাবার পরপরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমরা ছিলাম সুদূর পশ্চিম প্রান্তে, তাই প্রথম-প্রথম যুদ্ধের কোনো আঁচ পাইনি। আমার বয়স তখন বারো। কিন্তু তারপরই ভাল-ভাল শিক্ষকের তলব পড়ল, উপরের ক্লাসের ছাত্রদের নাম উঠল দুর্বিপাক-মোকাবিলা বাহিনীর তালিকায়; খাদ্যের মান খারাপ হতে থাকে। ক্রমশ যুদ্ধের বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটতে লাগল। কয়েকদিন যেতে না যেতে দেখি কখন যেন আমরা ঘোড়ার মাংসও খেতে শুরু করে দিয়েছি। রেশনের চিনি, রুটি, মাখনের জন্যে অধীর হয়ে পড়েছি। সাদা ইঁদুরের পরিবর্তে একদলা মাখন বিনিময় করতাম আমরা; খাদ্যসামগ্রী, ডাকটিকিট ইত্যাদি হয়ে উঠল বিনিময় সামগ্রী।

এরপরই ছড়িয়ে পড়ল সেই ভয়াবহ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী; স্কুলের প্রতিটি ডরমিটরিতে একই সঙ্গে, পরিচারকদের কোয়ার্টারে আরো তীব্র আকারে। প্রথম দুদিনে তো কেউ কাউকে দেখার নেই, কোনো পথ্যও নেই কারো। এখনো মনে আছে, একটুখানি দুধের জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঘর থেকে নিচে নেমে আমি রান্নাঘর অবধি গিয়েছিলাম। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বাস্তবিকই ভাল ছেলে, সে তো মারাই গেল। শেষমেশ খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর নার্সরা এসে দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ অফিসার্স ট্রেনিং ক্যর্‌জকে উদ্দীপিত করল। কোনোদিনই খেলাধূলায় আমি খুব আসক্ত ছিলাম না। আর, ও-টি-সি ছিল শুধুই উদ্যম অপচয়ের ক্ষেত্র। তবু আমাকেও শেষ অবধি উন্নীত হতে হয়েছিল সার্জেন্ট মেজর পদে। আবার মিলিটারি অফিসারের 'স্যাম ব্রাউন' বা কোমরবন্ধনী নিয়ে অহংকারের বড়াইটাও বেশ উপভোগ করতাম। বলতে গেলে আমি ছিলাম বোমা-বিশেষজ্ঞ! 'সার্টিফিকেট-এ' পরীক্ষায় বোমার ক্রিয়াপদ্ধতি বিষয়ে পেয়েছিলাম শতকরা আটানব্বই। 'মিলস্‌ বস' বা অন্যান্য বিধ্বংসী বোমার অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার রেখাচিত্রও আঁকতে পারতাম আমি। তবে দুর্ভাগ্যের কথা, বোমার ব্যবহারিক বিষয়টা তেমন জানতাম না। আর তাই যখন আমরাও লাইভ বম ব্যবহারের অনুমতি পেয়ে গেছি তখন একদিন আমার নিক্ষেপিত বোমাটি সোজা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিতেই সি. ও. প্রায় মারা পড়েছিলেন আর কি।

বিজয়-সংবাদে দেশের সব প্রান্তের মানুষের মতো আমরাও স্কুলের সবাই দারুণ উত্তেজিত। এবং বিজয়-দিবসের সকালে সার্জেন্ট-মেজর হিসেবে আমিও স্কুল টাওয়ারের ওপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পটকা ছুড়ি। তারপর দখল-করা একটা জার্মান ট্যাঙ্ক সামনে নিয়ে চেলতেনহামের রাস্তা ধরে একটা শোভাযাত্রাও পরিচালনা করি আমি।

সেদিন কিন্তু কারোই খেয়াল ছিল না কী ধরনের বৈপরীত্যের বাস্তব শিকার

আমরা। শাস্ত্রপাঠের ক্লাশে পড়ানো হচ্ছে, শত্রুকেও ভালবাসো; আবার বোমা নিক্ষেপের ক্লাশে শেখানো হচ্ছে, কী উপায়ে শত্রু নিধন করতে হবে।

আমার জীবনে সাংঘাতিক এক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিলেন তরুণী এক মহিলা। অথচ মহিলাটিকে আমি কখনো দেখিনি। আমার বয়স তখন সতের, মহিলাটির বয়স একুশ; তখনই তিনি খুন হন। তার নাম ছিল বেলা রাইট। সুন্দরী বাড়ন্ত এই বেলা রাইট ছিল চুল্লিতে কর্মরত এক যুবকের বাগদত্তা। লিসেস্টারের কাছে এক পুরনো রোমান রাস্তায় তার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

মাস ছয়েক বাদে আমাদেরই ডিন ক্লোজ স্কুলের শিক্ষক মিঃ রোনাল্ড লাইট ওই খুনের অভিযানে গ্রেপ্তার হলেন। মিঃ লাইট আমাদেরও পড়াতেন। সেদিনের কথা আজো স্পষ্ট মনে আছে। গ্রেট হল-এ ড. ফ্রেকার ঘটনাটি আমাদের জানাতেই আমরা সকলে আঁতকে উঠি। সেদিনও কিন্তু যথারীতি মধ্যাহ্ন ভোজের মেনুতে ছিল সারডিন মাছ আর স্যসিজ। তখনই অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে খোদ ড. ফ্রেকারকেও গ্রেপ্তার করা হল।

শেষ অবধি অবশ্য মিঃ লাইট বেকসুর খালাস পেলেন। খবরটা শুনে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছিলাম। মিঃ লাইট ছিলেন ছোটখাটো হাসিখুশি মানুষ; উনি আর স্কুলে ফিরে এলেন না। যুদ্ধের সময়ে শিক্ষক পাওয়া ছিল দুষ্কর। ফলে একজন শিক্ষকের ঘাটতিতেই চালাতে হল আমাদের।

আর আমি তো একটা 'স্পেশাল কেস'। ইংরেজি সাহিত্যকে বিশেষ বিষয় হিসেবে নিতেই এটা ঘটে। পড়াবার মতো কোনো শিক্ষক নেই। বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে মিঃ ফ্রেকার আমাকে বলেছিলেন, লাইব্রেরিতে পড়ে যতটা পারো শিখে নাও। বেলা রাইটের খুন আমার জীবনে পরোক্ষভাবে নিয়ে এল এক বিশাল প্রাপ্তি। পুরো একটা বছর ধরে সুযোগ ঘটল আমার, সেই অসাধারণ গ্রন্থাগারে বইয়ের রাজ্যে মনপ্রাণ নিয়ে ডুবে থেকে কবিতার মূলধারা-উপধারার সন্ধান করার। বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে। আমি ছাড়া আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। এরকম পরিস্থিতিতে কম-পড়ুয়া ছাত্র হলে ঘটনাটা হয়তো বিপজ্জনক হত, কিন্তু তখন থেকেই ছিলাম গ্রন্থপ্রেমিক। ফলে ওই স্বাধীনতা আমার মধ্যে উন্মেষ ঘটিয়েছিল অনুপুঙ্খ পাঠের, গবেষণাকর্মের প্রতি আগ্রহের। সেই প্রবণতা আজো অব্যাহত।

জনৈক অ্যাংলো-ক্যাথলিক যাজকের কাছে আমার এক বন্ধু স্বীকারোক্তি করেছিল, মেয়েদের পিছনে ছুটে তার অনেক বিপত্তি ঘটেছে। শুনে যাজকটি তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন : 'বরং ছেলেদের পিছনেই ছোটো, তারা অনেক নিরাপদ ও "শুদ্ধ"।

বহুদিন ধরে ব্যাপারটা আমার কাছে দুঃখজনক মনে হত। সম্প্রতি পড়লাম ভিক্টর গোলাঞ্চাজ-এর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডটি। স্কুলজীবনে গোলাঞ্চাজ গভীর আসক্ত ছিলেন একটি ছেলের প্রেমে। কিন্তু সেটা ছিল তাৎক্ষণিক ব্যাপার। তিনি স্পষ্টই

লিখেছেন : সমকাম-প্রবণতা থেকে যদিও আমি মুক্ত (ওই দিনটির কথা বাদ দিলে) এবং স্বাভাবিক যৌনতায় বেশ সক্ষম, তথাপি আমারও কখনো কখনো মনে হয়, সমকাম-প্রেম কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো-বা গড়পড়তা বিপরীতকাম প্রেম থেকে অনেক বেশি শুদ্ধ (হৃদয়ে শুদ্ধ); সেখানে তো থাকে না সব-দিলাম-কিছু-চাই না ধরনের প্রেমসম্পর্কের ক্ষাত্রধর্ম প্রদর্শন।' সমকাম প্রেমে থাকে 'অতীব মাধুর্য, অনাতুর আকুতি, খোঁজার চেয়ে প্রাপ্তির তৃপ্তি'। বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তিনি, এ থেকে কি বোঝা যায় না কেন স্কুলের ছেলেমেয়েরা 'মেহন' বা 'পেষণ'কেই 'জীবনের সর্বোত্তম প্রাপ্তি' বলে ভাববে?

এসব কথা বলার সাহস ইতিপূর্বে আর কারো মধ্যে দেখিনি। তবে আমার ধারণা বিষয়টির মধ্যে জটিলতা রয়েছে। হেডমাস্টার মশাই বলতেন, ডিন ক্লোজ স্কুলটা 'অশুদ্ধতা'য় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। স্কুল-ছাড়ার আগে অবধি জানতাম না উনি সঠিক কী বোঝাতে চাইছেন। তবে নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিল হস্তমৈথুন ও 'ছোট বালক'দের কথা। আমলাতান্ত্রিক বিরোধিতার পরিবেশে ছোটদের কোমল মনে জন্ম নেয় এক ধরনের কৌতূহল, যা প্রায় ধর্মবিশ্বাসের মতো; আমার তো তাই মনে হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষেত্রে তেমন কিছু 'ঘটেনি'। নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ ফলের প্রতি আমারও আকর্ষণ ছিল, তার মাধুরী ও প্রলোভনও ছিল। পৃথকভাবে একটি ছেলেকে আমি খুব ভালবাসতাম, সুদর্শন সহজাত গুণসম্পন্ন। ভাষা-শিক্ষার রোমান্টিক উপায় হিসেবে আমরা দুজনে মিলে রোমাত্তি'র কবিতা মূল ইটালি ভাষায় পড়তাম। পরে সে কেমব্রিজে চলে যায়। অক্সফোর্ডে যাবার পর কিংস কলেজে তার সঙ্গে কদিন একসঙ্গে ছিলাম। চারিদিকের মনোলোভা সৌন্দর্য আর তার একান্ত উপস্থিতি মানসিকভাবে আমাকে প্রমত্ত করে রেখেছিল বেশ কয়েক মাস ধরে।

সত্যি কথা বলতে কি, একুশ বছর বয়স অবধি মেয়েদের সম্বন্ধে আমি তেমন কিছুই জানতাম না। কোনোদিন ভাবতেই পারিনি, নারীর যৌন আচরণের বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিন্‌সে রিপোর্টে একদিন আমার নামই বার ছয়েক উল্লেখিত হবে। বছর পাঁচেক বয়েস হতে না হতেই আদিবাসী ছেলেমেয়েরা নারীদেহ গঠনের প্রায় সবকিছু জেনে যায়। কি নিয়মে তারা ঋতুমতী হয়, কিভাবে সন্তান গর্ভে আসে— মেলিনোভস্কি'র শোনানো কথাগুলো আর কি! আমি তো তার চারগুণ বয়সেও তেমন কিছু জানতাম না। বারো তেরো বছর বয়সেই অধিকাংশ আদিবাসী ছেলেমেয়েদের পরমানন্দীয় উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতাটি হয়ে যায়। আমার তখন ছিল নিষ্প্রভ চাহনি মাত্র। সাত বছর বয়সে প্রথম নারী সান্নিধ্য, অসাধারণ সুন্দরী ছ'বছরের মামাতো বোন জোয়ানের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ঘটে বারো বছর বয়সে প্রায় সমবয়সী রোবিনার সঙ্গে। রোবিনার মতো দুরন্ত যৌনাবেগময়ী কোনো মেয়ের মুখোমুখি সারা জীবনে হইনি। তবু, সি. এস. এস. এম-এর ইস্টবার্ন স্পোর্টসে ওকে কাঁধে চাপানোর

বেশি একধাপও আমি এগোতে পারিনি। ফলে ওখানেই শেষ।

আমার বাল্যকালটা ছিল তাই প্রাণহীন, শুখা। ছুটিতেও আমাদের জীবনে তেমন কোনো আনন্দ উত্তেজনার ব্যাপার ছিল না— বস্তুত কোনো আমোদ-প্রমোদের (ধর্মাচরণের ক্ষেত্র ব্যতীত) সুযোগই ছিল না। সিনেমা, গাড়ি সেসময়ে খুব কমই ছিল। বেশি লোকজনের দেখাও পেতাম না। বাবার কিছু বন্ধু—উইলি হল্যান্ড, আলেক ফ্রেজার, টম আলভারেজ, ওয়াল্টার মিলার (মিশনারি ইতিহাসে নামগুলো প্রসিদ্ধ) প্রমুখ আমাদের খোঁজখবর নিতে আসতেন। এঁরা সকলেই ধার্মিক মানুষ। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের বেশ খাটাখাটনি করতে হত, মাঝে-মধ্যে পরিচারক জুটত। রান্নাবান্না ঘরদোর সাফ করা, কাপড়কাচা—সব মা নিজে করতেন, আমরা যেটুকু পারি হাত লাগাতাম। কিছু মনে হত না আমাদের, বরং মজাই পেতাম। আসল কথাটা হল, আমরা তখন বুঝতেই পারিনি, আমাদের জীবনের দিগন্তটি কতটা সীমিত— জীবনে আরো কত কী পাবার আছে।

অন্যদের থেকে একটি ব্যাপার ছিল একেবারে আলাদা। সেখানেই সূচিত ছিল গতিমুখের ভিন্নতা। বয়স যখন আমার ষোলর মতো তখনই আমি কবিতার সন্ধান পাই, শব্দসৌন্দর্যের প্রেমে পড়ি। হয়তো স্বাভাবিক কারণেই টেনিসন ও তাঁর গোত্রীয় কবিগণ আমাকে দারুণ আকৃষ্ট করেন। কদিন যেতে না যেতেই সুইনবার্নের নেশায় মাতাল হই। হাতখরচার সামান্য টাকা থেকে জমিয়ে ইয়েটস্-এর কবিতার একটি খণ্ড কিনে ফেলি। কিন্তু আমার পরমানন্দ ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এ।

স্কুলে থাকতে প্রতিদিন সকালে নীল কাগজে বাঁধাই তাঁর একখানা কবিতার বই হাতে নিয়ে বনে-মাঠে উদাসীন হাঁটতাম। গ্রামের নির্জন শান্ত পরিবেশে কবির কোমল গভীর অভিভাবের রসাস্বাদনে মগ্ন হতাম। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের বোধন ঘটে তখনই। পরবর্তীকালেও হ্রদাঞ্চলে বেড়ানোর বিকল্প কোনো আনন্দের কথা আমি ভাবতে পারিনি। মনে পড়ে, কবির ডাডন সনেটগুচ্ছ পড়তে পড়তে একদিন কবিরই পদক্ষেপ অনুসরণ করে ডাডন নদীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম।

স্কুলজীবনের শেষ দু'বছর ছিলাম আনন্দে বিভোর। দুটি স্বতন্ত্র জগৎ আমার, একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সাযুজ্য নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের রহস্যময় সর্বেশ্বরবাদের পাশে আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থিত এভাঞ্জেলিক্যাল কট্টর ধর্মতন্ত্র। তখন বা তার কিছু পরেও আমি বুঝে উঠিনি, কোন জগৎটা প্রকৃতপক্ষে আমার। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সম্ভবত আমি ছিলাম একটা ধাঁধা বিশেষ। মনে পড়ে, হেডমাস্টার মশাইয়ের বাগানে শ্রীমতী ফ্রেকারের সঙ্গে একদিন পায়চারি করছি, বাগানটায় ছিল গোলাপের অনন্য সমাহার। রিচার্ড জেফারি থেকে উদ্ধৃত করে আমি তাঁকে শুনিয়েছিলাম : 'অমল বর্ণে বুঝি হৃদয় ঘুমায়।' শুনে বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তাকালেন তিনি; ক্বচিৎ তাঁর ওই চাহনি দেখেছি।

না, বলব না স্কুলজীবন নিয়ে আমি খুব অসুখী। তবে পিছনে তকিয়ে সাধারণত একটাই আফশোস হয়। সেটা আনন্দের অভাবের জন্যে নয় ঠিক; তবে অন্য ধরনের স্কুলে, অন্যধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতিতে যদি আমার পড়ার সুযোগ ঘটত তাহলে হয়তো আমি আরো ভালোভাবে শিক্ষিত হতে পারতাম, ভাল বন্ধু পেতে পারতাম। তথাপি বলব, জীবনের মাধুর্য ও আনন্দ বিষয়ে অনেকটাই জেনেছি স্কুলজীবনে।

বাড়ি ছিল আমার কাছে তীব্র এক আবেগের জায়গা। মমতাময়ী মা আমাদের দেখাশোনার সব দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু আমরা ছিলাম গরিব, খুব কষ্ট করে বড় হতে হয়েছে আমাদের। তার জন্যে কোনো দুঃখ বা আক্ষেপ নেই আমার। বরং পরবর্তীপর্বের চার্চ ও পুলিস সংক্রান্ত ঝামেলার জন্যেই আমার অনুতাপ বেশি। সে কথা থাক। কোনো কিছুই প্রত্যাশা করতে শিখিনি, ফলে জীবনে সফলতা বা শুভ কিছু ঘটলে সাধারণত বিস্মিতই হয়েছি। এখনো যদি ভাল কিছু আসে তবে জীবনের প্রতিই কৃতজ্ঞতা বোধ করি। সার কথা জীবনটা তো আনন্দেই কাটল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হ্লাদিত যৌবন

এখানে আসো, হ্লাদিত যৌবন,
চেয়ে দেখো আরভমাণ প্রভাত,
নবজাত সত্যের প্রতিমা।

—উইলিয়াম ব্লেক

এক

১৯২১-এর শরতে পড়তে যাই অক্সফোর্ডে। স্কুল লাইব্রেরির বই পড়ে পড়ে জীবনটা তখন আমার কাছে সাহিত্যেরই প্রতিরূপ। অর্থবল তো ছিল খুবই সামান্য; তাছাড়া জীবনে সেই প্রথম স্বাধীনভাবে বাইরে বেরিয়েছি। বলতে গেলে দিশাহীন অবস্থা আমার। তাছাড়া ১৯২১-এ অক্সফোর্ড ছিল চূড়ান্ত নৈরাজ্যময়। এ-বিষয়ে *রাইট অনরেব্‌ল জেন্টল্‌ম্যান* গ্রন্থে রজার ফুলফোর্ড লিখেছেন :

> অস্থিরতা কেটে ইংল্যান্ডে যখন শান্তি বিরাজ করছে তখন আণ্ডার গ্রাজুয়েট জীবন ছিল অত্যন্ত জঘন্য ও বিশুষ্ক। অক্সফোর্ডের তরুণরা তখন সুরা পান করছে, বাবার সঞ্চিত টাকা উড়োচ্ছে; আর ভিক্টরীয় ক্লাব-সদস্যদের মতো কুতর্ক আর কটুবাক্যবাণে জগৎ-সংসারে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তৎপরতা দেখাচ্ছে। একে অপরের বিরুদ্ধে বিরামহীন কুৎসা প্রচার করে চলেছে। পরনিন্দা ও কুরুচির মাত্রা দেখে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মনে হচ্ছিল কোনো মহিলা ব্রিজ ক্লাবের চায়ের আসর। সেখানে শুধু নানা রঙের বিদ্বেষের ছড়াছড়ি। আপাত বুদ্ধিমত্তার ছদ্ম-আড়ালে হিংস্র বোলতার মতো আচরণের ফ্যাশন। সেই ফ্যাশন ছড়িয়ে পড়ে ব্লুমসবারি থেকে অক্সফোর্ড পর্যন্ত। যে কোনো বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, হয়তো সেগুলো প্রায়শই একঘেয়ে নীরস ছিল, কিন্তু তা অতি দ্রুত বাঁক নিত ব্যক্তিগত কেচ্ছায়। ফলে সেগুলো তো চিত্তাকর্ষক হবেই। কথালাপের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে আসত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। শুধু সময়ের প্রবাহন নয়, বা স্মৃতির কৌতুকি নকশা নয়, কিংবা সমাজ-ইতিহাসবেত্তার মিষ্টকথার ছলাকলাই শুধু তাড়িত করেনি এই দৃশ্যচিত্রটি উত্থাপনে। দীপ্র যুগারম্ভের বস্তুত এটাই অ-প্রমত্ত রূপ। ১৯২২-এর অক্সফোর্ড এভাবেই চুপিচুপি বলে গেছে এডওয়ার্ডীয় যুগের শেষ জাদুমন্ত্রটি।

আর আমার হিসাবে, আণ্ডার গ্রাজুয়েটের তৃতীয় শিক্ষাবর্ষে ক্লড এবং অস্‌টেক'কে ('রাইট হো, জিভেস'-এর) বহিষ্কার করা হয়েছিল; অথচ তাদের নির্দোষ খ্যাপামিটা ছিল আমাদের যুগেরই ধর্ম। আমি নিজেও একটা মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম বড় সড়ক ধরে। মিছিলশেষে থানার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটা আবেগপূর্ণ ভাষণও দিয়েছিলাম, মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধে।

আমার কলেজ মার্টন, বাবারও ছিল তাই। সেখানকার ওয়ারডেন ভদ্রলোক নামের আদ্যাক্ষরে আমার নামের বদলে বাবার নামটাই লিখতেন। চ্যাপেলের ঠিক নিচে মব্ স্কোয়াডের ছাদের তলায় একটি ছোট কক্ষ জোটে আমার। কক্ষটি ছিল ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত সেই লাইব্রেরির ঠিক মুখোমুখি।

আমাদের পরিচারক হব্‌স্। তার মন-পাওয়ার একটা বাহ্যিক লক্ষণ ছিল— তার ভাললাগা তরুণটির জন্যে নিখরচায় এক কাপ প্রভাতী চা পরিবেশন। তার মন পেতে আমার খুব সময় লেগেছিল; আর যখন তা জুটল সেটা হয়েছিল তীব্র। কিন্তু প্রথম বছর আমাকে বেদনার সঙ্গে দেখতে হয়েছে সকলেই চা পাচ্ছে, শুধু আমি পাচ্ছি না।

দ্বিতীয় বর্ষে আমি নিচে চলে যাই। সেখানটায় মোটামুটি সবই ঠিকমতো চলছিল। বিশাল একটা কক্ষে আমি দুটো বছর কাটাই— গাঢ়-লাল ঝালর, বিশাল এক আয়না। আয়নাটায় বুলেটের ফুটো। মাতাল এক আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র আত্মহত্যা করতে গিয়ে আয়নায় প্রতিফলিত নিজেকে লক্ষ করেই নাকি গুলি ছুড়েছিল। মৃতের প্রেতাত্মা (মনে করা হয়, দুজন ডাইনকে এখানে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল) আর একদল বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল আমার জীবনের আনন্দ উপভোগের সময়।

এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শিক্ষকমণ্ডলী জুটেছিল আমাদের। আমার ধারণায়, তাঁদের সর্বোত্তম ছিলেন এ.সি. ব্রাডলে, টি. এস. এলিয়টের ওপর ছিল তাঁর অপরিসীম প্রভাব। এলিয়ট একবছর মার্টনেই ছিলেন; অধ্যাপক জোয়াচিম-এর সঙ্গে এখানে পোস্টেরিঅর এনালিটিক্‌স্ পড়েন। তাছাড়া ছিলেন স্যার ওয়াল্টার র্যালে। তিনি খুব অল্পদিন আমাকে পড়িয়েছিলেন। আর ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক ডব্লয়ু হাউ; প্রথমবর্ষে লিভি'র কিছু অংশ উনি পড়িয়েছিলেন।

তবে এই শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে অনন্য ছিলেন এইচ. ডব্লুয়ু গেরড্। কীটস্ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশারদ ছিলেন তিনি। তিনি কেমন যেন বিপর্যস্ত মানুষ ছিলেন। তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতাম আমি।

তখনকার সময়ে প্রাথমিকভাবে কতগুলি অনার্স স্কুল ডিঙিয়ে 'পাস মড' পরীক্ষাটা পাস করতে হত। তৃতীয়বর্ষে সেই পরীক্ষায় আমি অকৃতকার্য হই। সেই অসম্মানের পর আমি ইংরেজি সাহিত্য নিলাম। সকলেই এর বিরুদ্ধে ছিলেন। নতুন শিক্ষাক্রম, তাছাড়া প্রথম শ্রেণী পাওয়া খুবই কঠিন ইংরেজি সাহিত্যে। সেখানে আমার অধ্যাপক ছিলেন ডেভিড নিকোল স্মিথ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ওপর এক প্রধান কাব্য বিশারদ।

অসাধারণ সুদর্শন, শান্ত, সৌম্য এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছাড়া মার্টনে আরো ছিলেন এইচ. সি. উইন্ড ; ছাত্রীদের কাছে তো প্রজন্মান্তরে তিনি ছিলেন এক আতঙ্ক বিশেষ, আমার কাছেও প্রথম-প্রথম। তারপর তাঁকে আমি সঠিক চিনতে পারি। তাছাড়া, খুব অল্পদিনের জন্যে পড়েছি স্যার জর্জ গর্ডনের কাছে।

১৯২১-এও ইংরেজি সাহিত্য একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা পায়নি। ফলে এ-বিষয়টিতে কোনো বৃত্তিরও বন্দোবস্ত ছিল না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্টনে বাবা পড়েছিলেন, আমিও সেখানে পড়ি, এটা ছিল পরিবারের সকলের ইচ্ছে। সেমতো একজন 'কমোনার' (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-ছাত্র আহারের ব্যয় নিজে বহন করে।—অনুবাদক) হিসেবে মার্টনেই গেলাম। আর তিন-তিনটে বছর ধরে বাধ্য হয়ে পরিধান করতে হল গাঢ় লালরঙা ছোট জ্যাকেট। এখন আমি যে 'আদি' বা 'মিশনি' কুর্তাগুলো পরি, জ্যাকেটগুলো ছিল অনেকটা ওরকমই।

দ্বিতীয় পাঠবর্ষে পেলাম ফাউলার এক্সিহিবিশন বৃত্তি। কিন্তু সেই বৃত্তিতে ছিল না শিক্ষার্থীর গাউন পরিধানের সৌভাগ্য। একবছর বাদে অতি-আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি, চার্লস ওল্ডহ্যাম-এর জন্যে বসলাম। বৃত্তিটি দেওয়া হত শেক্সপীয়ারের সাহিত্যচর্চার ওপর। সেই বৃত্তি-পরীক্ষার প্রস্তুতিতে স্কুলের প্রাত্যহিকতার বাইরে চলে আসতে হল আমাকে। কারণ শেক্সপীয়ারের পাঠ-পরিমার্জন ও গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করার বাড়তি চাপ তো ছিল। তবে বৃত্তিটা পেয়ে খুবই আনন্দ হয়েছিল। তার পুরস্কার মূল্য আজকের (১৯৬৩-১৯৬৪-এর-অনুবাদক) টাকার ক্রয়ক্ষমতার হিসেবে তিন হাজার টাকার মতো ছিল। তাছাড়াও কলেজ উপহার দিয়েছিল একরাশি দারুণ বই।

ডিগ্রিলাভের পর ইউনিভার্সিটির আরো একটি পুরস্কার পাই। ম্যাথিউ আর্নল্ড পুরস্কার; 'বিপ্লবের কবিতা' শীর্ষক একটি রচনার জন্যে। কৌতূহলের ব্যাপার হল, পরবর্তী ঘটনাক্রমের ইঙ্গিত বোধহয় এই রচনাটিতেই উপ্ত ছিল।

আমার বড় ব্যর্থতা নিউডিগেট-এ। বিষয় ছিল কবিতায় মাইকেলএঞ্জেলো। সকলের মধ্যে আমার রচনাটি পঞ্চম স্থান পায়। মিঃ গেরড্ জানিয়েছিলেন, 'অতিরিক্ত উপদেশমূলক হয়ে গেছে।'

অক্সফোর্ডের শিক্ষণব্যবস্থা নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে একেবারে যেভাবে ছাত্রদের ওপর নির্দেশাবলি চাপিয়ে দেওয়া হয় তার ঠিক বিপরীত প্রণালী। পাঁচ বছরের মধ্যে একদিনও আমাকে ক্লাশে বসে থাকতে হয়নি একের পর এক ভাষণ শোনার জন্যে। (আমি আগাগোড়াই মনে করে এসেছি, ভাষণ শোনার কাল শেষ হয়ে গেছে পঞ্চদশ শতকেই— মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পরেই।) তবে দু-একটি ভাষণ শুনতাম, অন্য-ধরনের তৃপ্তির জন্যেই। তবে বেশির ভাগ শিক্ষকই পড়ে-পড়ে ভাষণ দিতেন; তাই বুঝে উঠিনি কেন বই পড়েই ব্যাপারটা শিখে

10,091.
22 cm
351 p
Rs. 130/-

নেওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে সপ্তাহে ঘন্টাখানেক আমাকে পড়ানো হত। কিন্তু কি অসাধারণ ছিল সেই শেখানোর কার্যকারিতা।

বিধিমতো আমার ইংরেজিপাঠ সীমাবদ্ধ ছিল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ অবধি। সম্পূর্ণ উনিশ শতকের অনুশীলন নিয়ে স্বতন্ত্র একটি পেপার করারও সুযোগ ছিল। কিন্তু আমার শিক্ষক নিষেধ করলেন। সেখানে 'সাহিত্য'গত উপাদান রয়েছে বেশি মাত্রায়, সেটা পড়ারই বিষয়। আর পরীক্ষকগণ সেখানেই যতটা সম্ভব অন্তরায় সৃষ্টি করেন। কোনো সরাসরি প্রশ্ন থাকবে না; যেমন, জিজ্ঞেস করা হবে না, ম্যাথিউ আর্নল্ড-এর দর্শন কী? বরং হয়তো বলা হবে, কোনো এক অখ্যাত যাজকের কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার তুলনা করতে। কার্লাইল-এর শৈলী-আঙ্গিক নিয়েও কোনো প্রশ্ন করা হবে না। সবসময়েই ফাঁদে ফেলার চেষ্টা। আধুনিক কবিতার প্রতি আমার অভিমুখীনতা সব সময়েই ছিল অপেশাদারসুলভ। রসাস্বাদনের জন্যে ভিক্টরীয় কবিদের কাব্য আমি পড়তেই পারি, কিন্তু বাধ্যবাধকতায় নয়।

আবার অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসঙ্গত পেশাদারিত্বের যে-অভিযোগ সচরাচর ওঠে তারও শিকার আমি হইনি। ইংরেজি সাহিত্য তখন নতুন এক শিক্ষাক্রম; সকলেই সেটা উদ্ভাবন করে চলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, শেক্সপীয়ারচর্চায় অভিনিবিষ্ট হতে বাধ্য হওয়াটা আমার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনা। অন্যথায় হয়তো কখনোই আমি সেটা করতাম না। আবার এ-কথাও সত্য, এভাবে যদি পড়াশুনার চর্চা না করতাম তাহলে সপ্তদশ শতকের বহু কবিতাই (বিশেষত জন ডন-এর কবিতা) আমার কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। সে যাক, আমার বড় প্রাপ্তি হল, আমি অষ্টাদশ শতককে চিনতে পারলাম, ভালবাসতে পারলাম। আমার শিক্ষক নিকোল স্মিথের বাড়িটা ঠাসা ছি' ওই শতকরে বইয়ে। আমার মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের একটি কবিতাও তিনি পড়েন নি প্রথম সংস্করণ ব্যতীত অন্য কোনো সংস্করণ থেকে। আমার ডিগ্রিলাভের পর উনি আমার সহযোগিতা চেয়েছিলেন 'দি অক্সফোর্ড বুক অফ এইটিন্থ্ সেঞ্চুরি ভার্স'-এর সম্পাদনার কাজে। ফলে আমাকে নিবিষ্ট মনে পড়তে হল চেলমার-এর 'ইংলিশ পোয়েটস'-এর আঠেরো খণ্ডের একরাশ ভালমন্দ কবিতা। সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় নিকোল স্মিথের বাড়িতে যেতে হত। একান্তে বসে কয়েক ঘন্টা ধরে দুজনার চলত গাদ থেকে সোনা বার করার কাজ। সে-সময়েই সম্ভবত কবিতার রস, কবিতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সব থেকে বেশি শিখেছি। সেই আয়ত্তি পাঠবর্ষের শিক্ষার যোগফলেরও ঢের বেশি।

বস্তুত ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ থেকে 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' প্রকাশকাল অবধি গোটা পর্বটাই আঠেরো শতকের মধ্যে পড়ে। আঠেরো শতকের কবিরা প্রকৃতির বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, এ-কথা নিকোল স্মিথ মনে করতেন না। দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সব কবি সম্পূর্ণত নাগরিক বলে সাধারণ্যে পরিচিত, তাঁদের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা ও

আমাকে খুঁজে বার করতে বলেছিলেন মিঃ স্মিথ। পোপ ও ড্রাইডেন-এর গুণানুধাবন কিংবা বসওয়েল ও জনসন-এর প্রতি মুগ্ধতাও যদি শুধুমাত্র ঘটে থাকে তবু এই শিক্ষা ছিল অশেষ মূল্যবান। বাস্তবিকই নিকোল স্মিথ ছিলেন একেবারেই অষ্টাদশ শতকের খাঁটি প্রতিভূ। তাঁর আস্থা ছিল সরল অকপট গদ্যে। কোনোরকম ধোঁয়াসে ব্যাপারে তাঁর প্রশ্রয় ছিল না।

একসময়ে ডি. এইচ. লরেন্স পর্বটা নিয়ে পড়াশুনা করি। কিন্তু আমার চিন্তন ও শৈলীর সঙ্গে সেটা ছিল একেবারে বেমানান। সেটা বুঝতেই অতি সত্বর তা কাটিয়ে উঠি। আধুনিক কালের বিখ্যাত কবি টি. এস. এলিয়ট ও এজরা পাউণ্ডকে পেতে পেতে আমি চলে এসেছি ভারতের অরণ্যভূমিতে। আর শিলংয়ে আসার পরেই ডব্লয়ু. এইচ. ওডেন ঘিরে আমার মধ্যে মুগ্ধ কৌতূহল দেখা দেয়।

মাঝে মধ্যেই আমি অনেকের সুপরামর্শ পেয়েছি। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'কখনো এমন দাবি করবে না, আমি 'দি ফেয়ারি কুইন' উপভোগ করেছি।' অথচ আমার প্রকাশভঙ্গি সেমতোই ছিল। 'ওভাবে করলেই তুমি ভান করছ বলে মনে হয়ে যাবে।' একবার একটি নিবন্ধে আমি ইটালি ভাষায় একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছিলাম, অথচ ইটালি ভাষা জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। গেরড্ কাজটার তীব্র নিন্দা করলেন : 'তুমি যে পারো সেটা প্রদর্শন করতেই যেন উদ্ধৃত করেছ বলে মনে হচ্ছে।"

শ্লেষাত্মক রচনায় তখন বেশ বেশ দক্ষতা এসেছিল। গেরড্ও আমাকে বেশ উৎসাহ দিতেন। কিন্তু কোনো একজনের প্রসঙ্গে একটি লেখায় 'মৌল অন্তঃসারশূন্যতা'র উল্লেখ করতেই উনি খুব চটে গেলেন। হয়তো প্রেরণাটা এসেছিল কিপ্‌লিং থেকে; কিন্তু গেরডের ওসবে সায় নেই।

'এল্যুইন, এল্যুইন আর কক্ষনো এমনটা করো না'— একেবারে বিলাপ করতে লাগলেন তিনি।

যতটা মনে পড়ে, ছাপার অক্ষরে আমার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল এই গেরড-এরই সৌজন্যে। কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা মিঃ গেরড্‌কে অনুরোধ জানিয়েছিল, সপ্তদশ শতকের নাট্যকার মিডলটন-এর ওপর একটি প্রবন্ধ লিখতে। তিনি অর্ধেকটা লিখেছিলেন। বাকি অর্ধেকটা উনি আমাকে লিখে দিতে বললেন। এ-জাতীয় বিষয়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেরডের সমকক্ষ কোনো বিশারদ ছিলেন না। ফলে প্রস্তাবটি ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট সম্মানের। যাই হোক, আমি সম্পূর্ণ লেখাটির একটি খসড়া করে তাঁকে দিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, কোনোরকম পরিবর্তন-পরিমার্জন ছাড়াই উনি সেটি মঞ্জুর করলেন। আমি ভয়ে-ভয়ে জানালাম, আমার রচিত অংশটির লিখনশৈলীর অবনমন নিশ্চয়ই সকলের চোখে পড়বে। উনি বলেছিলেন : 'এল্যুইন, তুমি আর আমি যে মনোযোগ সহকারে লেখাটি পড়েছি সেভাবে পড়ার মতো দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই।'

এখনো কেউ কেউ আমাকে তাঁদের হয়ে খসড়া তৈরি করতে বলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই গেরড নন; তাছাড়া তখন আমি নিজে সবে লিখতে শুরু করেছি। শিলংয়ের একটি কৌতুককর ঘটনা সব সময়েই মনে পড়ে। কে. এল. মেহ্‌তা ছিলেন তখন উপদেষ্টা; যখনই কোনো খসড়া তাঁকে দিতাম, তাঁর অভ্যাস ছিল প্রায় প্রতিটি শব্দকে পাল্টানো, আর পাশের মার্জিনে সবিনয়ে লেখা : 'অসাধারণ খসড়া; দু-একটি ক্রিয়াপদের পরিবর্তনের দুঃসাহস করেছি মাত্র।' সে কথা যাক, সব মিলিয়ে খসড়া তৈরি করতে বা অপরের খসড়া শুদ্ধ করার কাজে মজাই পেয়েছি। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, যে লিখছে সে তো লিখেই ফেলেছে নির্বাধ দায়িত্বহীনতায়; আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে, অন্যের ভুল শুধরানোর মধ্যেও থাকে স্কুলমাস্টারসুলভ তৃপ্তিলাভ।

আর একটা মূল্যবান উপদেশ পেয়েছিলাম খ্যাতনামা এভাঞ্জেলিস্ট ড. জে. জে. মেয়ার-এর কাছ থেকে। কয়েকটি ধর্মীয় ভাষণ দিতে তিনি অক্সফোর্ড এসেছিলেন। তাঁক সম্মত করিয়েছিলাম, আমার কক্ষে চা-পানে আসতে। স্বাভাবিকভাবেই ঘরের সবকিছু গোছগাছ করে রাখি, বাতিল কাগজের ঝুড়িটাও সাফ করে ফেলি। কিছু কথাবার্তার পরই লক্ষ করি, তাঁর চোখজোড়া নিবদ্ধ আমার টেবিলের দিকে। কোমল কণ্ঠে তিনি বললেন, 'সাহিত্যচর্চায় বা বিদ্যার্জনে যদি উপরে উঠতে চান তাহলে যা লেখা হয়ে গেছে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলবেন, আবার নতুন করে লিখবেন। কে কতটা বিদ্বান তা অন্তত আমি অন্তত বিচার করি, ঝুড়িতে জমা বাতিল কাগজের পরিমাণ দেখেই।' কথাটা আমার মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। বাস্তবিকই আমার যা-কিছু ছাপা হয়েছে সেগুলো বাদ দিলেও গত ত্রিশ বছরে এক বিপুল পরিমাণ বাতিল কাগজের স্তূপ আমাকে দেখতে হয়েছে।

১৯২৪-এ ইংরেজির ফাইনাল পরীক্ষা হল। আমি প্রথম হলাম। অধ্যাপক উইল্ড বিরসবদনে বললেন, ভালই তো হয়েছে, তুমি তিনটি পত্রে আলফা প্লাস পেয়েছে, আর বাকিগুলোয় আলফা পেয়েছে।' আমি তো বিস্মিত, কারণ সেগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ইংরেজি ও ভাষার পত্রও। বেশি শেখার অ-কার্যকারিতাও এখানে লক্ষণীয়; মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই অ্যাংলো-স্যাক্সন ও মিডল ইংলিশের প্রায় সবটাই আমি ভুলে গেছি; অথচ ওগুলোতেই আমি ভাল নম্বর পেয়েছিলাম।

দুই

ইংরেজি নিয়ে পাস করার পর স্থির করলাম, আরো দুবছর থেকে থিয়োলজি ফাইনালটাও দেব। তার মানে দাঁড়ায় আবার বি. এ. পড়া। এ-ব্যাপারে মার্টন কলেজ অর্থ মঞ্জুর করে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। চতুর্থবর্ষে আমি কলেজের বাইরে গিয়ে থাকি। আজ যেখানে পিটারস্ কলেজ তার কাছেই একটি আবাসে বন্ধু জর্জ

বসওয়ার্থ-এর সঙ্গে থাকতে শুরু করি। সেসব দিনের কথা এখন আর তেমন মনে নেই। তবে মনে পড়ে, আবাসটি ছিল সেন্ট পিটার লে-বেইলি গির্জাসংলগ্ন। ওই গির্জাতেই বাবা সহকারী যাজক হিসেবে প্রথম ঢুকেছিলেন। আর মনে পড়ে বন্ধু জর্জের অতিপ্রিয় একটা উদ্ধৃতি : 'আবেগহীন কোনো প্রেমই পবিত্র নয়, উদ্যামহীন কোনো গুণই নিরাপদ নয়।' সম্ভবত এটি 'ইক্‌কে হোমো' থেকে ঝাড়া।

আমার থিয়োলজির শিক্ষক এফ. ডব্লয়ু গ্রিন ছিলেন উচ্চতর যাজক, আধুনিক চিন্তনের অনুসারী; বলা যায়, সত্যে বিশ্বাসী এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। আমাদের সময়ে কার্ডিনাল নিউম্যানের নামে একটা গল্প চালু ছিল। সেই গানে যখনই তাঁকে প্রশ্ন করা হত, আধুনিক জার্মান 'তীব্র সমালোচনা'র বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়? উনি নাকি বলতেন, 'প্রথমত পবিত্র আত্মাকে ঠেকানো। আর অন্যটি হচ্ছে জার্মান ভাষায় অজ্ঞতা।' তবু আমি জার্মান ভাষা শিখতে শুরু করি, কিন্তু খুব বেশি দূর এগুতে পারিনি। মিঃ গ্রিন জার্মান ভাষাটা ভালই জানতেন। প্রাগ্রসর জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছ থেকে যেসব নোট তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলোও প্রচুর পরিমাণে আমাকে জুগিয়েছিলেন। ফলে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই মুক্ত ছিল— অন্তত আমাদের সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'এসেস্, ক্যাথলিক অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল'-এর প্রতিতুলনায়। বইটি বিষয়ে এখন অবশ্য আর তেমন কিছু মনে নেই।

আমাদের যুগেও বাইবেলের বাচিক দিব্যানুভূতি সংক্রান্ত পুরনো বিরোধের রেশ অনেকটাই ছিল। এ-বিষয়ে মিঃ গ্রিনের অবস্থানটি ছিল বৈশিষ্টপূর্ণ। তাঁর কথা হল, প্রকৃতপক্ষে তিনি যা বিশ্বাস করেন তা বাইবেলের ওই বাচিক দিব্যানুভূতিই— অন্তত কিং জেমস্-এর লোকজন যে প্রামাণ্য সংস্করণটি করেছেন সেটির। বস্তুত সব খ্যাতনামা এলিজাবেথীয়ানরাই ছিলেন দিব্যানুভূতিতে উদ্দীপ্ত। বাইবেলের ভাষা নয়, তার কিছু কিছু ভাষ্যকেই মিঃ গ্রিন সংশয়জনক বিবেচনা করতেন।

আমার চতুর্থবর্ষে বার্ষিক 'চার্চ কংগ্রেস' অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের জৌলুস বাড়াতে কর্তৃপক্ষ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল : 'তরুণসমাজ চার্চের কাছে কী প্রত্যাশা করে'। আমাকে অক্সফোর্ডের বক্তা-প্রতিনিধি মনোনীত করা হল; এবং আমার প্রাক্তন সহপাঠী (পরবর্তীকালে যাকে ভারতে ডাকা হয়েছিল) এস. সি. নেইল কেমব্রিজের প্রতিনিধি। নেইল ঠিক আমার 'সহপাঠী' নয়, স্কুলে সে ভিন্ন ক্লাশে পড়ত—অসাধারণ প্রতিভায় সে বৃত্তি পেয়েছে, পুরস্কার পেয়েছে। এখন সে বিশপ, বাস্তবিকই বিদ্বান ব্যক্তি। কংগ্রেস শুরু হবার ঠিক পূর্বাহ্নে সে আমাকে লিখে জানাল, আমি যেন আমার বক্তৃতার খসড়াটির একটি কপি তাকে দিই। একেবারে সরলচিত্তে আমি সেটা তাকে দিয়ে দিলাম। প্রতিদানের কোনো সৌজন্যই কিন্তু সে দেখাল না। ফলে সভার দিন তার অবস্থানই হল অনুকূল; আমার জোগানো তথ্য দিয়েই আমাকে আঘাত হানার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল সে। এখনো

আমার মনে আছে তার উচ্চারিত কিছু বাক্যাংশ : 'অক্সফোর্ড থেকে বাগ্মিতার যে উষ্ণ প্রস্রবণ নেমে এসেছে শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর...' (উচ্চ হাস্যরোল); আর একটি, তাঁর ভাষণ 'মেষপালক নেই এমন মেষদের জন্যেই।' বাস্তবত সেরকম একটা বেসামাল অবস্থাতেই আমি ভাষণটা দিচ্ছিলাম।

আর আলোচনাসভার এই ভাষণ সূত্রেই সংবাদপত্রের শিরোনামে আমি জায়গা পেলাম। জীবনে সেই প্রথম বড় হরফে নিজের নামটা দেখি। প্রকৃতই আমি কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম; সেই সভায় আমি বলেছিলাম, বয়স্কজনরা ভাবেন, তরুণদের আগ্রহ বুঝি শুধুই 'ফুড, ফেলিক্স আর ফুটবলে'। (ফেলিক্স হল মিকি মাউসের আগে-আগে ছোটা বিড়াল জাতীয় প্রাণী।) তবে ভাষণটি ছিল আপাত নিস্তেজ নিরুত্তাপ— বক্তব্যটি পেশ করা হয়েছিল যাজকবর্গের বিবেচনার্থে। সেটাকেই সংবাদমাধ্যম তুলে ধরল বড় বড় অক্ষরে। ফলে এর একটা মদির প্রভাবও পড়ল। প্রথম চুমুকটা তো সবসময়েই সুস্বাদু! তা আরো বেড়ে গেল মার্‌গট্‌ অ্যাসকুইথ-এর মতো ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে উদ্দীপনাময় চিঠি প্রাপ্তিতে। সংবাদপত্রে উল্লেখিত আমার প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গেই তাঁর সহমত জানালেন তিনি।

মা এ-সময়ে হেডিংটন হিলে একটি বাড়ি কিনলেন; খুবই পুরনো কিন্তু দারুণ বাড়িটা। রোববারগুলো সেখানেই কাটাতাম। তখন সাইকেল চালাতে খুব ভালবাসতাম। পাহাড়ের চড়াই ঠেলেঠুলে ওঠার শ্রমের প্রায়শ্চিত্তের পর প্যাডেল না চালিয়ে নিচে নেমে আসতেই ভারি মজা লাগত।

পার্শ্ববর্তী এক গ্রামের এক বাড়িতে তখন আমি মাঝে মাঝে যেতাম; সেটা ছিল এলসফিল্ডের একটা খামারবাড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেরভিন হার্টদের বাড়ি সেটা। সেখানেও এক মা ছিলেন, বাতের ব্যথায় পঙ্গু, অথচ কি প্রাণবন্ত আর রসিক! মেরভিনের বাবা ছিলেন পুরনো ধাঁচের এক ইংরেজ ভূস্বামী। সেখানে আরো ছিল দুটি লাবণ্যময়ী বোন। আরো অনেকে মিলে যেতাম; সর্বদাই পেয়েছি উষ্ণ ভালবাসা আর ইংরেজগ্রামের আতিথেয়তা।

মেরভিন পাস করে ডাক্তার হল; খুবই ভাল ডাক্তার। শেষে ভারতে গেল, কলকাতার কাছে রানাঘাট সি. এম. এস. হাসপাতালের কাজ নিয়ে। সেখানে ডাক্তার ও সার্জন, দুটো ক্ষেত্রেই তার সুনাম হয়। গান্ধীজির আদর্শে সে বেশ অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে। ফলে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্যে সে হাসপাতাল কর্মীদের উদ্দীপিত করল; মেথর-বিলোপের জন্যে প্রত্যেকেই সম্মত হল নিজেদের নোংরা-আবর্জনা নিজেরাই সাফ করতে। অস্পৃশ্যতা বিলোপের এই সৎ প্রচেষ্টা কিন্তু তার লক্ষ্য পূরণ করতে পারল না। কাজ খুইয়ে মেথররা সব ক্ষেপে গেল— তাদের অসন্তোষে ইন্ধন জোগাল কিছু কমিউনিস্ট কর্মী। ১৯৪৯-এর নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় হাসপাতাল কর্মীরা যে ঘরটায় বসে নৈশাহার করছিল তার জানলায় কোনো এক লোক বন্দুক নিয়ে

দাঁড়ায়; মেরভিন এবং দুজন নার্সকে আততায়ীটি গুলি চালিয়ে খুন করল। অক্সফোর্ডে থাকাকালীনও মেরভিনের মধ্যে মহত্বের অনেক লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তার এই অকাল দুঃখজনক মৃত্যুতে একদিকে যেমন চিকিৎসাজগতের ক্ষতি হল, অন্যদিকে তেমনি সদর্থক ধর্মের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হল।

স্বতন্ত্র আবাসে বছরখানেক থাকার পর বসওয়ার্থ চলে গেল এক যাজকপল্লীতে, আর আমি গিয়ে উঠলাম উইক্লিফ হল-এ। এটা ছিল উত্তর অক্সফোর্ডের একটি থিয়োলজিক্যাল কলেজ। প্রটেস্ট্যান্ট ও এভাঞ্জেলিক্যাল ধারায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এই কলেজটি গড়ে উঠেছিল। তখন অবশ্য ওখানে আমার পড়ার কোনো ব্যাপার ছিল না। আমি তখনো পড়ছি মার্টনে— মিঃ গ্রিনের কাছে। মা হাজারখানেক পাউন্ড দিয়ে উত্তর অক্সফোর্ডের ওয়ার্নবরো রোডে একটা বাড়ি কিনলেন। পরিবারের একেবারে কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেলাম, মাঝে মাঝেই বাড়ি চলে যেতাম। এ-বছরটাও কেটে গেল বহির্জীবনের কোনো বড় ঘটনা ব্যতিরেকে। আর এ বছরেই আমি দ্বিতীয় ফাইনাল পরীক্ষায় বসি। অন্যবারের তুলনায় এবার আমি বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল, এবারও আমি প্রথম স্থান পেলাম।

১৯২৫-এ মেগডেলেন কলেজে ইংরেজি পড়ানোর জন্যে একজন ফেলোর প্রয়োজন ছিল। আমি আবেদন করলাম। নিকোল স্মিথের ধারণা ছিল, আমার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। কারণ আবেদনকারীদের মধ্যে আমার এক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন— সি. এস. লুইস। পরবর্তীকালে এই লুইসই বহু ক্ষেত্রে— ধর্মপ্রচার, সাহিত্য সমালোচনা, কল্পবিজ্ঞান, উপন্যাস লেখার মতো ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এসেছিলেন ১৯১৭-তে; তাঁর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা ছিল, গ্রেটস হিসেবে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন,— আমার মতো তেইশ বছরের যুবকের তুলনায় তিনি অনেকটাই পরিণত ছিলেন। নিকোল স্মিথের কথাই ঠিক হল, লুইসই নির্বাচিত হলেন। তারপরেই আমি। প্রেসিডেন্ট স্যার হারবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং ফেলোদের মেসে আমন্ত্রিতও হলাম— আমার চালচলন, আচার-ব্যবহার কতটা পরিশীলিত তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে।

যতদূর মনে পড়ে ডিনার পর্বে আমি আশ্চর্যজনকভাবে সহজ, স্নায়বিক চাপ-মুক্ত থাকতে পেরেছিলাম। ফেলো-পদপ্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের জন্যে ভাপানো চেরি পরিবেশনের একটা গল্প কে যেন শুনিয়েছিলেন। প্রথমজন চেরির বীচি থু করে প্লেটে ফেলতেই বাতিল হলেন; দ্বিতীয়জন চামচে করে বীচিগুলো বার করে প্লেটে সাজিয়ে রাখলেন— তিনিও বাতিল হলেন; তৃতীয়জন বীচিগুলো গিলে ফেলতেই সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, নিয়োগপত্র হাতে নেবার আগেই বেচারি ভদ্রলোক অ্যাপেন্ডিসাইটিসে মারা যান।

স্যার হারবার্টকে নিয়ে আরো একটা গল্প তখন অক্সফোর্ডে খুব চালু ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ

জীবিত উন্নাসিক হিসেবে তখন তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি।

মিসেস বেসান্ত অক্সফোর্ডে এলেন তাঁর প্রতিপাল্য কৃষ্ণমূর্তিকে কোনো একটি কলেজে ভর্তি করাতে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি সরাসরি মেগডেলানে এসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন। স্যার হারবার্ট তাঁর প্রার্থীকে ভর্তি করে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় মিসেস বেসান্ত সজোরে বললেন, 'আমার প্রার্থীটি কিন্তু স্পেশাল ব্যক্তি; বেশি কিছু বলতে চাই না, সে যেন অনেকটা ঈশ্বরের সন্তান।'

উত্তরে স্যার হারবার্ট বলেছিলেন, 'ম্যাডাম, অনেক নামী-দামি মানুষের সন্তানেরা এই কলেজে পড়ছে।'

বহু বছর বাদে ভারতের প্রাক্তন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সর্দার পানিক্কার যখন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য হিসেবে আসামে এসেছিলেন তখন এই কৌতুকি গল্পটি তাঁকে শোনাই।

—কোথায় শুনেছেন গল্পটা?

আমি বলি, এটা আমার নীরেস অক্সফোর্ড-জীবনের সংগ্রহ। শুনে উনি বললেন, 'জানেন, গল্পটা আমিই বানিয়েছিলাম। তরুণ বয়সে জীবিকার্জনের জন্যে মার্কিনি পত্রপত্রিকায় লিখে দু'পয়সা পেতে এটা লিখি। গল্পটা প্রথমে আমেরিকায় প্রকাশ পেল, তারপর লণ্ডন 'টাইমস'-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল; সেখান থেকেই হয়তো ঢুকে গেছে অক্সফোর্ডে।'

শারীরচর্চায় কোনোদিনই আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। উদ্দেশ্যহীন দৈহিক শ্রমকে শার্লক হোমসের মতো আমারও শক্তির অপচয় বলে মনে হত। আবার কেউ মেয়েলিও যাতে না বলে আমাকে, সেজন্যে খেলার মাঠেও হাজির থাকতাম। স্কুলে থাকতে বক্সিং খেলে পুরস্কার পেয়েছিলাম 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'-এর একটা কপি। পরে অবশ্য আমিও বেরি উস্টার-এর কথাই মেনে নিলাম; তাঁর বক্তব্য ছিল : বক্সিংয়ের মতো সাংঘাতিক খেলাটা বরং অনোরিয়া গ্লাসোপ-এর মতো পুরুষালি মেয়েদের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকা ভাল। আমার বাবা মার্টনের নৌকা-চালনার দলে ছিলেন, তবে বুদ্ধি করে হালের বিপরীতে বসতেন কক্স হিসেবে। সেমতো সাধ্যমতো শক্তির অপচয় রুখতে আমিও অন্য একটি খেলায় গোলরক্ষকই হতাম। এই ছকে বুদ্ধি খাটিয়ে একবার আমি ফুটবল খেলায় মার্টন স্কুল একাদশের দ্বিতীয় দলের অধিনায়কও হই। নিঃসন্দেহে সেই বছরটা কলেজের সুনামের পক্ষে বিপর্যয়করই হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমার দল প্রতিটি ম্যাচই হারল— কোনো কোনো ম্যাচে পনের-শূন্য গোলেও হেরেছি। অতঃপর ভণিতা ছেড়ে খেলাধূলার জগৎ থেকেই সরে এলাম।

সাঁতার কাটতে অবশ্য ভালই লাগত। মাঝে মাঝে পার্সনস প্লেজার-এ চলে যেতাম। সেখানে সকলেই নগ্ন হয়ে স্নান করত। আমি কিন্তু ডোঙায় শুয়ে নদীতে বেশ আরামেই ভেসে চলতাম।

এখন যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি সেই ড. রাধাকৃষ্ণানকে নিয়ে গ্রীষ্মের এক বিকেলে বার্নাড অ্যালুইয়ার ও আমি সেরকম নৌকোয় চেপেছিলাম। ড. রাধাকৃষ্ণান তখন ছিলেন 'অল সউলস্'-এর ফেলো। এখন মনে করতেও লজ্জাবোধ করি, সেদিন তাঁকে আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম : তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না?

অক্সফোর্ডে থাকতে কখনো ধূমপান করিনি, মদ্যপানও করেছি মাঝে মধ্যে। তৃতীয়বর্ষে ওঠার পরেই কখনো কখনো বিয়ার ও শ্লেণ্ডি খেতে শুরু করি। অবশ্য কলেজ বা কোনো ক্লাব ডিনারে ওয়াইন খেতে খুব ভাল লাগত। তবে সব ক্ষেত্রেই সেটা হত শালীন পদ্ধতিতে পান— প্রকাশ্যে এবং খাবারের সঙ্গে। আমরা যারা বসবাসের জন্যে প্রাচ্যে এসেছি তাদের মধ্যে ওয়াইন ছেড়ে স্পিরিট ধরাটা একেবারেই অভব্য নেশা।

ভারতে আসার পর, এবং বয়েস চল্লিশ পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি। তখন অবধি আমি ধূমপান করতাম না বলেই হয়তো সেটা হত। (সিগারেট আমি কখনো খাই নি) কিন্তু চুরুট খাওয়া অভ্যেস করার পর কখনোই আর ম্যালেরিয়া হয়নি, সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়েছে।

ইংল্যান্ড ও কন্টিনেন্টে চুরুট খাওয়া হচ্ছে ধনবানের লক্ষণ; কমিউনিস্ট কার্টুনে পুঁজিবাদকে চিত্রিত করা হত মুখে একটা চুরুট বসিয়ে দিয়ে। কিন্তু ভারতের ঘরে-তৈরি সিগার (লেখক হয়তো 'বিড়ি' বা বীটি বোঝাচ্ছেন— অনুবাদক) হচ্ছে আসল চুরুট; সিগারেটের তুলনায় কিছুটা শস্তাও।

তিন

আণ্ডার গ্রাজুয়েট পর্বে ধর্ম নিয়ে কি বিপুল সময়ই না অপচয় করেছি! সংকীর্ণ যেসব ধারণা আমার মধ্যে ছিল সেগুলো জীবন থেকে অনেক আগেই উবে গেছে। সেগুলো আমার জীবনে কখনো কোনো উপকারে লাগত কিনা তা নিয়েও সন্দেহ আছে। কিন্তু এই সময়ে ধর্ম ছিল দারুণ এক উত্তেজক ব্যাপার। ব্রিজ খেলা বা ঘোড়দৌড়ের মতো ব্যাপারে যেমন নেশা থাকে সেরকমই অনেকটা।

নিয়মিত আমাদের প্রার্থনা সভা হত, 'প্রায়শ্চিত্ত'ও হত আত্মার মুক্তির জন্যে। বিশিষ্ট কোনো এভাঞ্জেলিস্ট বা কোনো কট্টর শিক্ষককে আমন্ত্রণ করে এনে একটি ঘরে আমরা সমবেত হতাম। থাকত বিশ থেকে ত্রিশজন বন্ধুবান্ধব, বিশেষত যেসব বন্ধুর আত্মা পরিশোধনে আমরা বেশি উদ্‌গ্রীব তাদের নিয়ে আসা হত। হেরিং মাছ ভাজা, কেক, ক্রামপিট আর বড় বড় কাপে চা খাইয়ে তাদের যখন অনেকটাই বিগলিত করা গেছে তখনই এভাঞ্জেলিস্ট শুরু করতেন তাঁর ভাষণ।

আরো বেশি ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক অনুশীলন চলত প্রতি রবিবার সন্ধ্যা আটটায় মারটায়ার্স মেমোরিয়ালে। নায়কসুলভ আণ্ডার-গ্রাজুয়েটরাই সেখানে জড়ো হত। কেউ জুটিয়ে নিয়ে আসত একটা হারমোনিয়াম (অসহ্য এই যন্ত্রটির প্রতি আমার আজীবন বীতরাগের উৎসও বোধহয় এখান থেকেই), প্রার্থনাগীতির কাগজটা হাতে হাতে ঘুরত আর ঘন্টাখানেক ধরে চলত উচ্চস্বরে ভজন; তারপর ধর্মোপদেশ দান। একটা পলকা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে, গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশে আমি ভাষণ দিতাম। শ্রোতাদের মধ্যে প্রায়শই উপস্থিত থাকত বিদ্রূপকারী আণ্ডার গ্রাজুয়েটরাও। শ্রোতাদের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনকামী সেই ভাষণ প্রদানই সম্ভবত আমার জীবনের দুঃসাহসিক কাজ। মনে হয়, সবটাই ছিল অর্থহীন। তবু বলতে বাধা নেই, এর ফলেই কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পেয়েছিলাম— লিণ্ডসে গডফ্রে, নোয়েল ওয়ার্ডলে-হারপুর আর এফ. ডব্লুয়ু ডিলিস্টোন।

আর এক ধরনের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আমার প্রচুর সময় নষ্ট করেছে। সেটা হল ও-ইউ-বি-ইউ'র, অর্থাৎ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাইবেল ইউনিয়নের কাজ। শেষ অবধি এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলাম আমি। সেটা ছিল ও-আই-সি-সি-ইউ'র উত্তরাসূরি (কেমব্রিজ সোসাইটির একই নামের একটি ধারার অনুরূপ)— কয়েক বছর আগে বে-লাইনে চলে এই সংগঠনটি স্টুডেন্ট ক্রিশ্চিয়ান মুভমেন্টের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আমাদের কাছে সেটা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ফলে ও-ইউ-বি-ইউ হয়ে ওঠে অক্সফোর্ডের সবচেয়ে কট্টর ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় ছাত্র-সংগঠন। নাম-বৈশিষ্টেই সেটি দিব্য-প্রেরণার ক্ষেত্রে তা এক চতুর্ভুজিক অবস্থান নিয়ে নেয়। প্রতি শুক্রবার সভা হত সেন্ট পিটার হল-এ। বিশিষ্ট অভ্যাগত ও সদস্যদের সেখানে ভাষণদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হত। ভজন, প্রার্থনা ইত্যাদিও হত। সদস্যসংখ্যা সত্তর-আশিজনের মতো আণ্ডার গ্রাজুয়েটেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ সজীব ছিল, এক ধরনের প্রেরণাও কাজ করত।

অক্সফোর্ড-জীবনের প্রথম তিনটি বছর যদিও আমার এ-জাতীয় ধর্মীয় কাজে নিবদ্ধ ছিল তবু অ্যাংলো-ক্যাথলিকদের ব্যাপারেও আমাকে কিছু কিছু কাজ করতে হয়েছিল। মব কুয়াড-এ আমার প্রতিবাসী ছিল অ্যালস্টন ডিক্স; ওঁর মতো প্রখর মেধার তরুণ আমি খুব কমই দেখেছি। শেষমেশ তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। ডম গ্রেগরি ছিলেন এক বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ্। ম্যাক্স পেটিটপীয়ার ছিলেন এক অসাধারণ যুবক— নিখাদ সোনার মতো ছিল তার হৃদয়। আর একটি যুবক ছিলেন বিশেষ চরিত্রের, তাঁর নাম ব্যাগনি স্মিথ। প্রথম বছরটা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, ওঁর কাছ থেকেই ঘরটা পেয়েছিলাম। ও-ইউ-ডি-এসের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন তিনি। খুবই কৌতুকপ্রিয়।

এই উপরোক্ত তিনজনই ছিলেন অ্যাংলো-ক্যাথলিক। প্রথম সপ্তাহ থেকেই তাঁরা

উঠেপড়ে লেগে পড়েছিলেন আমাকে দীক্ষান্তরিত করতে। তাঁরা খুবই তোষামোদ করতেন আমাকে (এভাঞ্জেলিক্যাল নির্বোধ রীতিতে সময় নষ্ট করার পক্ষে আমি অনেক বেশি উন্নত)। তাঁরা এমন সব যুক্তি খাড়া করতেন যেগুলো আমি স্কুলে শিখিনি। আমাকে খুব আদর-আপ্যায়নও করতেন তাঁরা। একজন যখন যুক্তি সহকারে আমাকে বোঝাচ্ছেন অন্যজন হয়তো তখন শয়নঘরে হাঁটু গেঁড়ে বসে আমার হৃদয় ছোঁয়ার জন্যে প্রার্থনা করে চলেছেন। অ্যাংলো-ক্যাথলিকরা কাজটা নিষ্ঠা সহকারে ভালভাবেই করেছিলেন; কারণ বলতে বাধা নেই, চূড়ান্তে তাঁরা সফলও হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে, আমার অক্সফোর্ড-জীবনের শেষপর্বে অন্য এক ধর্মীয় চেতনার অভিঘাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়েছিল। তার উৎসে ছিলেন ফ্রাঙ্ক বাক্‌ম্যান। আমার সৌভাগ্য, তাঁর অক্সফোর্ডের প্রথম সভাতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর ওই চেতনায় গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড-গ্রুপ এবং আরো পরে মরাল-রিআরমামেন্ট।

সরাসরি বাক্‌ম্যানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি আমার দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে বলে উঠলেন : 'তোমার জীবনে গোপন পাপ আছে।'

নিশ্চয়ই আছে। আমি তখন সরল সাদাসিধে। তবু সেদিনও আমার মনে হয়েছিল কথাটা যেন সারবত্তাহীন, কথার কথা। অক্সফোর্ডের যে-কাউকে এরকম প্রশ্নে নিশ্চিন্তে লক্ষ্যভেদ করা যায়। বাক্‌ম্যানের দু-তিনটে সভায় হাজির ছিলাম। তারপর ব্যাপারটা আমার কাছে আর একেবারেই পছন্দের মনে হয়নি। তবে সব মিলিয়ে বেশ মজার ব্যাপার ছিল।

প্রকাশ্যে পাপ স্বীকারকেই আমি বিশেষ পছন্দ করতাম। মনে হয় এখন আর সেটা কোনো অনুষ্ঠানে থাকে না (খুবই পরিতাপের কথা)। মনে পড়ে প্রথমবর্ষের একটি ছেলের কথা— একেবারে শিশুর মতো নির্দোষ ছেলে। পাপ স্বীকারে তার পালা এল, বলার মতো কোনো কথাই সে খুঁজে না পেয়ে বলে ফেলল, পাবলিক বাথরুমের তোয়ালেতে একদিন সে নাক ঝেড়ে ফেলেছিল। আর একটি ঘটনায় একটি ছাত্রী পাপস্বীকারে বলেছিল : আটলান্টিক-ভেদী এক উচ্চকণ্ঠ যখন বললে, 'আরো স্পষ্ট হও বোন' তখন তা আমি শুনে ফেলেছিলাম— নৈতিকতার এই স্খলন আমার ঘটেছে।

ওরচেস্টার কলেজে আর বোহ্‌ডস্ স্কলারদের মধ্যে বাক্‌ম্যানবাদ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও আমার সময় অবধি তার কোনো বড় ধরনের সাফল্য ছিল না। আর তাই অ্যাংলো-ক্যাথলিকদের, কিংবা এভাঞ্জেলিক্যানদের জন্যে বিশপ সেভেস্-এর মতো বড় কর্তৃত্বের বাক্‌ম্যানবাদের বিরোধিতায় নামার কোনো আবশ্যকতাও ছিল না।

থিয়োলজির ফাইনাল শেষ হতেই আমি উইক্লিফ হল-এর উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হই। আমার বন্ধু জুলিয়ান থর্নটন-ডিউসবেরি ওই একই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়েছিল।

সে হল চ্যাপলিন। কয়েক মাস বাদেই অক্সফোর্ডের বিশপ টমসি স্ট্রং আমার ওপর ক্রাইস্ট চার্চ ক্যাথিড্রালের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বিশপ টমসি স্ট্রংয়ের প্রতি আমি সবিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলাম। মনে হয় তিনিও আমাকে কিছুটা স্নেহ করতেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সারস্বত আলোচনা হত; এরিওপোগাইট-এর (এথেন্স নগরীর সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের অন্যতম বিচারপতি—অনুবাদক) ছদ্ম-পরশুরামত্ব নিয়ে কিংবা হেইস্টারবাকের স্বৈরাচার নিয়ে গভীর আলোচনা হত আমাদের। তিনি দুই স্বরবিশিষ্ট শব্দের থেকে অন্য কোনো শব্দ সাধারণত ব্যবহার করতেন না, কিন্তু তাঁর ভাষণ ও লিখন সারল্য আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

বিশপ স্ট্রং ছিলেন ছাত্রদের বন্ধু ও দিশারী। সকলেরই বিশ্বাস ছিল, ক্রাইস্ট চার্চের একজন আদর্শ ডিন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি যথেষ্ট যোগ্য হলেও অক্সফোর্ডের বিশপের পদটি তাঁর পক্ষে ছিল একেবারেই বেমানান। সাধারণ অনুষ্ঠানে তিনি বিরক্ত হতেন; বিশেষত যাঁরা খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক ছোট পল্লবগ্রাহী ভাষণদানে পটু তাঁদের তিনি বাধাই দিতেন। উপদেশদানকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। স্তবগান বা ভজনের কোনো আবশ্যকতা আছে বলেও তিনি মনে করতেন না। অতি দ্রুত গির্জার কাজকর্ম শেষ করাকেই সাফল্য বিবেচনা করতেন।

তাঁর জীবনীকার লিখেছেন : 'ধর্মোপদেশ লোকে কেন শুনবে, এটাই সম্ভবত তিনি বুঝতেন না। তাঁর হয়তো মনে হত, ধর্ম নিয়ে এদের কিছু যায় আসে না।' তারপর তিনি একটি কৌতুককর ঘটনার কথাও শুনিয়েছেন। গ্রামের কোনো একটি ছোট গির্জায় যাজক-বরণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। সেখানে যেসব যাজক রয়েছেন তাঁদের দৃষ্টি এড়াতে মিঃ স্ট্রং গাড়িতে বসেই পোশাকাদি পাল্টে নিতে চাইলেন (সহকারী যাজকদের সঙ্গে তা নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে গেল প্রায়)। সেখানে পৌঁছে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, কোন স্তবগানটা গাওয়া হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'কোনো স্তবগানই নয়।' তড়িঘড়ি প্রার্থনার অনুষ্ঠানটি সেরে শোভাযাত্রা থেকে সটকে গাড়িতে ঢুকে পড়লেন তিনি। অভিষিক্ত নতুন যাজকের সঙ্গে করমর্দন করে শুধু বললেন, 'আশা করি আপনি খুশি হয়েছেন'— বলেই দ্রুত গাড়ি চালিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

যতদিন চার্চে ছিলাম মিঃ স্ট্রংয়ের এই আচরণের কোনো তাৎপর্যগত প্রভাবই আমি বোধ করিনি। বিলম্বিত ক্রিয়ায় সেটাই আমার পরবর্তী জীবনে প্রভাব ফেলেছে। অভ্যর্থনা, সমিতি, উৎসব, মিছিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই মনোভঙ্গি আমার মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। সরে যেতে না পারলে ধৈর্য ধরে আমি বসে থাকতাম— টমসি স্ট্রং হয়তো সেটাও পারতেন না, — বসে বসে আমি 'ধম্মোপদে'র অসংলগ্ন পদগুলো আপন মনে আবৃত্তি করতাম : 'সৃষ্ট সবকিছুই দুঃখময় বেদনাময়; সব সৃষ্ট বস্তুই ধ্বংস হবে; সমস্ত আকাং অবয়বই অপ্রাকৃত।' অপ্রাকৃত জিনিস যথাসময়েই কেটে যায়।

উপাধ্যক্ষ হিসেবে হল-এর এক ধারে বেশ কয়েকটি কক্ষযুক্ত বাসস্থান জুটল, একা

আমার জন্যেই। দায়িত্ব বর্তাল নিয়মিত ক্লাশে পড়ানোর, টিউটোরিয়াল নেয়ার। আর সেই সঙ্গে ছিল অ্যাংলিক্যান যাজক হিসেবে প্রাত্যহিক কর্তব্য সম্পাদন।

এ সময়ে মার্টনে আমি কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেন্টা জেমস্-এর 'এপিসল'-এর ওপর। সাধারণভাবে বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করা হয়ে থাকে; কিন্তু এখানে লেখক সচেষ্ট রয়েছেন খ্রিস্টধর্মের বাণীকে ইহুদি পাঠক-সংবেদনে পৌঁছে দিতে— ইহুদি জাতিকেও স্বমহিমায় বিকশিত হতে হবে; ইহুদিদের বিশ্বাস সদর্থে খ্রিস্টধর্মের বিরোধী নয়, বরং একাত্মিক। এভাবেই আমার আজীবন অনুসৃত নীতি হিসেবেই বিষয়টি নিয়ে তখন থেকেই ভাবছিলাম। তাই পুণেতে থাকতে পাশ্চাত্যের অতীন্দ্রিয়বাদকে হিন্দুধর্মের বিন্যাসে উপস্থাপিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে চেষ্টা করেছি আদিবাসীদের মধ্যে একটা নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটাতে। তাদের চেনা-পরিচিতি উপায়ের মধ্যে দিয়ে আধুনিক বিশ্ব তাদের বর্তমানে নিয়ে আসবে; অতীত থেকে বর্তমানে তাদের নিয়ে আসবে এমন এক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেখানে অতীতের সঙ্গে তাদের বিযুক্তি ঘটবে না। বলা যায়, প্রস্তুতির কাজটা আমি অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলাম।

উপাধ্যক্ষ হিসেবে বহুবখানেক কাজ করেছিলাম। বর্হিজীবনটা ছিল প্রথাগত এবং বেশ নীরসই। অন্তর্জীবনে কিন্তু এ সময়টা ছিল তীব্র উত্তেজনাময়। প্রথমত অতীন্দ্রিয়বাদ বিষয়ক আমার পাঠকে আরো ঋদ্ধ করলাম। আর ধর্মীয় রীতিনীতি আচার-আচরণ পালনের ক্ষেত্রে আগের থেকে অনেক বেশি মনোযোগী হলাম।

থিয়োলজি পাঠ্যক্রমে অতীন্দ্রিয়বাদ ছিল আমার বিশেষ পত্র। সেই সূত্রে পড়েছি উইলিয়াম ল'। তাই স্বাভাবিকভাবেই জেকব বোহেম-এর লেখাও গভীরভাবে পড়ার প্রয়োজন হয়েছিল। প্লটিনিয়াস আমাকে বিমুগ্ধ করেছিলেন। ডিন ইন্‌গে-এর সঙ্গে একদিন এ-বিষয়ে আলোচনাও হল। মিতব্যয়ে সঞ্চিত প্রতিটি অর্থ দিয়ে কিনে অতীন্দ্রিয়তা বিষয়ক একটি অসাধারণ সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলাম। আর গোগ্রাসে সেগুলো পড়তে থাকি। ঈশ্বরের সন্ধানে তখন আমি মরিয়া। প্রতি বুধবার ও শুক্রবার আমি তখন সারাদিন উপোস করছি— সন্ধ্যা সাতটার আগে কিছু খাচ্ছি না। কোনো কোনোদিন সারারাত কেটে যায় প্রার্থনায়। চিরপ্রাচীন, চিরনবীন যে-সৌন্দর্য কয়েক শতক পূর্বে অগাস্টাইন-এর সংবেদনশীল হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল সেই সৌন্দর্যের অপার্থিব প্রেমে আমিও মগ্ন হলাম। 'যে প্রেম আদিত্য ও অন্যান্য নক্ষত্রকে চালনা করে' তা আমাকে আবিষ্ট করল। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমার শান্তি; নিভৃত কক্ষে বসে আমি সকাতরে উচ্চারণ করতাম : 'তুমিই আমাকে তোমার জন্যে গড়েছ —তোমাতে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত আমি রয়েছি অশান্ত-হৃদয়।'

একই সঙ্গে বখাটে ছেলেদের প্রতি আমার পুরনো মমতাটা আরো বেড়ে গেল। তাদের বেশ কয়েকজনকে আমি বাগে আনতে পেরেছিলাম। আমাকে মার্টনের

যাজকও করা হল। সেখানে প্রভাতীভজন ও সান্ধ্যভজন নিয়মিত পরিচালনা করতাম; উইক্লিফ-এর কাজের দায়িত্ব তো ছিলই।

ফলে ক্যাথলিকতন্ত্রের দিকে আমার অনিবার্য ঝুঁকে পড়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। ঠিক ক্যাথলিকতন্ত্র নয়, অ্যাংলো-ক্যাথলিকতন্ত্রের বিকল্পের প্রতি প্রবণতা। রোমের প্রতি আমার কোনো বীতরাগ নেই; কিন্তু সেটা অচেনা। আর এদিকে মায়ের কাছে এটা হবে এক চরম আঘাত। অ্যাংলো-ক্যাথলিকতন্ত্রে কাব্য ছিল, সৌন্দর্যবোধ ছিল— এক ধরনের অতীন্দ্রিয় চেতনাও ছিল। সেরকম কিছুই ছিল না ইংল্যান্ড চার্চের এভাঞ্জেলিক্যাল সম্প্রদায়ে।

ব্যাপারটা আমি প্রথমে খুলে বলি মার্টন চ্যাপেলের মিঃ গ্রিনের কাছে। তবে বলার আগে আমি খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম; তাই আগেভাগে যাজক-ঘরে ঢুকে এজমালি ওয়াইনের প্রায় আধ-বোতল গিলে বুকে বল সঞ্চয় করে নিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন পাপক্লিন্ন জীবনের এক আতঙ্ককর অধ্যায় উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। আজ যখন ভাবি তখন বিস্মিত হই— কী অকিঞ্চিৎকর কথাটাই না সেদিন বলার ছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে বেশ প্রতিকূল অবস্থায় ফেলল। অ্যাংলো-ক্যাথলিক আন্দোলন প্রতিরোধের লক্ষ্যে যে-সংগঠনটি সক্রিয় আমি তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ধর্মতত্ত্ব পড়াব, এটাই আমার কাছে প্রত্যাশিত। আমার কাছে আরো প্রত্যাশা মাস্, পাপস্বীকার, মেরীমাতার উপাসনা— এ জাতীয় রোম-চার্চের ধর্মীয় প্রথার বিরুদ্ধে আমি যুক্তি বিস্তার করব। বছরের শেষাশেষি স্পষ্ট হয়ে গেল, প্রতিকূল এই অবস্থানটি আমার পক্ষে আর বহন সম্ভব নয়।

১৯২৭-এর গ্রীষ্মের ছুটিতে প্যালেস্টাইন ভ্রমণের এক আয়োজন করলেন অধ্যক্ষ মহাশয়। হল-এর শিক্ষক ও ছাত্ররা সেখানে গিয়ে কয়েক মাস থাকবেন। ঐতিহাসিক ঘটনাস্থলের প্রেক্ষিতে তাঁরা বাইবেল চর্চা করবেন। প্রায় একটা বছর ধরে এরকম এক স্বপ্ন আমিও দেখছিলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার মনে হল, এই সুযোগ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অনুচিত কাজ হবে। সচেতন বিবেক ও ন্যায়বোধ দাবি করল, অভিযানের পরে নয় আগেই আমার পদত্যাগ করা কর্তব্য। নিঃসন্দেহে এটা একধরনের ভাবাবেগীয় কাজ, কিন্তু আমার মনে হল, এক্ষেত্রে এটাই সঠিক পদক্ষেপ।

অধ্যক্ষ গ্রাহাম-ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অত্যন্ত শুষ্ক এক সাক্ষাৎকারই হল। তিনি বললেন, 'অনেকদিন ধরেই সন্দেহ হচ্ছিল আপনি স্বীকারোক্তির পথে আসবেন।' বাচনভঙ্গির ধরনে মনে হচ্ছিল যেন কোনো গণিকালয়ে আমার যাওয়া সংক্রান্ত সন্দেহের কথা উনি বলছেন। বস্তুত আত্মীয়পরিজন আমার মানসটিকে এমতো জটিলতায় গড়েছিলেন যেখানে সত্যের সপক্ষে লড়াইও পাপ। এবং শিখিয়েছিলেন, আলোর সন্ধানে ধাবমান আত্মার গতিধারায় কোনো বাধা দিতে নেই।

বুঝতে পারছিলাম আমি প্রিয়জনদের খুবই কষ্ট দিচ্ছি; কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে আমি কিন্তু খুবই স্পর্শকাতর ছিলাম। মন ও আত্মা যেখানে বাস্তবের গূঢ়ার্থ বুঝতে তৎপর সেখানে চিত্ত হল ভারাক্রান্ত। গ্রীষ্মের পরে বেকার হয়ে বাড়িতে মায়ের কাছে চলে এলাম। আমি ইতিমধ্যে মার্টনের চ্যাপলিন হয়ে গেছি, ফলে সেখানে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা খুব অসম্ভব নয়। আমি আবার হাউস-এও যেতে পারি, এবং পেতে পারি কেব্‌ল্-এর একটা ফেলোশিপ। আমি নিশ্চিত, কিছু একটা পাবই, মনের মতো কিছু একটা অবশ্যই জুটে যাব শরতের আগেই।

চার

সেই গ্রীষ্মাবকাশেই কিন্তু ধর্মীয় আনুগত্যের থেকে অনেক বড় একটা পরিবর্তনের সামনে পড়তে হল আমাকে। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পুরো ছকটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হল আমাকে। এতদিন পর্যন্ত আমার জীবন ছিল সোজা-পথের। লেখাপড়ার শিক্ষা ভালই হয়েছে; দুটো পরীক্ষামূলক যাজকবৃত্তিতেও নিযুক্ত হয়েছি। তিনটে কলেজে ফেলোশিপের কথাবার্তা চলছে। নর্থ অক্সফোর্ডে মা একটা বসতবাড়িও কিনে ফেলেছেন।

কিন্তু উইক্লিফ হল থেকে আমার পদত্যাগ নতুন করে আমাকে ভাবাল। প্রাক্তন শিক্ষক মিঃ গ্রিন ছিলেন যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ, তাঁর প্রভাব আমার ওপর ছিল যথেষ্ট। তিনি আন্তরিকভাবে চাইছিলেন, আমি যেন অক্সফোর্ডে না থাকি। লন্ডনের বস্তির কোনো গির্জায় অথবা অন্য কোনো শিল্পশহরে গিয়ে গরিব সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন আমি বাস করি। সে-চেষ্টাও আমি করেছিলাম, কিন্তু কার্যকর হয়নি। তারপরই তাঁর অন্যান্য প্রস্তাবগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আর আমাকে ভারতবর্ষ বিষয়ে ভাবনার দিকে নিয়ে যায়।

অক্সফোর্ডকে তখন যতটা ভালবেসেছিলাম ততটা ভাল আমি সারাজীবনে অন্য কিছুকেই বাসতে পারিনি। অক্সফোর্ডে ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশার সবকিছু; আর চাওয়ার জিনিস বলতে তখন মানুষিক কিছু নয়, বা স্বাচ্ছন্দ্য-আরামের আকাঙ্ক্ষাও নয়। 'জন ইন্‌গ্লসেন্ট' বইটি আমার চেতনায় খুব প্রভাব ফেলেছিল। সত্যান্বেষণ, সারস্বতজীবনের মর্যাদা ও তৃপ্তি, উচ্চমানের বন্ধুত্বের উত্তাপ আর অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে অক্সফোর্ড তখন আমার সামনে দীপ্যমান। তবু তাতেও যেন মন তৃপ্তি পাচ্ছিল না; 'যাদের জীবন ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য নয়' তারা আমার মনের অতলে আলোড়ন তুলতে থাকে— আমি যেন এক জ্ঞানী জিপসি— তারই মতো সংক্ষোভে তাড়িত— তাড়িত কোনো অরণ্যে।

সে-সময়ে এবং বস্তুত তারও কয়েক বছর পর পর্যন্ত টাকাকড়ির ব্যাপারে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ উদাসীন। মায়ের শিক্ষার সূত্রে মনে হত, টাকাপয়সার প্রতি আকর্ষণের

মধ্যে কেমন যেন একটা অসম্মান জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের পরিবারটি যে খুব নামী তা নয়, তবে বংশের কেউই ব্যবসায়ে নেমেছে বলে শুনিনি। ব্যবসায়ীর ছেলে যত ধনীই হোক না কেন বা কোনো দোকানির ছেলে যতই শ্রীমন্ত হোক না কেন তারা কেউই আমাদের বন্ধু হতে পারে বলে মনে হত না। মা গরিব ছিলেন—সংসার নির্বাহে তাকে হিমসিম খেতে হত ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে ছিল এমন একটা পরিবেশ যেখানে মনে হত, অর্থ কোনো সুখ আনে না— ভালমানুষেরা কখনো টাকাপয়সা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আর সে-জন্যেই, পুরস্কার বা বৃত্তি হিসেবে বেশ ভালো টাকা আমি পেয়েছিলাম বটে কিন্তু সেসব আমাকে খুব নাড়া দেয়নি। আর যে-টাকাই বাঁচাতে পেরেছি তাই পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছি। আমাকে যখন উইক্লিফের উপাধ্যক্ষের পদে ডাকা হয়েছিল তখনো আমি জানতে চাইনি মাইনে কত পাব। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল থাকা-খাওয়ার ব্যয় বাদে বছরের ত্রিশ সপ্তাহের জন্যে দুশো পাউন্ড। আপাতদৃষ্টিতে সেটা খুবই কম। ১৯২৭ সালের বার্ষিক ২০০ পাউন্ডের ক্রয়ক্ষমতা আজকের (১৯৬৪-এর—অনুবাদক) মাসিক ১০০০-এর মতোই হবে। কিন্তু বেতনটা কম না বেশি সেটা কোনো ব্যাপার ছিল না— এসব নিয়ে আমি কিছু ভাবিই নি।

আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ে ছিল সহজাত ঔদাসীন্য। ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাবো— এ-জাতীয় প্রস্তাব পরিবার-পরিজনদের কেউ কোনোদিন দেয়নি। কী করতে হবে সেটি ছিল সহজ ব্যাপার। আমাদের তখনকার ভাষায়, ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, সেটা জানা এবং সেমতো কাজ করে যাওয়া।

তাই আমার কর্মপন্থা পছন্দের ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। আর ভারতবর্ষ বিষয়ে অনেক কথা শুনেওছিলাম। ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ছিল দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। তাছাড়া প্রেরণার তাড়নটাও ছিল তখন একেবারে খাঁটি— আমার চিন্তনের ওপর তা বেশ গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

'প্রত্যার্পণ' বলে ধর্মাচরণে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে। জগৎ-সংসারের পাপের বোঝা বহন করেছিলেন খ্রিস্ট। ত্যাগ-তিতিক্ষা আর প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে সন্তগণ নিজেদের ও অপরদের পাপ মোচন করে থাকেন। সেই প্রত্যার্পণের ইচ্ছেটা আমার মধ্যেও দেখা দিয়েছিল অক্সফোর্ড-জীবনের শেষ বছরগুলোতে। সেই ইচ্ছাটা রূপ পেয়েছিল অপেক্ষাকৃত ধনীদের দ্বারা বঞ্চিত শোষিত দুঃস্থদের মধ্যে প্রত্যাবসনে। তাই ভারতবর্ষ সূত্রে আমার মনে জাগল, কিভাবে আমাদের পরিবার ও সেই দেশটি থেকে অন্যান্যদের মতো অর্থ উপার্জন করে এনেছিল। তাছাড়া আমার স্বদেশবাসীরা ভারতবর্ষে গিয়েছিল শোষণ করতে, শাসন করতে।

তাই আমার মনে হল প্রত্যার্পণের ব্রত নিয়েই আমি ভারতবর্ষে যেতে পারি। আমাদের পরিবার থেকে অন্তত একজন মানুষ ওদেশে যাক শুধু পাবার আকাঙ্ক্ষা

নিয়ে নয়, সে-দেশটির দরিদ্রতম মানুষকে সেবা করতে; যে-দেশটিকে শাসনের কর্তৃত্বে অবনত করে রাখা হয়েছে, সেই অবনত মানুষেরই একজন আত্মীয় হয়ে উঠতে। অক্সফোর্ডের কর্মজীবনের ওপর যবনিকা টানতে এই চিন্তনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে কষ্টকর বছরগুলো অতিক্রমণের ক্ষেত্রেও এটাই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ভিতরে কাজ করেছে।

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই মনে হল, পণ্ডিতিজীবনের এখানেই ইতি ঘটছে— আমি হারিয়ে যাচ্ছি এক অচেনা জগতে। তারপরেই আবার ভাবলাম, আমি এমন এক পথে পা রাখতে যাচ্ছি যেখানে অফুরান সুযোগ ঘটবে আরো এক বড় গবেষণার— অক্সফোর্ডের বইয়ের জগতের চৌহদ্দিতে তেমনটা জোটা কখনোই সম্ভব নয়। বাস্তবিকই আমার স্ব-আরোপিত নির্বাসন আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিল অসংখ্য মানুষের বিচিত্র জীবনধারাকে অদৃষ্টপূর্ব দৃষ্টিতে দেখার। চোদ্দ বছর বাদে এ ধরনের গবেষণার জন্যেই আমাকে ডি. এসসি. সম্মান প্রদান করেছিল এই অক্সফোর্ডই।

প্রথম আমি যখন অক্সফোর্ডে যাই ভারতবর্ষ বিষয়ে তখন তেমন কিছুই জানতাম না। সামান্য কিছু জেনেছিলাম আত্মীয়বর্গের কথাবার্তায়। ভারতীয়রা ওগ্ বা নেটিভ; নিজেরা তারা শাসনকার্য চালাতে পারে না। যেমন রয়েছে তেমনই রেখে দেওয়া উচিত তাদের। অক্সফোর্ডে থাকাকালীন তৃতীয়বর্ষে পরিচয় হল বার্নাড অ্যাল্লুইয়ার-এর সঙ্গে। ভারতবর্ষ থেকে নয়, তিনি এসেছিলেন সিংহল থেকে; তবু তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত ছিল এশিয়া বিষয়ক সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক-ধারণা। আমিও তো বড় হয়েছি সেরকমই ধারণার আবহে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার সঙ্গে, মহাত্মা গান্ধীর চিন্তনের সঙ্গে তিনিই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় দর্শনের ওপর গ্রন্থাদিও তিনি আমাকে পড়িয়েছেন। ধীরে ধীরে আমার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টে গিয়েছিল।

আমার মধ্যেও ভারতীয় জাতীয় চেতনার উদ্দীপন ঘটল। বিশেষত গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব আমাকে আলোড়িত করে তোলে। আর ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল হিন্দু মরমীয়াবাদ। খুব বেশি ভারতীয় ছাত্রকে আমি চিনতাম না। চেনাজানাদের মধ্যে একজন হলেন সেন্ট জন-এর জয়পাল সিং। পরবর্তীকালে ভারতীয়দের জীবনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ক্রীড়াবিদ হিসেবে তো তিনি ইতিমধ্যেই বিখ্যাত।

অক্সফোর্ডের পঞ্চমবর্ষে, যখন আমি নর্থ অক্সফোর্ডে শিক্ষকতা করছিলাম তখন আরো অনেকে আমাকে ভারতবর্ষ বিষয়ে আগ্রহান্বিত করে তুলেছিল। ক্রিশ্চিয়ান সন্ত অতি সুভদ্র সাধু সুন্দার সিং অক্সফোর্ডে এসেছিলেন। আমাদের অনেকেরই মনের ওপর তিনি গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। তার অল্প কদিন বাদেই অধ্যাপক হেইলার অক্সফোর্ডে এসে কয়েকটি ভাষণ দেন। যুদ্ধের পর জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে তিনিই সম্ভবত প্রথম অক্সফোর্ডে আসেন। সাধু সুন্দার সিং-এর ওপর তিনিও একটি বই

লিখেছিলেন। ফলে আমাদের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে বৌদ্ধিক আলোচনা হয়। শেষে এলেন জ্যাক উইন্‌সলো।

পাঁচ

ফাদার জ্যাক উইনসলো ছিলেন খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ নামক একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পশ্চিম ভারতে মিশনারি ছিলেন বহুবছর। কিন্তু কিছুকাল বাদে প্রথাগত ধর্মাচরণের কর্মকাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। গরিবদের সঙ্গে এবং ভারতীয় জাতীয়তা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে আরো বেশি একাত্ম করে নিতেই তিনি মিশনারি কর্মকাণ্ড থেকে বিযুক্ত হয়েছিলেন। উইনসলোর সামনে ছিল এক বড় স্বপ্ন। ভারতীয় মরমীয়াবাদ নিয়ে তিনি গভীর চর্চা করলেন, আর তারপর তৎপর হলেন স্বপ্নটিকে রূপদানে। যোগের তত্ত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছুই জানতেন। তিনি ছিলেন বড় এক ক্রিশ্চিয়ান নেতা— নিঃসন্দেহে খ্রিস্টীয় চেতনার এক বলিষ্ঠ উদ্‌গাতা। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে, কারো পক্ষেই ডানায় ভর করে ভেসে থাকা সম্ভব নয়। যথার্থ প্রাচ্য চরিত্র পেলে খ্রিস্টধর্ম কী হয়ে উঠতে পারে সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনার চিত্রটি তুলে ধরে তিনি আমাকে এবং আমার মতো আরো অনেককে বিমুগ্ধ করেছিলেন, বলতে কি, একেবারে বেঁধে ফেলেছিলেন।

নতুন এই বীক্ষাকে আমি যারপরনাই আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে গ্রহণ করি। এবং ইংল্যান্ড ত্যাগ করার আগে হিন্দু দর্শন ও ধর্ম নিয়ে কিছুটা পড়াশুনাও করি। খ্রিস্টীয় স্থাপত্য, শিল্পকলা, দর্শন, অতীন্দ্রিয় চেতনা, উপাসনা ইত্যাদিকে কিভাবে প্রাচ্য মডেলে রূপাভাসিত করা যায়, তার নানা উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করি। আজ হয়তো সদর্থে সেগুলো আর আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিনের সেই প্রস্তুতি ও ভাবনাচিন্তা আজো সমানভাবে যুক্তিপূর্ণ।

প্রাচ্যে খ্রিস্টধর্মের অভিমুখ পরিবর্তনের ও পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যেই খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা নতুন কিছু নয়। ভারতবর্ষে আগত প্রথম ইংরেজ জেস্যুইট ফাদার স্টিভেন্স পুরাণের আঙ্গিকে বাইবেলের তর্জমা করেছিলেন। আব্বে ডুবিস ভারতীয় রীতিতে পোশাকাদি পরেছেন, জীবনযাপন করেছেন। শোনা যায়, খ্রিস্টধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্যে তিনি বেদের একটি ক্রোড়পত্রও রচনা করেছিলেন। আরো আধুনিক কালে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ফাদার হেরাস গির্জা-স্থাপত্যের ভারতীয়করণের ওপর অনুশীলন করেছেন।

এই বহমান ধারাটিকেই বিকশিত করার কিঞ্চিৎ উচ্চাভিলাষে খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘের যাত্রারম্ভ। কিন্তু বেশি দূর সে যেতে পারল না, তেমন কিছু প্রভাবও ফেলতে পারেনি।

আমার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—অক্সফোর্ডের অলিভার (বার্নাড) ফিল্ডিং-ক্লার্ক এবং কেমব্রিজের এলগি রবার্টসন খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন উইনসলোর চিন্তন-প্রকল্পে।

উইনস্‌লো তাঁর সম্প্রদায়ের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পুণেতে। ওঁরা দুজনেই ১৯২৭-এর গ্রীষ্মে সিদ্ধান্ত নিলেন, উইনস্‌লোর সঙ্গে ক্ষুদ্র এই সম্প্রদায়ের কাজে যোগ দেবেন। আনেক বাদানুবাদের পর আমিও ওদের সঙ্গে যেতে সম্মত হলাম।

এই সিদ্ধান্তগ্রহণের অর্থ দাঁড়াল শুধু অক্সফোর্ড ছেড়ে অচেনা-অজানা ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়া নয়, তার থেকেও বেশি কিছু। এই সিদ্ধান্তে নিহিত ছিল, একদিন হয়তো প্রকৃতঅর্থেই আমাদের হতে হবে আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী— চূড়ান্তে দীক্ষিত হতে হবে কৃচ্ছ্রতা, চিরকৌমার্য ও আজ্ঞানুবর্তিতায়। বছর তিনেক ধরে বাস্তবিকই আমরা খুব একনিষ্ঠ ছিলাম। এলগি সন্ন্যাসীই রয়ে গেলেন; অন্যভাবে বলা যায়, শেষজীবনে তিনি হয়ে যান এক প্রকৃত খ্রিষ্টভিক্ষু। বার্নাড ও আমি অবশ্য নানা কারণে ওই ধারণাটা পরিত্যাগ করি।

'সাধু-সন্ন্যাসী' বিষয়টা মায়ের পছন্দ ছিল না, কিন্তু সৌভাগ্য, বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে মা বাধা দেন নি। আর এলডাইথ ছিল এ-ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী। গান্ধীজির চিন্তাভাবনা যখন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও গোঁড়া বিশপদের খুবই তিতিবিরক্ত করে তুলেছে তখন কিন্তু সেটা লৌকিকতাবর্জিত সাধারণদের মধ্যে বেশ উদ্দীপন ঘটিয়েছিল। যেমন আমার মায়ের ক্ষেত্রে। কল্পনাও করা যায় নি, খ্রিস্টধর্মের প্রতিপক্ষ বা খ্রিস্টধর্মের কোনো কিছুর সমালোচক এমন কারো প্রতি মা যে কখনো আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারেন; বাস্তবতই মা গান্ধীজির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং পাঁচ বছর বাদে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে, গান্ধীজি যখন ইংল্যান্ডে যান সে-সময়ে উনি আমাদের নর্থ অক্সফোর্ডের বাড়িতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন। ফলে মা খুব উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালেও মা গান্ধীর সচিব, মহাদেব দেশাইয়ের মতো অমায়িক মানুষের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ রেখেছেন। নতুন ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনে আকৃষ্ট অসংখ্য মানুষের আদর্শ প্রতিনিধি হিসেবেই গণ্য করা যায় এই মহাদেব দেশাইকে।

আমার মায়ের ওপর গান্ধীজির প্রভাব ছিল অপরিসীম। গান্ধীজি নিহত হওয়ার সংবাদ জানার অনেক পরে আমার কাছে লেখা তাঁর চিঠিতেই ধরা পড়ে সেই প্রভাবের মাত্রা :

> 'কত বড় এক মানুষ এই রিক্ত, বিষণ্ন, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আত্মত্যাগ আর সহিষ্ণুতা— মহৎ ও দুর্জয় সাহস আর প্রেমময়তার কি এক অমলকান্তি রূপ। চিরকাল আমি মনে রাখব তাঁর সেই সপ্রেম স্মিতহাস্য ও নির্মল চাহনি-শোভাকে। তা কখনোই 'লোক-দেখানো' ভান ছিল না। তাঁর দেশবাসীর দুঃখকষ্ট আমার হৃদয়কেও বিদীর্ণ করে— তিনিই ছিলেন তাদের আশা ভরসার প্রতিরূপ। সেই কঠিন পথ অতিক্রমণে আজ সেই

জনতার সামনে কি নৈরাশ! তাদের বিষয়ে ভাবনা আর এই ক্লেশকর পাপময়তা বাস্তবিকই এক দিবাস্বপ্ন।'

মা সবিস্তারে জানিয়েছিলেন, সবে যখন মা মধ্যাহ্নভোজনে বসতে যাচ্ছেন তখনই কেউ একজন রেডিওতে দুঃসংবাদটা শুনে মাকে জানায়। মা কাঁদতে কাঁদতে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন— মুখে কিছু তোলার মতো ইচ্ছে আর তখন ছিল না। মা লিখেছিলেন : 'এত বড় শোক ও বেদনার আঘাত আমি কমই পেয়েছি। বাপুকে আজ বলা হচ্ছে, পৃথিবীর মহামহিম ব্যক্তি। যারা তাঁকে প্রতিনিয়ত ক্রুশে বিঁধেছে এ তাদের কি উপহাস!'

খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘের চঞ্চল অথচ নিবেদিত প্রাণ সাথিদের সঙ্গে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেবার পরই আমি ভারতবর্ষে যাবার উদ্যোগ নিই। সঙ্ঘ থেকে আমি কোনো অর্থসাহায্য পেলাম না— বস্তুত জানাই ছিল কোনো টাকা আমরা পাব না; টাকাপয়সার কোনো প্রয়োজনই আমাদের হবে না। এমনকি যদি কোনো টাকা আমাদের থাকেও সেটা আমরা সঙ্ঘের হাতে তুলে দেব। ব্যক্তিগত কোনোকিছুই আমাদের থাকবে না। আর আমার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল সত্যটা হল, অক্সফোর্ড-জীবনের শেষে বাস্তবিকই আমি ছিলাম কপর্দকশূন্য। ইউরোপ অতিক্রমণের জন্যে সঙ্ঘ আমাদের জন্যে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে দিল। আর তারপর একটা ফরাসি প্যাসেঞ্জার জাহাজে জেনোয়া থেকে সিংহল। জাহাজে ওঠার আগে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখা হত, কোনোরকম যৌনরোগ আছে কিনা। তার জন্যে যাত্রীদের সাত-আটজনকে একটা ছোট কেবিনে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এতে আমরা তিনজনেই খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি। কিন্তু প্রত্যেকেই তখন নিজেকে মনে করছি এক-একজন তরুণ ভগবদ্ভক্ত— যে কোনো প্রতিকূল বা অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে উঠতে পারি। বাস্তবিকই আমরা তখন ভেসে চলছিলাম তীব্র উত্তেজনার সফেন তরঙ্গে-তরঙ্গে।

তৃতীয় অধ্যায়

সন্ত ও সত্যাগ্রহী

তাকাও প্রাচীপানে,
বিষ্ণুভূমে কোন অবতারে সহস্র
অদৃষ্টপূর্ব মানব সমাবেশ?

—ব্রাউনিং

১৯২৭-এর তিরিশে নভেম্বর আমরা কলম্বো পৌঁছাই। কদিন সিংহলে থাকি এবং ক্যাণ্ডি বেড়িয়ে আসি। অবশেষে মালাবার; ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখে সে কি উত্তেজনা আমাদের! অসংখ্য সাধুসন্ত মরমীয়াবাদী সত্যান্বেষণীর পদরেণুধন্য এই দেশ তখন আমাদের কাছে এক রোমান্টিক কল্পনার জগৎ। ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে শ্যামল সজীব মালাবারের কি অপূর্ব শোভা! বইয়ে পড়েছি দারিদ্র পীড়িত ভারতবর্ষের কথা। কিন্তু এসে দেখছি চারিদিক ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন, লোকজন ভাল খাচ্ছে-পরছে—হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। প্রথমদিকে নয়, ভারতবর্ষের চূড়ান্ত দারিদ্র ও দুর্গতি দেখেছি পরে।

তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যেই আমাদের পরিভ্রমণ বদলাতে হল। পাহাড়ের মাঝখানে একটা মঠ, আমরা চললাম সেই মঠের উদ্দেশে। ইস্টার্ন চার্চের অন্যতম বিশপ মার্ আইভানিয়াস মঠটি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সেবাধার্মিক। মঠটি চলত আদি-ফ্রন্সিসীয় রীতিতে (সেন্ট ফ্রান্সিস নামক খ্রিস্টীয় সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত সন্ন্যাসীসম্প্রদায়গত ব্যবস্থাপনা—অনুবাদক)। সেই মঠবাসীগণের সহজ সরল নিয়মানুবর্তী জীবন— তাদের পরমানন্দীয় অভিভাব দেখে আমরা একেবারে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ি। এরকম এক জীবনই তো আমার কল্পনায় ছিল! কিন্তু তার উল্টো অভিজ্ঞতাগুলো সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। আমি তখন জনজীবন থেকে দূরে রয়েছি। বাস্তব রাজনীতি যে তখন আমার জন্যে অপেক্ষা রয়েছে— তার কর্মকাণ্ড যে আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠবে সে-কথা ভাবতেই পারিনি তখন। ভাবতেই পারিনি কোনোদিন সত্যি-সত্যি গান্ধীজির সাক্ষাৎ পাব, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ মিলবে। ভারতীয় নেতৃবর্গের কাছে যে যাওয়া এত সহজ তা আমার জানা ছিল না। মালাবারের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, অথচ তাদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। জীবনে সম্ভবত অতঃপরই আমি সত্য-শিব-সুন্দরের উপরে পরোপকারিতাকে আমার মূল কর্মকাণ্ড বা দিশা হিসেবে গণ্য করেছি।

তারপর ভারতভূমির মধ্যে দিয়ে ট্রেনে চেপে গেলাম পুণে। শহরপ্রান্তে বিরাট এক মাঠের মধ্যে দেখি কতকগুলো ইতস্তত ছড়ানো সাদামাটা বাড়ি। সেটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। পৌঁছতেই দেখি কয়েকজন শিষ্য, গুরুভাইকে নিয়ে ফাদার উইনসলো আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষা করছেন। ১৯২৭-এর ইংরেজদের, বিশেষত যাজকদের জীবনযাত্রার তুলনায় অতিদ্রুত আমরা এক অনভ্যস্ত অস্বাভাবিক জীবননির্বাহে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। পশ্চিম ভারতের হিন্দু পরিবারগুলোর মতো সবকিছুই করতে হত মেঝেতে; ঘরে কোনো আসবাব ছিল না; শুতেও হত মেঝেতে। ভারতীয় খাবারই আমাদের খেতে হচ্ছিল (শুধু অসমর্থরা ব্যতীত) সকলকে। বিশেষ নজর ছিল পরিবেশনের ওপর : বড়-বড় কাঁসার থালা, আর ছোট-ছোট অনেকগুলো বাটি থাকত; আহারের আগে ও পরে ছিল আনুষ্ঠানিক হস্তধৌতন। যে কোনো বাড়িতে প্রবেশ-পূর্বে চটি খুলে রাখতাম। সঙ্ঘের সদস্যদের পোশাক ছিল খাদির সাদা জামা; প্রাথমিক দীক্ষিতজনরা পরতেন গৈরিক বন্ধনী।

উইনসলো ছিলেন অসাধারণ ভাষাবিদ্। তাঁর ইচ্ছে ছিল মারাঠি ভাষাটা আমরা প্রথমেই শিখে নিই। চারধারের সকলেই মারাঠি ভাষায় কথা বলছে। সেই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ কয়েকজন পণ্ডিত নিয়োগ করলেন; শহর থেকে এসে তাঁরা আমাদের শেখান। আমার ভাগ্য ভাল, এইচ. ভি. হরসে নামক একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন হিন্দু-ঐতিহ্যের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিরূপ। আমার ভাষা শিক্ষার বারো আনা সময় কেটে যেত হিন্দু মরমীয়াবাদ ও দর্শন বিষয়ক আলোচনায়। ফলে ছ'মাসের মাথায় উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরের, যোগের অঙ্গবিন্যাস ও তার অনুশীলনের মারাঠি ও সংস্কৃত নামগুলো মোটামুটি শিখে ফেললাম। কিন্তু আমার শেখা হল না রেল স্টেশনে লাঞ্চের অর্ডার দেবার মতো উপযুক্ত মারাঠি ভাষা।

আমাদের অন্তর্জীবনে তখন চলছিল অবিরাম আলোড়ন আর উদ্দীপন। মনে রাখার মতো বহির্জীবনের ঘটনাটি ঘটল ১৯২৮-এর জানুয়ারিতে; আমাদের সবরমতি আশ্রমে যাওয়া। বোম্বাই চিরকালই সংস্কারমুক্ত শহর। সেখানকার বুদ্ধিজীবীগণ তখন সবেমাত্র 'ইন্টার-রিলিজিয়াস ফেলোশিপ' নামক সংগঠনের একটি শাখা খুলেছেন। অভিজ্ঞ অধ্যাপক পি. এ. ওয়াদিয়া ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ বোম্বাইতে সমবেত হয়ে নিয়মিত অসাম্প্রদায়িক প্রার্থনাদি করতেন; আর বছরে একবার হত তাঁদের সম্মেলন হত। সেই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতেন সব ধর্মের অনুগামী প্রতিনিধিবর্গ। ১৯২৮-এর সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল আহমেদাবাদ-সংলগ্ন মহাত্মা গান্ধীর সবরমতি আশ্রম।

সেখানে পৌঁছেই আমি যেন নিয়তি-তাড়িত ব্যক্তিতে পরিণত হলাম। দীর্ঘদিন ধরেই ছিলাম একই পথের সমবেদী সহযাত্রী : আর এখন হয়ে গেলাম তাঁর উদ্দীপিত ভাবশিষ্য। আর এই সময়পর্বেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের

এমন এক শিখর-মাত্রায় পৌঁছেছিল যার পূর্ব-দৃষ্টান্ত বিশ্বের কোনো রাজনৈতিক জাগরণেই দেখা যায় নি। আশ্রমটি সবরমতি নদীর তীরে—সারি-সারি কুটিরে রয়েছেন দুঃস্থদের সেবায় সংকল্পবদ্ধ কয়েক শ' মানুষ। সকলেই শান্ত সৌম্য, নিয়মনিষ্ঠ। সেটাই ছিল তখন একজন আদর্শ কংগ্রেসকর্মীর বিশেষত্ব। সেখানেই সকলের মধ্যে গান্ধীজি ঘুরে বেড়াতেন অপার্থিব সৌন্দর্য আর সম্ভ্রম নিয়ে। তাতেই আমি প্রথমে আকৃষ্ট হই। তাঁর ক্ষীণ দেহে রূপাভাসিত ছিল তাঁর অন্তর্জীবনের মোহন রূপ আর আত্মিক শক্তি; সমগ্র আশ্রমটি যেন পরিপূর্ণ ছিল তাঁর করুণাময়তা তার প্রেমময়তায়।

সবরমতি আশ্রমের স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রবল। অকস্মাৎ যেন ভারতের মাটিতে একজন ভারতীয় হিসেবে আমার পুনর্জন্ম ঘটল। সমগ্র প্রক্রিয়াটিই এত সাবলীলভাবে ঘটল যে আমি বুঝতেও পারিনি তখন কী ঘটে চলেছে— নবলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গির কতটা গুরুত্ব বা কী তার পরিণতি।

প্রথমে বুঝতে পারিনি, বিরোধটা ভারত আর ব্রিটেনের মধ্যে, না কি দুটি স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। আমারও লক্ষ্য ছিল মুক্তি; আর সে মুক্তি শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে সীমিত নয়। 'বিপ্লবের কবিতা' নামক যে পারিতোষিক প্রবন্ধটি আমি অক্সফোর্ডে থাকতে লিখেছিলাম সেখানেও উল্লেখ ছিল কত ইউরোপীয় কবি, বিশেষত ইংরেজ কবি মুক্তিকামিতাকে ভাণ্ডারজাত করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অধিকাংশ প্রেরণামূলক চিন্তন এসেছিল মূলত পশ্চিম থেকে। গান্ধীজির ওপর টলস্টয় ও রাসকিন-এর প্রভাবও ছিল অপরিসীম। তাঁকে দেখে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়াটাই ছিল, আমি যেন বাস্তবিকই তেমন ইউরোপীয় বা ব্রিটিশ মানুষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি যিনি ঔপনিবেসিকতা বা সাম্রাজ্যবাদকে অসহনীয় ব্যাপার বলে মনে করেন— যাঁর কাছে সব দেশেরই প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা হল এক তীব্র আকুতি, এক সর্বাত্মক ভাবাবদর্শ।

এ-জাতীয় ধারণা আমার মধ্যে কোনো সংশয় বা আত্মিক পীড়া সৃষ্টি করেছিল বলে মনে পড়ে না। গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাতের এটাই ছিল সম্ভাব্য পরিণতি; হয়তো বিস্ময়কর ঠেকবে কিন্তু তাই ঘটেছিল। তারও একটা সহজ কারণ ছিল। তখন অবধি ভারতে অবস্থানরত কোনো ইংরেজকে আমি প্রায় চিনতামই না। কোনো ক্লাবের সদস্যও ছিলাম না যে আমার অভিমত প্রকাশের জন্যে বহিষ্কারের অভিজ্ঞতা থাকবে। আমার সঙ্গে কোনো ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরও সাক্ষাৎ ঘটেনি (দু-একজন অ্যাংলিকান বিশপ ব্যতীত)। আর ইংল্যান্ডের যেসব বন্ধুর সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচালি হত তাঁরা তো সকলেই ছিলেন ভারতের ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন।

পরে যখন থেকে আমার অন্তঃস্থ দ্বন্দ্ব বিকশিত হতে থাকে তখনই গান্ধীজির প্রতি ও তাঁর আন্দোলনের প্রতি আমার আগ্রহের পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি।

ইংরেজ ও ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিতি যতই বাড়তে থাকে ততই বুঝতে পারি— বুঝবার ব্যাপারটাও সব সময়ে কোমল ধরনেরও ছিল না; তাঁদের দৃষ্টিতে আমি বে-লাইনে চলে গেছি। কখনো কখনো এগুলো খুবই অস্বস্তিকর হয়ে উঠত। আবার কখনো একেবারে বিপর্যয়কর। কিন্তু স্বাধীনতার চেতনা এতই উত্তেজক ছিল— তার জন্যে কিছু করা এতই পরিতৃপ্তির ছিল যে আজ বলতে পারব না, সেদিন খুব ব্যথিত হয়েছিলাম।

জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আমার সংযোগের যথার্থ তাৎপর্যটা আমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম সম্ভবত অনেক পরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন জব্বলপুরে আয়োজিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের একটি লাঞ্চ-পার্টিতে আমি গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় এবং ব্রিটেনের সঙ্গে যদি তার যুদ্ধ বাধে, তাহলে আমি কী করব? তিনি বললেন, 'ভারত-পক্ষাবলম্বীদের ক্ষেত্রে সেটাই হবে চূড়ান্ত পরীক্ষা।' উত্তরে আমি বলেছিলাম, কোনো অবস্থাতেই আমি যুদ্ধে বিশ্বাসী নই; তবে তেমন এক পরিস্থিতি দেখা দিলে আমি ভারতের পক্ষেই থাকব। আজো মনে আছে, কি এক বিহ্বল অবিশ্বাস টেবিল জুড়ে নেমে এসেছিল। বুঝতে পারি, স্পষ্টতই অন্তরে-অন্তরে বেচারিরা ভাবছে এই লোকটা এক বিশ্বাসঘাতক; আবার একে গুলি করে মারাও ঝামেলার। অথচ নিজেকে কোনোদিনই বিশ্বাসঘাতক ভাবতে পারিনি; বরং মনে হয়েছে, ব্রিটেন নিজে যে মহত্তম নীতি বিশ্বকে শিখিয়েছে, আমার আনুগত্য সেই নীতির প্রতিই।

মনে হচ্ছে, নির্দিষ্ট কালক্রম থেকে আমি অনেকটা সরে এসেছি, শুরুর বছরগুলোতে আবার ফিরে যাওয়া যাক। সবরমতি এবং তার অভিঘাতের পরেই আমার জীবনে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে। আমি প্রায় মরতে বসি। বলতে গেলে গোটা ১৯২৮ জুড়েই স্বাস্থ্য নিয়ে ঝামেলায় ছিলাম। শুধু যে মেঝেতে বসতাম আর চলতাম তাই না, আর একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলাম। সিমেন্টের মেঝের ওপর চটের একটা বস্তা বিছিয়েই শুয়েছি বসেছি। আত্মশাসন ও কৃচ্ছ্রতার ভাবাবেগে তোশক, এমনকি বালিশও পরিহার করেছিলাম। খালি পায়ে হাঁটতাম, যা দিত তাই খেতাম। বছরের প্রথমদিকটা কোনোরকমে কাটল। কিন্তু গরম আবহাওয়াকেও হার মানতে হল বৃষ্টির কাছে। একরোখা যুবক ব্যতীত সকলের কাছেই ব্যাপারটা ছিল স্পষ্টত বোকামির নামান্তর। কে যেন একজন বলেছিলেন, ওডহাউস, হুইস্কি আর পরমাত্মা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তো এই তিন প্রতিষেধক সত্ত্বেও আমার কঠিন আমাশয় হল। দ্রুত আমাকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। অন্যদের কথায়, ছ'সপ্তাহ ধরে চলল জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে আমার দোলকের মতো ঝুলে থাকা। বেশির ভাগ সময়ই কাটত অচৈতন্যে। অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পূর্বে যারা আমাশয়ের তীব্র সংক্রমণের শিকার

হয়েছিলেন তারা সকলেই জানেন, কী ধরনের ব্যথা-যন্ত্রণা হত; এ-থেকে কী ধরনের দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হত। চরম বিপর্যয়ের আশঙ্কায় ইংল্যান্ডে আমার পরিবারের কাছে তারবার্তা পাঠান হল। এমনকি, (পরে আমাকে বলা হয়েছিল) স্থানীয় পেশাদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারীর সঙ্গেও যাবতীয় আয়োজন করা হয়ে গিয়েছিল। বোম্বাইয়ের বিশপও এসে গেলেন আমার অন্তিম-রীতি ক্রিয়া পালনের জন্যে— মৃত্যুর জন্যে আত্মার প্রস্তুতিতে অন্তিমসংরক্ষণের কাজ সম্পাদনের জন্যে।

আবার ঠিক তখনই বালিওল-এর বিশপ পামার এলেন। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডীয় ভাবাদর্শ ও সাধারণ জ্ঞানের আদর্শ ব্যক্তি। আলখাল্লার ভিতর লুকিয়ে তিন বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তারদের খুব অনুরোধ-উপরোধ করে বোঝালেন, এটাই হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ওষুধ। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, আমাকে জীবিত রাখতে এ-ওষুধ যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে অন্তত তা আমাকে প্রফুল্লচিত্তেই পরলোকে পাঠিয়ে দেবে। আর বাস্তবত, অন্তত আমার ধারণায়, বিশপের শ্যাম্পেনই আমার জীবনটা বাঁচিয়েছিল। প্রথম গ্লাস পানের পর থেকেই উন্নতি হতে লাগল, এবং মাসখানেকের ভিতর আমি হাঁটাচলার মতো শক্তিও পেলাম। খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলাম।

কিন্তু পুণের ডাক্তারদের কঠোর নির্দেশ : সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্যে পুরো একটা বছর বিশ্রাম দরকার। তাই স্থির করা হল, সবচেয়ে ভাল হচ্ছে আমার অক্সফোর্ডে ফিরে যাওয়া, সেখানে গিয়ে টুকটাক কিছু কাজ করা, যাতে বছরখানেক বাদে আবার আমি ফিরে আসতে পারি ভারতে।

দুই

বছরটা ইংল্যান্ডে কাটানো ফলপ্রসূই হল। প্রায় সবটা সময় অক্সফোর্ডে মায়ের কাছেই ছিলাম। ফলে বোডেলিয়েন ও অন্যান্য লাইব্রেরিতে পড়ারও সুযোগ জুটল আমার। বলতে কি, পুরো বছরটা জুড়ে পড়া ও লেখা বাদে বিশেষ কিছুই করিনি, আর সেই সুবাদে তিনখানা বইয়ের খসড়াও তৈরি করে ফেলতে পেরেছিলাম। 'ক্রিশ্চিয়ান ধ্যান' নামক বইটায় ছিল অতীন্দ্রিয়বাদের চর্চা। বস্তুত বইটি চতুর্দশ শতকের এক অনামীর লেখা অতীন্দ্রিয়বাদ সংক্রান্ত ধ্রুপদী গ্রন্থ 'দি ক্লাউড অফ আননোয়িং'-এর ওপর। উক্ত বইটি সম্বন্ধে আমি লিখেছিলাম : 'বইটি সম্ভবত কোনো খ্রিস্ট সাধুর লেখা; প্রাচ্য চিন্তনবৈশিষ্টে বইটিতে রয়েছে আগাগোড়া ছান্দস দর্শন—গভীর, মন্থর প্রশ্বাস। ক্ষুদ্র জাগতিক বিক্ষেপণ থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়, বিচ্ছেদকারী পাপ থেকে কী উপায়ে শুদ্ধি ঘটতে পারে, মনকে কিভাবে একীভূত ও একাগ্র করা যায়, কী উপায়ে সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়— এবং সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে কিভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে

উপস্থাপিত করা যায়, এসব আবশ্যকীয় ও বাস্তব প্রশ্ন প্রতিটি ঈশ্বর-প্রেমিককেরই জিজ্ঞাস্য। 'দি ক্লাউড অফ আননোয়িং'-এ এধরনের প্রশ্নেরই উত্তর মিলবে।'

দ্বিতীয়টি ছিল ছোট একটি বই, 'স্টাডিস ইন দি গস্‌পেল'। বইটি লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ইন্টার-রিলিজিয়াস ফেলোশিপ সংগঠন। ঠিক একইভাবে 'কোরান'-এর ওপর একটি, এবং ও 'ভাগবদ্‌গীতা'র ওপর লিখেছিলেন সি. রাজাগোপালাচারী— বইগুলো প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আমার বইটির বিশেষত্ব ছিল যে আমি রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ হিন্দুধর্মের উদার পন্থীগণের লেখকদের উপদেশাবলি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছিলাম।

তৃতীয় বইটির কাজ আমি তৎক্ষণাৎ শেষ করিনি— তবে তার সব বিষয়-উপকরণই সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। বইটি ছিল ব্রিটিশ অতীন্দ্রিয়বাদী রিচার্ড রোল-এর চর্চা নিয়ে। হিন্দুধর্মের 'ভক্তি'র আধারে তাঁর চিন্তন ও বাণীকে আমি উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি। পরবর্তীকালে করনজিয়াতে আমি অ্যাসিসি-এর সেন্ট ফ্রান্সিসকে নিয়ে একটি সহায়ক বই লিখেছিলাম। সেন্ট ফ্রান্সিস-এর জীবন ও বাণীকেও আমি চেয়েছি হিন্দু ধর্মপদের বিন্যাসে হাজির করতে।

১৯২৯-এ শরতে মনে হল, এবার আমি ভারতে ফিরবার মতো যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠেছি। প্রথমে গেলাম অ্যাসিসি ভ্রমণ; তারপর লিওনারড স্কিফের সহৃদয় সাহচর্যে গেলাম প্যালেস্টাইন।

অ্যাসিসি'তে শহর থেকে অনতিদূরে একটি পাহাড়ের ওপর, জলপাইগাছে ঘেরা মনোরম একটি কনভেন্টে গিয়ে সেখানকার সিস্টারদের সঙ্গে দেখা করলাম। রীতিপ্রথার তোয়াক্কা না করে এই সিস্টাররা আদি ফ্রান্সিসীয় ধারার অনুসরণে চরম দারিদ্র ও কৃচ্ছ্রতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। অথচ গান্ধীজি ও ভারতবর্ষের প্রতি কিন্তু ছিল তাঁদের অশেষ সহানুভূতি। বেশ কিছুদিন ধরে এঁরা আমার সঙ্গেও চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখছিলেন। আমার আরোগ্য ও শুভকামনায় তাঁরা একটি আশীর্বাণীও পাঠিয়েছিলনে। *লিভস্‌ ফ্রম দি জাঙ্গল* গ্রন্থে সেটি উদ্ধৃত করেছি। এখানেও তা রাখছি; কারণ একসময়ে তা আমাকে যথেষ্ট আনন্দ ও প্রেরণা জুগিয়েছিল— বিশেষত তার ধ্বনিগত চমৎকারিত্বে।

'আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, প্রফুল্ল হয়ে উঠুন
মুক্ত থাকুন অতিরিক্ত উত্তাপ থেকে,
মুক্ত থাকুন অবিরাম বারিধারা থেকে,
মুক্ত সতর্ক থাকুন ডাশ-মশা থেকে,
মুক্ত থাকুন কলেরা, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধি থেকে,
মুক্ত থাকুন ঝঞ্ঝাটে-অফিসার আর বিরক্তিকর মানুষের কাছ থেকে

সংশয় বা বিষাদ নয়, শান্তি মুক্তি কর্মশক্তি নিয়ে থাকুন।

এখানে বিশুদ্ধভাবে ও সর্বোত্তমভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ক্যাথলিক ভাবাদর্শ। নিজেকে আমি খুবই সৌভাগ্যবান মনে করি যে জীবনের এই পর্বে ইউরোপে এটা দেখতে পেয়েছিলাম; আর হিন্দুজীবনের বিশুদ্ধ ও মহত্তম রূপ দেখতে পেয়েছিলাম গান্ধীজির সবরমতি আশ্রমে।

প্যালেস্টাইন ভ্রমণটা হয়েছিল খুবই আনন্দের। নির্দেশক ও পথসাথি ছিলেন এক খেয়ালি ধরনের জ্ঞানী অ্যাংলিক যাজক। বহু বছর তিনি ওদেশে কাটিয়েছেন। জেরুজালেম ও বেথলেহামে আধ্যাত্মিক ভাবাবেশে আমারও কয়েক ঘন্টা কাটে; বিশেষত সেপালক্রে-এর মতো মহান গির্জায়। আর তারপরই জুডার নিঃসঙ্গ প্রান্তর অভিমুখে আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেখানে অর্থোডক্স চার্চের বেশ কয়েকটি গির্জায় যাই। তার একটা ছিল উঁচু গিরিচূড়ার মুখোমুখি; মেঝের ফাটল দিয়ে পাহাড়ের কয়েক শ ফিট নিচটাও দেখা যেত। এই মঠ ও গির্জাগুলো চলত কঠোর নিয়মে, ব্যাপক ছিল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম; ভোর দুটোয় শুরু হয়ে চলত টানা সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু মধুর আবহসংগীত ও রোমান্টিক পরিবেশ কাউকেই ক্লান্ত হয়ে পড়ার কোনো সুযোগ দিত না। সকাল পাঁচটায় আমাদের নিয়ে আসা হল গির্জার ছোট কক্ষে—ডিম সিদ্ধ আর ভদ্‌কা খেয়ে ফের সতেজ হলাম।

প্যালেস্টাইন থেকেই আমরা ভারতাভিমুখে রওনা হই; এবং নভেম্বরের শেষে পুণে পৌঁছাই। এসে দেখি ততদিনে খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ আপাতদৃষ্টে বেশ সুগঠিত মঠ বা আশ্রমের মতো হয়ে উঠেছে। পরিবেশ আরো মনোরম হয়েছে, আশ্রমটিও চলছে অনেক নিয়মশৃঙ্খলায়।

আমি পৌঁছতেই উইনসলো ছুটিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমাকে একেবারে বিস্মিত করে উইনসলো আমার ওপরই (বয়স তখন আমার খুবই কম) সঙ্ঘের সব দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। তার ফলটা হল অচিন্ত্যনীয়। ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে উইনসলো সহানুভূতিশীল ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থানটা উদারমনস্ক ইংরেজদের মতো। তাঁরা চাইতেন ভারতের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা-পূরণ; আর 'ন্যায়সঙ্গত' শব্দটির যত রকম ব্যাখ্যা সম্ভব তার মধ্যেই 'আকাঙ্ক্ষা'টি ঘোরাফেরা করত, সমর্থন পেত। স্বাধীনতার প্রশ্নের মতো মহাবির্তকের ক্ষেত্রে দুই যুযুধান পক্ষের কাছেই সংযত ও গ্রহণীয় থাকার কৌশলটি উইনসলো আয়ত্ত করেছিলেন।

বিড়াল নেই তো ইঁদুরের মহারাজত্ব : উইনসলো চলে যেতে হল আমাদের সেই বেগতিক দশা! বোম্বের অ্যাংলিক্যান ক্যাথিড্রেল যদি গির্জাচূড়ায় ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করতে পারে, আমরাই বা কেন সঙ্ঘে ভারতীয় পতাকা তুলতে পারব না? আমিও আশ্রমে তেরঙ্গা বিপ্লবী পতাকা উত্তোলন করলাম। পতাকা-উত্তোলনে নয় সমস্যাটা দেখা দিল আশ্রমে আয়োজিত হল-এর বক্তৃতা নিয়ে।

তখন এক ইংরেজ তরুণের ভারতে আর্বিভাবে সংবাদমাধ্যম দারুণ আলোড়িত।

সেই ইংরেজ তরুণটিকেই গান্ধীজি মনোনীত করেছেন ভাইসরয়কে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক পত্রটির বাহক হিসেবে। শণের মতো সোনালি চুল, খাকি শর্ট-পরিহিত গান্ধীজির এই তরুণ-দূতটি যেন কেতাদুরস্ত এ-ডি-সিদের জগৎটাকেই তছনছ করে দিলেন; আর আপামর ভারতীয় জনগণের প্রত্যাশা ও কল্পনাকে করলেন উদ্দীপিত। সমমর্যাদার শর্তে রাজ-প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ভাইসরিগ্যাল প্রাসাদের সিঁড়ি ভেঙে দৃপ্তপদে অর্ধ-উলঙ্গ ফকিরের উপরে ওঠার দৃশ্যেরই যেন পুনরাভিনয়— যেন একই আবেগ ঘিরে নতুন করে স্বপ্নের উদ্দীপন! ইংরেজ সেই তরুণটির নাম রেজিনাল্ড রেনল্ডস্। পরে তিনি বিয়ে করেন। ইথেল মানিন-কে। নিভৃত কক্ষের ইতিবৃত্ত তিনিই রচনা করেছিলেন; আর পরবর্তী পর্বে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। তারুণ্যের মতো অমার্জনীয় অপরাধে সেই সময়ে রেজিনাল্ড ও আমি অপরাধী। তরুণ যা বলে তা সঠিক হতে পারে না, সে যা করে তা যথার্থ হতে পারে না— কারণ সে তরুণ। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটেছে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই হয়তো রেজিনাল্ড তাঁর যৌবনের উদ্দীপনার ঋণ শোধ করে গেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, তখন অবধি জানতামই না, এই রেজিনাল্ড কে, কী তাঁর পরিচয়। তিনি আমাকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ডে যাবার পথে তিনি আমাদের আশ্রমের আতিথেয়তায় কয়েকটা দিন কাটাতে চান। সকলকে যেমন উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাই, তাঁকেও আমন্ত্রণ জানালাম এসে থাকতে। তিনি এলেন এবং তাঁর হাস্যপরিহাস আর সারল্যে সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন। গান্ধী-দর্শনের ওপর আশ্রমে একটি ভাষণ দিতে তাঁকে অনুরোধ জানাই। প্রচুর মানুষের সমাবেশে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন তিনি। জাতীয় বিকাশে ও বিশ্বশান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে গান্ধীজির ভাবধারা নিয়ে আলোচনা করলেন। সেই ভাষণে এমন একটি বাক্যও ছিল না যা ইংল্যান্ডের কোনো ক্যাথিড্রেলে উচ্চারণ করা যায় না।

কিন্তু শাসক সরকারের পক্ষে এটা সহ্যাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তারা খুব তৎপর হল। আমাদের আশঙ্কা ছিল, পুলিস আসবে। পুলিস নয়, এল সহকারী ধর্মাচার্যের পত্র। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, ইংল্যান্ডের চার্চ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার মাত্রা! পত্রে তিনি জানালেন : রেজিনাল্ডের মতো এক ব্যক্তিকে আমাদের আপ্যায়নে সরকার খুবই হতাশ বোধ করছে। আমার আচরণের জবাবদিহিও চাইলেন তিনি। ব্যাখ্যা করে বলার মতো কিছু ছিল না; তবে মনে আছে, লিখেছিলাম : বিস্ময়ের ব্যাপার যে-প্রশ্নটা গোয়েন্দা দপ্তরের তোলার কথা সেটাই তুলছেন চার্চের এক প্রতিনিধি।

এরপরই আমার পিছনে পুলিস ঘুর-ঘুর করতে লাগল, প্রাতিষ্ঠানিক যাজকগণ নজরদারি শুরু করলেন।

তবুও কোনোভাবেই চার্চের নেতৃবর্গের উপর্যুপরি চাপকে খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ

তোয়াক্কা করেনি। গোয়েন্দাদের ক্রমবর্ধমান জ্বালাতনকে উপক্ষো করেছে— সঙ্ঘ যা ভাল মনে করেছে তাই করে গেছে। এমনকি সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে কিন্তু আমরা সুভাষচন্দ্র বসুকেও সাদরে গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৩০-এর শেষদিকে সঙ্ঘ আমাকে অনুমতি দেয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আমন্ত্রণের ভিত্তিতে গুজরাটে যেতে। পরে স্বাধীন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন এই সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল; তিনি আমাকে তখন ডেকেছিলেন খাজনা-বন্ধ বিক্ষোভের ওপর পুলিসি দমনপীড়নের যে বেসরকারি তদন্ত শুরু হয়েছে তাতে অংশ নিতে।

এই খাজনা-বন্ধ বিক্ষোভটা খুব ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয়েছিল। আর সরকারও তা দমনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছিল। কঠোরতার মাত্রা এতটাই ছিল যে গোটা জনগোষ্ঠীই প্রতিবেশী রাজ্য বরোদায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পাঁচটি তালুকের ষাটটি গ্রাম আমি পরিদর্শন করি। তালুকগুলো হল : আনান্দ, নাদিয়াদ্, বোরসাদ, বারদোলি ও জালালপুর। পরিদর্শনান্তে একটি রিপোর্ট তৈরি করি। রিপোর্টটি প্রথমে বেরয় 'বোম্বে ক্রনিকল'-এ; এবং পরে 'ইন দি ডেজারেটেড ভিলেজস ইন গুজরাট' নামক পুস্তিকাকারে। অবশ্য তখনো আমি একজন ক্রিশ্চিয়ান যাজক। একটি 'ক্রিশ্চিয়ান'-সরকারের কাছেই খ্রিস্টধর্মের প্রচারিত মৌল নীতিসমূহ মেনে চলার আবেদন রেখেছিলাম আমি; অবশ্যই কঠিন ভাষাবন্ধে। আমি লিখেছিলাম :

> 'এরকম এক জরুরি অবস্থাও নিশ্চয়ই অন্য কোনো উপায়ে সমাধান করা যেত। আইনানুগ ও ন্যায়ের— ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিকতার উপায়ে; আর যা তাকে লঙ্ঘন বা প্রতারিত করে তেমন কোনো পন্থার দ্বারা নয়।
> আমার এই লেখার পাঠক প্রত্যেক সহোদর ক্রিশ্চিয়ানদের প্রতি— এমনকি রাজকর্মে নিযুক্ত ক্রিশ্চিয়ানগণের প্রতিও আমার সনির্বন্ধ আবেদন, আপনাদের অক্ষিযুগল যদি সৌভাগ্যের দর্শন পেতে চায় তাহলে জানবেন, আপনাদের ব্যক্তিজীবনের ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খ্রিস্টের নীতি সমানভাবে প্রযুক্ত।...তারা যদি খ্রিস্টের নীতি বিষয়ক লব্ধ জ্ঞানকে গুজরাটের জনজীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন, আন্দোলনের উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন, তারা নিশ্চয়ই আইনের কর্তৃত্বকে, ন্যায়পরায়ণতার পবিত্রতাকে অটুট রাখতেন; এরকম মর্মান্তিক উত্তরাধিকার তারা পশ্চাতে ফেলে আসতেন না।'

পুণেতে থাকাকালীন প্রভাতী ও সান্ধ্য উপাসনার শেষে আমরা একটি প্রাচীন ভারতীয় স্তব উচ্চারণ করতাম : '[হে প্রভু,] আমাকে অ-প্রাকৃত থেকে প্রাকৃতে চালিত করো : তামস থেকে আলোকে নিয়ে আসো; মৃত্যু থেকে মৃত্যুহীনতায় চালিত করো।' বার্নাড ফিল্ডিং-ক্লার্ক ছিলেন কট্টর সোস্যালিস্ট; অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

এই প্রার্থনাটির মর্ম তাঁর কাছে একরূপ আর আমার কাছে ভিন্নরূপ। তাঁর বক্তব্য ছিল, আমার মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতের, ক্ষণিকের জগৎ থেকে শাশ্বত বাস্তব অতিক্রম করা ও বাস্তবাতীতে পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষা; আর তাঁর কাছে এই স্তবের মর্ম হল, সামাজিক-রাজনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় অবাস্তবতা থেকে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দৈন্য ও বেদনার কঠিন বাস্তবতায় পৌঁছনো। ভারতবর্ষে আমার প্রথম আগমনকালে কথাটি ছিল একদম নির্ভুল। আর অতি দ্রুত স্তবটির মর্ম আমার কাছেও বার্নাডের মতোই হয়ে ওঠে। এবং এখনো তাই করে চলেছি। তবে আপাতত আমি দুটো মর্মার্থকেই সামনে রেখে ঘটমান বিষয়ের অন্তঃস্থ সত্যের দিকে এবং একই সঙ্গে দারিদ্র ও ক্লেশের বাস্তবতার দিকে তাকাব।

তিন

পুণেতে আমার অবস্থানকালে বহু বিশিষ্ট ভারতীয় আমাদের আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; এবং তাঁদের একজন হয়ে ওঠেন আমার সারাজীবনের বন্ধু ও সাথি। তিনি শামরাও হিভালে— তাঁর নামটি এই বইয়ে বারবার আসবে।

শামরাও আমার থেকে মাস ছয়েকের ছোট। তবু সরাসরি তিনি চলে এসে আমাকে সহায়তা করলেন; ভারতীয় জীবনধারায় অনুপ্রাণিত করলেন আমাকে। আমি যেবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি তিনিই আমাকে হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যান। এবং আমার জীবন রক্ষা করেন। আমার ভালমন্দের প্রতি তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ নজর। তাছাড়া শামরাও ছিলেন অতি সুদর্শন এক যুবক, তাঁর মুখের মিষ্টহাসি সকলকেই মুগ্ধ করত। আর 'অন্তঃপ্রকৃতির সম্মোহনে' সকলকেই তিনি কাছে টেনে নিতেন। তাঁর প্রয়াত অগ্রজ বি. পি. হিভালে আহমেদনগরে একটি বড় কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রে পশ্চিম ভারতে খুবই খ্যাতিমান হয়েছিলেন। শামরাও নিজেও ছিলেন দৃঢ়সংকল্পের মানুষ, পথ তিনি বার করে নিতেনই। তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইংল্যান্ডে যাওয়ার। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘকে তিনি সম্মত করালেন তাঁকে মিরফিল্ডে অবস্থিত একটি অ্যাংলো-ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণে। বছরখানেক তিনি সেখানে ছিলেন। মিরফিল্ডে যাবার আগে গুজরাট-তদন্তে শামরাও আমার সাথি হয়েছিলেন। তিনি যখন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসেন ততদিনে আমি খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ ছেড়ে দিয়েছি। এবং আমার সঙ্গেই তিনি উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে যাবতীয় পরিকল্পনা আমরা দুজনে মিলে করতাম। নেফায় (নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি) আমার চলে যাবার পূর্বাবধি বেশ কয়েক বছর আমরা দুজনে মিলে একসঙ্গে কাজ করেছি। তখনকার দিনে একজন ইংরেজের (জন্মসূত্রে তো তাই) পক্ষে সাহেবদের সংকীর্ণ বৃত্তের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা সহজ ছিল না। সামান্য যা কিছু করতে পেরেছি তাও সম্ভব হত না যদি শামরাওয়ের মতো বন্ধু

আমার সঙ্গে না থাকতেন। সাথি হিসেবে তিনি ছিলেন (আজো আছেন) একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁর অমায়িক সহৃদয়তা আর অফুরান প্রাণপ্রাচুর্য বহু কঠিন বাধা অতিক্রমণে সাহায্য করেছে।

চার

১৯২৮ থেকে ১৯৩২, এই সময়পর্বে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি। আর এই পর্বটিই ছিল ভারতের অনাগত ইতিহাসের পক্ষে এক জটিল সন্ধিক্ষণ। এসময়েই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পুরনো জাতীয় দাবিটা পরিত্যক্ত হয়; এবং দাবি ওঠে পূর্ণ স্বরাজের, স্বাধীনতার। জওহরলাল নেহরু এই সময়েই তাঁর সমাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। আর কংগ্রেসও ক্রমশ নিজেকে সংহত করতে থাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি দায়বদ্ধতায়।

১৯২৮ থেকে ভারতীয় জনগণের মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। দেখা দিল কৃষকদের মধ্যে আলোড়ন; শিল্পশ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত করতে লাগল। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সামনে চলে এলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল; গুজরাটে তিনি সূচনা করলেন সরকারবিরোধী বিক্ষোভ। গত বছরের শেষের দিকে (বাস্তবত ১৯২৮-এর তেশরা ফেব্রুয়ারি— অনুবাদক) সাইমন কমিশন এদেশে এলে তার প্রতিবাদে জেগে উঠল বুদ্ধিজীবী এবং তরুণসমাজ। সবরমতি আশ্রম থেকে আমার প্রথম দফায় ঘুরে আসার পরে-পরেই লালা লাজপৎ রায় লাহোরে পুলিসের হাতে নিগৃহীত হন এবং পরে মারা যান। কয়েক সপ্তাহ বাদে লক্ষ্ণৌয়ে নেহরুজিও পুলিসের হাতে মার খেলেন। পাঞ্জাব ও বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেল।

অন্যদিকে সরকারও হয়ে উঠল কঠোর। সারা দেশজুড়ে গণআইনঅমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা শুরু হল। ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসে লাহোরে। প্রতিশ্রুতি-পূরণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের টালবাহানা ও ব্যর্থতায় অধৈর্য হয়ে ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি সমগ্র ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতার সপক্ষে একসঙ্গে শপথ নিল :

> আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণের মতো ভারতীয় জনগণেরও পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে; উন্নয়নের সুযোগলাভের জন্যে তার অধিকার আছে শ্রমের উৎপাদনেক পূর্ণ ভোগ করার— জীবনধারণের আবশ্যকীয় উপকরণ প্রাপ্তির। আমরা আরো বিশ্বাস করি, যদি কোনো সরকার এই ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত রাখে, তবে জনগণেরও অধিকার রয়েছে সেই সরকারকে শুধরে দেবার— প্রয়োজন তাকে উৎখাত করার।

গান্ধীজির সঙ্গে হাঁটছেন

সবরমতি আশ্রমে মীরাবেনের
সঙ্গে কথা বলছেন, ১৯৩১

গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলছেন, ১৯৩১

ধুলিয়া জেলে গিয়ে যমনালাল বাজাজ (মাঝে) এবং গান্ধীজির সচিব প্যারেলালের সঙ্গে কথা বলছেন, ১৯৩২

পরের বছর লবণ আইনভঙ্গে গান্ধীজির ডান্ডি অভিযান (মার্চ, ১৯৩০—অনুবাদক) জনগণের স্বপ্নকে উদ্বেল করে তোলে। পাঁচই মে গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন। তার তিন সপ্তাহ আগেই নেহরুজি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন। ফলে আইন-অমান্য আন্দোলন জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক লক্ষ মানুষ কারাবন্দি হলেন। সরকারও এবার বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ল। মনে পড়ছে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব ইমারসন কয়েকদিন বাদে আমাকে বলেছিলেন : আর কিছু নয়, ভারতীয় মহিলাদের এই অভূতপূর্ব জাগরণ—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা যে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছে সেটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় অস্বস্তির ব্যাপার। বস্তুত সমগ্র ভারতবর্ষ তখন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ। বিক্ষোভের সেই উত্তাল ঝঞ্ঝা এমনকি সুদূর উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারে গিয়েও আছড়ে পড়েছিল।

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে মোতিলাল নেহরু মারা গেলেন। গান্ধীজি বস্তুত চিরকালই শান্তির সপক্ষে ছিলেন; তাই ওই ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকেই তিনি লর্ড আরউইন-এর সঙ্গে সমঝোতার আলোচনায় বসলেন। ব্রিটেনের নেতৃবর্গ অবশ্য তখনো পুরনো সাম্রাজ্যবাদী ধারণায় আচ্ছন্ন; ফলে লর্ড আরউইনের আন্তরিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি ঘটল না। তবে সেখানে স্থির হল, লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকে যাবতীয় বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে। সেই গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গান্ধীজি ২৯ আগস্ট ভারত থেকে যাত্রা করলেন লন্ডন অভিমুখে। ডিসেম্বর মাসের শেষে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন; এবং পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের চার তারিখেই গ্রেপ্তার হন। সেবার তিনি বেশ কয়েক মাস জেলে ছিলেন। এ-বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

এদিকে এই সময়পর্বেই খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘের সঙ্গে আমার বন্ধনও দিনে দিনে শিথিল হতে থাকে। বার কয়েক আমি সবরমতি আশ্রমে যাতায়াত করি।

একবার সবরমতি আশ্রমে গিয়ে টানা বেশ কিছুদিন থাকি; সেবার ভাগ্যক্রমে আমি থাকার ঘর পেয়ে গিয়েছিলাম গান্ধীজিরই নিজস্ব কুটিরে। সেই ঘরে বসে আমি অপলক তাকিয়ে থাকতাম সবরমতি নদীর জলধারা আর তার বিস্তৃত বালুরাশির দিকে। আর দূরের দৃশ্যপটে দেখতাম যে-প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজি সংগ্রামরত তাদেরই নানা প্রতীকী সমাবেশ। সেই দৃশ্যপটে রয়েছে হস্তচালিত তাঁতশিল্প ধ্বংসসাধনে উদ্যত বড় বড় বস্ত্র-কারখানার উঁচু উঁচু চিমনি; সেখানে রয়েছে ভারতবর্ষের পৌরুষ ও প্রাণশক্তি শোষণকারী বিদেশীশাসনের প্রতীকী উপস্থিতি হিসেবে কালেক্টারের প্রাসাদ; সেখানে আরো দৃশ্যমান রেলওয়ে লাইন—অথচ গান্ধীজি মনে করতেন, গ্রামীণ কৃষকজীবনের শান্তিকে বিঘ্নিত করে চলেছে এই রেলব্যবস্থা। এইসব বিপ্রতীপশক্তির সমাবেশের বিপরীতে সহজ সরল আশ্রমজীবন—তার সারি-সারি নিচু কুটির। জাগতিক শক্তি আর পারমার্থিক শক্তি— দুই বিপরীত

শক্তি যেন বিন্যস্ত একে অপরের বিরুদ্ধে— যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে আত্মার শক্তি, অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে ভালবাসার শক্তি! প্রথম ভ্রমণের সময়ে দেখেছিলাম সবরমতি নদীটা যেন ধীরে ধীরে ফেপে উঠছে : হয়তো দিন কয়েকের মধ্যেই শুখা শস্যহীন বালির ঢিবিগুলো হারিয়ে যাবে; গোটা গ্রীষ্ম জুড়ে যে-সবরমতি ছিল শীর্ণস্রোতা অচিরেই সে হয়ে উঠবে বাধাবন্ধনহীন এক খরস্রোতা নদী। আমি তখন তরুণ। আর তরুণ বলেই লিখতে পেরেছিলাম : নদীও কি এখানে প্রতীক নয়? 'কোনো স্বর্গীয় গিরিশৃঙ্গ থেকে কি প্রেম-ন্যায়-ত্যাগে সৃষ্ট এক ধারার আধুনিক বিশুষ্ক মরুতে প্রবহনের সময় এসেছে?'

সবরমতি আশ্রমের কর্মসূচি ছিল খুব ক্লেশকর, কঠোর। ভোর চারটেয় ঘুমভাঙার ঘন্টা বাজত; তার বিশ মিনিট বাদেই প্রার্থনার ঘন্টা; মুক্তবাতাসে সেই প্রার্থনা চলত টানা এক ঘন্টা। ছ'টায় হাল্‌কা প্রাতরাশ— এক কাপ দুধ, এক পিস রুটি। তারপর সমস্ত সকালটা জুড়ে একের পর এক নানা কাজের চাপ; চড়কা-কাটার ক্লাশ, তুলো-ধুনার কাজ, হিন্দি শেখা। সকাল দশটায় স্নান—সকলকেই নিজের কাপড়চোপড় নিজেকেই ধুয়ে নিতে হত; কোনো ধোবী ছিল না আশ্রমে; পৌনে এগোরোটায় মধ্যাহ্নভোজন— চাপাটি, সব্‌জিসিদ্ধ আর দই।

আবার সাড়ে বারোটা থেকে একটানা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলত সুঁতোকাটা, তাঁত-বোনার কাজ। কাজের পদ্ধতি শেখানোর জন্যে মাঝে মাঝে ক্লাশ হত; কিন্তু ন্যূনতম দুটি শ্রমঘন্টা শেডের বুননের কাজের জন্যে, আর একটি শ্রমঘন্টা সূতা-কাটার কাজের জন্যে অবশ্যই ব্যয় করতে হত। সাড়ে পাঁচটায় বিকেলের খাবার— চাপাটি, সব্‌জি সিদ্ধ, খানিকটা ভাত, দুধ আর ফল। তারপর সোয়া ছ'টায় সান্ধ্যভ্রমণ। এই সান্ধ্যভ্রমণপর্বটাই ছিল আমার কাছে উত্তেজনাকর। গান্ধীজিকে মাঝখানে রেখে অর্ধবৃত্তাকারে আমরা হাঁটতাম। একের পর এক প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে কথা বলতেন। সান্ধ্য প্রার্থনা বসত সাড়ে সাতটায়; তারপর বিনোদন। আর ঠিক নটায় শুয়ে পড়ার ঘন্টা বাজত।

ঠিক যেন পুরনো স্কুলজীবনে ফিরে আসা : সব সময়েই ভিতরে আতঙ্ক, এই বুঝি দেরি হয়ে গেল! গান্ধীজি (সকলেই আমরা তাঁকে 'বাপু' বলে ডেকেছি) প্রতিদিনের ঘটনাক্রমকে রেলযাত্রার সঙ্গে তুলনা করতেন : দেরি করে স্টেশনে পৌঁছলে যেমন ট্রেন ধরা যায় না তেমনি খাবার সময়ে দেরি করে পৌঁছলে আহারও জুটবে না। বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠোর ছিল নিয়মানুবর্তিতা। প্রভাতী ও সান্ধ্য প্রার্থনাকালে নাম ডাকা হত। প্রতিদিন বিকেলে হিসাব দিতে হত, কতটা সুতো বোনা হয়েছে। ছাত্র-আবাসিকদের সঙ্গে আমার নামও ডাকা হত। আমার অবস্থানকালে ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য আশ্রমিক মিলিয়ে সেখানে শ'দেড়েক লোক ছিলেন। তাদের কেউ বিবাহিত, কেউ অবিবাহিত। সংযমের ব্যাপারে ছিল অলঙ্ঘনীয় কঠোরতা— বৈবাহিক

সম্পর্কের বাইরে (স্বাভাবিকভাবেই) তো বটেই, এমনকি বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রেও। সবরমতি আশ্রমে ছিল বাস্তবিকই যৌথ সন্ন্যাসজীবনের আশ্চর্য ও বিরল প্রতিরূপ। অবশ্য তা কতটা কার্যকর হয়েছিল তা বলতে পারব না।

সবরমতি আশ্রমজীবনে মুখ্য বিষয় ছিল : শারীরশ্রম (আট ঘন্টা শ্রম প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যাশিত ছিল), ব্যয়সংকোচন বা মিতব্যয়িতা (মাসিক ব্যয় নামিয়ে আনা হয়েছিল মাথাপিছু বারো টাকায়— ব্যক্তিগত মালিকানার কোনো অনুমতি তো ছিলই না); আর ছিল পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা আর সময়ানুবর্তিতা। পূর্ণ সদস্যগণের দুটি বিশেষ শপথ নিতে হত : সত্য ও অহিংসা (প্রেম), কৌমার্য ও লোভশাসন; পরস্বাপহরণহীনতা (একান্ত অপরিহার্য বস্তু রাখাও চৌর্যবৃত্তি) এবং সম্পত্তিহীনতা।

বাপু একদিন আমাকে বলেছিলেন, তাঁর বিবেচনায় লোভশাসনই কঠিন কাজ। সংকোচের সঙ্গে ফিসফিস করে বলেছিলেন যে সুস্বাদু খাবার তিনিও ভালবাসেন— গুজরাটের ভারতীয় নিরামিষ রান্না তো খুবই সুস্বাদু।

যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত রাখতেন বাপু। কায়িক শ্রমকে তিনি ব্রত হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন, আর সারাজীবন নিরবচ্ছিন্ন শ্রম করে গেছেন। আহার্যের পরিমাণ হ্রাস করতে করতে ন্যূনতম পরিমাণে নামিয়ে এনেছিলেন তিনি। পরতেন দরিদ্রতম কৃষকের পরিধান। একদিন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সেই বিখ্যাত কটিবস্ত্রটি ধুয়ে দেওয়ার। দেখেছি কতটা সামান্য পরিমাণ বস্ত্র তিনি পরিধান করতেন। এমনকি বস্ত্রের প্রান্তভাগ কেটে তিনি রুমালও বানিয়ে নিতেন। সবসময়েই তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতেন। তাঁর লেখা অসংখ্য বইয়ের গ্রন্থস্বত্বও তিনি রাখতেন না। তাঁর সবরমতির কুটির কিংবা যেখানে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সেই কেরাডি'র কুঁড়েঘর, সেগুলো ছিল অতিসাধারণ, অত্যাল্প আসবাবসহ বাসস্থান— তাঁর দরিদ্রতম অনুরাগীও সেখানে কোনোপ্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। তিনি তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র লিখেছেন ছোট বাতিল কাগজের টুকরোয়— একেবারে কঠোর মিতব্যয়িতা। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সারল্যটা ছিল তাঁর কাছে ধর্মাচরণ বা উপাসনার মতো।

বাপুর কঠোর তপশ্চর্যার প্রকাশ কন্টকাসনে উপবেশনের মধ্যে নয়, বরং সুষ্ঠু হিসাবনিকাশ রাখার মধ্যে। এসব দেখে আমি এসময়ে লিখি— কিছুটা কাব্য করেই লিখেছিলাম :

> বাপুর তপশ্চর্যা মুক্ত পবনের। তাকিয়ে দেখুন তিনি নক্ষত্ররাজির নিচে ঘুমিয়ে আছেন— স্থির, প্রশান্ত। প্রস্ফুটমান কুসুমরাজি, তাজা ফল, উন্মুক্ত বিস্তৃত নদী, আকাশে প্রভাতী শুকতারা— উদয়-পূর্বের প্রার্থনায় বা দিনান্তের নির্মল সমীরণে তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হয়েছি আমি।'

তুলো ধুনো করা, সুতো কাটা, ক্লাশ বা বয়নকাজের শেডের অভিজ্ঞতা বেশ উপভোগ করেছি। সবই আমার কাছে একেবারে নতুন। অনভিজ্ঞ হলেও এই দৈহিক শ্রম উত্তেজনাকর ছিল। সঠিক মাপের একটি নিখুঁত সুতো বার করার মধ্যে ছিল একটা বিজয়োল্লাস— তুলো ধুনার পটাং-পটাং শব্দের অনুষঙ্গে সাদা পশমের মতো তুলারাশি দেখার উত্তেজনা— বয়নের জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি— এবং শেষমেশ একজনের হাতের নিচে কিভাবে একটি বস্ত্র বুনন হয়ে চলেছে, তা দেখার মধ্যে ছিল পরম আনন্দ। সেই দিনগুলোর অভিজ্ঞতা বুঝি আবার পেতে ইচ্ছে করে। বলা যায়, চুরুটের তৃপ্তির মতোই সেই আনন্দবোধ।

সবরমতি আশ্রমে বাপুকে আমি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখার সুযোগ পেয়েছি : একজন সন্ন্যাস-প্রবর্তক ও আধ্যাত্মিক নির্দেশক হিসেবে। হয়তো ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে বেরুচ্ছেন, ঠিক তার আগেই আশ্রমিকদের উদ্দেশে লিখে চলেছেন অসংখ্য আধ্যাত্মিক উপদেশাবলি। তাঁদের প্রত্যেককে তিনি স্বতন্ত্রভাবে চিনতেন, জানতেন— তাঁদের সবকথা, সব স্বীকারোক্তি শুনেছেন; তিনি তাঁদের পরামর্শ-উপদেশ দিতেন— সব সময়েই তাঁদের পাশে ছিলেন। সতের বছরের এক সদ্যযুবক আমাকে বলেছিল : 'আমি বাপুর কাছে গিয়ে আমার জীবনের সব বাজে-নোংরা ব্যাপার খুলে বলে ফেলি। আমার পাপের ভারটা সরে গেল; তখন কি দারুণ স্বস্তি পেয়েছিলাম!' আর একজন জীবনের করণীয় কাজ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন; উত্তরে তিনি বললেন, 'প্রথমে সত্যকে খোঁজো— সবকিছু তোমার সামনে চলে আসবে।' বাপু খুবই অনমনীয় ছিলেন, আর তাঁর দাবিও ছিল তেমনি সাংঘাতিক। তবু বুঝতেও পারতেন সহজে। নিজেকে সম্পূর্ণত উজাড় করে দেবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর—আপাত গুরুত্বহীন কোনো কাজেও।

রোমাঁ রোঁলার উৎসাহে কয়েক বছর আগে মিস্ স্লেড এসে আশ্রম-জীবনে যোগ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মীরাবেন্ নামে তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

খুবই মেধাবী এবং সুন্দরী ছিলেন এই মীরাবেন— আত্যন্তিক সংকল্প ছিল তাঁর। সম্ভ্রান্ত এক নাবিক পরিবারে তাঁর জন্ম। আমি যখন আশ্রমে গেলাম ততদিনে তিনি তাঁর সুন্দর কেশরাশি মুড়িয়ে ফেলেছেন।

বাপু তাঁকে একেবারে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। ১৯৩০-এ আমিও একদিন বাপুর একটা কথা শুনে দারুণ আলোড়িত হয়েছিলাম। বাপু আমাকে বলেছিলেন, 'মীরাবেন্ যেমন আমার মেয়ে, তুমিও হবে আমার তেমনি এক ছেলে।' বস্তুত সেদিন থেকেই নিজেকে আমি ভারতের নাগরিক বলে ভাবতে শুরু করি।

মীরাবেনই আমার দেখভাল করতেন। বাপুকে একদিন জানালাম, এক কাপ চা না খেয়ে ভোর চারটে কুড়ি মিনিটে প্রার্থনা করা বাস্তবিকই আমার পক্ষে অসম্ভব। যে-কজন ভাগ্যবান পালনীয় বিধান থেকে অব্যহতি পেয়েছিলেন আমি তাঁদের একজন।

আর সেই স্বস্তিকর এক কাপ চা আমাকে প্রতিদিন জোগাতেন মীরাবেন্।

আশ্রমে আমার আসল পরীক্ষাটা হয়েছিল আগত দর্শনার্থীদের দ্বারা। আমার ঘরটিতে কাচের পাল্লার পরিবর্তে ছিল লোহার শিক। মনে হত আমি যেন খাঁচায় বন্দি আছি। দলে-দলে মানুষ প্রতিদিন আশ্রমে আসত। আমাকে দেখার কৌতূহলে তারা জানালা দিয়ে উঁকি দিত। হয়তো আমি ঘুমুচ্ছি, জামাকাপড় পরছি বা কিছু খাচ্ছি— কোনো ব্যাপার নয়! আর তারা প্রায়ই আমাকে ভুল করত মীরাবেন ভেবে। চুল কামিয়ে ফেলার পর মীরাবেনকে অবশ্য কিছুটা পুরুষ-পুরুষ দেখাত; আর ঢিলেঢালা পোশাকে আমাকে কেমন দেখাত কে জানে! টের পেতাম জানালার ওধারে ভিড় বাড়ছে, কেউ কেউ আবার বাচ্চাগুলোকে উঁচুতে তুলে ধরেছে ভাল দেখতে পাবে বলে। আমাকে যেন তারা গিলছে, গিলতে-গিলতে একসময়ে একটু বিরতি; তারপরই কানে আসত, কেউ নিচু গলায় বলছে : 'ভাবা যায় ইনিই হচ্ছেন এক ইংরেজ অ্যাডমিরালের মেয়ে!'

ঝাড়ু-সাফাইয়ের কাজ প্রত্যেককেই পালাক্রমে করতে হত। আশ্রমে এক বড় ব্যাপার ছিল, শৌচাগার-সংক্রান্ত কোনো বাজে শুচিবায়ুগ্রস্ততা ছিল না। অবশ্য বাপুর তেমন ঘ্রাণশক্তিই ছিল না। পয়ঃব্যবস্থা পরিদর্শনে বেরুলে মীরাবেন বা কখনো কখনো আমি সঙ্গে যেতাম— আমাদের ঘ্রাণশক্তির রিপোর্টে তিনি যথার্থ অবস্থাটি জানতেন।

সেসময়ে ঠিক বুঝিনি, অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে এখন টের পাই, কৌমার্য বিষয়ে আশ্রমে বেশ বাড়াবাড়িই চলছিল। স্বামী-স্ত্রীকে বাস করতে হত ভাই-বোনের মতো— ফলে তাদের ওপর স্নায়বিক চাপটা পড়ত সাংঘাতিক—প্রায় অ-স্বাভাবিক ধরনের। যৌনাচারকে গণ্য করা হত এক সাংঘাতিক স্খলন হিসেবে। একদিনের এক ঘটনায় আমিও হাজির ছিলাম। তরুণ সুখী এক দম্পতির রতিক্রিয়াজনিত তথাকথিত পাপাচারের তদন্ত করছিলেন গান্ধীজি। মনে আছে তিনি শুরু করেছিলেন এভাবে : 'দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার নিজ অভিজ্ঞতায়...।' সেখানে তখন শ্রীমতী কস্তুরীবাইও ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'না-না-না, ওসব কথা থাক।'

ব্যাপারটা কতটা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বোম্বের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। মীরাবেন তখন সমুদ্রমুখী একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। আমি গেছি ওখানে লাঞ্চ খেতে। দারুণ গপ্পোগাছা চলছিল। এ সময়ে খাবার এল; খাবারগুলো মেঝেতে সাজিয়ে রেখে মীরাবেন উঠে গিয়ে জানলাগুলো সব বন্ধ করে দিলেন। আমি বারণ করলাম, তখন বেশ গরম পড়েছে। দৃঢ়কণ্ঠে মীরাবেন বললেন, 'না, ভেরিয়ার, সমুদ্রের হাওয়ায় লবণকণা থাকে; সেই লবণকণা এসে আমাদের খাবারে পড়বে। তখন তোমার কামভাব ঠেকিয়ে রাখা আরো কঠিন হয়ে পড়বে।'

বাপু অবশ্য সমস্ত কিছুই সত্যের নিরিখে বিচার করতেন। ১৯৩৩ এর শুরুতে আমি যখন বিয়ে করব মনস্থ করেছি তখন বাপুকে সংবাদটি জানিয়ে একখানা চিঠি

লিখি। তখন তিনি ইরায়াদা জেলে বন্দি। চিঠির উত্তরে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে লিখলেন :

> স্নেহের পুত্র,
>
> বাছা এখন তুমি তোমার ইচ্ছার নিয়ন্তা হয়ে গেছ। আমিও আমার সম্মানজনক অবস্থান মেনে নিচ্ছি। তুমি আমার ছেলেই থাকবে সারাজীবন। তোমার ও আমার মধ্যেকার বন্ধনটি রক্তের থেকে ঘন, আরো বেশি দৃঢ়। সেই বন্ধনটি হচ্ছে যে কোনো শর্তে সত্যের প্রতি প্রজ্বলিত ভালবাসা। ফলে তুমি যাই করবে, আমি হতাশ হব না। কিন্তু আমি কিছুটা দুঃখ পেয়েছি। কৌমার্যের মহত্ত্বকে বিবাহের ওপরে জায়গা দেবার কথা আমি ভাবছি না; আমি শুধু ভাবছি তুমি কী চেয়েছিলে— কী হয়ে ওঠার জন্যে তুমি নিজেকে প্রায় অঙ্গীকারবদ্ধ করে ফেলেছিলে। কিন্তু আমি জানি, নিজের কাছে তোমার সত্য থাকতেই হবে— সেইভাবেই নিজেকে প্রকাশ করতে হবে।

বিয়েতে শুভেচ্ছা জানানোর কথাও তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু বিয়েটাই তো শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। আর চিঠিটি শেষ করেছিলেন এই বলে : 'সত্যের প্রতি তোমার প্রেমই তোমার স্বতন্ত্র প্রণয়কে রূপাভাসিত করবে সত্যের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের পরিণয়ে। সেই দিব্য পরিণয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা সকলেই নারী, আর সত্যই হচ্ছে একমাত্র পুরুষ, প্রভু এবং স্বামী!'

পাঁচ

সেই দিনগুলোর ব্যক্তিগত অনুস্মৃতি খুব বেশি রাখিনি; তবে ১৯৩১-এব একটি ভ্রমণ বিবরণ রয়েছে। সেটি এইরকম .

> বোম্বেগামী রাত্রির ট্রেনের তিনটি কামরা আমাদের জন্যে বুক করা হয়েছে। প্লাটফর্মে প্রথমে এলাম আমি; তাবপর এলেন মীরাবেন— তাঁর সঙ্গে এক অসুস্থ মহিলা ও একটি অসুস্থ ছেলে— বাপু তাদের বোম্বে নিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্যে। তারপর এক বাসভর্তি মালপত্র নিয়ে পৌঁছলেন প্যারেলাল— স্তূপের ওপর স্তূপ, বাক্স-বাক্স ফাইল, গোল করে পাকানো বিছানাপত্র, ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল, সুতো-কাটার চড়কা, কুঁজো-কুঁজো জল— আর ছলকে-পড়া জলে ছোট আধারটি থৈ থৈ করছে। সবশেষে এলেন গান্ধীজি, শ্রীমতী গান্ধী, যমনালাল বাজাজ আর অন্যান্য সচিবরা। বাপুর যাবার খবর তেমন কেউ জানত না, ফলে কোনো শোভাযাত্রা বা সমাবেশ ছিল না, কিন্তু তাও শ' খানেক লোক গাড়িটার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ট্রেন ছাড়লে কোনো ধ্বনিও উঠল না। আমরা যখন সত্যিই চলেছি তখন বাপু

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তাঁর মৌনতার দিন শুরু হয়ে গেছে; আগামীকাল সন্ধ্যা অবধি তিনি কোনো কথা বলবেন না। মীরাবেন সবে তাঁর বিছানা করে দিয়েছেন, তিনি সরাসরি বিছানায় গিয়ে উঠলেন। এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাদ বাকি আমরা এখানে-সেখানে, সিটের মাঝখানের ফালিতে বসে মাঝরাত অবধি ঝিমুতে লাগলাম। পালা করে একজনকে জেগে থাকতে হল পাহারায়, স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই কৌতূহলী কোনো মানুষ যাতে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে বাপুর ঘুম ভাঙিয়ে না দেয়। বৃদ্ধারা চায় তাঁর মস্তক স্পর্শ কবতে, কেউ কেউ চায় উপহার দিতে, আবার কেউ চায় লণ্ঠনের আলো এগিয়ে ধরে তাঁকে শুধু এক পলক দেখতে। শিশুর মতো ঘুমে অসাড় মানুষটিকে দেখতে চমৎকার লাগছিল! মাঝে মাঝে সেই ঘুম বিঘ্নিত হচ্ছিল ট্রেনের ঝাঁকুনিতে, কিংবা হয়তো পাশে স্তূপীকৃত ফাইলের কথা মনে আসায়।

ভোর চারটেয় আমরা সবাই উঠে পড়লাম প্রার্থনার জন্যে। ট্রেনটা ছুটে চলেছে, আর চারধারের ঘন আঁধারের মধ্যে আমরা গেয়ে চলেছি আমাদের অভ্যস্ত প্রার্থনাগীতি। আর 'ভগবদ্গীতা' থেকে আবৃত্তি করে চলেছি দেহ ও মনের সংযম এবং তা থেকে উৎসারিত শান্তির স্তবসমূহ।

আমি মাত্র কয়েকটা দিন বোম্বে ছিলাম। শেষদিন বিকেল সাড়ে-ছটায় আটটার গাড়ি ধরে যখন পুণেতে ফিরবার প্রস্তুতি নিচ্ছি ঠিক তখনি একটা ফোনবার্তা এল : যাবার পথে আমি যেন লাবুরনাম রোড ঘুরে বাপুর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে যাই। বার্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। তাই আমিও সেখানে গিয়ে সরাসরি দোতলায় উঠে যাই।

সেদিন ছিল সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কমিটিব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা। ছোট একটা ঘরে বাপু বসে আছেন, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ভদ্রলোকটির সঙ্গে পুলিসের কি যেন ঝামেলা হয়েছে। ছুটির দিনে আমাদের মেজাজ যেমন উৎফুল্ল থাকে— নিশ্চল শান্ত থাকে ঠিক তেমনি বাপুর মুখেও বিরাজ করছিল নিরুদ্বিগ্নতা আর প্রশান্তি।

কিছুক্ষণ আমি অপেক্ষা করলাম। তারপব তিনি আমাকে বললেন, তিনি জানতে পেরেছেন যে আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন; তাঁর মনে হয়েছে, আমার ব্যাপারে তাঁরও হয়তো কিছু করার আছে। বাস্তবিকই তখন খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিয়ে খুবই মানসিক চাপে ছিলাম। মীরাবেন নিশ্চয়ই তাঁকে এ-ব্যাপারে কিছু বলে থাকবেন। সব কথাই তাঁর মনে গাঁথা থাকত; আর আজকের মতো দিনে তার উত্থাপন। তারপর প্রায় মিনিট বিশেক ধরে— একেবারে স্বচ্ছ ধারণা আর বিচক্ষণতার সঙ্গে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার

দৃষ্টান্ত দিলেন। আমাকে শোনালের সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে তাঁর নিজ সম্পর্কের বৃত্তান্ত— কেন তিনি তাতে যোগ দেননি, সেইসব কথা।

তিনি বলেছিলেন, 'সোসাইটিতে তোমার অবস্থান নিয়ে যদি সন্দিগ্ধ হয়ে থাকো তাহলে নিজের সম্বন্ধে তাদের কাছে বাজে কথা বলতে থাকো। অসুবিধাগুলো বাড়িয়ে-ফাঁপিয়ে—রং চড়িয়ে বলো। তারপরও যদি তারা সবকিছু হজম করে নেয় তো মিটে গেল।' 'সাধারণ নিয়মটা হচ্ছে, যতক্ষণ না বের করে দিচ্ছে তুমি বেরুবে না।' 'আর সোসাইটিকে বুঝি আমি বিব্রত করছি—এরকম কোনো চাপ সর্বদা বহন করে বেড়াবে না। যদি সেই চিন্তাটা কাল্পনিকও হয়, তাহলেও দেখবে তার একটা বাস্তব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। একবার যদি মনে করি আমার ঘরে একটা ভূত আছে—জগতের কোথাও কোনো ভূত না থাকা সত্ত্বেও আমি কিন্তু রাত্রে ঘুমুতে পারব না। এই ভূতটাকে তোমার শেষ করে ফেলতেই হবে। সেটাকে পেটাও, খুন করো—এক্ষেত্রে কোনো অহিংসার প্রশ্ন ওঠে না।' শেষে আমাকে বললেন, হিমালয়ের ওপর আলমোড়ায় গিয়ে শরীরটাকে পুরোপুরি সুস্থ চাঙা করে আসতে— ব্যয়ভার তিনিই বহন করবেন।

এই কয়েকমাসের অভিজ্ঞতাগুলোই হয়ে উঠেছিল আমার সমগ্রজীবনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্তিকা। আমি সিদ্ধান্তে এলাম, খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ থেকে আমি বেরিয়ে আসব। কোনো একটি রিক্ত নিঃস্ব গ্রামে গিয়ে বসবাস করব— তাদের নিবিড় সান্নিধ্য পাবার চেষ্টা করব। 'অপ্রাকৃত থেকে প্রাকৃতে আমাকে চালনা করো'— এবার নতুন মাত্রা নিল। প্রথমে ভেবেছিলাম গুজরাটে অস্পৃশ্যদের মধ্যে যাব।

কিন্তু সর্দার বল্লভভাই আমাকে সেই উদ্যোগ থেকে নিবৃত্ত করেন। তিনি বললেন, 'অস্পৃশ্যরা আপনার সমস্যা নয়, তারা হিন্দুর পাপাচারের সৃষ্টি। ওদের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে হিন্দুদেরই।' তিনি আরো জানালেন, ইতিমধ্যেই সমাজসেবী আর মিশনারিতে গুজরাট ছেয়ে গেছে। স্বচ্ছন্দে কাজ করার মতো নিষ্কণ্টক জায়গা পাওয়া দুষ্কর। হয়তো আমি সেটা পেতে পারি শুধু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

একদিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর যমনালাল বাজাজকে নিয়ে আমেদাবাদের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছি। ওঁরা দুজনে কথাবার্তা বলছিলেন; হঠাৎ যমনালাল বাজাজের মুখ থেকে অশ্রুতপূর্ব একটি জাদু-শব্দ শুনলাম : 'গোণ্ড'।

এবার তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কেন মধ্যপ্রদেশে এসে চরম অবহেলিত এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্যে কিছু করার কথা ভাবছেন না? দেশীয় বা মিশনারি কেউই তাদের জন্যে কিছু করেনি।'

গোণ্ডদের সম্বন্ধে যমনালালজি যা বলতে চাইলেন সবই আমার মনে দাগ কেটে যায়। বছর ঘুরবার আগেই ওখানে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

তারপরই আমার সব ইচ্ছা ও পরিকল্পনা জানিয়ে ইংল্যান্ডে শামরাওকে চিঠি

লিখলাম। আমি জানতে চাইলাম, এই কাজে তিনি আমার সঙ্গে যোগ দেবেন কিনা। এখানে মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু তখনো নিজেদের চার্চ-সদস্য বলে মনে করছি। শ্যামরাওয়ের তখনো ইচ্ছে তিনি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হবেন। আমার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবার অর্থ, তাঁর বিলেতবাস সংক্ষেপিত হওয়া। আমাদের ইচ্ছেটা ছিল কোনো এক গোণ্ড আদিবাসী গ্রামে গিয়ে ছোট একটি আশ্রম গড়া, বসবাস করা। জাতীয় আন্দোলনের ইতিমূলক দিকগুলোর সঙ্গে নিজেদের আত্তীকৃত করা। চার্চের সদস্য হিসেবেই থাকব, এবং ফ্রান্সিসীয় জীবনচর্চার নতুন অনুশাসন রচনা করে নেব। কিন্তু আমরা কোনো মিশনারি কাজ করব না, কোনোরকম ধর্মপ্রচারও করব না— ধর্মান্তরণের কোনো উদ্দেশ্যেই আমাদের থাকবে না। যে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী বা একেবারে নাস্তিক সকলের জন্যেই উন্মুক্ত থাকবে আমাদের আশ্রমের দরজা।

এরকম এক ধর্ম-প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইংল্যান্ডে হয়তো সম্ভব নয়; আমার মনে হয় না, সেখানকার কোনো বিশপ এটা মেনে নিতে পারবেন। কিন্তু ভারতে এটা সফল না হওয়ার কোনো কারণ নেই। জাতীয় চেতনাসম্পন্ন যে কোনো ক্রিশ্চিয়ান গোষ্ঠী তাঁদের স্বধর্মের বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র না খুইয়েও অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে কেন দুঃস্থ মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে পারবেন না?

দীর্ঘ আলোচনার পর, এবং গান্ধীজির পরামর্শে অবশেষে শামরাও এক তারবার্তা পাঠিয়ে আমাকে জানিয়ে দিলেন, বছরের শেষভাগে উনি এসে আমার সঙ্গে যোগ দেবেন। এই সংবাদটি আমার প্রকল্পকে রাজনীতির বাস্তব চৌহদ্দিতে নিয়ে এল। আমি খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ থেকে পদত্যাগ করলাম। ব্যবস্থা হয়েছিল, শামরাও গান্ধীজির অনুগামীদের সঙ্গে ভারতে ফিরে আসবেন।

এক ঘোর অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া হল। আমাদের নতুন গ্রাম দেশটা কেমন হবে জানা নেই; আদিবাসী মানুষদের সম্বন্ধে তো কিছুই জানি না। আর বাস্তবিকই আমাদের কাছে কোনো টাকাপয়সাও ছিল না, কিভাবে তার সংস্থান হবে তাও জানা নেই।। আশু প্রয়োজনের ব্যয়টা আমাদের নতুন সুহৃদ যমনালালজি জোগাড় করে দিতে সম্মত হলেন। ওই কঠিন সময়টা পেরোতে তিনি যেসাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন তা ভোলা যাবে না কোনোদিনই।

বছর দুয়েক আগেই অনিবার্য বিচ্ছেদের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল, কিন্তু খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি বাস্তবত যখন ঘটল তখন সেটা ছিল সাবলীল : একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একজনের নির্বিরোধ বিদায়— কোনো বিরুদ্ধ চিন্তার সংঘাত ছিল না। আর শামরাও ও আমিও চেয়েছিলাম আগের মতোই কাজ করে যেতে, তবে অনেক বেশি স্বাধীনতায় এবং কোনোরকম মিশনারি নিদান ছাড়াই; সঙ্ঘের নীতিতে কিন্তু সেই নিদানগুলো খুবই প্রকট ছিল। সম্পর্ক যতই ক্ষীণ বা দূরত্বের হোক না কেন

তখনো কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা ছিল চার্চের সঙ্গেই থাকা। খ্রিস্টধর্মের অতীন্দ্রিয় চেতনাকে হিন্দু মরমীয়াবাদের সঙ্গে সংশ্লেষণে তখনো আমরা উৎসুক ছিলাম।

শেষাবধি কিন্তু আমার পদত্যাগের পরিণতিটা হয়েছিল দূরপ্রসারী। তাতে সময় লেগেছিল। ১৯৩১-এ প্রধানতম বাস্তব পরিণতিতে আমার ব্যয়নির্বাহের জন্যে কোনো সোসাইটিই আর রইল না।

কয়েক সপ্তাহ পুণেতে রইলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে চলে গেলাম ওয়ার্ধার কাছে সেবাগ্রামের সত্যাগ্রহ আশ্রমে। সেটা ছিল গান্ধীজির খুবই প্রিয় আবাস। যখনই বিশ্রাম বা নিভৃতবাসের আবশ্যকতা বোধ করতেন তখনই তিনি চলে যেতেন সেখানে। পরবর্তীকালে এই ওয়ার্ধাতেই তিনি তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। সবরমতির মতো কোনো রোমান্টিক নদীদৃশ্য সেখানে নেই। মধ্যভারতের ধূলোবালিময় সমভূমিতে সেবাগ্রাম। মাটি তেতে ওঠে একেবারে নির্দয়ভাবে; সেখানে থাকাকালীন গান্ধীজি প্রভাতী ও সান্ধ্য ভ্রমণটা করতেন রেল-লাইন ধরে হেঁটে। আত্মাকে বিচলিত করার মতো কোনো মনোরম বা ইন্দ্রিয়গত উপকরণের সমারোহ নেই বলেই হয়তো তিনি এরকম একটা স্থান খুঁজে নিয়েছিলেন। তাঁর অনুগামীরা এখানে সম্পূর্ণত নিবেদিত হতে পারতেন দরিদ্রজনের সেবায়— সত্যান্বেষণের দ্বৈরথেও।

আমিও মাঝে মাঝে এসে থেকেছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যমনালাল বাজাজের সঙ্গে। তিনি থাকতেন অনতিদূরে। যমনালালজি ছিলেন বিশাল সম্পত্তির মালিক। বছর দশেক পূর্বে এই ধনী-বণিক যুবরাজটি তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে একটা ছোট ভিড়েঠাসা বাংলোতে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। খুবই সহজ সরল জীবনযাত্রা ছিল তাঁর। যদিও তখনো তিনি বহু সম্পত্তির মালিক কিন্তু নিজেকে মনে করতেন তার একজন সামান্য অছিমাত্র; তাঁর বেশিরভাগ ধনদৌলতই ব্যয় হয়ে যেত জনকল্যাণে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক আদর্শ রূপ : জাতির পুনর্গঠনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেন। বহুদিন আগেই তিনি তাঁর গৃহমন্দিরের দরজা 'অস্পৃশ্য'দের জন্যে খুলে দিয়েছিলেন। খাদি আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক প্রধান সারির নেতা। এই আন্দোলন গরিব মানুষের কিছু উপকারও করেছিল। তাঁর সঙ্গে অবস্থানকালে দেখেছি, অস্পৃশ্যদের ব্যবহারের জন্যে তাঁকে বেশ কয়েকটি ইঁদারা উদ্বোধন করতে। এবং বেশ কয়েকটি মন্দিরকেও তিনি জাতপাতের নিষেধ থেকে বিমুক্ত করতে পেরেছিলেন। খুব কম ইংরেজ ভদ্রলোকই তখন ওয়ার্ধায় গেছেন, ফলে অন্যান্য নেতাদের মতো যমনালালজি তাঁদের পরিচিত ছিলেন না। তার আর একটা বড় কারণ, ইংরেজিতে কথা বলতে তাঁর বেশি ভাল লাগত না। আমার মতে, তাঁর অপরিচিতি খুবই পরিতাপের ব্যাপার। তাঁর মধ্যে অসংখ্য মহৎ গুণ ছিল : তাঁর সারল্য, স্পষ্টবাদিতা, বাচনভঙ্গির সহজতা

(মনে আছে, বারবার 'ধন্যবাদ' জানানোয় তিনি আমাকে খুব বকাঝকা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, আমি কি বোঝাতে পারছি না?)। 'কোয়াকার' (জর্জ ফক্স প্রতিষ্ঠিত 'বন্ধুসভা'র সভ্য— অনুবাদক)-এর মতো তাঁর উপস্থিতিজনিত চাহনি অন্যদের মনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করত।

যমনালালজিকেও অবশ্য জেলে যেতে হয়েছিল। একদিন ধুলিয়া জেলে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। জেলে তাঁকে যেভাবে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি হিসেবে রাখা হয়েছিল সে দৃশ্য দেখে আমি খুবই ব্যথা পাই। আর সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করি,(তখন অনেকেই এরকম সব প্রতিজ্ঞা করতেন) যতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন না করবে আমিও খালি পায়ে হাঁটব। তবে ব্যতিক্রম বা ছাড়ও থাকবে। সবার দৃষ্টি যাতে না পড়ে সেজন্যে শহরাঞ্চলে আমি চপ্পল পরব; বাস্তবিকই প্রায় পনের বছর আমি প্রতিজ্ঞাটা পালন করতে পেরেছি। শেষে অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছিলাম। ফলে জুতো, মোজা, পালিশের খরচের টাকাও সাশ্রয় হয়েছে অনেকটা। শেষে প্রতিজ্ঞাপালনের শর্তটাই আর রইল না তখন, সত্যি কথা বলতে কি, আমি কিছুটা দুঃখই পেয়েছিলাম।

এ. ভি. (ঠাক্কার বাপা) ছিলেন তাঁর সমসময়ের একজন নামী সমাজসেবক। এই সময়ে একবার তাঁর সঙ্গে দশদিনের ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম 'অচ্ছুত'দের জন্যে কী করা হয় দেখতে। সেই দেখাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। প্রথমে আমরা যাই বোম্বে, গিয়ে উঠি সার্ভেন্টস্ অফ ইন্ডিয়া সোসাইটিতে। সেখানে শ্রমিক নেতা এন. এম. যোশি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। বোম্বেতে ভাঙ্গিদের বস্তিতে বস্তিতে ঘোরাঘুরি ব্যস্ততায় কয়েকটা দিন কাটল। ফ্লাস-ব্যবস্থার পরিবর্তে ভাঙ্গিরাই পায়খানা থেকে মল বয়ে নিয়ে যেত। এই 'অচ্ছুত' ভাঙ্গিরা ছিল মিউনিসিপালিটির কর্মী— মিউনিসিপালিটির আবাসনেই তারা বাস করত।

এই ঘটনার অভিজ্ঞতা জানিয়ে ওই সময়ে আমি একখানা চিঠি লিখেছিলাম। সেটি এখানে অংশত উদ্ধৃত করছি :

> লন্ডনের সব থেকে নোংরা বস্তির সঙ্গেও এই বাড়িগুলোর কোনো তুলনা চলে না। মানুষে-মানুষে গিজগিজ করছে, বেশির ভাগ বাড়িই উঁচু, শয়ে শয়ে ঘর। সামান্য কয়েকটি ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাসও আছে কিন্তু ভিড়ে ঠাসা। অল্প কয়েকটি অবাস একতলা, সুনির্মিত, বেশ ফাঁকা। কিন্তু চারতলা বা একতলা, যাই হোক, অধিকাংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন, গাদাগাদি ভিড়, অসহ্য নোংরা। কতগুলো বস্তির একটি তো একেবারে কুকুর-বিড়ালের বাসস্থান— বাতিল কেরোসিনের টিন পেরেক দিয়ে জুড়ে-জুড়ে তৈরি সেই বস্তিঘরে কোনো জানলা নেই, ঘরটা একেবারে মাটির ওপর— বৃষ্টি পড়লে জলে থৈ থৈ করে, বিষাক্ত ভাঁপ্ বেরোয়। এরকম পরিবেশেই বাস করে

চলেছে সামাজিক প্রথায় অবনমিত আমাদের কিছু নিজস্ব মানুষ— মানবেতর অবমাননাকর শ্রমে নিযুক্ত তারা। তাদের সমস্ত আনন্দ বেদনার মঞ্চ ওই খাঁচাগুলোই। একটিতে আমি ঢুকলাম : পরিবারের সবাই তখন ঘন অন্ধকারে শুয়ে-বসে রয়েছে : কুটিরটি তখন বোম্বের আর্দ্র উত্তাপে ভারি। শ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছিল, দ্রুত বেরিয়ে এলাম বাইরের স্বাভাবিক সূর্যালোকে। এখানে জন্মসূত্রে শিশুরা পৃথিবীতে আসে প্রাথমিক আনন্দে; তারপর জ্বর ও আন্ত্রিক সয়ে যেতে হয় যতদিন না মৃত্যু এসে তাদের বিমুক্ত করে দেয়— এই ভাই-বোনেরা আমাদেরই, কিন্তু সমাজ তাদের জীবনটাকে বাধ্য করেছে মানুষের মলমূত্র বহনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে।

আমরা প্রধান সিউইজ স্টেশনে গেলাম; মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু চারিদিকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ! অদ্ভুত দমবন্ধ দুর্গন্ধ। এক দুর্গন্ধে অন্য এক দুর্গন্ধ মিলে গিয়ে তৈরি হয়ে চলেছে তৃতীয় এক ভয়ংকর দুর্গন্ধের নরক। তা যেন আসছে মুর্হুমুহু— অসংখ্য বৈচিত্রে সেই দুর্গন্ধময় বাতাস ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের সামনে—কখনো আমাদের উত্তেজিত করে তুলছে, কখনো ম্রিয়মান করছে; কোনোদিন ভুলতে পারব না সেই দুর্গন্ধের আবহটি। সেখানকার মেথরদের কতকগুলো বাসস্থান ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কচি শিশুরা আছে, সেই শিশুদের কুটুম্বিতা নীল আকাশের সঙ্গে—• 'মোহন এক শুদ্ধতার' সঙ্গে। নিচে খোলা নর্দমা ধরে মন্থরগতিতে বয়ে চলেছে নোংরা পাঁকধারা।

বোম্বে থেকে ঠাক্কার বাপা আর আমি চলে গেলাম জালহোড়-এ। সেখানে গিয়ে এক জমিদার বাড়িতে উঠলাম। সাফাইদারদের একটা দল ঠাক্কার বাপার সঙ্গে সেখানে সাক্ষাতের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। তাদের কিন্তু বাড়ির সীমানায় ঢুকতে দেওয়া হল না, এমনকি উঠোনেও নয়। রাস্তায় বেরিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হল আমাদের।

ওখান থেকে আমরা দোহাদ-এ গেলাম। ভিলদের মধ্যে কাজের তাঁর মূলকেন্দ্র ছিল এই দোহাদ-এ। এখানে আমি সম্মানিত হলাম একটি রাস্তা উদ্বোধন ও নামকরণের মতো বিরল অভিজ্ঞতায়; রাস্তাটির নাম হল 'ঠাক্কার স্ট্রিট'।

তারপর যমনালালজির পরামর্শমতো আমি চলে গেলাম বেতুল-এ। সাতপুরা মালভূমির ওপর মনোরম একটি আধাশহর। ওই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আমাদের কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব কিনা, সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানকার বড় ব্যবসায়ী ও ভূস্বামী দীপচাঁদ গোথি-কে লেখা একটি পরিচয়পত্র আমার সঙ্গে ছিল। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই রাজসিক আপ্যায়ন করলেন দীপচাঁদ গোথি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে-গ্রামে যতটা সম্ভব ঘুরলেন তিনি। যথেষ্ট ধনী মানুষ, কিন্তু তাঁর কোনো মোটরগাড়ি ছিল না।

তিনি বলেছিলেন, 'গাড়ি হয়তো একটা কেনা যায়, কিন্তু অফিসাররা যে সেটা

হরদম নিয়ে নেবেন। সেটা বড্ড খারাপ লাগবে— তার চেয়ে বরং হেঁটে চলাই ভাল।'

তাই ট্রেনে চড়ে আমরা তাপতি নদী পর্যন্ত চলে যাই। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম। বেশ কয়েকটি গোণ্ড-গ্রাম দেখা হল। তারপর গরুর গাড়ি চেপে এক দীর্ঘ যাত্রা। পথটা করকু জেলার মধ্যে দিয়ে। বেতুলকে আমার খুবই পছন্দ হল। গোণ্ড ও করকুদের দেখে আমি খুব উদ্দীপিতও হই। তবু পুলিস যেভাবে আমার পিছনে লেগে পড়েছে—ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে সর্বত্র, তাতে গ্রামজীবনে বসবাসও কি অতিষ্ঠের হতে পারে তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা আমার ছিল। তখন আমি মাদ্রাজি ফ্যাশনে লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরতাম, তার ওপর থাকত ঝুলশার্ট। শার্টটা বাইরে ঝুলত। দুটোই অবশ্য খাদির। কিছুকাল আমি গান্ধীটুপিও পরেছি। তবে সেটা পরলে আমাকে কেমন দুষ্কৃতী-দুষ্কৃতী দেখাত— এমনকি বন্ধুবান্ধবদের চোখেও, তাই ওটা বাতিল না করে পারলাম না। সুতরাং এরকম আজব পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিত এক ইংরেজের প্রতি পুলিসের চোখ আকৃষ্ট হওয়াটা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া বেতুল ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছিল সরকার আর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত কয়েকটি লড়াইয়ের ক্ষেত্রভূমি।

বেতুল থেকে আমি চলে যাই হিন্দাওয়াড়া। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সেখানে আমার জন্যে একটা গাড়ি ছিল। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পাঁচমারহি রাস্তার ওপর তামিয়া নামে দারুণ এক গ্রামে। এখানে বাসস্থান স্থাপনের কথা ভাবনায় স্থান পেল না। কাছাকাছি মিশনারিরা রয়েছে, সরকারি চিকিৎসালয় রয়েছে, এমনকি একটি ডাকবাংলোও আছে। স্থানটি নিঃসন্দেহে মনোরম, তবু ওখানে আস্তানা গড়ার চিন্তা আমাকে খারিজ করতেই হল।

ওয়ার্ধায় ফিরে এসে নিজেকে খুবই ক্লান্ত অবসন্ন মনে হল। শামরাও ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো গ্রামে চলে যাওয়া বা আস্তানা স্থাপন সম্ভব নয়। যদিও-বা জমি পেতাম বা অন্যান্য ব্যবস্থাও যথাসময়ে হত তবু তিনি তো আর খ্রিস্টমাসের আগে ফিরছেন না। তাই চলে গেলাম মিরাটে আচার্য কৃপালনির সঙ্গে কদিন থাকার জন্যে। বিতর্কিত রাজনীতিবিদ হিসাবে পরবর্তীকালে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি।

সেখানে কয়েকদিন খাদিশিল্পের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করি। তারপর কৃপালনিজির সঙ্গে যুক্তপ্রদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। তাঁর মতো ভাল সঙ্গী পাওয়া সত্যিই ভার। আমরা বড় বড় জায়গাগুলো ঘুরলাম; অনেকগুলো ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়ও গেলাম— মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, অযোধ্যা। খাদির বিকাশ সাধনই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য : কেন খাদি পরিধান করা উচিত তার সপক্ষে নানা যুক্তি আমরা তুলে ধরতাম। খাদি ব্যবহার করা কর্তব্য কারণ খাদি হচ্ছে স্বাধীনতার প্রতীক; এখই পোশাকে ধনী ও গরিবের মধ্যে সাম্য ঘটবে; পুঁজিপতির পরিবর্তে টাকাটা যাবে

চাষীর হাতে। আর সবসময়েই আমরা গান্ধীবাদের উল্লেখ করতাম। সাধারণত আমরা গান্ধী-দর্শনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটির পরিচয় রাখতাম ভাষণে; বিশেষ করে বলতাম তাঁর আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ও অহিংস চেতনার কথা— গণবিক্ষোভের ক্ষেত্রে গান্ধীজি-প্রবর্তিত শান্তিপুর্ণ পদ্ধতির কথা।

আর এই যুক্তপ্রদেশ পরিভ্রমণকালেই আমি ভারতবর্ষের নগ্ন দারিদ্রের বাস্তব রূপ দেখতে পাই। যুক্তপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশের গ্রামগুলো গুজরাট বা মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলোর তুলনায় নিঃস্বতর। কৃপালনিজি বলেছিলেন, 'এসব জায়গায় কেউ আসার কথা ভাবতেই পারে না। আমার পক্ষেও সহ্যের বাইরে।' তাঁর কথা একদম সঠিক ছিল। আমি তখন লিখি :

> এই বিধ্বস্ত থুবড়ে-পড়া গ্রামগুলোর দিকে তাকালে বুকটা ভেঙে যায়। আবর্জনার স্তূপ, নোংরা ডোবা, নিস্পন্দ জীবন, পরনে লজ্জা নিবারণের সামান্য বস্ত্রখণ্ড— এই আদিবাসী মানুষের জঠরে জ্বলছে ক্ষুধার আগুন, চোখে ভাসছে চরম হতাশা। মিরাটের নিকটবর্তী একটি গ্রামের একজন লোক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। সারাটা দিন তাকে শুয়ে থাকতে হয় একটা এবড়োখেবড়ো বিছানার ওপর। দেখাশোনার কেউ নেই। খাজনা দেবার সময় এলে দুশ্চিন্তা বাড়ে : লোকটাকে কি করে খাওয়াবে। বাড়ির লোক একদিন তাকে সযত্নে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। তখন আমি সেই গরিব বেচারিকে দেখি; তার সারা গায়ে শয্যাক্ষত হয়ে গেছে। তার আপনজনরা তাকে খুবই ভালবাসে, অথচ ডাক্তারবাবুকে তারা মিনতি জানচ্ছে : "আমরা ওকে খেতে দিতে পারছি না। ওকে দেখার মতো কেউ নেই। ওকে পরলোকে পাঠাবার মতো কোনো দাওয়াই কি দেওয়া যায় না ডাক্তারসাব?"

ভ্রমণটা ছিল আশ্চর্যরকমের ঘটনাবিহীন, ম্যাড়মেড়ে। শুধু বার কয়েক নানা উপলক্ষে পুলিস আমাদের খোঁজখবর নিয়েছে। কানপুরে পুলিস আদেশ জারি করল, কোনোরকম জনসভা ওখানে করা চলবে না।

ফিরতিপথে— বোম্বেমুখী যাত্রায় আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল ছিল জব্বলপুর। গোলটেবিল বৈঠক সেরে গান্ধীজি সদলবলে বোম্বে আসছেন— সঙ্গে ফিরছেন শামরাও। জব্বলপুরেও আমি আমার ভাষণে যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য সভায় যে-কথা বলেছি তাই আবার বললাম। জনসাধারণের কাছে আবেদন রেখেছিলাম অহিংস থাকতে— তাদের শত্রুকেও ভালবাসতে— দুর্বার সাহসে ভর করে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই চালাবার সময়েও অন্তরস্থ শান্তিময় আত্মাকে অবিঘ্নিত রাখতে। স্থানীয় গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মীরা হয়তো ইংরেজি ভাষাটার সঙ্গে তেমন সুপরিচিত ছিল না; তারা তাদের রিপোর্টে লিখল : আমি হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা বলেছি— সদ্য ফাঁসিদণ্ডে

মৃত সন্ত্রাসবাদী ভগৎ সিং-এর প্রশস্তি করেছি। বস্তুত আমি ভাগবদগীতার কিছু অংশ উল্লেখ করেছিলাম আমার ভাষণে; আমি নিঃসংশয়, রিপোর্ট-লেখক পুলিসকর্মীটি দুটো নামের মধ্যে গোল বাঁধিয়ে ফেলেছিল।

ফলে যা ঘটল তা সারা ভারত জুড়ে যা ঘটে চলছিল তারই মতো। রিপোর্টটি কমিশনারের কাছে গেল; এবং সেটি পড়ামাত্রই আমাকে ভারত থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে দিলেন।

জব্বলপুর থেকে কৃপালনিজি আর আমি ফিরছিলাম বোম্বে; কৃপালনিজির কাছে বড় ঘটনা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন; আর আমার কাছে শামরাও-এর প্রত্যাবর্তনটা ছিল আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নৌকায় ওঠার একটা পাস জোগাড় করতে পেরেছিলাম; সেদিনের সকালের দৃশ্যটা ছিল দেখার মতো। গান্ধীজিকে অভ্যর্থনা জানাতে গোটা শহরটাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ডকের প্রবেশমুখের রাস্তাটার দুপাশে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন গৈরিক পোশাক-পরিহিতা দেশ-সেবিকরা।

দেখে মনে হল শামরাও ভালই আছেন; তাকে এবং আমার পুরনো বন্ধু বার্নাড অ্যালুইয়ারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তৃপ্তি পেলাম। রাজনীতির জগতে গুরুত্বহীন কোনো ইউরোপীয় লোক ঠেলেঠুলে গান্ধীজির কাছে যায়— এটা কোনোদিনই আমার ভাল কাজ মনে হয়নি। তবু আমাদের ডাক পড়ল তাঁর আস্তানায় যাবার জন্যে। অত্যুৎসাহী সুইস দম্পতি প্রিভাতদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে সেখানে রাত কাটাই। গান্ধীজির সঙ্গে দম্পতিটি ভারতবর্ষে এসেছেন।

পরদিন শামরাও আর আমি চলে গেলাম মাথেরানে— নিভৃতে বসে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা বলতে। কিন্তু তিনদিনের মাথায় মহাদেব দেশাইয়ের কাছ থেকে এক তারবার্তা এল : সত্বর চলে আসুন। মিনিট দশেকের মধ্যেই দুটি ঘোড়া নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম; পাহাড় ডিঙিয়েই একটা রেলস্টেশন; প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বোম্বেগামী গাড়িও পেয়ে গেলাম।

ছয়

মণি ভবন নামক একটা বাড়িতে গান্ধীজি তখন অবস্থান করছেন; আমাদেরও বললেন তাঁর সঙ্গে থাকতে। শহর জুড়ে তখন প্রবল উত্তেজনা। ভাইসরয় শেষাবধি কংগ্রেসের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন; ইতিমধ্যেই নেহরুজি জেলে, জাতীয় স্তরের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় রয়েছেন।

কিন্তু মণি ভবনের ছাদে উঠে গিয়ে আমরা দেখি, বাইরে জনতার ভিড় আর গণউত্তেজনার বিপরীতে আশ্চর্যরকম পূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করছে ভিতরে। ছাদটা দারুণ; নিচু করে তাঁবু খাটানো হয়েছে, পাম ও অন্যান্য গাছ দিয়ে সাজানো: অন্তত

শ'তিনকে লোকের সমাবেশ হতে পারে সেখানে। হিমেল আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। নীরবে বাপু চড়কায় সুতো কাটছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর সাপ্তাহিক মৌনতা শুরু হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে আমি একতরফা কথা বলে চললাম— তিনি তাঁর প্রশ্ন ও উত্তরগুলো লিখছিলেন ছেঁড়া বাতিল কাগজের টুকরোয়। সেইসব অমূল্য কাগজের টুকরো আজো আমার কাছে সঞ্চিত রয়েছে। প্রথমেই আমি জিজ্ঞেস করি, আমার কি কোনো করার মতো কাজ আছে?

তিনি লিখলেন :

> তোমাকে তো ডেকে পাঠিয়েছি সেজন্যেই। আমার ভাবনাচিন্তার সব কথাই মহাদেবকে জানিয়েছি। ও এলে তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবে। তবে সংক্ষেপে আমি লিখে দিচ্ছি, তোমাকে কী করতে হবে।
>
> — আপনার শরীর কেমন আছে?
>
> মহাদেব এক্ষুনি এসে যাবে। সে না এলে দাঁড়াও, হাতের কাজটা শেষ করে তোমাকে লিখছি আমি কী বলতে চাই।
>
> — আপনি কি এখানেই শোবেন? বিছানাপত্রের ব্যবস্থা হয়েছে?

তারপর শামরাও আর আমি সরে গেলাম ছোট তাঁবুটায়। বাপু শুয়ে পড়লেন, আমাদের থেকে গজ তিনেক দূরে। আর ছাদের ত্রিপলের তলায় আরো জনা ত্রিশেক মানুষ শুয়ে পড়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী আর মীরবেন্ রাতের খাবার হিসেবে আমাদের খাওয়ালেন সুস্বাদু খেজুর, বাদাম আর নানারকমের ফল। আমি কিন্তু ঘুমুতে পারলাম না। সেই সময়ে আমি লিখে রেখেছিলাম : "মন বলছে আমাকে নজর রাখতে হবে। আর আমি ঘন্টার পর ঘন্টা জেগে বসে রইলাম সেই উদিত দীপ্তিমান তারকারাজির নিচে; মাথার ওপর সারি-সারি নক্ষত্র আর আমার পাশে ঘুমিয়ে আছেন বাপু— পরমপিতার হাত আঁকড়ে-ধরা একটি শিশুর মতো। মনে পড়ছিল খ্রিস্টের কথা; যিশু খ্রিস্ট জেরুজালেম যাচ্ছেন, তাঁর চোখে সংকল্পের দ্যুতি আর শৌর্যের জ্যোতি : শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে খ্রিস্টের আত্মা যেন একটি শুভ্র তরবারির মতো যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠেছে। আর এই ঘুমন্ত মানুষটি— আমাদের সবার প্রিয় এই মানুষটির মধ্যেও বুঝি রয়েছে নির্ভীক, একনিষ্ঠ, পবিত্রহৃদয়, প্রেমাত্মার প্রতিরূপ, অপরাজেয় সত্তা।"

শেষে বার্নাড ও শামরাওয়ের মাঝখানে আমিও ঝটিতি বিছানার বন্দোবস্ত করে শুয়ে পড়লাম; ঠিক বাপুর পাশে; এবং মুহূর্তে গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম। হঠাৎ স্বপ্নের মতো কানে এল ফিসফিসানি, একটা তৎপরতা : 'পুলিস এসেছে।'

সবাই উঠে পড়লাম। সেদিনের ঘটনাবলির দৃশ্য কোনোদিন ভুলতে পারব না। বাপুর পায়ের কাছে সুসজ্জিত ইউনিফর্ম পরিহিত এক পুলিস কমিশনার। বাপু তখন

সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন, কিছুটা যেন বিহ্বল— তাঁকে আরো বেশি বৃদ্ধ দুর্বল দেখাচ্ছে, ঘুমের আবছায়ায় কিছুটা নিরানন্দও।

—মিঃ গান্ধী, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি। এটা আমার ডিউটি।

মুহূর্তে গান্ধীজির মুখে অভ্যর্থনার অপূর্ব স্মিতহাসি খেলে গেল। তখনই ফের তাঁকে বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী এক তরুণের মতো দেখাল। ইশারায় জানালেন যে তিনি মৌনতা অবলম্বন করে আছেন।

কমিশনার হাসলেন এবং সৌজন্যসহকারে জানালেন,'আমার ইচ্ছে আধ-ঘন্টার মধ্যে আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন।'

তখন তিনটে পাঁচ। বাপু ঘড়ি দেখলেন। পুলিস কমিশনার বলে উঠলেন 'আঃ সেই বিখ্যাত ঘড়ি!' দুজনারই প্রাণখোলা হাসি। বাপু একটা পেন্সিলে লিখলেন, 'আপনার সঙ্গে বেরুতে আধ-ঘন্টার মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি।

কমিশনার বাপুর কাঁধে এমন আদরে হাত রাখলেন যে আমি ভাবলাম, এটা বুঝি আন্তরিক আলিঙ্গন। পরে জেনেছিলাম ওটা গ্রেপ্তারের একটা রীতিমাত্র। বাপু দাঁত মাজলেন, বাথরুমে গেলেন— দরজায় পুলিস পাহারা রইল। ছাদে আমরা সবাই গোল হয়ে বসে আছি। বাইরের রাস্তার দিকে তাকালাম— নিশ্চয়ই কেউ সারারাত ওখান থেকে নজর রেখেছিল। এখন সেখানে কিছু মানুষের জটলা, অথচ শান্ত সুশৃঙ্খল। তেমন কোনো পুলিসি পূর্বপ্রস্তুতিও নেই।

প্রস্তুত হয়ে বাপু আমাদের মধ্যে এসে বসলেন প্রার্থনায়। সকলে মিলে আমরা প্রকৃত বৈষ্ণব ভজন গাইলাম। তারপর পেন্সিল নিয়ে বাপু কয়েকটি বাণী লিখলেন, অনুগামীদের কিছু নির্দেশ দিলেন এবং বল্লভভাইজিকে একটা চিঠিও লিখলেন। চিঠিটা ছিল এরকম :

> 'ভগবানের অসীম করুণায়' (প্রতিবার গ্রেপ্তারের সময়েই এই বাক্যাংশটি তিনি লিখতেন)।
>
> জনগণকে বুঝিয়ে বলবেন, তারা যেন কখনোই সত্য ও অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। পিছিয়ে আসার জন্যে নয়, স্বরাজলাভের জন্যেই আত্মত্যাগ করতে হবে তাদের।'

তারপরই একটি চিরকুট লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন :

> প্রিয় এল্যুইন,
>
> তুমি আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার ইচ্ছে তুমি নিজেই তোমার স্বদেশবাসীকে বুঝিয়ে বলো, আমি আমার দেশকে ভালবাসলেও তোমার স্বদেশবাসীকেও কম ভালবাসি না। ঘৃণা বা অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে আমি কিছু করিনি। ভগবানের ইচ্ছায় আগামীতেও করব না। তাদের

প্রতি আজো এমন কোনো বিষম আচরণ করছি না যা একই পরিস্থিতিতে আমি আমার আপনজনদের প্রতি করতাম না।

ভালবাসাসহ
তোমারই
এম. কে. গান্ধী

তারপর বিদায় নিতে গান্ধীজি উঠে দাঁড়ালেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য : দরজায় প্রহরারত পুলিস, দেবদাস ও মীরাবেন মালপত্র নিয়ে ছুটোছুটি করছেন, সবই ইত্যাবসারে গোছানো হয়ে গেছে; বাপুকে ঘিরে আছেন তাঁর বন্ধুজন, তাঁদের কেউ কাঁদছেনও। শ্রীমতী গান্ধীর গাল বেয়ে অশ্রুধারা বইছে, তিনি বলে চলেছেন : 'আমাকে কি ওঁর সঙ্গে নিতে পার না?' একে-একে সকলে বাপুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। আমি 'গুড বাই' জানাতেই তিনি সহাস্যে আমার কানটা ধরলেন। তখন তিনি খুবই প্রাণবন্ত; মনে হচ্ছিল জেলে নয়, উনি যেন চলেছেন কোনো উৎসবানুষ্ঠানে।

গান্ধীজি তারপর নিচে নামলেন, সারিবদ্ধভাবে সকলে তার পিছনে পিছনে। শামরাও ও আমি ছাদ থেকে তাকিয়ে দেখছি। বাপুর ছোটখাটো শরীরটা গাড়িতে ঢুকে গেল— ঘিরে-থাকা ভিড়টা উচ্ছল হয়ে ভেঙে পড়ল চারিদিকে। কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা না করেই সামান্য কয়েকজন পুলিস যে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিল এটাও সম্ভবত ভারতের অহিংসা নীতিরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরপরেই খবর আসে, কংগ্রেস সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও গ্রেপ্তার হয়েছেন। অন্যদিকে ভারতের আত্মশক্তির প্রতিভূকে নিয়ে পুলিসের গাড়িটা অন্ধকার রাস্তায় মিলিয়ে যেতেই জনতার জটলাটাও ভেঙে গেল।

সাত

গ্রেপ্তারকালে মহাদেব দেশাইয়ের কাছে যেসব নির্দেশ ঝটিতি বাপু লিখে রেখে গিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা ছিল আমার প্রতি; আমাকে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে যাওয়ার জন্যে। ওই প্রদেশে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে তা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখার উদ্দেশ্যে। ওখানে 'লাল-কুর্তা' (রেড শার্ট) আন্দোলন দমনের যে নৃশংস খবর কিছুটা পরিশ্রুত হয়ে বোম্বেতে পৌঁছাচ্ছিল তাও ছিল উদ্বেগজনক। ফলে পাঠান জাতির ভাগ্য নিয়ে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। একেবারে অভাবনীয়ভাবে এই পাঠানরা গান্ধীজির অহিংসার নীতি গ্রহণ করেছিল। আমিই ছিলাম নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারে প্রবেশে সমর্থ প্রথম বহিরাগত সাংবাদিক। পরবর্তীকালে এই নিয়ে অনেক প্রশস্তি শুনেছি; বিপরীতে ইন্ডিয়া অফিস হয়ে উঠেছে আমার প্রতি আরো বিরক্ত।

এসব অনেক আগের কথা। পাঠককে তাই বাস্তব প্রেক্ষিতটি সম্বন্ধে সামান্য

পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি। উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটা মূলত খান আবদুল গফ্‌ফর খানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নায়কোচিত এই অসাধারণ মানুষটিকে ঘিরেই পাঠান জাতির স্বপ্ন ও কল্পনা বিস্তার পেয়েছিল। গান্ধীজির নামের সঙ্গে উপর্যুপরি তাঁর নাম উচ্চারিত হত। তবে গফ্‌ফর খানের বক্তৃতা ছিল আরো বেশি তেজোদৃপ্ত, উদ্দীপক; কিন্তু গান্ধীজির মতো শত্রুর মন জয়ের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক; তবে কিছুটা স্বেচ্ছাচারী, সম্পূর্ণত একজন নেতা। অথচ বাস্তবে তিনি ছিলেন প্রকৃত একজন সুভদ্র ব্যক্তি; গ্রামীণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক মমতা। অহিংসার মূল বাণীটি তাঁর চোখেমুখে দীপ্ত ছিল। পরে, কয়েকবছর আগে, তাঁকে দেখে অপর এক হাইল্যান্ডার-এর সূত্রে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থের কয়েকটি পংক্তি :

বর্বর আদিম জাতিগরিমা, প্রতিহিংসা কিংবা
রক্তঘাতী কূটকৌশল, সবই মৃত তাহাতে;
নেই কোনো বিচলন; শুধু ঊর্ধে তুলে ধরে
বিরোধের গর্ভজাত সুকল্যাণ বিজ্ঞতা।

১৯৩০-এর শুরুতে খান আবদুল গফ্‌ফর খান একটি সংগঠন গড়ে তোলেন; সেই সংগঠনের মুখ্য লক্ষ্যই ছিল অহিংস এক সেনানী বাহিনী গঠন। তার নাম 'খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার' (আল্লার সেবক)। প্রথমদিকে তাদের কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। তারপর একদিন এক স্বেচ্ছা-সেনানী এল ইঁটে-ভেজা লালরঙা জামা পরে; তার ওই পোশাকটা দেখতে দারুণ লাগল সবার। আর ব্যাপারটা সহজও, তাই সেদিন থেকেই সেটা হয়ে গেল খুদাই খিদ্‌মদ্‌গারদের ইউনিফর্ম। রেড-শার্টের মতো এক আতঙ্কজনক নামের এই হচ্ছে উৎস-ঘটনা। আর লাল-কুর্তার মধ্যে 'লাল' বলতে যা ইঙ্গিত করে তার কিছুই ছিল না— তাদের সঙ্গে না ছিল মস্কোর কোনো যোগাযোগ, না ছিল হিংসাত্মক কোনো ব্যাপার-স্যাপার। পরে অবশ্য সুদিনে তারা গঠন করেছিল ফ্রন্টিয়ার স্কাউট বাহিনী। এই স্কাউট আন্দোলনটি ছিল সুসংগঠিত। জেনারেল-কর্নেল-ক্যাপটেন-এর মতো পদবিন্যাস ছিল। এমনকি তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগও ছিল। সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশটিকে কয়েকটি 'জেলা'য় ভাগ করা হয়েছিল। সেখানে প্রচলিত ছিল প্রশাসনিক ও সামরিক দুই শাসনব্যবস্থাই। প্রতিটি জেলার ছিল প্রেসিডেন্ট ও কমিটিসহ স্বতন্ত্র 'জিরগা' ('পশতু-জিরগা' নামে সবিশেষ পরিচিত—অনুবাদক) বা স্থানীয় ব্লক; আবার তারই পাশাপাশি কর্নেল বা মেজরের অধীনে একটি খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনী।

গান্ধীজির পরামর্শ ব্যতীত কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই খান আবদুল গফ্‌ফর খান নিতেন না। এটাই ছিল কর্মনীতি। ফলে এই সময়েই গান্ধীজির অহিংসার বাণীকে স্বীয়

প্রদেশে প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি সাফল্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছিলেন। বাস্তবিকই এটা ছিল অতি কঠিন ও বিরাট ব্যাপার। পাঠানজাতি প্রকৃতিগতভাবেই উগ্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাদের হাতে অস্ত্র থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে শত শত বছর ধরে তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে এসেছে খুনের-বদলা-খুনের নীতিতে। মার খাওয়ার মতো, বিশেষত মহিলাদের সামনে মুখ বুজে পিটুনি খাওয়ার মতো, অসম্মান আর কিছু নেই। সেই অপমান বেইজ্জত প্রতিশোধহীনতায় সহ্য করা, সত্যাগ্রহের মতো বিস্ময়কর শুদ্ধ অস্ত্র নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মতো অভিনব আদর্শ ফ্রন্টিয়ারে প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন খান আবদুল গফ্ফর খান। তিনি বলতেন, 'তোমরা দুঃখী মানুষের সেনানী, প্রতিশোধ নেবার জন্যে নও। সহনশীলতার মধ্যে দিয়েই তোমাদের বিজয় আসবে।' আর অন্যদিকে যেসব আফ্রিদি জিনিসপত্র বেচতে পেশোয়ার বাজারে আসত তারা চোখের সামনে সবিস্ময়ে দেখত, সত্যাগ্রহী পাঠানরা হরদম মার খাচ্ছে কিন্তু প্রতিশোধ নিচ্ছে না। বিস্ময় আর ক্রোধ নিয়ে তারা ফিরে যেত নিজেদের পাহাড়-দুর্গে।

এদিকে সরকারও সঙ্গে সঙ্গে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ততদিনে লালকুর্তার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে কয়েক লক্ষে পৌঁছে গেছে (এক বছরের মধ্যে আশি হাজার থেকে তিন লক্ষে— অনুবাদক)। তাদের সংগঠনও দারুণ তৎপর— সরকারকে পঙ্গু করে দেবার মতো শক্তি ততদিনে তারা অর্জন করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা একটি সমান্তরাল সরকারই চালাচ্ছিল; খান আবদুল গফ্ফর খানের মর্যাদা তখন তুঙ্গে। বছরের শেষদিকে সরকার তাই এক অত্যাদেশ এই প্রদেশে জারি করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল— রেড-শার্টের সমস্ত পদাধিকারী গ্রেপ্তার হলেন; স্বয়ং আবদুল গফফর খানও গ্রেপ্তার হলেন খ্রিস্টমাসের দিন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে প্রতিটি রেড-শার্টের অফিসার— কর্নেল থেকে সুবাদার এবং প্রতিটি 'জিরগা'র প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি জেলে গেলেন।

মহাদেব দেশাই চাইছিলেন আমরা (তাঁকে বলে-কয়ে শামরাওকেও সঙ্গে নিয়ে নিই) অবিলম্বে পেশোয়ার রওনা হই। অথচ আমাদের সঙ্গে ভাড়া বা পথখরচায় কোনো টাকা নেই। দেবদাস গান্ধী আমাদের সঙ্গে নিয়ে বোম্বের দু-তিনজন ধনী ব্যবসায়ীর কাছে গেলেন, এবং অতিক্রুত কিছু টাকাও জোগাড় করে ফেললেন। মনে হচ্ছে সেটা শ'তিনেক টাকা হবে। আমাদের মনে হয়েছিল (অবশ্য সবসময়েই মনে হত, টাকাটা কোনো ব্যাপার নয়) এতেই চলে যাবে।

সমগ্র এই ঘটনাক্রমটির দিকে আমি সব সময়েই পরম সন্তুষ্টির সঙ্গে তাকাই। জীবনে হয়তো এই একবারই আমি কাজের মানুষ হিসেবে এবং যথেষ্ট বিপজ্জনক কাজে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিলাম। থ্রিলার বইয়ের

একাগ্র পাঠক তো ছিলাম চিরকালই; এবার আমার সুযোগ ঘটল 'লম্বাকোট আর ছোরা'র উত্তেজনাকর অভিযানে সামিল হবার। স্পষ্টই বোঝা গেল যেভাবে আছি— যে গান্ধী পোশাক-আশাক পরে রয়েছি সেভাবে গেলে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হয়ে যাব। তাই লন্ডনে তৈরি বার্নাড অ্যালুইয়ারের একটা স্যুট আমি ধার করে নিলাম। আমার পক্ষে স্যুটটা বেশ খাটো হলেও দেখে অভিজাত-অভিজাত লাগছিল। আমরা ইন্টার-ক্লাশে চাপলাম। আমার কেন যেন মনে হল, সাধারণভাবে চোখে পড়ব ঠিকই কিন্তু এর ফলে ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যে পুলিস বেষ্টনীটি অপেক্ষা করে আছে তা স্বচ্ছন্দে গলে যেতে পারব। সরকারি দপ্তরও আগেভাগে খবর পেয়ে গিয়েছিল যে আমি যাচ্ছি। তাদের ধারণা ছিল আমি প্রথম শ্রেণীতেই যাব। আর তারা সহজেই গ্রেপ্তার করে ফেলবে নিখুঁত নির্দোষ এক ইংরেজ ব্যবসায়ীকে। অত্যন্ত অসম্মানিত হবেন তিনি নিশ্চয়ই। বাস্তবিকই তেমন এক ভদ্রলোকের ছদ্মবেশেই আমরা কোনোরকমে ঢুকে পড়েছিলাম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে।

যাবার আগে কয়েক ঘন্টা দিল্লিতে কাটাই। সেখানে লাল-কেল্লার দেয়ালের আড়ালে রাতে কয়েকজন সংযোগকারী ব্যক্তির সঙ্গে গোপন উত্তেজনাকর কথাবার্তা হল। ঠিক কী কথা হয়েছিল আজ মনে নেই। তবে সোনাদানা নিয়ে যে কিছু কথা হয়েছিল সেটুকু মনে আছে। পরে লাহোর প্লাটফর্মে দেখা হল বন্ধু বুল (খুরশেদ নওরাজি)-এর সঙ্গে। বুল আমাদের সতর্ক করে দিলেন— কী কী ঘটতে পারে তা জানানো।

পেশোয়ারে নেমে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করি এক চরম বিভ্রান্তিকর পরিবেশে। এতই হুটোপুটি করে বেরিয়ে পড়া হয়েছে যে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনাই ছিল না : কোথায় গিয়ে উঠব, কিভাবে কাজ শুরু করব। দেবদাস অবশ্য শহরের এক ব্যবসায়ীর নাম বলে দিয়েছিলেন। টাঙ্গা নিয়ে সেই ব্যবসায়ীর বাড়ির দিকেই রওনা হলাম। ঘন্টাখানেক হাপিত্যেস বসে থাকতে হল সেখানে। ভদ্রলোকটি শুধু ভেবেই চলেছেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিরাপদ কিনা। পেশোয়ার পৌঁছানো আর তার পরের ঘটনাবলি শামরাও লিখেছেন এভাবে :

> 'ব্যবসায়ীটি কেতাদুরস্ত পোশাকে সেজেছে, আপাতদৃষ্টে বেশ সাহসীও দেখাচ্ছে তাকে। আমাদের আশা ছিল তার কাছ থেকে বেশ সাহায্য পাব। কিন্তু পরিচয়পত্রটি পড়েই ওর শরীর যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। "আপনারা যার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ, চোখেও দেখেন না— কাউকে চিনতেই পারেন না।" তবু আশা ছাড়লাম না আমরা— বসে বসে তার সঙ্গে গপ্লোগাছা করতে লাগলাম। আর ভেরিয়ার তো লোকের পেট থেকে কথা বার করতে খুবই পটু! ফলে এই ভীতসন্ত্রস্ত লোকটির কাছ থেকেও পেশোয়ারের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক কথা

> জেনে গেলাম। আর উনি নিজেই তো ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে বিদ্যমান সন্ত্রাসের মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। ভদ্রলোকটির মনে হল, মারাঠি পোশাকে আমাকে সন্দেহজনক দেখাচ্ছে; তাই তিনি কয়েকটি ঢোলা পাঠানি পাৎলুন দিলেন আমাকে, রাশিয়ান জুতোও। ঘন্টাখানেক বাদে উদ্দিষ্ট ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি এসে পড়লেন— বয়েস বছর পঁয়ত্রিশের মতো, সুঠাম স্বাস্থ্য; তাঁকেই এতক্ষণ তার ভাইটি বুড়ো ও অন্ধ বলে চলছিলেন। ভদ্রলোকটি কিন্তু আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন; অবশ্য তিনি সব সময়েই খুব সাবধানতা অবলম্বন করছিলেন, পাছে কোনো সরকারি আমলা যেন ভ্রূণাক্ষরে তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগের কথা জানতে না পারে।
>
> প্রথমে ভাবা হল আমরা তাঁর ওখানেই থাকব— ব্যবসায়িক কারবার উপলক্ষে যেন আমরা এসেছি। পরমুহূর্তে বোঝা গেল, না এটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে না — এই শহরে কোনো ইংরেজ সাহেব ভারতীয়দের বাড়িতে কোনোদিন থাকেনি। তাই বেরিয়ে পড়া হল; কয়েকটি পুলিস প্রহরা পেরিয়ে আমরা সরেও পড়লাম। উঠলাম গিয়ে ক্যান্টনমেন্টের সব থেকে বড় হোটেলে। সেখানে আরো বহু ইংরেজ ব্যক্তি ও অফিসারও ছিলেন।'

হোটেলটি খুবই আরামের ছিল বটে কিন্তু আমাদের বাজেটের পক্ষে ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। পরদিন আমরা চলে গেলাম একটা ডাকবাংলোয়। সেখানকার ফর্মে আমার আসল নামটাই লিখলাম— লিখলাম পুলিসের জন্যেই। জানি আমাকে চিনতে না পারার জন্যে পুলিস-মহলে রকেট এসে পড়বে, হৈ চৈ বাধবে। তবে একটা বিশ্রী ব্যাপার আমাকে করতেই হয়েছিল। শামরাওকে দেখাতে হয়েছিল আমার গরিব পরিচারক হিসেবে— তার চিকিৎসা করাচ্ছি যেন আমি। একটাই কামরা জুটেছিল, তাই শামরাওকে রাত্রিবাস করতে হল হিম বারান্দায় শুয়ে। ইংরেজ ও ভারতীয় দুটি মানুষ যে পরস্পরের আপনজন বা বন্ধু হতে পারে ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে সেটা তখন এক কষ্টকল্পনা বৈ আর কিছু ছিল না। অন্যদিকে দুজনে যদি একই কামরায় ভাগাভাগি করে থাকি তাহলেও সন্দেহ দেখা দিত। যখন বিলটা এল তখন দেখি বিভাজনটা : 'সাহেবের খাবার'-এর অর্ধেক দাম তার 'সঙ্গীর খাবার'-এর। আমরা একে অপরকে এতটাই চিনতাম যে এসব বৈষম্যের কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটেনি আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

বাধানিষেধ ও বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা কিন্তু পেশোয়ার সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য ও সংবাদ জেনে গেলাম। কাউকে কিছু বলতে রাজি করানো ছিল দুঃসাধ্য কাজ; খবর যারা দিতেন তারাও আসতেন রাতের অন্ধকারে, অলক্ষিতে— খিড়কি দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতেন তাঁরা। কখনো-কখনো অনির্দেশ্য কোনো ঘরে এসে তাঁরা দেখা করতেন।

তৃতীয় দিন পেশোয়ার সংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম ঘুরে এলাম। চতুর্থ দিন কোনোরকমে একটা গাড়ি ভাড়া করলাম; তারপর সেই গাড়ি চেপে রুখা এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের ওপর দিয়ে পৌঁছলাম কোহাট-এ। দারুণ এক অভিযান। বারবার আমাদের গাড়ি রাস্তায় দাঁড় করানো হচ্ছিল। এক জায়গায় পুলিস এসে জিজ্ঞেস করল, কোনো বন্দুক-পিস্তল আছে কিনা। আমি 'না' বলতেই ওরা বিস্মিত হল; আমাকে একটা পিস্তল পর্যন্ত সাধল তারা। নিস্পৃহভঙ্গিতে আমি একটা সিগারেট ধরালাম (তখন আমি সচরাচর ধূমপান করি না, তাই বেরিয়ে গিয়েই সেটা নিভিয়ে ফেলি)। ভঙ্গিটা হয়তো তাদের আশ্বস্ত করে থাকবে যে আমি একজন খাঁটি সাহেব।

কোহাট-এ বেশির ভাগ কাজই শামরাও করলেন। কারণ শহরের যত্রতত্র ঘুরে খবর সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

পঞ্চম দিনে আমরা গেলাম খাইবার পাস। লাণ্ডি কোটাল থেকে ঝিনতারা পায়ে হেঁটে নামতে হল। মাঝে মাঝেই শুনি রাইফেলের গুলির গর্জন— চারদিক থেকেই আসছিল সে-শব্দ। পথনির্দেশক নিরাসক্তভাবে জানাল : 'মামুলি পারিবারিক ঝগড়া হবে হয়তো।' আমরা কয়েকটি আদিবাসী গ্রামে গেলাম; আফ্রিদিদের সঙ্গে বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা হল। মনে পড়ছে পেশোয়ারমুখী ফিরতি-পথে শামরাওকে আমি বলেছিলাম, দায়িত্বপালনের কাজ তো শেষ হল, এখন একটা কাজই আমরা করতে পারি : গ্রেপ্তার বরণ করে নায়ক বনে যাওয়া! খাইবার পাস-এ যাবার আগে ডেপুটি কমিশনারকে লেখা এক চিঠিতে আমি জানিয়েছিলাম আমাদের আসার উদ্দেশ্য। এবং আরো লিখেছিলাম, একটা সাক্ষাৎকারের যদি বন্দোবস্ত করেন তাহলে সরকার পক্ষের কথাও আমাদের শোনার সুযোগ ঘটবে— রিপোর্টটিও পক্ষপাতহীন ও যথেষ্ট ভারসাম্যমূলক হবে। পেশোয়ার স্টেশন থেকে বেরুতেই আমি আমার চিঠির জবাব পেয়ে গেলাম, দুজন ইংরেজ পুলিসকর্তা আর জনাকয়েক কনস্টেবলের মাধ্যমে। তাদের কাছে ছিল বহিষ্কারের আদেশনামা :

আদেশনামা

> জরুরি ক্ষমতা অত্যাদেশ-এর ৪(১) মোতাবেক যে-অধিকার আমার ওপর অর্পিত, তার বলে এতদ্বারা রেভারেন্ড ভেরিয়ার এল্যুইনকে নির্দেশ জানানো হচ্ছে, তিনি যেন নিজেকে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার থেকে অবিলম্বে সরিয়ে নিয়ে যান এবং আর কখনো এই প্রদেশে প্রবেশ না করেন।
>
> এই আদেশ অমান্য বা ভঙ্গের পরিণতিগত শাস্তির কথা মিঃ এল্যুইনকেই ব্যাখ্যা করা হবে।
>
> ও. কে. ক্যারো
> ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, পেশোয়ার

যে পুলিস অফিসারটি ওখানে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তিনি ছিলেন মজার লোক; বারবার বলছিলেন 'আমি দারুণ দুঃখিত'। আমাদের নিয়ে পুলিসরা গেল ডাকবাংলোয়, মালপত্র সব সার্চ করা হল। কিন্তু কিছুই আপত্তিকর পেল না। গ্রেপ্তার হয়েছি, তবু সেখানেই থাকার অনুমতি জুটল। কিন্তু মিঃ ক্যারো আদেশ দিলেন, দিনের বেলার কষ্টকর গাড়িতেই আমাদের পেশোয়ার ছাড়তে হবে। সজ্জন পুলিস ইন্সপেক্টর তা সত্ত্বেও নোট পাঠালেন, পরদিন সকালের গাড়ি ধরার প্যারল দিতে তার কোনো আপত্তি নেই। মিঃ ক্যারো কিন্তু অবিচল; তিনি চান আমি তৎক্ষণাৎ ট্রেন ধরি এবং ট্রেনের ভোগান্তিটা পোহাই সারারাত ধরে। সজ্জন পুলিস অফিসারটি পরিশেষে মন্তব্য করেছিলেন, 'একেই বলে সাম্রাজ্যবাদ!'

পুলিস ভদ্রলোকটির সঙ্গে সামান্য পানাহার করে আমরা সোজা চলে গেলাম স্টেশনে। সেখানে চোখে পড়ল কয়েক ডজন কীটসদৃশ গোয়েন্দা ঘুরঘুর করছে; তাদের নজর তীক্ষ্ণ। কারণটা বোধ হয়, ফের বেয়াদবি করলে আমাকে শনাক্ত করতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়— সহজেই যাতে পাকড়াও করতে পারে। ফ্লিট স্ট্রিটে বসে নিজের 'প্রতিকৃতি আঁকতে' গিয়ে মিঃ পিকউইক-এরও একই অবস্থা হয়েছিল।

পুলিস মূলত খুঁজছিল তথ্য-প্রমাণাদি। সমস্ত কাগজপত্র নোট আমি লুকোতে পেরেছিলাম। এমন তথ্যাদিও তার মধ্যে ছিল যা ধরা পড়লে পেশোয়ারের কিছু মানুষের দুর্ভোগ-হেনস্তার অন্ত থাকত না। সবটা লুকিয়ে রেখেছিলাম একটা 'ফোর্স'-এর প্যাকেটে; অ্যালেন পো'র 'পারলয়েণ্ড লেটার'-এর মতো সেই প্যাকেটটা টেবিলের ওপর সবার চোখের সামনেই ছিল। পুলিস তদন্তকারী দল সবকিছুই তন্ন তন্ন করে দেখছিল— স্বনন লবণের মাত্রাটা পর্যন্ত। কিন্তু টেবিলের ওপর নির্দোষ করনফ্লেকের প্যাকেটটা তারা উপেক্ষা করল। বিজয়ীর মতো সেই প্যাকেটটা নিয়ে আমি বোম্বে চলে এলাম। আর তার সুবাদেই পরে রিপোর্ট লেখা ও প্রকাশের সুযোগ পাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রিপোর্টটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। পরে অবশ্য লন্ডন থেকে তা পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। তবে মাঝখানের বহু বছর আমি নিজেও একটি কপি জোগাড় করতে পারি নি। তবু কিং জর্জ তার একটা কপি পেয়েছিলেন ভেবেই আনন্দ পেয়েছি।

আট

বোম্বে ফিরে এসে আমরা অন্য এক সমস্যায় পড়লাম। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যেই শামরাও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ বিসর্জন দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছিলেন। আমার নিজেরও আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা ছিল সেদিকে। কিন্তু এখন, বিশেষত গান্ধীজি গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর এবং আমার ওপর দেশত্যাগের আদেশ জারি হয়ে যাবার পর, রাজনীতিতে সদর্থক প্রবেশের ক্ষেত্রে আমার ওপর চাপটা

বেড়ে গেছে। যেমন, কংগ্রেসে তখন ভাবছিল প্রতিটি সম্প্রদায়কে জাতীয় কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্ত করে বেশ কয়েকজন সভাপতি নিযুক্ত করা হবে। যমনালাল বাজাজ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইউরোপীয়দের প্রতিনিধিত্বের শীর্ষ পদটির প্রশ্নটি সেভাবে যখন উঠবে আমি তাতে সম্মত আছি কিনা। তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন যে কাজের তেমন গুরুভার থাকবে না— প্রেসিডেন্ট হওয়া মানেই তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে কারবাস গমন। তাঁকে আমার সম্মতির কথা জানিয়েছিলাম। পরে অনেকবার ভেবেছি, সেদিকে যদি যেতাম কী ঘটত।

কিন্তু শামরাও ও আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা, আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এলাম : রাজনীতি আমাদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র নয়। যেসব বিষয়ে ইউরোপীয়দের খুব স্বচ্ছ ধারণা নেই সেখানে তাদের শৌখিন নাক-গলানোটার কোনো মূল্য আছে কিনা তা নিয়ে চিরকালই আমার মনে সংশয় রয়েছে। আর জেলে-যাওয়া হল না বলে যতই আফশোস করিনা কেন, ব্রিটিশ সরকার কোনোদিনই সেই গৌরবার্জনের সুযোগ আমাকে দিত না— আমাকে তারা ভারতবর্ষ থেকে শুধু বিতাড়িতই করত মাত্র। সেটা কিন্তু চরম অসম্মান ছাড়া আর কিছু হত না। সুতরাং মনস্থির করে ফেললাম : আমরা আমাদের পুরনো পরিকল্পনা রূপায়ণের পথ ধরেই চলব— যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডদের দেশে চলে যাব।

বেতুল-এ যেহেতু কোনো জমির ব্যবস্থা হয়নি, আর আমার বন্ধু-বান্ধবরাও দক্ষেই তখন জেলে তাই নাগপুরের বিশপের কাছেই পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখলাম। (এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শিথিলভাবে হলেও তখন অবধি আমি ইংল্যান্ড চার্চের অনুগত।) আর ইনি হলেন বিশপ উড—সাহসী, বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক মমত্ববোধ। অন্যদিকে ঠিক তেমনি দরদ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি। তাঁর জীবনীকার তাঁর সম্বন্ধে জানিয়েছেন : 'ফরেস্ট অফিসারদের সঙ্গে তাঁর সর্বদাই সৌহার্দমূলক সম্পর্ক ছিল।' 'সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততা তিনি কতটা সম্পূর্ণত অর্জন করেছিলেন তা বোঝা যায় একটি ঘটনায় : ভারতবর্ষে আসার তৃতীয় বর্ষেই কেশর-ই- হিন্দ্‌ পদকদানে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল।' আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও তাঁর ওই সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ রেখেছিলেন।

বিশপ উড ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন, আমার পক্ষে ভাল হবে মাণ্ডলা জেলার করনজিয়া নামক একটি গোণ্ড গ্রামে কাজ করা। তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গেই জানালেন : আমার আগে যে পাঁচজন ইউরোপীয় ওই করনজিয়া গ্রামে এসেছিলেন তাঁদের চারজনই বছর না-গড়াতেই মারা গেছেন। তাঁর এই বক্তব্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মপন্থা আরো জোরদার হল। এবং ১৯৩২-এর ২৮ জানুয়ারি— তারিখটি প্রকৃতপক্ষেই আমার জীবনে এক সন্ধিক্ষণ—শামরাও হিভালে আর আমি একটি গরুর

গাড়িতে চেপে রওনা হলাম। সঙ্গে দুজনার কাছে রয়েছে মাত্র কয়েক শ' টাকা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, মাইকাল পাহাড় পেরিয়ে দুদিন ধরে গরুর গাড়ি চলছে। দুদিন বাদে আমরা করনজিয়া গ্রামে এসে পৌঁছলাম— সম্মুখে স্তূপীকৃত আমাদের মালপত্র, খাদ্য সামগ্রী— আমরা ক্লান্ত বিধ্বস্ত এবং ক্ষুধার্তও। কেউই এগিয়ে আসছে না কাছে— এক ঘটি জলও পাচ্ছি না। শামরাও বেরিয়ে পড়লেন সন্ধানে। পথের ধারে আমি প্রতীক্ষা করছি। আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে কি নিঃসঙ্গতাবোধ সেদিন আমার চেতনায় প্রবাহিত হয়েছিল। কেমন একটা ভয় দেখা দিয়েছিল : বুঝি ভুল ঘোড়ায় সর্বস্ব বাজি ধরেছি! আমার মন চলে গেল সেই অক্সফোর্ডের জীবনে— সেখানে আছেন সমসময়ের বন্ধুবান্ধব। কেউ কি এখানে আমার বন্ধু হতে পারেন? অক্সফোর্ডে সুখস্বাচ্ছন্দ্য আছে : এখানে তো তা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বোম্বাই, পুণে, সবরমতি, ওয়ার্ধাতেও আপনজন ছিলেন— তাঁদের সঙ্গে কাজও করা যায়। অচেনা এই যুক্তপ্রদেশের মাণ্ডলা জেলা— এই শীতল অভ্যর্থনা— এই প্রত্যন্ত আশ্চর্য প্রতিকূল গ্রামে সেদিন আমি চূড়ান্ত নিঃসঙ্গ বিবিক্ত বোধ করছিলাম। তাছাড়াও আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন আত্মবিনাশ করে চলেছি— নিজেকে ধ্বংস করে ফেলছি— বাতিল পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছি : এর থেকে বহিষ্কারের মুখোমুখি হওয়া বা কারাবাসে যাওয়া হত অনেক সৌভাগ্যের। হায়, কেন আমি অক্সফোর্ড আর লন্ডনের বই আর লাইব্রেরির জগৎ ছেড়ে চলে এলোম!

রাতটা আমরা কাটালাম বন বিভাগের নোংরা স্যাঁৎসেতে ডাকবাংলোতে। পরদিন বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম দেখতে। ছোট-ছোট দশটা গাঁ নিয়ে করনজিয়া। একেবারে কাছের গ্রামটির নাম চমৎকার— টিকেরা টোলা (বিচ্ছিন্ন ছোট পাহাড়কে বলা হয় 'টিকেরা'; সে থেকেই ওই নামটা; শিলংয়েও আমি টিকেরার ওপর বাস করেছি)। সেখানে এক গরিব সদালাপী মুসলমানের সঙ্গে দেখা। একটি গোণ্ড মেয়ে বিয়ে করে সে আদিবাসী জীবন কাটাচ্ছে। মাসিক তিন টাকা ভাড়ায় সে তার একটি ঘর ভাড়া দিতে রাজি হল। ঠিক ঘর নয়, একটা ছাউনি মাত্র— যেখানে সে ছাগল রাখে। লাগোয়া দেওড়িটাকে রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তো আমরা ভাড়া নিতে রাজি হয়ে যেতেই লোকটি ছাগলগুলো বার করে নিয়ে গোবর দিয়ে কুঁড়েটাকে ধোয়ামোছা করে দিল। রাশি-রাশি ইবদুঝ খড় বিছানো হল মেঝেতে। বারান্দায় একটা উনুনের জায়গাও তৈরি হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই আমরা আমাদের নতুন বাসস্থানে থাকা শুরু করলাম।

মাটির মেঝের খড়ের ওপর টানটান শুয়ে পড়তেই গত সন্ধ্যার যাবতীয় ভয়ভীতি-সংশয় মুহূর্তে উবে গেল। সেসব হারিয়ে গেল চিরকালের জন্যে। সেই অপ্রশস্ত ছাগল-ছাউনিটির ভিতরে বসে আমি টের পেলাম : আমি বাঁধা পড়ে গেছি— আর বুঝি সাধ্য নেই এই আদিম সমাজকে অস্বীকার করার; ভাল বা মন্দের প্রশ্ন নয়,

আমি যেন নতুন এক জীবনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে গেছি। তখনো সেখানে সুন্দর, উদ্দীপক বা রোমান্টিক বলে কিছু ছিল না, বরং টিকেরা টোলার গোণ্ডদের বেশ নিষ্প্রাণই (আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে কোনো নাচের অনুষ্ঠান ছিল না) মনে হল। তারা চরম দরিদ্র, নির্জীব, অপরিচ্ছন্ন আর সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু সেই যে এক ঝলক মায়াবী মাণিক্যের দ্যুতি চোখের সামনে ঝলসে উঠল, মন যেন বলে দিল : সেই মাণিকের সন্ধান আমাকে করতেই হবে— তাতে যদি গোটা জীবন কেটে যায় তো তাও সই।

অবশ্য প্রথম-প্রথম মনে হয়েছিল, সেই সন্ধানের কাজ বেশিদিন হয়তো আমাদের চালানো সম্ভব হবে না। মাণ্ডলার ডেপুটি কমিশনারকে সৌজন্যমূলক একখানা চিঠি লিখলাম। কদিনের মধ্যেই তার বিস্ময়কর উত্তরও পেয়ে গেলাম। তিনি লিখলেন :

> আপনার ২৯ জানুয়ারির পত্রের উত্তরে জানাই, কমিশনার আপনাকে জানাতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার অতীত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার প্রেক্ষিতে আপনি এই জেলায় থাকুন কর্তৃপক্ষ সেটা চায় না। ইতি
>
> একান্ত আপনার
> ডি. ভি. রেগে

চিঠিটিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিলাম না। তবে আশঙ্কা ছিল, হয়তো যে কোনো মুহূর্তে আমরা গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারি। কার্যত আমরা একটি ছেলেও নিযুক্ত করেছিলাম পুলিসের আগমনের ওপর নজরদারির জন্যে; —নিকটবর্তী একটি টিলার ওপর সে মোতায়েন থাকত। এক্ষেত্রে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, পুলিস আসার আগেই যাতে আপত্তিকর কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে পারি। অবশ্য তেমন কিছু ঘটল না। পুলিস শুধু একবার এসে তল্লাশি করেছিল। তার কদিন বাদে স্বয়ং মিঃ রেগে এসে আমাদের কুটিরের মেঝেতে বসে অনেকক্ষণ খোশ গপ্‌পো করে গেলেন। বস্তুত মিঃ রেগে ছিলেন সত্যিই খুব ভালমানুষ; ব্যক্তিগতভাবে তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট সহমর্মীও ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে কমিশনারের নির্দেশেই তাঁকে ওই চিঠিটি লিখতে হয়েছিল। পরে আরো কয়েকবার পুলিসি হানা চলে। একবার তো পুলিস এসে আমার কিছু বইপত্রও নিয়ে যায়; অবশ্য তারা আমার কোনো প্রিয় বই ছোঁয়নি।

এই ঘটনাক্রমকে আমাদের কর্মধারার প্রেক্ষিতে বিচার করে বোঝা গেল, আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যাভিমুখেই এগোচ্ছি; অর্থাৎ গ্রামবাসীদের পক্ষে সঠিক পথেই আছি। গ্রামবাসীরা বুঝল আমরা নিপাট ভালমানুষ— তাদের মতোই অনেকটা; পুলিস তাদের জ্বালাতন করে, আমাদেরও করছে। আমরা এক পক্ষেরই লোক।

করনজিয়া-বাসের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই আমি একখানা বই লিখে ফেলি।

বইটির নাম দিই ট্রুথ অ্যাবাউট ইন্ডিয়া; প্রকাশক, আমার ধারণায়, কিছুটা উন্নাসিকতাবশত নামকরণ করেন : ট্রুথ অ্যাবাউট ইন্ডিয়া— ক্যান উই গেট ইট? করনজিয়াতে কোনো আসবাবপত্র নয়, সঙ্গে ছিল আমার টাইপরাইটারটি। ক্ষুদ্র কুটিরের মেঝেতে বসে আমি গোটা বইটা টাইপ করেছিলাম।

অতঃপর একটু পিছিয়ে গিয়ে সামান্য উল্লেখ রাখা যাক, কিসব কাজ ইতিপূর্বে আমি করেছি। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বইটির কাজ মিঃ উইনসলো এবং আমি যৌথভাবে করেছিলাম সেটির নাম, *দি ড্যন অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম*; তার ভূমিকাটি লিখেছিলেন আর্চবিশপ টেম্পল। ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে, বিশেষত ব্রিটেনে এর পরিণতিটা ভালই হয়েছিল। গ্রন্থটিতে আমার অবদান ছিল দুটি দীর্ঘ অধ্যায়; প্রথমটি গান্ধী-বিশ্লেষণ, আর দ্বিতীয়টি সত্তর পৃষ্ঠা জুড়ে সত্যাগ্রহের ইতিহাস ও নীতিসমূহের রূপরেখাগত আলোচনা। আমার প্রণীত অধ্যায় দুটিকে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' তুলোধুনো করেছিল; এবং আর্চবিশপকে উদ্দেশ করে লিখেছিল : 'যে বিষয়টি সম্বন্ধে লেখক এত কম জানেন তা নিয়ে তাঁর ঘাঁটাঘাঁটি না করাই শ্রেয় ছিল।' অন্যত্র কিন্তু বইটি ভালভাবেই গৃহীত হল; এমনকি আমার বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যেও।

সবরমতিতে আমার অবস্থানকালে পরিচয় ঘটেছিল স্বভাবশিল্পী বিখ্যাত কানু দেশাইয়ের সঙ্গে। তাঁর আঁকা গান্ধীজির ছবি ও রেখাচিত্রের অ্যালবাম বইয়ের ভূমিকা লিখে দিতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। অসম্ভব পরিশ্রম করে সেটা লিখে দিই। বইটি লন্ডনের গোল্ডেন ভিস্তা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। পরে ভারত থেকেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তবে ভারতীয় প্রকাশক আমার নামের বানানটা আগাগোড়া ভুলই ছেপেছিলেন।

খ্রিস্ট অ্যান্ড সত্যাগ্রহ শীর্ষক আমার বইটি ছিল অনেকটা ক্রিশ্চিয়ানদের গাইড বই। ওই পুস্তিকাটিতে আমি বলতে চেয়েছি, একজন নিষ্ঠাবান ক্রিশ্চিয়ান হিসেবে আধুনিক কালের ফাদার ও ধর্মশিক্ষকগণের অধিকার রয়েছে যে কোনো পরদেশী বা স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করার কাজে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে দেখাতে চেয়েছি যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, অন্তত নীতিগতভাবে, চার্চের মনে রাখা আবশ্যক যে সরকারকে ঠেকানো দরকার। প্রথমত যেখানে সরকার ন্যায়সঙ্গত নয়, বলপূর্বকভাবে কর্তৃত্বকারী। 'ভারতবর্ষে আজ সকলেরই বিশ্বাস, যে-সরকার আজ সেখানে কর্তৃত্ব করে চলেছে তা বলপূর্বকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বল খাটিয়েই শাসন করে চলেছে; ফলে অনতিবিলম্বে তার উচ্ছেদ চাই। তাছাড়া যখন কোনো সরকার তার জনগণকে অন্যায় কাজে বাধ্য করে— সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটায় না— প্রজাসাধারণের জীবনকে নিঃস্বতর করে তোলে— এবং যখন সে তার নিজেরই প্রণীত আইন ধর্ম ও ন্যায়শাস্ত্রের উচ্চতর বিধিবিধানকে ভঙ্গ করে, তখন সেই সরকারকে প্রতিরোধ করতেই হয়।

উপরোক্ত কথাগুলো ছাড়াও [আমি লিখি] *ক্রিশ্চিয়ানদের অন্যতম কাজ হল বিরোধনিষ্পত্তি। 'শান্তি-সংস্থাপকগণ আশীর্বাদধন্য, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের সন্তান।'* শান্তি-সংস্থাপক হওয়ার অর্থ ব্যক্তির রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হওয়া নয়; তার অর্থ হল, একদিকে সে যেমন আপন উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হবে, অন্যদিকে তেমনি বিপরীত পক্ষের যা কিছু শুভ তা প্রকাশ করবে। আব কখনোই সে শান্তিস্থাপনের পথটা বন্ধ করে দেবে না। রোমা রোঁলা বলেছেন, 'আমি আমার সমস্ত জীবনটাই মানবজাতির মধ্যে শান্তিসংস্থাপনের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছি।' এটা এমন কোনো দুর্লভ আদর্শ নয় যা বর্তমানের রক্তপাতহীন বিবাদপর্বে যুযুধান দুই পক্ষের কাছে অর্জন অসম্ভব। ভাবতবর্ষের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে সংহতি স্থাপনের অর্থ কিন্তু লক্ষ্যার্জনের আগেই হাব মেনে নেওয়া নয়— যখন কোথাও কোনো শান্তি নেই তখন সংহতিস্থাপনের অর্থ শান্তি-শান্তি বলে চিৎকার করা নয়। সংহতিসাধন বা আপসের অর্থ এক্ষেত্রে হচ্ছে, শান্তির লক্ষ্যে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়া; আমরা শুধু এমন কাজই করব যাতে কোনো তিক্ত স্মৃতি বা কাঁটা-বেঁধা লজ্জা আগামী প্রজন্মকে পীড়িত না করে; প্রতিপক্ষের সঙ্গে আচবণও যেন এমন হয় যাতে প্রমাণিত থাকে একদা সে আমার বন্ধুই ছিল।

এক অর্থে, সব যুদ্ধই গৃহযুদ্ধ; মানুষে-মানুষে সব বিরোধই ঘরোয়া বিরোধ —শুধু একটাই জাতি, একটাই গোত্র, শুধু একটাই পরিবার; আমবা সকলেই একই ঈশ্ববেব জাতি-গোত্র-পরিবারের মানুষ।

এছাড়াও বেরিযেছিল আমার একটা পুস্তিকা, *রিলিজিয়াস অ্যান্ড কালচাবাল অ্যাসপেক্টস অফ খাদি*। সেখানে আচার্য কৃপালনিব লেখা একটি ভূমিকা ছিল। 'আশ্রম বিভিয়ু' পত্রিকায প্রকাশিত হযেছিল অনেকগুলো ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ—নিবৃত্তি-মার্গ, ভক্তিতন্ত্র, আলোক বিষয়ক ধর্মীয় অনুষঙ্গে অতীন্দ্রিয়বাদ ইত্যাদি। 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'মহাত্মা গান্ধীস্ ফিলোসফি অফ ট্রুথ', গান্ধীদর্শনে সত্য কী। প্রথমে আমি পশ্চিমি অতীন্দ্রিয়বাদীগণের মধ্যে যাঁরা মুখ্যত সত্যের নিরিখে বিচার করেছিলেন তাঁদের ওপব ইতিবৃত্তিমূলক সমীক্ষা রাখি— একেবারে প্লেটো প্লটোনিয়াস থেকে আধুনিক কাল অবধি। তার সারাৎসার এভাবে রেখেছিলাম :

চূড়ান্ত বাস্তবতার সঙ্গে সত্যের শনাক্তকরণ অত্যন্ত প্রাচীন ব্যাপার। আর সত্য সম্বন্ধীয় আলোচনায় গান্ধীজি কোনো মৌলিক কথা বলেন নি, বস্তুত তিনি অশ্রুতপূর্ব কোনোকিছুই বলেন নি। সত্য বিষয়ক তাঁর প্রীতি অধিবাস্তব, অতীন্দ্রিয় এবং নৈতিক। তার কোনো অংশই তাঁর কাছে অপ্রাকৃত বা অবাস্তব নয়। তাঁর বিশেব কর্মকাণ্ড ছিল ওই অত্যুচ্চ দার্শনিক বীক্ষাটিকে মাটির কাছে নিয়ে আসা— সাধারণ মানুষের জীবনচর্চার ক্ষেত্রে তাকে কর্মপন্থা হিসেবে

প্রবর্তন করা— তার কঠোর নৈতিক হুমকিকে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে নির্দেশ করা— কাজকর্ম ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিহিত গূঢ়েষণাকে অধিকতর নিখুঁত যথার্থতায় অনুশীলন ও যাচাই করা।

বেচারা আমাকে নিয়ে তখন লোকজনের মধ্যে কি ধন্ধ! বেশ কয়েক বছর বাদে ভারত সরকারের এক আমলা আমাকে বলেছিলেন, যুক্তপ্রদেশ সরকার তখন আমাকে নিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিল— আমি কী হয়ে উঠতে পারি তাই নিয়ে তাদের শঙ্কার শেষ নেই। আবার তাদের ব্যাপারে আমিও খুব কম বিব্রত ছিলাম না। অবশ্য জানতাম, সবই কর্মকাণ্ডের উপসর্গবিশেষ— এমনকি পুলিসের বড়কর্তাদের সান্নিধ্যও বেশ উপভোগ করেছি। কিন্তু যখন দেখা যেত আমার চিঠিপত্র পড়া হচ্ছে, ঘরদোর তল্লাশি চলছে, নিম্নপদস্থ পুলিস আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে তখন খুব খারাপ লাগত বৈকি। আসলে এদের সামান্যতম সৌজন্য বা ভদ্রতাবোধ নেই— কাজে অন্তরায় সৃষ্টিতেই ছিল তাদের অন্তহীন উৎসাহ

নয়

১৯৩২ স্থির করলাম, বর্ষার সময়ে একবার ইংল্যান্ড যাব। প্রথম উদ্দেশ্যটা ছিল ভারতের পরিস্থিতির গুরুত্ব সেখানকার মানুষের কাছে তুলে ধরা; আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা ছিল অসুস্থ মাকে একবার দেখে আসা। কিন্তু সিদ্ধান্তটি সে সুবিবেচনার কাজ হয়নি তা পরবর্তী ঘটনাক্রমই প্রমাণ করেছে। শামরাও এবং আমি সরাসরি বোম্বে চলে এলাম। যাওয়ার ব্যাপারটা বাতিলই করে দিচ্ছিলাম আর কি। আমার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আর বোম্বাই সরকার সেটা তিন সপ্তাহের বেশি মেয়াদের নবীকরণে রাজি নয়। তিন সপ্তাহ মানে তো কোনোক্রমে ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছানো (জাহাজযাত্রায়— অনুবাদক)— ফেরার কোনো সুযোগই থাকছে না। গিয়ে আর তবে কী হবে। তাই ব্যাপারটা সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রকাশ করে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ পড়ে গেল; 'বোম্বে ক্রনিকল' তার প্রভাতী সংস্করণে সংবাদটাকে প্রধান খবর হিসেবে ছেপে দিল তো বটেই, তাছাড়া আরো জানাল : আমার মতো মানুষই 'ভারতীয়দের মনে বিশ্বাস জাগাতে পেরেছে যে ব্রিটিশজাতি বলতে শুধু সাম্রাজ্যবাদী, বাণিজ্যিক শোষক আর নির্বীর্য বিশেষ-প্রতিবেদকই বোঝায় না। বাস্তবত এখনো এঁরাই আগলে আছেন ইন্দো-ব্রিটিশ সম্পর্কের জীর্ণ বন্ধনটি।'

আর সঙ্গে সঙ্গে চিফ পাসপোর্ট অফিসারের কাছ থেকে এল একেবারে বন্ধুসুলভ বিগলিত চিঠি— আমাকে দেখা করার জন্যে অনুরোধ। আমিও দেখা করতে গেলাম। অফিসারটি অনেক বুঝিয়ে বললেন, যদি তিনি পাঁচ বছর মেয়াদের পাসপোর্টও দেন তবু কিন্তু সরকার যে কোনো মুহূর্তে তা বাতিল করে দিতে পারে; বেশি সময়ের

জন্যে তিনি পাসপোর্ট মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেছিলেন পদ্ধতিগত কারণেই। তিনি আরো জানালেন, ইংল্যান্ডে পৌঁছে পূর্ণ মেয়াদের পাসপোর্ট পেতে আমার কোনো অসুবিধা হবে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না।

আজকের তুলনায় সেসময়ে আমি অনেক সরলমতি ছিলাম। নিঃসন্দেহে আমার বোঝা উচিত ছিল, বিশেষ করে কমিশনারের সেই বিতাড়ন চেষ্টার পর, যে সরকার চাইছে সংবাদমাধ্যমে হৈ চৈ না ঘটিয়ে কৌশলে আমাকে ভারত থেকে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তনের আগ্রহটা ছিল আমার সবিশেষ; তাই শামরাওকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বোম্বে বন্দর ত্যাগ করলাম। যাবার পূর্বে দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ইত্যাবসারে তিরুপাত্তির আশ্রমে শামরাও মেডিকেল ট্রেনিংটা নিয়ে নেবেন।

ইউরোপের মধ্যে দিয়ে সেবারের যাত্রাটা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ইটালি, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্সের বিভিন্ন ভারতপন্থী গ্রুপের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হল। পঁচাত্তর বছরের অত্যুৎসাহী উদারমনা সেই ইংরেজ রমণী— সেই দীপ্তিময়ী মিস টারটন-এর সঙ্গে সিয়েনা ও ফ্রোন্সের পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। বাস্তবিকই তাঁকে বলা যায় বেসরকারি ভারত-প্রচারক। সিয়েনাতে আমি রইলাম রাভিঝার এক মনোরম প্রাসাদে। সেই প্রাসাদের পরিবারবর্গও ছিলেন ভারতের বিষয়ে সমান উৎসাহী। ফ্লোরেন্সে আমার একটা দিন কাটে ভিলা স্টার নামক একটি সুসজ্জিত বাড়িতে। সেই বাড়ির নিজস্ব গির্জাটি চিত্রিত করেছিলেন গ্যিব্‌নি এবং মাই কস্‌তেতির' মতো খ্যাতনামা শিল্পী। গ্যিব্‌নি ইটালি ভাষায় গান্ধীজির ওপর একটি ছোট বই লিখছিলেন। এবং আমাকে ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে-বই আর বেরোয়নি।

আমি ভিলেনিয়ুভ-এ গেলাম মিঃ এবং মিসেস প্রিভাতের সঙ্গে : রোমা রোলাঁ'র ওখানে রইলাম। আর ফিরতিপথে তাঁর বোনের কাছে। প্যারিসে লাটিন কোয়ার্টার-এ মাদাম গুয়েস-এর কাছে যাই— 'ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া' নামে তিনি একটি সোসাইটি গড়ে তুলেছিলেন; এবং 'নুভেল দ্য লা'ইন্দে' নামক একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতেন।

লন্ডনে গিয়ে পৌঁছতেই ভিক্টোরিয়া স্টেশনে একেবারে প্রথামাফিক সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল আমাকে। একটা গোটা প্রোগ্রামই ছিল আমাকে নিয়ে। বাউ কিংস্‌লে হল-এ আমার প্রথম সভা; সভাপতিত্ব করবেন জর্জ ল্যান্‌স্‌বারি (হাউস অফ কমনস-এ তিনি তখন বিরোধী পক্ষের নেতা)। লন্ডনে এসে এই কিংসলে হলেই গান্ধীজি অবস্থান করে গেছেন। আমি বেশ জোর দিয়েই বললাম : 'বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান হচ্ছে ভারত যা চাইছে তাকে তা দিয়ে দেওয়া— তাকে স্বশাসনের অধিকার প্রত্যার্পণ করা। ব্রিটেন যদি তা না করে তাহলে নিদেনপক্ষে শুদ্ধ

হাতেই তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।' উপসংহার টেনে বলেছিলাম : 'আন্তরিকভাবে আমি দেখতে চাই, মহাত্মা গান্ধীর শৌর্যপূর্ণ আবেদনের উত্তরে আমার স্বদেশবাসীও নিজেদের উন্নীত করেছে যথেষ্ট পরিমাণ মহত্বে। বাস্তবত আমরা যদি তা করতে পারি তাহলে দেখিয়ে দিতে পারব, পাশবশক্তিই একমাত্র শক্তি নয়। আর যিশু খ্রিস্টের আদর্শ আজো প্রযোজ্য হতে পারে মহান মানবজাতির পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে।'

সি. এফ. অ্যান্ড্রুজের সভাপতিত্বে পরবর্তী এক সভায় আমি সবিস্তারে ভারতের প্রকৃত অবস্থা, পুলিসি দমনপীড়ন, রাজবন্দিদের প্রতি অমানবকি আচরণ তুলে ধরি। আবার এখানেও আমি ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গটি তুলে বললাম : 'যে দেশ স্বাধীনতা চায় তার প্রতি সুবিচার করার অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা নয়, বরং আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি মহত্তম আনুগত্য।... ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিকরা যেখানে পাশবশক্তি পরিহারে সচেষ্ট সেখানে ব্রিটেন সেই শক্তিই ভারতে প্রয়োগ করে চলেছে।' ওই বছরের শুরুতে গান্ধীজির গ্রেপ্তারের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে আমি বললাম, মহাত্মাজি এবং পুলিস কমিশনার—দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। 'কোনো সন্দেহ নেই মহাত্মাজির খালি হাতদুখানি ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। আর সেই হাতদুটি যদি ইংল্যান্ডের কব্জা থেকে তার সাম্রাজ্যের উপনিবেশটি ছিনিয়েও নেয়, তবু সেই হাতই ইংল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিতে পারে যে কোনো প্রজাজনগণের সঙ্গে আচরণের ক্ষাত্রধর্মীয় চেতনা।'

আরো অনেক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতে হল। সরকারি প্রতিনিধির সঙ্গেও অনেকগুলো সাক্ষাৎকার দিতে হল। তার একটি ছিল লর্ড আরউইনের সঙ্গে— তখন তিনি ওইরকমই একটি পদে বহাল। লর্ড চ্যান্সেলর বা লর্ড স্যাঙ্কের সঙ্গে আমার ভালই পরিচয় ছিল। ইতিপূর্বে যেসব বই উপহার পেয়েছিলাম তার মধ্যে একটি বইয়ের নাম ছিল 'দি স্পিরিট অফ ম্যান'; লর্ড স্যাঙ্কে সেই বইয়ের ওপর তাঁর পছন্দের অংশগুলো দাগিয়ে ছিলেন। স্যার হোয়ের (পরবর্তীকালে লর্ড টেম্পলউড) ছিলেন ভারত বিষয়ক স্বরাষ্ট্র সচিব। তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হলেন না। তাঁর যুক্তিতে আমার আচরণ 'হঠকারি'— তাই 'আমার মতো ব্যক্তিকে ইন্ডিয়া অফিসে 'ডাকা সমীচীন নয়।' বাস্তবিকই আমি যখন লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে যাই তিনি শুরুই করেছিলেন এভাবে : 'সহকর্মীদের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠায় আপনাকে জানাতে হচ্ছে, আপনার সম্বন্ধে ভারত বিষয়ক স্বরাষ্ট্র সচিবের ধারণা কিন্তু একেবারেই ভাল নয়। এতৎসত্ত্বেও অনুরোধ, আসুন, বন্ধুজনের মতো আলোচনা করা যাক।'

স্যার স্যামুয়েল তাঁর অসন্তোষটা একেবারে বিষয়গতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। লন্ডনে পৌঁছেই আমি পাসপোর্টের জন্যে আবেদন করি। জর্জ ল্যান্সবারিকে পাওয়া গেল অ্যাটস্টেশনের স্বাক্ষরদানে। সপ্তাহখানেক বাদেই ওই অফিস থেকে চিঠি এল :

চিফ পাসপোর্ট অফিসার রেভারেণ্ড এইচ. ভি. এইচ. এল্যুইনকে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। তাঁর পাসপোর্ট পুনর্নবীকরণের আবেদনের প্রেক্ষিতে জানাতে বাধ্য হচ্ছে যে ভারত বিষয়ক স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্দেশ মোতাবেক তাঁকে ভারতগমনের সুবিধার্থে পাসপোর্ট মঞ্জুর করা সম্ভব হচ্ছে না।

তা সত্ত্বেও মিঃ এল্যুইন যদি পাসপোর্ট পুর্ননবীকরণে আগ্রহী থাকেন তবে তা করাই যেতে পারে; তবে সেক্ষেত্রে সেই পাসপোর্টে পৃষ্ঠাঙ্কণ থাকবে, ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে।

কদ্দিন বাদেই আমি লিখেছিলাম :

'এ চিঠিটির মতো এতটা বিকারগ্রস্ত নথি জীবনে খুব বেশি পাইনি। পেয়ে কিন্তু ভালই হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের থেকে এটা অধিকতর স্পষ্ট করে তুলেছে যে রাজনৈতিকভাবে জাতিচ্যুত হলে কেমন দুরবস্থা হয়। এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বিগতপর্বের স্বৈরাচার— এই দুইয়ে মিলে হাজার হাজার মানুষকে এক পাকচক্রে ফেলে দিয়েছে। কারো সাক্ষাৎকার পাওয়া অসম্ভব; কেউই আপনার চিঠির উত্তর দেবেন না। আমি এতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নই যে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম আমার উদ্দেশ্যটা বুঝবে, কিংবা পক্ষাবলম্বন করবে। মনে হয় যেন একটা উঁচু খাড়ার সামনে হতভম্ব দাঁড়িয়ে আছি— তা ডিঙোনোর কোনো সম্ভাবনা নেই। সম্ভাব্য সকলকেই বলেছি, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই জানিয়েছেন যে কর্তৃপক্ষকে রাজি করানো বা তাদের সঙ্গে কথা বলাও দুঃসাধ্য।'

অন্যদের তুলনায় আমার দুর্ভোগ নিশ্চয়ই মাত্রাগতভাবে অনেক কম। কিন্তু এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাকে অন্তত বুঝিয়ে দিয়েছে, পাসপোর্ট না থাকলে একজনের কি দশা হয়।

আমার সুহৃদের সংখ্যাও কম ছিল না; তাঁদেরই কেউ কেউ আড়ালে থেকে ইন্ডিয়া অফিসের কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যাতে আমার ভারতগমনের পাসপোর্টের একটা বিহিত হয়। শেষমেশ তারা রাজি হল কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে। প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করে আমাকে ঘোষণা করতে হবে যে :

এক. আমি আমার কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণত সীমাবদ্ধ রাখব গোণ্ডদের মধ্যে;

দুই. আমি আইন-অমান্য বা অন্য কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করব না;

তিন. রাজনৈতিক বিক্ষোভে যাঁরা সামিল হবেন তাঁদের থেকে আমি নিজেকে যতদুর সম্ভব দূরত্বে রাখব;

চার. সরকারবিরোধী লেখালিখি থেকে বিরত থাকব; এবং

পাঁচ. এই প্রতিশ্রুতিগুলো আক্ষরিক ও মমার্থগতভাবে আমি মেনে চলব।

আবার এক নতুন সংকট। সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ মনে করলেন, এ-জাতীয় প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। পরবর্তীকালে যিনি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন সেই কৃষ্ণ মেনন এক্ষেত্রে আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। নিজ কর্তব্যকর্মের ব্যাপারে আমার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমি কাজের সূচনা করেছি, সেই কাজ আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে। সুতরাং আমি প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করলাম; এবং যে জাহাজটি প্রথমে ছাড়ছে সেটাই চেপে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলাম। পরে যখন গান্ধীজি ও যমনালালজিকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম তাঁরাও আমার সিদ্ধান্ত সঙ্গে সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। আর পিছনে ফিরে আজো মনে হয়, পদক্ষেপটি সঠিকই ছিল।

কিন্তু এর পরিণতিতে সক্রিয় রাজনীতিতে আমার আগ্রহের ক্ষেত্রে সমাপ্তি ঘটে গেল চূড়ান্তভাবে। এই সরে যাওয়ার মূলে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি, আর বেশিটাই নিঃসঙ্গতা— আমি প্রত্যেকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। বাস্তবে কিন্তু এই বিযুক্তির পরিণতিটা ভালই হয়েছিল। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজবেণ্ড মন্তব্য করেছিলেন : 'আমি অন্তত চিরকাল স্যার হোয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব একটা কারণে— এল্যুইনকে তিনিই রাজনীতি থেকে কবিতায় চলে আসতে বাধ্য করেছিলেন।'

তবে বাপুর কাছ থেকে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাইনি; তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচালি চলত— তিনি যখন জেলে তখনো। তাঁর স্বহস্তে লেখা এক বান্ডিল অমূল্য পত্রসম্পদ এখনো আমার হেফাজতে রয়েছে। ঘরে-বানানো অদ্ভুত ছোট-ছোট খাম, ছেঁড়া-বাতিল টুকরো-টুকরো কাগজে লেখা সেই চিঠি।

গান্ধীজির অন্যতম প্রধান উদ্বেগ ছিল অস্পৃশ্যতা বিলোপের জন্যে। ১৯৩৩-এ রামসে ম্যাকডোনাল্ড সরকার যখন অস্পৃশ্যদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর প্রবর্তন করল তখন গান্ধীজি ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও অসন্তুষ্ট হলেন। সদিচ্ছার কোনো অভাব গান্ধীজির মধ্যে ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁর মনে আশঙ্কা জেগেছিল যে এই বিভাজনের ফলে বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে তাদের ভ্রাতৃপ্রতিমরা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, দূরত্ব বাড়বে। তাই তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন : এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যদি তৎপরতা অব্যাহত থাকে তাহলে তার বিরোধিতা ও প্রতিবাদে তিনি আমৃত্যু অনশন করবেন। এই নাটকীয় উদ্যোগের নির্ধারিত তারিখটি ছিল বিশে সেপ্টেম্বর। আর ষোলই সেপ্টেম্বর ইরায়দা সেন্ট্রাল জেল থেকে বাপু আমাকে লিখলেন :

প্রিয় ভেরিয়ার,

আশা করি যে-পদক্ষেপটি আমি নিতে চলেছি তার তাৎপর্য বুঝতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। শুধু একটা কথা তোমাকে বলতে চাই,

যখন আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছিলাম তখনো কিন্তু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল আমার সব ইংরেজ সুহৃদগণের মুখচ্ছবি। করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায়, এ থেকে শুভর উদ্ভাসন ঘটুক।

তোমার প্রতি আমার ভালাবাসা রইল— মহাদেবে ও সর্দারের ভালাবাসাও তার সঙ্গে যোগ করে নিও।

আমরা সন্ধ্যায় (*শুক্রবারের ভজন*) প্রার্থনাগীতটি গেয়েছি।

— বাপু

সুখের ব্যাপার যে অচ্ছুৎবর্গের নেতারা এবং কংগ্রেসের মধ্যপন্থীরা উদ্যোগ নিয়ে মূল পরিকল্পনাকে সংশোধন করিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে ছ'দিন বাদে গান্ধীজিও অনশনভঙ্গ করলেন। তবে মনে হচ্ছিল তিনি যেন এতে সন্তুষ্ট হন নি। তাই নেহরুজির বাধা সত্ত্বেও বাপু সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পরবর্তী বৎসরের মে মাসে তিনি 'আত্মশুদ্ধি'র অনশন' ব্রত পালন করবেন বিশ দিন। সেই অনশনটি শুরু হয়েছিল আটই মে। তার আগের দিন গান্ধীজি জেল থেকে আমাকে লিখলেন :

প্রিয় ভেরিয়ার,

তোমার সঙ্গে কথা না বলে এই অগ্নিপরীক্ষায় আমি প্রবেশ করতে পারছি না। খুবই আনন্দের বিষয়, আমাকে প্রাণিত করার জন্যে রয়েছে অগণিত প্রকৃত বন্ধুজনের প্রার্থনা : সত্যই ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরই এই উপবাসপর্বে আমার আবশ্যকীয় খাদ্য জোগাবেন। ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বলি।

আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছো।

তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে রইল ভালবাসা

—বাপু

পরদিনই সরকার তাঁকে মুক্তি দিল; বাপু গিয়ে উঠলেন পুণেতে, তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু অনশন তাঁর চলতেই থাকে, সেই অগ্নিপরীক্ষার সপ্তাহখানেক বাদে ওখান থেকে একখানা চিঠি লিখলেন আমাকে। 'একুশটি অনবদ্য দিন'-যাপনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে, তিনি লিখলেন :

প্রিয় ভেরিয়ার,

তোমার খবরাখবর সবই অবশ্য আমি পাই। এই মুহূর্তে তোমার গতমাসের চিঠিখানা তো সামনেই রয়েছে।

হ্যাঁ, ঈশ্বর আমার প্রতি কৃপাময়। আপদে-বিপদে তিনিই আমার সহায়। ওই চমৎকার একুশটি দিনে আমাকে তিনি পরিত্যাগ করেন নি। মীরাকে

একটি চিঠি পাঠাতে একটু আগে দীর্ঘ ডিকটেশন দিতে হয়েছে— সেটার খুব দরকারও ছিল তার। তাই তোমাকে দীর্ঘ চিঠি লেখা যাচ্ছেনা। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই তুমি ছুটে আসো, সেটা আমি চাই না। 'আসো'— বলার বাসনাটা তো আছেই, কিন্তু জানি সেটা আমার ঠেকানো দরকার। তোমার কাজেরও একটা কর্মসূচি আছে, সেটা বিপর্যস্ত করা ঠিক নয়।

তোমরা সকলে ভাল আছ জেনে খুশি হলাম। যখন মাকে চিঠি লিখবে তখন তাঁকে আমার প্রীতি জানাবে— আর এলডাইথ ও তোমার ইটালীয় বোনদের জানাবে ভালবাসা। আমি বেশ ভালই আছি।

ভালবাসাসহ
বাপু

১৯৩২-এ গান্ধীজি জেলে যাবার পরেই আমি আমার এদেশের এবং বিদেশের বন্ধুদের কাছে, এমনকি স্বয়ং গান্ধীজির কাছে চিঠিতে প্রস্তাব করি যে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আমরা সকলে একটি ভজন গাইব : 'হে ত্রিদিবজ্যোতিঃ, তুমি আমাদের চালনা করো।' এই ভজনগীতটির মধ্যে দিয়ে কারাবন্দি ও অন্যত্র যেখানে যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের মধ্যে একটি আত্মিক মেলবন্ধন গড়ে উঠবে। এই ভজনগীতটিরই উল্লেখ করেছেন গান্ধীজি তাঁর প্রথম চিঠিতে। বিষয়টি সাধারণভাবে সকলেরই পছন্দ হয়, এবং বহু বছর ধরে চালু থাকে।

বাপুর লেখা আরো অনেক চিঠিপত্র আমার কাছে রয়েছে— তার বেশির ভাগই তাঁর স্বহস্তে লেখা। ১৯৩৯-এ গোন্ড আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে চড়কার উপযোগিতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে তাঁকে একখানা চিঠি লিখি। উত্তরে একটি চিঠিতে তিনি আমাকে লিখলেন, চড়কার বিষয়ে আমাদের আগ্রহ যদি আন্তরিক না হয় তাহলে চড়কাকাটার আমাদের কোনো প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন : চড়কাকাটার উদ্দেশ্যে 'বহু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে এটা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের জনগণ যদি তাতে উদ্দীপিত নাও হয় তবু আমি চড়কা কেটেই যাব— অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েই যাব। এছাড়া অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সত্যও যথার্থ স্বরূপে বৈধতা পেতে পারে না।'

কোনো একজনের কাছে বাপু আমাকে 'নরম' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই বিশেষণ ব্যবহারে বাস্তবিকই তিনি কী বোঝাতে চান জানতে চেয়ে আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখি। উত্তরে তিনি লিখলেন :

'কোন প্রসঙ্গে তোমার সম্বন্ধে 'নরম' বিশেষণ ব্যবহার করেছিলাম তা আজ আর মনে নেই। 'নরম' বলতে বোঝায় কোমল ভদ্র, প্রবণ, অদৃঢ়।

ক্ষেত্রবিশেষে এর প্রতিটি বিশেষণই তোমার প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে। কখন এবং কী বোঝাতে বিশেষণটি ব্যবহার করেছিলাম তা মনে পড়ছে না। যোগসূত্রটাই ভুলে গেলে বিব্রত হওয়ার আর কি থাকে। অনেক কিছুই তো জানা আছে, যেমন জানি, সত্যান্বেষণে কোনো আত্মত্যাগকেই তুমি বড় করে দেখো না।'

ওই বছরের শেষের দিকে বাপুর কাছে একখানা চিঠি লিখেছিলাম নিজের চূড়ান্ত হতাশা জানিয়ে। তার জন্যে তিনি আমাকে বকুনি দিয়ে লিখলেন :

'মহত্তর সেবাকর্মের জন্যেই ঈশ্বর তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। হতাশা বিমর্ষতাকে প্রশ্রয় দেবে না। বিমর্ষতা হচ্ছে বিশ্বাস-ঘাটতির সূচক। ...তুমি যে আজ কতটা হয়রানির শিকার হচ্ছ তা আমি বুঝি। কিন্তু সেটাই হচ্ছে বস্তুত তোমার আত্মপরীক্ষার সময়। তোমার বিশ্বাস হবে হিমালয়ের মতো অবিচল। বিশ্বাস যদি তোমার যথার্থ হয় তবে তোমার বিশ্বাস নয়, সেই অপশক্তিই লুপ্ত হয়ে যাবে। না-না, এভাবে ভাববে না। নিজেকে প্রফুল্ল স্ফূর্ত করে তোলো। অলস দুঃখবিলাস আর নয়।'

চিঠির শেষে 'এক ঠেলাভর্তি ভালবাসা' জানিয়েছিলেন শামরাওকে

চল্লিশের দশকে গান্ধীজির সঙ্গে আমার যোগাযোগটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আমার দুই ঘনিষ্ঠ সুহৃদ যমনালাল বাজাজ ও মহাদেব দেশাই তখন মারা গেছেন। অন্যান্য যাঁরা তখন ছিলেন (গান্ধীজির সচিব প্যারেলাল ব্যতীত) তাঁদের মধ্যে নিজেকে কিছুটা অনাত্মীয় মনে হচ্ছিল। কিন্তু গান্ধীজির প্রতি আমার অনুরাগ কখনোই হ্রাস পায়নি। দুজনার মধ্যেকার মতানৈক্যের কারণেই নিজেকে আমি দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদি উদ্যোগটা বেমানান বা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে যেদিন প্রথম আমি বুঝতে পারি সেদিন নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট পেয়েছিলাম। চিরকালই আমি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সমর্থক; কিন্তু গরিব মানুষের পক্ষে এবং যেখানে তুলা উৎপন্ন হয় না সেখানে তাঁতবোনাটা একেবারেই কৃত্রিম ব্যাপার ও অর্থনৈতিকভাবে চূড়ান্ত অপচয়।

'প্রহিবিশন' বা পান-নিষেধ (আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যা আমার বিবেচনায় ক্ষতিকর)-এর ক্ষেত্রে গান্ধীজির অনড় দৃষ্টিভঙ্গি, যৌনসম্পর্ক বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা— বিশেষত তাঁর অনুগামীরা যে মাত্রায় বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেছেন (প্রত্যেকের পক্ষেই যা ক্ষতিকর বলে আমার ধারণা), এবং কিছু কিছু মূল্যবোধ— আহার্যের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপকে আমার মনে হয়েছিল বিকৃত মূল্যবোধ। এগুলোও তাঁর কাছ থেকে আমার বিযুক্তির ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

আজ এসব বিষয়ে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; জীবনের সায়াহ্নেই গান্ধীজি তাঁর শিখর অবস্থানে পৌঁছতে পেরেছিলেন; আর তখনই আমি তাঁর স্নেহের উত্তাপ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি। তাছাড়া জীবনের জটিল পর্বগুলোতেও তিনিও তো আমাকে কতখানি মনোবল জোগাতে পারতেন। কিন্তু সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম বলেই তাঁর কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পেরেছি। আমার তো মনে হয়, দৃষ্টিভঙ্গির এই ক্ষেত্রে আমি সঠিক ভূমিকাই পালন করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশপ এবং অস্ত্রবল

> বিশপ কি মনে করেন যেসব বৃষকে তিনি ধর্মসঙ্ঘের অপদেবতার কাছে বলি দিতে চাইছেন তারা কেউই নড়াচড়া গুঁতোগুঁতি করবে না বা লাথিটাথিও মারবে না? তিনি কি ভেবে নিয়েছেন পারলে পরেও বৃষটি কাঁধ থেকে জোয়াল ছিটকে ফেলবে না? শূন্যে ছুঁড়ে ফেলবে না মুকুটধারী কসাইকে?
>
> —সিডনি স্মিথ

তারপর বেশ কয়েক বছর ধরে ধীরেধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই আমি চার্চ থেকে দূরে সরে যেতে থাকি; বেছে নিই ধর্মতাত্ত্বিক ও বৌদ্ধিক এক স্বাধীন জীবন। এই সরে আসাটা ছিল কঠিন ও বেদনাদায়ক। তার কারণও আছে। জীবনের একেবারে শুরু থেকে আমি তো মনে-প্রাণে নিবেদিত ছিলাম খ্রিস্টধর্মে—খ্রিস্টধর্মের অ্যাংলো-ক্যাথলিক চর্যার প্রতি। অন্যকে আঘাত বা কষ্ট দিতে কখনো চাই নি; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে-বিরোধে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম তাতে আমার পরিবার ও পরিজন এবং বহু পুরনো বন্ধু পীড়িত বোধ করছিলেন।

মূলত দুটি ব্যাপারে খ্রিস্ট ধর্মসঙ্ঘ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার বিরোধ দেখা দেয়। তার প্রথমটা হল, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রিশ্চিয়ানদের অংশগ্রহণ নিয়ে; আর দ্বিতীয়টা হল, অ-ক্রিশ্চিয়ান মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। 'রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের কোনো সংস্রব নেই'— এই বলে যাজকবর্গ ও সরকারের বহু ব্যক্তি যে প্রচার তখন চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য ছিল : এটা সর্বৈব অনৃতপ্রচারণা। গান্ধীজির মতোই আমি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছি : রাজনৈতিক জীবনে 'ধর্ম'-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; এবং ধর্মের বাণী ও মমার্থকে গণজীবনে সম্প্রচারিত করার অধিকার শুধু নয়, কর্তব্যও রয়েছে প্রতিটি খ্রিস্টধর্ম সম্প্রদায়ের। প্রসঙ্গটি আমি বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেছি 'খ্রিস্ট ও সত্যাগ্রহ' অধ্যায়ে—সেখানে আমার অভিমতও রয়েছে। সেই অধ্যায়ে চার্চের ফাদার ও ধর্মতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীগণের লেখা থেকে বহু তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে আমি দেখাতে চেয়েছি : ক্রিশ্চিয়ানদের অধিকার ও কর্তব্যই হল, অহিংস উপায়ে যে কোনো পরদেশী বা স্বৈরাচারী সরকারের বিরোধিতা করা, উৎখাত করা।

ধর্মান্তরণের প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করা যাবে; কিন্তু আশু যে বিষয়টা আমাকে বিব্রত করে তুলেছে সেটা ধর্মতাত্ত্বিক নয়, রাজনৈতিক সমস্যা। যতদিন আমি বোম্বাইয়ের বিশপের এক্তিয়ারে ছিলাম ততদিন বাস্তবত চার্চের সঙ্গে আমার কোনো

সংঘাত ঘটেনি। তবে কি, আমি ও আমার বন্ধুরা যেসব কাজ করছিলাম তাতে বিশপ মহাশয় ও যাজকরা খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। বিশেষত আমার পেশোয়ার অভিযান খ্রিস্টধর্মসঙ্ঘ কর্তৃত্বকে খুবই বিরক্ত করেছিল। এমনকি ডোরনাকলের ভারতীয় বিশপ মহাশয় আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে একখানা চিঠিও লিখেছিলেন। আর বোম্বাইয়ের বিশপ— সেই 'শ্যাম্পেন' পামার নন, তাঁর বিরসবদন উত্তরসূরি বিশপ মহাশয় লিখেছিলেন : 'দিন দিন আপনার ওপর বীতরাগ জন্মানোয় আমি দুঃখিত। মনে হচ্ছে, এখন আর আপনি প্রকৃতঅর্থে খ্রিস্টের প্রচারক নন, কংগ্রেসের গুপ্তচরবৃত্তি করে চলেছেন। নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে আপনার গমনের ক্ষেত্রে এতদ্ব্যতীত কোনো কারণ আমি দেখছি না।' অথচ তাঁদের কারোই মনে জাগে নি, দুর্দশা ও সংকটকালে খ্রিস্টীয় নীতি প্রয়োগের উদ্যোগটা প্রকৃত এক ক্রিশ্চিয়ানেরই কাজ।

সমস্যাটা জটিল হল পরে; মধ্যপ্রদেশের করনজিয়াতে যাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যখন আমরা নিয়ে ফেলেছি। বোম্বাইয়ে তবু আমাদের পক্ষে কিছুটা সমর্থন ছিল, কিন্তু এবার আমাদের নাগপুরের বিশপের এক্তিয়ারে প্রবেশ করতে হচ্ছে; সেখানে আমাদের কোনো সুহৃদ নেই, সবাই অচেনা। অথচ নতুন বিশপ মহাশয়ের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আমাকে আসতেই হবে। শামরাও এবং আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম বিলাসপুরের ডেপুটি কমিশনারের বাড়িতে। প্রথম দর্শনে (আমার পুলিসি নথিপত্র না দেখায়) তিনি আমার প্রতি খুবই বন্ধুবাৎসল্য দেখালেন। কিন্তু আমরা করনজিয়াতে চলে যাবার পর শুরু হল অসাধারণ সব পত্র-বিনিময়। তার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরলেই বোঝা যাবে ভারতের অ্যাংলিক্যান চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি তখন কী ছিল; স্পষ্ট হয়ে যাবে আত্মিক মুক্তির জন্যে আমাকে কী ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল। সেইসব চিঠি ও তার অভিমুখের দিকে এবার ফিরে তাকানো যাক।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আমাকে করনজিয়ার ঠিকানায় বিশপ চিঠি লিখে জানালেন :

> 'মাণ্ডলা জেলায় আপনাকে অবস্থানের অনুমতিদানের ফলে আশঙ্কা হচ্ছে অনেক ঝামেলার সৃষ্টি হতে চলেছে। আমি মিঃ আরউইন (কমিশনার)-কে চিঠি লিখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে তিনি জানালেন যে জব্বলপুরের ঘটনার জন্যে তিনিই আপনাকে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কারের সপক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। মিঃ আরউইনের কাছে রক্ষিত নথিপত্রের কিছু কিছু আমিও দেখেছি; বাস্তবিকই সেইসব নথিপত্রের ভিত্তিতে তাঁর সুপারিশের মধ্যে বিস্ময়কর কিছু আমি দেখছিও না।'

বিশপ মহাশয় আমাকে আরো অবহিত করলেন, রাজ-সম্রাটের প্রতি আমাকে

অবশ্যই আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। অথচ এ ধরনের শপথ কিন্তু তখনো ভারতের কোনো যাজককেই সাংবিধানিকভাবে নিতে হত না— এমনকি বিশপের নিজের অনুশাসনিক আনুগত্যের শপথের ক্ষেত্রেও সেটা আবশ্যিক ছিল না। শেষোক্তটির বিষয়ে কোনো সংশয়ই নেই; আর বিশপ মহাশয়ের ব্যাখ্যায় প্রথমটির অর্থ হল :

> 'এ ব্যাপারে আমি যা বলতে চেয়েছি সেটা একেবারে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। প্রথম কথা হল, আমার বিবেচনায় যাজক মণ্ডলী কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে থাকবেন না। তাঁদের কর্তব্য হল, ঈশ্বরের কৃপায় মানুষ জীবনযাপনের যে স্তরে সুস্থিত সেখানেই তাকে সুনাগরিকের কর্তব্যে সংস্থাপন। রাজনৈতিক সংগঠন-নিরপেক্ষভাবে তাঁরা নিজেদের সুসংহত করে নেবেন, যা কিছু যথার্থ ও ন্যায্য সমর্থন করবেন। ভারতের বর্তমান শাসনব্যবস্থায় রাজ-সম্রাটও সন্তুষ্ট নন; তার পরিবর্তন ও সংস্কারের সপক্ষে তিনি নির্দেশও জারি করেছেন। আনুগত্যের শপথ গ্রহণকারী প্রত্যেক যাজকই বাধ্য রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখতে, বিশেষত যে রাজনৈতিক সংগঠনটি অসাংবিধানিক ও অন্যায় উপায়ে বিক্ষোভের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

তার উত্তরে আমি বিশপ মহাশয়কে চিঠি লিখে জানাই, আমার কোনো অসুবিধাই নেই...

> '..ইংল্যান্ডের চার্চের প্রতি পুনর্বার আনুগত্যের শপথ নিতে; কিন্তু ভারতের চার্চের প্রতি সেটা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার কিছু আপত্তি রয়েছে। ভারতের চার্চ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং তার যাজকগণের ক্ষেত্রে এই ধরনের শপথগ্রহণ বাধ্যতামূলকও নয়।
>
> কোনো কংগ্রেসি যদি চার্চের সদস্য হতে না পারেন সেক্ষেত্রে আপনি নিজেই কিন্তু বিশেষ এক রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত বা আত্মীকৃত করে ফেলেছেন; আর এভাবেই ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের, এদেশের অগণিত নারী-পুরুষের মুখের ওপর আপনি চার্চের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছেন; অথচ এঁরাই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আস্থাভাজন মানুষ, আর এঁদের হাতেই দু-এক বছরের মধ্যে সরকারি শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে আমাদের। এই চার্চ যদি ভারতীয় জনগণের চার্চ না হয় তবে ভারতের চার্চের স্বাধীনতার কোনো অর্থ আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। ভারতীয় জনগণের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস। অন্যদিকে কংগ্রেসিরা কিন্তু খ্রিস্টের সদস্য হবার অধিকার খারিজ করে নি; আর তাঁরা বিক্ষোভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে গণ-আইনঅমান্য— জনগণ যেখানে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত সেখানে

কিন্তু বিশ্বোভের এই উপায়টিই সুপ্রাচীন ও ন্যায়সম্মত।
সেন্ট অগাস্টাইনের ভাষায় চার্চ হচ্ছে একটি নগর বিশেষ, যেখানে

> 'সমবেত হয় সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর নাগরিকেরা— যেখানে সব ভাষার ভাণ্ডার থেকে তীর্থযাত্রীর সাথিত্ব তারা সংগ্রহ করে নেয়— যেখানে আচরণ, বিধান বা ব্যবস্থাপনার ভিন্নতা গণ্য হয় না।" ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের ভালবাসা বাহুবন্ধনে আঁকড়ে ধরতে হবে চার্চকে।...মহাশয় যিশু খ্রিস্টের উপদেশাবলিতে এমন কিছু নেই যা বিশ্বজনীন চর্চের সঙ্গে আপনার পার্টি-রাজনীতির আত্তীকরণকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে পারে; অথবা রাজনৈতিক মতাবলম্বনের জন্যে আমাকে শাস্তি বিধান করতে পারে।
>
> আমি কংগ্রেসের সদস্য নই; আর মাননীয় মহাশয়, আমি বুঝতেও পারছি না কেন আপনি উল্লেখ করছেন যে নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হওয়ার দরুনে আমার গ্রেপ্তারের দায়িত্ব প্রসঙ্গটি। তবে একজন প্রকৃত ক্রিশ্চিয়ান হিসেবে কংগ্রেসের মতো এক সংগঠনের প্রতি আমার বাস্তবিকই আন্তরিক সমর্থন রয়েছে। কারণ এই সংগঠনটি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে কর্মসূচি অনুসরণ করছে তা যিশুরই মূল শিক্ষা ও নীতি; এবং আন্দোলনের উপায় হিসেবে সংগঠনটি সশস্ত্র শক্তিকে প্রশ্রয়ও দেয় নি; গ্রহণ করেছে সত্যনিষ্ঠ ও অহিংস সত্যাগ্রহের পদ্ধতি যা যুদ্ধনীতিকে পরিণত করে 'গিরিভূমিতে যিশুর ধর্মোপদেশ' (বাইবেল : নুবসন্ধি; মথি ৫ম থেকে ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য— অনুবাদক) হিসেবে। মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করার মধ্যে এক ক্রিশ্চিয়ানের লজ্জার কিছু নেই— গান্ধীজি হচ্ছেন এই গ্রহের খ্রিস্টসদৃশ মহামহিম এক ব্যক্তিত্ব।'

তার কয়েকদিন বাদেই আমাদের স্বচক্ষে দেখতে বিশপ মহাশয় স্বয়ং চলে এলেন করনজিয়াতে। সেই সাক্ষাতের বিবরণটি আমি পুনঃপেশ করছি; করতে পারছি, কারণ আমি সাক্ষাৎকারটি সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলেছিলাম।

বিশপ করনজিয়াতে এলেন, তাঁর সঙ্গে দুজন সি. এম. এস.-এর মিশনারি। আমাদের ঘরে কোনো চেয়ার না থকায় বুটসুদ্ধ পা তুলে মেঝেতেই অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বসতে হল তাঁদের। দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল। পরিণতিতে কিন্তু বলতে গেলে অচলাবস্থাই থেকে গেল। বিশপ জানালেন, মহাত্মা গান্ধী কিংবা তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্রব থাকলে তাঁর পক্ষে আমাদের জন্যে কিছু করা সম্ভব হবে না; আধুনিক ভারতে গান্ধীজি হচ্ছেন খ্রিস্টের সর্বপ্রধান শত্রু; সি. এফ. অ্যান্ড্রুজও বারবার অবজ্ঞাভরে নিন্দিত হচ্ছিলেন 'এক বিশ্বাসঘাতক যাজক' হিসেবে; কংগ্রেস 'শয়তানের কাজ' করে চলেছে এবং পাশবশক্তিকে বেছে নিয়েছে সত্যাগ্রহের বিকল্প হিসেবে। এমনকি খাদিতেও বিশপের প্রবল আপত্তি। গোণ্ডদের

মধ্যে সুতাকাটা ও বয়নের কোনো প্রসার ঘটাতে গেলে আমরা তাঁর অনুমতি পাব না; সম্ভবত তার কারণ হচ্ছে ঘরে তৈরি বস্ত্র তো কংগ্রেসি পোশাকেরই মার্কা।

এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে উপস্থিত দুজন সি. এম. এস-এর কনিষ্ঠজন— মাত্র মাসখানেক পূর্বে যার ভারতে আগমন, চিৎকার করে উঠলেন : 'হুজুর, খ্রিস্ট বিষেয়ে এরকম এক ধর্মত্যাগীর সঙ্গে আলোচনার কোনো মানে হয় না। মিঃ এল্যুইন প্রকৃতপক্ষে শুধু ধর্মত্যাগী মাত্র নন, তার থেকেও বেশি, তিনি এক বিশ্বাসঘাতক : তিনি তাঁর দেশের সঙ্গে, তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন— আর নিজের অদৃষ্টকে জুড়েছেন শত্রুর সঙ্গে। এরকম একজন মানুষের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনার কি প্রয়োজন?'

মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাসের মতো এই মন্তব্য বস্তুত আমার সমগ্র জীবনের দুঃখকষ্ট পুষিয়ে দেয়; আমার হ্লাদিত হাসিটা ছিল এতই প্রকট যে বলতে সংকোচ হচ্ছে, তাতে বেচারি মিশনারিটির মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে— আত্মার উল্লাসনে যেমন পাটলবর্ণ হয়ে যায় মুখমণ্ডল; তাকে তখন বাস্তবিকই দেখাচ্ছিল একেবারে 'বিঙ্গো লিট্‌ল'-এর মতো।

বিশপ মহাশয় আরো জানালেন, 'আমার কোনো যাজকেরই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে না।' আমি কয়েকটি পূর্ব দৃষ্টান্ত রাখার চেষ্টা করি, বললাম সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস ও ইয়র্কের আর্চবিশপের কথা। 'আর্চবিশপের ব্যাপার-স্যাপার আমি তোয়াক্কা করি না। আমার এক্তিয়ারে ওসব চলবে না।'

—কিন্তু কোনো কংগ্রেসি যদি ক্রিশ্চিয়ান হতে চায়?

—সেক্ষেত্রেও শপথগ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাঁকে কংগ্রেস ছেড়ে আসতে হবে।

— কিন্তু আপনার গির্জাগুলোতে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। সেটা কি রাজনৈতিক কাজ নয়?

—আঃ! ইউনিয়ন জ্যাক তো হচ্ছে ক্রুশের মতো পবিত্র।

—'রক্তমাথা ক্রুশ!' নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন শামরাও।

আমি পুনরায় তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। বিশপ মহাশয় তখন আমাদের গোবরলেপা মেঝেতে একটু স্বস্তি পেতে এধার-ওধার নড়াচড়া করে বসছেন।

—স্যার, আপনি তো যুদ্ধে চ্যাপলেইন ছিলেন। সে-সময়ে কিন্তু আপনি দিনযাপন করেছেন যাদের হাত খুনের রক্তে রঞ্জিত— যাদের দীক্ষাই মানুষ হত্যা করা সেইসব মানুষের সঙ্গে। আপনি তাদের নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছেন (মাথা নেড়ে বিশপ সম্মতি জানালেন); আর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যাতে যুদ্ধে তারা জয়লাভ করে। ঠিক কিনা? আমিও হলাম এক সাধারণ চ্যাপলেইন, রয়েছি এমন কিছু মানুষের মধ্যে যাদের হাত রক্তরঞ্জিত নয়—

যারা অহিংসা ও সত্যের মতো অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে চলেছে। আমি যদি ভুল করে থাকি তবে আপনার কাজটা সঠিক হয় কিভাবে? কংগ্রেসকর্মীদের কি আত্মা নেই?

বিশ্বাসহীন চোখে বিশপ তাকালেন; মুখে বললেন, 'তা হোক, কংগ্রেসকর্মীদের আত্মার মোক্ষদান এক বড় ব্যাপার।'

কথা হল আরো অনেক কিছু নিয়ে; কিন্তু সবটার সারাৎসার হল, যদি আমরা গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গ না ছাড়ি, ছাড়তে রাজি না হই— এমনকি খাদির মতো বিষয়ও যদি পরিত্যাগে সম্মত না হই, আমাদের বিষয়ে বিশপের আর কিছু করণীয় থাকবে না।

একেবারে শেষে শাসানির ভঙ্গিতে তিনি বলে গেলেন : 'খ্রিস্টকর্মে আপনি একজন ধর্মত্যাগী। রাজ-সম্রাটের কাছে আপনি একজন বিশ্বাসঘাতক। আপনি এক পাপাচারী অধিদেবতার দুষ্টকর্ম করে চলেছেন।'

বিশপ উঠে দাঁড়ালেন, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শামরাওয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর আপনার ক্ষেত্রে আমার করার কিছুই রইল না।'

নাগপুরে ফিরে গিয়েই আবার এক চিঠিতে উল্লেখ করলেন কী ধরনের অবাঞ্ছিত ও বিপজ্জনক মানুষ আমি। আর সেই সঙ্গে তিনি আরো জানালেন যে আমাকে তিনি কংগ্রেস ছাড়তে বলেছিলেন...

> 'কারণ আমিও গোণ্ডদের ভালবাসি। আমি চাই না যে আমার কোনো কাজের সূত্রে গোণ্ডরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের' অংশ হিসেবে; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে মহাত্মাজি যে 'রক্তস্রোতে'র কথা বলছেন তাতে যেন ব্যবহৃত না হয় গোণ্ডরা। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মনে হয় মহাত্মাজির উদ্দেশ্যই হবে বৈদিক ধর্ম ও তার সংস্কৃতিকে ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
>
> যদি কোনো ভারতীয় ক্রিশ্চিয়ান জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেন ও ভারতের স্বশাসন চান তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এবং সেই সমর্থনও ততক্ষণই যতক্ষণ অবধি তিনি সাংবিধানিক পদ্ধতির ওপর আস্থা রাখছেন।
>
> কিন্তু আপনি বারবার জানিয়েছেন আপনার সমর্থন রয়েছে মহাত্মা গান্ধীর ওপর আর কংগ্রেস সংগঠনের ওপর— অর্থাৎ হিন্দুত্বের ওপর এবং খ্রিস্টধর্মের প্রসারের বিরুদ্ধে; আর খ্রিস্টধর্মের প্রচারের কর্তব্যের ঊর্ধে আপনি আপনার রাজনৈতিক ধারণাগুলোকে জায়গা দিয়েছেন।'

সেই বছর নভেম্বর মাসে বিশপ আবার লিখলেন :

> 'ইতিপূর্বে যেমন জানিয়েছিলাম, আপনার তরফে আমার লেখা পত্রের উত্তরে কমিশনার আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিমধ্যেই তিনি সরকারের

কাছে আর্জি পেশ করেছেন, আপনাকে তাঁর জেলা থেকে এবং ভারতবর্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। সত্যি কথা বলতে কি, কমিশনার বা সরকার কাউকেই আমি দোষ দিতে পারি না। আপনার সরকার বিরোধিতা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ— ক্রমশ যা জানতে পারছি তাতে বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা খুবই গুরুতর।

মাত্র একটা শর্তেই আমি আপনাকে সমর্থন করতে পারি— আমার এই এক্তিয়ারে আপনাকে কাজ চালিয়ে দিতে পারি। সেটা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই কংগ্রেসের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছেদ করে ফেলতে হবে। কংগ্রেস একটি নিষিদ্ধ বা বেআইনি সংগঠন; চার্চের কোনো যাজকেরই উচিত নয় এমতো একটি সংগঠনের সঙ্গে কোনো প্রকারে যুক্ত থাকা। ভারতবর্ষকে যাঁরা ভালবাসেন, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যেসব মানুষ সচেষ্ট এদেশে শান্তি ও উন্নতি সাধনে তাঁদের কাছে আপনার কার্যকলাপ নিশ্চিতভাবে অস্বস্তিকর ও নিন্দনীয়। অতএব আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, কংগ্রেসের সঙ্গে আপনি পুরোপুরি সম্পর্ক ছেদ করুন; আর একজন চার্চের যাজক হিসেবে নিজ কর্তব্যকর্মের দিকে মনোযোগী হন। যতদিন আপনি আপনার রাজনৈতিক মতামত আঁকড়ে থাকবেন ততদিন আপনি আপনার মতো থাকুন। আশা করব আপনি আপনার বর্তমান রাজনৈতিক মতামতের ঊর্ধে একদিন উঠে আসতে পারবেন।'

পক্ষকাল বাদে বিশপকে একখানা চিঠি লিখে আমি আমার জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিই; আমি তাঁকে জানিয়ে দিই চার্চের সঙ্গে আমার সম্পর্কছেদের সিদ্ধান্ত। তাঁকে জানাই, আমি আর সম্মতিপত্র চাইব না। এবং অতঃপর স্পষ্ট হয়ে গেল যাজক হিসেবে কাজ করার আর কোনো অধিকার রইল না আমার। তিন বছর বাদে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে যাজকবৃত্তিটাই আমি সম্পূর্ণত ত্যাগ করেছিলাম। আর সেই সঙ্গে, এমনকি চার্চের সাধারণ সদস্যপদও ত্যাগ করি। প্রপীড়িত বিশপ মহাশয়কে আবার এক চিঠি লিখি :

'আমার যুক্তি হচ্ছে, ভারতের চার্চ যদিও আপাতভাবে স্বাধীন, কার্যত কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে এক বিদেশী সরকার দ্বারা। বোম্বাই ধর্মসঙ্ঘের এক্তিয়ারে কাজ করার সময়ে সেই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা খুব প্রকট ছিল না; কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই নিয়ন্ত্রণ থেকে উদ্ভূত সমস্যা তীব্র আকার নিয়েছে।

কোনো প্রকার বৈরিতার কারণে নয়; শুধু আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমি যদি তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরি, আশা করি আপনি কিছু

মনে করবেন না। যে-খামটিতে আপনি চিঠি পাঠিয়েছেন আমাকে, তার মাথায় লেখা রয়েছে 'গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া'— আপনার পত্রে ছাপা রয়েছে 'অন হিজ ম্যাজেস্টিস সার্ভিস'। আপনি আপনার বেতন গ্রহণ করেন সরকারি নাজিরখানা থেকে; ইউনিয়ন জ্যাক অবৈধভাবে ওড়ে আপনার ক্যাথেড্রেল চূড়ায়। আমি যখন আপনার কাছে অনুমতিপত্র প্রার্থনা করেছিলাম আপনি আমার আধ্যাত্মিক বা ধর্মতাত্ত্বিক যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেন নি; যে প্রশ্ন উত্থাপনের সাংবিধানিক অধিকার আপনার নেই সেটাই আপনি আমার কাছে দাবি করে বসলেন : রাজ-সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ। শেষ সাক্ষাৎকারের উপসংহারে আপনি আমাকে বলেছিলেন, আমি "পাপাচারী অধিদেবতা" দুষ্টকর্ম করে চলেছি। শেঠ যমনালাল বাজাজের নিজ বাড়িটা যখন পুলিস কর্তৃক অবৈধ বলে ঘোষিত হয় ও অধিগৃহীত হয় তখন আমার কাছে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। সেই নোটিশটি কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আসেনি, এসেছিল আপনার দপ্তর থেকে। রাজনৈতিক কারণবশত আমার সহকর্মীকে (শামরাওকে)-কে দীক্ষিতকরণের বিষয়টি আপনি বিবেচনা করতেও সম্মত হননি অথচ তিনি ধর্মপীঠে তিন বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

গত তিন-চার বছর ধরে ভারতীয় জাতীয় চেতনাকে দমনপীড়নের বর্বর উপায়ে নিশ্চেষ্ট রাখার যে নীতি চলে আসছে তার বিরুদ্ধে আপনি বা আপনার মতো কোনো বিশপ ক্ষীণ প্রতিবাদও তোলেন নি। বরং আপনারা সেই পীড়নকে ন্যায্য বলে বিবেচনা করেছেন; এমনকি অহিংস রাজনৈতিক কর্মীর ওপর বেত্রদণ্ডকে ন্যায়সঙ্গত বলে বিধান দিয়েছেন। আর আমার সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একজন ঈশ্বরীয় ফাদার হিসেবে নয়, পরদেশী সরকারের এক এজেন্টের মতোই আপনি আচরণ করে এসেছেন।

নবসন্ধি (নিউ টেস্টামেন্ট) ও এই রাষ্ট্রধর্মের মধ্যে আমি কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না। 'সিজার ব্যতীত আমাদের কোনো রাজা নেই'— বলে যিনি আর্তনাদ করেন তিনি কোনো ধর্মপ্রাণ শিষ্য নন। সিজারের টেবিলে আরামে বসে আছেন এমন কোনো ধর্মাদর্শবানকে কোনোদিন দেখি নি আমরা; বরং দেখি জীর্ণবস্ত্রাচ্ছদনে তিনি রয়েছেন বিচারাসনে। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ভবিষ্যতে গান্ধীজির সরকারের প্রতিও যদি চার্চ এমন গোলামসুলভ মনোভাব নেয় একই প্রতিক্রিয়া হবে আমার। জনগণের ইচ্ছার সপক্ষে যদি সরকার না থাকে অবস্থাটা হবে তখন আরো খারাপ।

ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছি আমি ঠিকই, কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞার বাধ্যবাধকতায় ইদানীং আমি সক্রিয় রাজনীতির বাইরেই

রয়েছি। আমি চাইও না আমাদের আশ্রমটি রাজনৈতিক বিক্ষোভের কেন্দ্র হয়ে উঠুক। কিন্তু সরকারবিরোধিতার ক্ষেত্রে আমি অবিচল। আর আমার নিশ্চুপতা মানসপরিবর্তনের কারণে নয়; আমি নীরব রয়েছি সরকারি অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনজনিত বন্দিত্বের কারণে। আর সেই বন্দিত্ব থেকে যতদিন না বিমুক্ত হই এভাবেই চলতে হবে আমাকে। কিন্তু যাঁরা নির্যাতিত হয়ে চলেছেন সেই কারাগারস্থ খ্রিস্টসুলভ হৃদয়বান ব্যক্তিবর্গের প্রতিই নিবেদিত থাকবে আমার মন ও আত্মা। আমার প্রিয় দেশটার স্বার্থবিরোধী কাজ করে চলেছে যে সরকার সেই সরকারেরই আপনার মতো এক জীত-হুজুর আমলার অধীনে কিভাবে কাজ করব আমি?'

তিন বছর বাদে ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতাস্থ আর্চবিশপের কাছে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে লিখি :

> 'বিধিবৎ ঘোষণার কারণে আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি আর ইংল্যান্ডের চার্চের সদস্য থাকছি না— যাজক বা সংবাদবাহক, কোনোভাবেই নয়। ...বিরোধিতা বা তিক্ততার কোনো অবকাশ না রেখেই আমি আমার ব্যাপটিজমের চার্চ থেকে বিদায় নিচ্ছি। যে মহান ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে আমি বড় হয়ে উঠেছি তার প্রতি অন্য কিছু ব্যতিরেকে শ্রদ্ধা জানিয়েই বিদায় নিচ্ছি। আরো অধিক কাল এভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে অসততাই হত।'

কিন্তু এখানেই ব্যাপারটির ইতি ঘটল না। অ্যাংলিক্যান এক যাজকের অবস্থান শুধু আধ্যাত্মিক নয়; তার সামাজিক ও আইনি ব্যাপারও আছে। ১৯৩৬ সালে আমি যখন ইংল্যান্ডে যাই তখন আর্চবিশপ মিঃ টেম্পল, এর সঙ্গে তাই নিয়ে পরামর্শ করি। আর সে বছরেরই নভেম্বর মাসে আমি ইস্তফা দলিলে স্বাক্ষর করি। সেখানে আমাকে লিখতে হল : 'ইংল্যান্ডের চার্চের যাজকপদের দায়িত্বভার গ্রহণান্তে এতদ্বারা আমি জানাইতেছি যে, ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের যাজক-সংক্রান্ত অযোগ্যতা আইন মোতাবেক আমি আমার অধিকার, সুযোগসমূহ এবং ঐ পদের আইনানুগ নিবৃতি বা ছাড়সমূহ পরিত্যাগ করিতেছি।'

রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম নিয়ে কথা বলাটা ভারতে আজ হয়তো কিছুটা বিস্ময়কর ব্যাপার; কারণ আজ আমাদের মুখ্য কাজই হচ্ছে 'ধর্ম'কে রাজনীতির অঙ্গন থেকে সরিয়ে রাখা। কিন্তু গান্ধীজি যখন ধর্মের কথা বলতেন সেটা কিন্তু তখন কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের ব্যাপার ছিল না। এই সাম্প্রদায়িক ধর্মই তো ভারতবর্ষকে উপর্যুপরি বিহ্বল ও বিভাজিত করেছে। আর তার ফলে সে তার নিজেরই বিনাশ ডেকে এনেছে। ধর্ম বলতে গান্ধীজি বুঝতেন, আমরাও বুঝতাম ধর্মের প্রকৃত মৌল

নীতি— সব ধর্মেরই— হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামধর্মেরই মৌল নীতিটা। গান্ধীজির সমসময়ে যেমন তা সত্য ছিল আজকেও তেমনি ভারতের (এবং সব দেশেরই) জনজীবনে ধর্মের আবশ্যিক গুণ সেই প্রেম ও সহনশীলতার মূলনীতিটা খুবই জরুরি।

এবং আমাদের আরো মনে আছে, কংগ্রেসকে তখন আমরা কেউই শুধু একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ভাবিনি। গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজি এই বিষয়টাই বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন : কংগ্রেস শুধু একটি রাজনৈতিক পার্টি নয়, কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি।

মনে হয়, বিশপগণের (নাগপুরের বিশপই ছিলেন আমার একমাত্র প্রতিপক্ষ— বিষয়টা এমন নয়) সঙ্গে আমার বিরোধের মূল কারণটা ছিল যুদ্ধ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধিতা ছিল আপতিক, অদৃঢ়: স্বাধীনতালাভের পরপরই তো বহু বিশপ খাদির পোশাক পরা শুরু করে দিয়েছেন, গান্ধীজির ভাবাদর্শে প্রচারকর্ম চালাচ্ছেন। সাম্প্রতিক এক সফরে এসে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ মহাশয় রাজঘাটে গান্ধীজির সমাধিতে পুষ্পার্ঘও অর্পণ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ, মারণ-যুদ্ধ এক অন্য ব্যাপার। সেই অক্সফোর্ড-জীবন থেকেই আমি শান্তির সপক্ষে, শান্তিবাদী— সেই বিশ্বাসের অবস্থান থেকে কখনো আমি সরে আসি নি। আর ক্রমশ দেখে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছি, যে প্রাতিষ্ঠানিক চার্চগুলো যুদ্ধকে নিন্দা তো করেই না, বরং সক্রিয়ভাবে যুদ্ধকেই সমর্থন করে চলে।

আমার জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই চিঠিগুলো এখানে আমি সন্নিবিষ্ট করেছি। চিঠিগুলো নিঃসন্দেহে এক তরুণের চিঠি; এসব চিঠির পিছনে রয়েছে বিশ্বাস-হারানোর অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনা, যন্ত্রণা। চিঠিগুলোয় কোনো তিক্ততা নেই, রয়েছে আন্তরিকতা, অন্তঃস্থ আবেগের প্রকাশ; তাই কোমলও নয়। ধনবান ও ক্ষমতাবানদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কাজটা আজো আমি শিখে উঠিনি। মনে হয়, এ-কারণেই প্রত্যেক বিশপের পক্ষে আমি ছিলাম মাথাব্যথার ব্যাপার। সেদিনের পরিস্থিতি আজ দেখা দিলে হয়তো চিঠি লেখালিখির প্রয়োজন পড়ত না। ভারতবর্ষ বদলে গেছে, বদলে গেছে ভারতীয় চার্চও। ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে ক্যাথেড্রেলের চূড়ায় জায়গা করে নিয়েছে ভারতের পতাকা। এমনকি ইংল্যান্ডের চার্চও অনেকটা উদার হয়ে গেছে।

ঔদার্যের এই পরিবর্তন সত্ত্বেও কদিন আগে বছর তিনেকের একটি শিশু মারা গেলে তাকে পবিত্র স্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল বলে এক ভারতীয় বিশপ কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন (সেখানে উপস্থিত সহৃদয় ব্যক্তিগণ সেই কথা তৎক্ষণাৎ শিশুটির বেদনাকাতর মাকে শুনিয়েও দিয়েছিলেন)। বিশপের এই মন্তব্য প্রকাশ কি অনুচিত কাজ হয়নি?

দেখে দুঃখ হয়, ধর্মপ্রাণ তথাগত মানুষেরা আজো আধ্যাত্মিক লাল ফিতায় বাঁধা পড়ে আছে; বিশেষত ভারতে নবদীক্ষিত খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা খুবই কঠোর ও গোঁড়া। তাদের বিশ্বাসীকৃত নৈতিকতা থেকে যারা চ্যুত তাদের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করে তারা। কেউ হাঁড়িয়া খেলে বা নাচে অংশ নিলে আসামের চার্চগুলো তাদের বহিষ্কার করে দেয়। যৌন অনাচারের গণবিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। সুন্দরী এক গ্রাজুয়েট তরুণী— পেশাগত সাফল্যের দিকে তরুণীটি যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে তখনই সে অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ক্রিশ্চিয়ান ধর্মগুরুরা কী বলবে বা গুরুতর ব্যবস্থা নেবে, সেই ভয়ে আতঙ্কিত, কাউকে কিছু বলে না তরুণীটি, গোপন রাখে ব্যাপারটা। তারপর অনেক দেরিতে সে যখন গর্ভপাত ঘটাতে গেল সেখানেই মৃত্যু ঘটে হতভাগিনীর। ক্রিশ্চিয়ানরা যদি আরো সুবিবেচক ও হৃদয়বান হত এরকম করুণ ঘটনা ঘটত না। প্রেমের ক্ষেত্রে চ্যুতি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে যদি সবার মনে আর একটু মমতা থাকত।

চার্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার প্রথম বিরোধ ছিল রাজনীতি নিয়ে। বর্তমানে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে গেছে; কারণ ধীরে ধীরে আমি সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতায় মগ্ন হয়ে গেছি। রাজনৈতিক বিষয়ে আমার তৎপরতা হ্রাস পেয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার মূল দৃষ্টিভঙ্গিটা অভিন্নই রয়েছে। ভিতরে ভিতরে একটা অন্য বিষয়ও ছিল এবং আজো আছে; তা হল, ধর্মান্তরণ ও সাংস্কৃতিক সমস্যা। এই সমস্যাটা এক নৃতাত্ত্বিকের মতো এক যাজকের কাছেও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়।

ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের প্রশংসা সকলকেই করতে হয়, তা থেকে বিরত থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অভিযান ও আত্মদানের উদ্দীপনা ভারতবর্ষে তাঁরাই নিয়ে এসেছেন। শত শত মিশনারি ভারতবর্ষের দূর দূরান্তে বসবাস করে চলেছেন; বছরের পর বছর নিজেদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিত্যাগ করে তাঁরা সেইসব জায়গায় রয়েছেন। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় তাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন; অন্ত্যেবাসীদের সামনে নিয়ে এসেছেন; অস্পৃশ্যদের সুহৃদ হয়ে উঠেছেন; আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থপূরণে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রেও তাঁরা অনেক কাজ করেছেন, বিশেষত আদিবাসীদের উপভাষার ক্ষেত্রে। শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য; শিশু ও আতুরজনদের জন্যে তাঁরা কাজ করছেন পেশাগত দক্ষতায় ও মানবিক মমতায়।

মিশনারি আন্দোলনের সঙ্গে আমার সংঘাতটা কিন্তু তাঁদের ভূমিকার মূল্যায়ন নিয়ে নয়; তার উৎস ছিল অনেক গভীরে— আমার অক্সফোর্ড জীবনের মনোভাব ও বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে।

অভিনিবেশ সহকারে অতীন্দ্রিয় সাহিত্য পঠনপাঠনের কারণে জীবনের মাঝপথে

এসেই আমি তার প্রভাব উপলব্ধি করতে শুরু করি। ধর্ম বলতে তখন আর নিজের বা প্রতিবেশীর পাপ বা নরকযন্ত্রণা নয়, কিংবা ধর্মমতে কাউকে দীক্ষিতকরণের বিষয় রইল না; ধর্ম তখন আমার কাছে আধ্যাত্মিক মার্গের জন্যে আত্মার অন্বেষণ। তথাকথিত সেবা বিষয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীরা চিরকালই সাধারণের কাছে পরিচিত আন্তরিক হিসেবে। অলক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমার ওপর প্রভাব ফেলে। সেই প্রভাবের মাত্রাটা ছিল প্রবল, ফলে অক্সফোর্ড ছেড়ে আসার পর অপরকে ধর্মান্তরিত করার মতো ব্যাপার আর আমার মধ্যে প্রশ্রয় পায় নি।

সুতরাং এটা সর্বৈব ভ্রান্ত ধারণা যে ভারতবর্ষে আমি মিশনারি হয়ে এসেছি, আর তারপরেই আমার মানসপরিবর্তন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে কোনোদিনই আমি মিশনারি নই। খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘে আমার যোগদান ভগবদ্বাক্য প্রচার করার উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রত্যাশা ছিল সেখানে থাকবে পঠনপাঠন, অতীন্দ্রিয়বাদের চর্চা ও সংস্কার মূলক কাজ। কিন্তু অনতিকালে সেখানকার সদস্যবর্গের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফাদার উইনসলো কোনো সমস্যাকেই যৌক্তিক পরিণতির প্রেক্ষায় চিন্তা করে দেখতেন না। ফলে মাঝে মাঝেই তিনি স্ববিরোধী বিবৃতি দিয়ে ফেলতেন। হিন্দুদের কাছে তিনি হয়তো ধর্মান্তরণের ব্যাপারে তাঁর আতঙ্কের কথা শোনালেন; পরমুহূর্তেই তিনি ক্রিশ্চিয়ানদের কাছে ধর্মান্তরণের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। বস্তুত ইউরোপীয়দের কাছে ধর্মান্তরণ হচ্ছে সাধারণভাবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের থেকে অন্যায় সুযোগগ্রহণ। আকালের সময়ে মানুষের অসহ্য ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে বহু মিশনারি তাদের ধর্মানুগত্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। ফাদার উইনসলো কিন্তু নিজেই বলেছিলেন : ধর্মান্তরণ বলতে আমি একেবারে ভিন্ন জিনিস বুঝি; ধর্মান্তরণ হচ্ছে মানবজীবনের শ্রেয়তম জিনিসকে নিজের জীবনের অংশ করে নেওয়া। তাঁর স্ববিরোধিতা ও দৃষ্টিভঙ্গির নৈরাজ্যটা ছিল আমার খ্রিস্ট সেবা সঙ্ঘ ত্যাগের প্রধান কারণ।

প্রথম যখন আমি করনজিয়াতে তখনো আমার ভাবনা চালিত হচ্ছিল খ্রিস্টধর্মাদর্শে; যাবতীয় পরিশোধন ও সংস্কারের ব্যাপার-স্যাপারও ছিল নির্দিষ্ট ক্রিশ্চিয়ান ধাঁচের। আবার এ-কথা সত্য, তখনো আমার ধর্মকে অন্যের কাছে হাজির করার সামান্যতম ইচ্ছা আমার ছিল না। কোনো গোণ্ডকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতকরণের তো প্রশ্নই ওঠে না; আমি খুশি ছিলাম শুধু আমার নিজ জীবনটাকে খ্রিস্টাদর্শে ব্যাখ্যা ও চালিত করার মধ্যেই।

তারও কিছু কারণ আছে। ইতিপূর্বেই বলেছি, অক্সফোর্ড-জীবনে অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে আমার চর্চা, গান্ধীজির খণ্ডপ্রভাব এবং অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে আমার ক্রমবর্ধমান জ্ঞানার্জন ও তার পরিণতিতে মানসে গড়ে ওঠা শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদির কথা। সব ধর্মই সমান— এরকম সরল নিষ্পত্তি কোনোদিন মেনে নিতে পারি নি; আবার মনেও করি

নি, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের গুণগত বিচারের ভার আমার ওপর ন্যস্ত— এক ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্মের স্বপক্ষে বলারও কোনো অধিকার আছে আমার। ততদিনে আমার ভিতরে গড়ে উঠেছে অন্যদের, বিশেষত আদিবাসীদের ওপর কিছু আরোপ করার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মনোভাব। ধর্ম নিয়ে কোনো মিশনারি ও ব্রাহ্মণের তর্কযুদ্ধের তবু একটা মানে বুঝতাম; কিন্তু সরল এক আদিবাসী মানুষকে ধর্ম পথে তাড়া করাটা আমার কাছে মনে হত বিহঙ্গ-শিকার।

স্বভাবতই সুসমাচার প্রচারণায় সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমার এই অনাগ্রহতাটা হয়ে উঠেছিল চার্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার সংঘাতের আরেকটি বিষয়। এমনকি আমার অনেক উদারমনা বন্ধুরাও এ-কারণে বহু বছর ধরে আমাকে হার্দিক ভর্ৎসনা করে গেছেন।

যেমন ধরুন ফাদার উইনসলোর কথা। তিনি মনে করতেন, ধর্মপ্রাণ ও বুদ্ধিমান হিন্দুরা তাদের স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্বভাবে থাকে থাকুক, তাদের ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় আদর্শ উদ্দীপনই যথেষ্ট; কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠী বা অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে কর্তব্যকর্ম হল তাদের ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত করে নেওয়া— চার্চের অধীনে নিয়ে আসা।

সি. এফ. অ্যান্ড্রুজের মতো ব্যক্তিত্বও একই কথা বহুবার আমাকে জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। 'এস. এস. মালেজা' জাহাজ থেকে ১২ নভেম্বর ১৯৩৩ সালে তিনি আমাকে লিখেছিলেন :

> 'আমার তো মনে হয়, কোনো উদ্দেশ্যসাধনের দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হবার সময়ে কিছু কিছু জিনিস আপনাকে এড়িয়ে যেতেই হবে— তবে বিচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহানি ঘটে ততটা অগ্রসর হবেন না। জানি কথাটা 'কেটলিকে কালো বলা'র মতো শোনাচ্ছে, এবং 'পাত্র'টি সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতনও; তা সত্ত্বেও আমাকে-আপনাকে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিক্ষা নিতে হবে; মাত্রাগত বিষয়ে সচেতন না হলে আমাদের অনেক খেসারতও দিতে হবে। যেমন ধরুন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে সত্য; কিন্তু সেখানেও তো অমার্জিত ও নারকীয় বর্বরতা রয়েছে। আমি নিজেই মধ্যে আফ্রিকা ও ফিজিতে তা দেখেছি। হয়তো গোণ্ডদের মধ্যে প্রকৃতঅর্থে সেটা অনুপস্থিত, এবং এটুকু বলাও আমার পক্ষে ঠিক হল কিনা তাই নিয়েও আমার সংশয় আছে। ধর্মীয় ভাবাবেশে নরবলি, ডাইনি প্রথা, এমনকি নরমাংসভোজের উপাসনাও সাধারণভাবে মধ্য আফ্রিকায় দেখা যায়। আর এই আদিম জীবনযাপন প্রায়শই দারুণ আতঙ্কর; কোনোভাবেই সেই ভীতি-শঙ্কা লিখে বোঝানো যাবে না। যেভাবে খ্রিস্ট আমাদের বিমুক্ত রেখেছেন, তার প্রেক্ষিতে আদিম এই হিংস্রতার আতঙ্ক থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টা সম্ভবত বাড়তি হিসাব।

অশুভ এই 'ধর্ম'-এর নিন্দা করা যাবে না বা সেই ধর্মচারীদের ধর্মান্তরিত করা যাবে না— বাপুর এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। দক্ষিণ ভারতে অপদেবতার যেভাবে পূজা হয় তার প্রথা-প্রকরণদৃষ্টে আমার তো মনে হয়, সেটা ঈশ্বরপ্রতিমে-সৃষ্ট মানুষের এক চূড়ান্ত অবরূপই।

মথুরায় একবার এক দৃশ্য দেখে আমার মনে ঘৃণা ও বিরক্তি জেগেছিল। সেটা ছিল আদি গো-উপাসনা—একেবারে আচারে-অনুষ্ঠানে গরু পুজো চলছিল; পূজার পর্যায়ে পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল আবেশ, উন্মাদনা; নিঃসন্দেহে এটা স্পষ্টতই মানবাত্মার প্রতি অবমাননা। উপস্থিত সকলের হয়তো ধারণা হয়েছিল, যেহেতু আমি পশুপ্রেমিক, বিশেষত গোরু ভালবাসি, তাই ওই পুজোর দৃশ্য দেখে আমি পুলকিত হব। কিন্তু যারা সুস্থ ও সচেতন মানুষ, অন্তত সাধারণভাবে, তাদের এই ধরনের বাতিকগ্রস্ততায় আমি বিরক্তই হয়েছিলাম।

এতসব কথা খোলামেলা আপনাকে লিখছি একটাই কারণে, আমি নিজেই দুর্বলতার সীমানা ছুঁয়ে সহনশীলতার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি। আপনার ক্ষেত্রেও আমি একই বিপদের আশঙ্কা করছি।

তাই ফিরে আসা যাক আপনার প্রসঙ্গে। গোণ্ডদের জীবনের সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরে তাদের মধ্যে কাজ করার সময়ে আপনি যদি তাদের আদর্শায়িত করে ফেলেন তাহলে কিন্তু তাদের প্রতি বা আমাদের প্রতি কোনো উপকারই সাধিত হবে না; এক সময়ে আমি যেমন হিন্দুত্বকে আদর্শায়িত করে ফেলেছিলাম এবং তার পরিণতির ইঙ্গিতও এই চিঠিতে রয়েছে। আমিও তখন আপনার মতো তরুণ ছিলাম। এখন আমার অনেক বয়েস হয়েছে, এবং এটাও সত্য আমি আমার প্রথম প্রেমকে হারাতে চাই না, কিন্তু সেই সঙ্গে কিন্তু চাই পার্থক্য নির্ণয় ও সুবিবেচনা।'

১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ আবার সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ লিখলেন :

'বাপুর মতানুসরণে 'ধর্মান্তরণ' বিষয়ে আপনি কি একটু বেশিই এগিয়ে যান নি? গোপন অভিসন্ধির আশঙ্কা ও ভীতি থেকে পাহাড়ি এই আদিবাসীদের মন আপনার প্রতি নিঃসংশয় থাকুক, এ ব্যাপারটা আমিও মানি। তাদের ব্যাপারে গড়পড়তা এক অবস্থানই আপনি নিন, সেটাও আমি বলতে চাই না। কিন্তু খ্রিস্ট প্রেমে আমাদের হৃদয়ে যে আনন্দবোধ জাগে তারও তো প্রকাশ চাই— সেটাও তো আমাদের জীবনের প্রেরণাশক্তি। যে আনন্দবোধ এককের জীবনের বল ও অবলম্বন তা অন্য একজনের মধ্যে সঞ্চারের ক্ষেত্রে বাপু হয়তো বলবেন, দাতার মনের আকাঙ্ক্ষাটাই এক্ষেত্রে বড় ব্যাপার; কিন্তু সেটা একেবারে ভ্রান্ত মীমাংসা।

সম্ভবত আমি তাঁর সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত হতে পারব না; শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমি যদি নির্বাধে যিশু সম্বন্ধে কথা বলতে না পারতাম নিশ্চয়ই আমি অখুশি হতাম। কিন্তু সেখানে সবই ছিল স্বাভাবিক খোলামেলা; কোনোরকম বিধিনিষেধ ছিল না। আস্থা প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করা হয়েছিল যে আমি কোনো অন্যায্য সুযোগ নেব না। একটি মাত্র শব্দবন্ধে, 'ধর্মান্তকরণ' উল্লেখ খ্রিস্ট কিন্তু সেই সুযোগের কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন।'

বলতে বাধা নেই, অ্যান্ড্রুজের তীব্র ভর্ৎসনা বধির কর্ণকুহরে গিয়েই পড়েছিল; এবং নেহরুজির দৃষ্টিভঙ্গিই (যদিও মিশনারিদের প্রসঙ্গে সরাসরি বলেন নি) আমার বিশ্বাসমতে যথার্থ মনে হয়েছে। জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন :

'আমি দেখে বিস্ময়ে চমকে যাই কিভাবে, শুধু এদেশে নয়, অন্যান্য মহান দেশেও কিছু মানুষ চায় অন্যকে তাদের পছন্দ বা ভাবনামতো গড়ে নিতে; চায় অন্যের ওপর নিজেদের বিশেষ জীবনচর্চাকে চাপিয়ে দিতে। আমাদের জীবনচর্চা আমাদের কাছের নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু অন্যের ওপর সেটা চাপানো কেন? জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রেই এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত বিশ্বে অনেকটাই শান্তি আসবে যদি অন্য মানুষের ওপর বা অন্য দেশের ওপর কেউ তাদের জীবনচর্চাকে আরোপ করা থেকে বিরত থাকে।'

শুধু রাজনীতি নয়, এমনকি খ্রিস্টের উপদেশাবলি প্রচারের সমস্যাটা আমাকে চার্চের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক নিরাপত্তা থেকে দূরে ঠেলে দেয় নি। আমার ধারণা, এই গ্রন্থ সূত্রে বোঝা যাবে আমি বাস্তবত খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং এক সময়ে খ্রিস্টধর্মের ব্যাপারে প্রবল আবেগের সঙ্গে জড়িতও ছিলাম। চার্চের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদটা মূলত বিশ্বাসের ব্যাপার নিয়ে। বিশপ গোরে-এর সঙ্গে একবার আমার কথাবার্তা হয়; আমি তাঁকে জানাই কোন কোন বিষয়ে আমার মনে সংশয় আছে; যেমন ধরুন, বাইবেলের প্রশ্নাতীত সত্যতা নিয়ে, কুমারী জন্ম নিয়ে বা পুনরুত্থান নিয়ে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন : 'এগুলো কিছুই নয়; খ্রিস্টধর্মই বলো আর অন্য যে কোনো ধর্মের কথাই বলো, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঈশ্বরকে যদি বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে পার, অন্য সবকিছুই গলধঃকরণ করতে পারবে।' একটা সময় এল যখন সেই গলধঃকরণ আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

গান্ধী আশ্রমের অভিজ্ঞতা আমাকে মেনে নিতে বাধা দিল যে খ্রিস্টধর্মই হচ্ছে একমাত্র বিশ্বাসের আঙ্গিক। উদারমনা মানুষেরা যে যাই বলুন, খ্রিস্টধর্ম থেকে একচেটিয়া ব্যাপারগুলো ছেটে দিলে অনেক কিছুই ওই সঙ্গে বাদ পড়ে যায়। একদিকে

চার্চ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যদিকে আমার ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের মধ্যে অনেকগুলো বছরের কষ্টকর সংঘাতের শেষে সহসা এক সময়ে ধীরে ধীরে, স্বাভাবিকভাবে সংঘাত স্তব্ধ হয়ে গেল : আমি মুক্তি পেলাম। বস্তুত এটা এক নাটকীয় রূপান্তরণ, তবে বিপরীতমুখীন। এই মুক্তি ছিল এত বিশাল— এই মুক্তি এতটাই স্বাধীনতা নিয়ে এল যে সেই মুহূর্তটির দিকে আমি ফিরে তাকাই চরম আনন্দের সঙ্গে, বিন্দুমাত্র অনুশোচনাও থাকে না সেখানে।

পঞ্চম অধ্যায়

চাঁদের মতো প্রিয়

ছোট এই গ্রামটি চাঁদের মতো প্রিয় আমার,
আমাকে সে বড় শহর থেকে টেনে নিয়ে আসে।

— গোণ্ড লোকগীতি

সম্প্রতি দিল্লির একটি নিউজ ম্যাগাজিন আমার সম্বন্ধে লিখেছে : 'আমি এমনই এক খেয়ালি ইংরেজ ভদ্রলোক যার খেয়ালিপনার ঔজ্জ্বল্যকে অক্সফোর্ড পর্যন্ত ম্লান করতে পারে নি।' পত্রিকাটি অবশ্য স্বীকার করতে কুণ্ঠা করে নি যে 'বিচিত্র সব জায়গায় আমি কবিতা ও শিল্পের খোঁজ পেতে সমর্থ হয়েছি।' এ ধরনের উদ্ভট বিচারে ক্ষোভের কিছু নেই; খেয়ালিপনার মধ্যে তো মন্দ বা অপযশের কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু আমার বিস্ময় জাগে অন্য বিষয়ে : কথাটা কতটা সত্য? পাহাড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিমণ্ডলে এ-দেশেরই নিঃস্ব, অজ্ঞ অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর কিছু মানুষের সঙ্গে বসবাস করাটা কি শুধুই খেয়ালিপনা? আর শহরের হৈ-হল্লা, নোংরা আর গোলমালের মধ্যে বাস করা— ক্লাবে গিয়ে তাস নিয়ে বোকা-বোকা খেলা, কিংবা ছোট একটা বলকে টেনিস কোর্টে বা গল্ফ কোর্সে সজোরে পেটানোটাও কি খেয়ালি ব্যাপার নয়! জীবনের অর্থময়তার সন্ধানে একটা লক্ষ্য নিয়ে গ্রামে চলে যাওয়া— বিশ্রী সব কেচ্ছা-কুৎসা থেকে রেহাই পাওয়া বা সভ্যতার ক্লান্তিকর বিনোদন থেকে নিষ্কৃতি খোঁজা হয়তো কারো কারো কাছে অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হতেই পারে, কিন্তু আমার তো মনে হয় না এর মধ্যে খেয়ালিপনার কোনো ব্যাপার-স্যাপার আছে।

এমনকি তখনকার কিছু আচরণ-অভ্যাস আজো পর্যন্ত আমার কাছে বিসদৃশ বা অস্বাভাবিক ঠেকে না, বরং মনে হয় সেগুলোই বাস্তবসম্মত। বহু বছর গ্রামে বাস করেছি, খালি পায়ে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। জুতো ব্যবহার না করার ফলে বহু টাকার সাশ্রয়ও হয়েছে। কখনো মাথায় টুপি পরিনি; সেটা শুধু বেমানান ঠেকত বলেই নয়, সামান্য হলেও খরচ তো কিছু কমেছিল। কোনোদিন মাথায় তেলও মাখি নি। আর এই অল্প কদিন হল দাড়ি কামানোর সময়ে আয়না ব্যবহার শুরু করেছি। তবে একথাও ঠিক, ব্লেড বা শেভিং ক্রিমের খরচ বাঁচাতে দাড়ি রাখা অবধি এগোই নি। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, প্রাচ্যের বাস্তবতায় ও জলবায়ুতে অত্যধিক পোশাক-আশাকের পরিবর্তে সাদাসিধে হাল্কা পোশাকই ভাল।

হয়তো এসবই খেয়ালিপনা, কিন্তু বাস্তবিকই আমি সুস্থ স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি— নিজেকে উপভোগ করেছি। সম্প্রতি আবার আমি প্রথাগত হয়ে উঠলেও চিরকালই

তো অমি ঝাকড়ামাকড়া চুলঅলা একটা বেমানান মানুষ! মনে পড়ে, একবার একটা ট্যুর সেরে হাওড়া স্টেশনে এসে নেমেছি, একজন আবগারি অফিসার এসে নিষিদ্ধ ড্রাগের খোঁজে আমার মালপত্র তল্লাশি করতে চাইলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শত শত যাত্রীর মধ্যে থেকে আমাকে কেন বেছে নেওয়া হল? অফিসারটি উত্তরে বলেছিলেন, 'স্যার, তার একটাই কারণ, আপনাকে দেখে পহেলা শ্রেণীর ইংরেজ ভদ্রলোক মনে হচ্ছে না।'

এই পোশাক-আশাকই বহুদিন আগে আরেকবার আমাকে চূড়ান্ত হেনস্তায় ফেলেছিল। স্বাধীনতার আগে প্রাচীন স্থাপত্যে নির্মিত সিমলার এক ক্লাবে স্যার মারটিমার হুইলার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা, আমার একটা কোটও ছিল না। সেই হিম থেকে বাঁচার কোনো বিকল্প উপায় খুঁজে না পেয়ে একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে আমি ক্লাবে গিয়ে হাজির হলাম। বাটলার তো হতভম্ব; তার হাতে কম্বলটা সঁপে আমি ভিতরে ঢুকে যাই। পরে আমার মতো একটা হতচ্ছাড়া লোককে আমন্ত্রণ করার কারণে মারটিমার হুইলারকে কমিটির সদস্যরা নাকি খুবই গালমন্দ করেছিলেন। আশঙ্কা হয়, আজো যদি আমার নাম ওঠে নিশ্চয়ই হুইলার জিজ্ঞেস করবেন : 'আজকাল এল্যুইন কী পোশাক পরে?' বাস্তবিকই আমাকে বলা হত, আমি নাকি দেখতে পি. জি. ডব্লুয়ুর সেই চরিত্রটিরই মতো— দেখলেই মনে হবে এইমাত্র সে তার পোশাকের ঢিবি থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে; কিন্তু তার জানা নেই *কখন* তাকে বেরিয়ে আসতে হয়।

আদিবাসী মানুষের উষ্ণ সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নিঃসন্দেহে আমার মধ্যেও দেখা দিত নিঃসঙ্গতাবোধ। পাটানগড়ে একবার বর্ষার পাঁচ মাসে পাঁচটি বাইরের লোকের মুখ দেখেছিলাম কিনা সন্দেহ। শামরাও যখন থাকতেন না তখন গ্রামে থাকার সময়ে বা ট্যুরে বেরিয়ে তিন-চার সপ্তাহে হয়তো একটা ইংরেজি বর্ণাক্ষরও উচ্চারণ করিনি। কিন্তু এই বিবিক্ততা আমাকে আমার গভীরে ঠেলে দিয়েছে— কখনো কখনো আমাকে করে তুলেছে অতি স্পর্শকাতর, আবার তা নিঃসঙ্গ মানুষকে বুঝতেও সাহায্য করেছে আমাকে অনেকটা; অন্যদিকে এই নির্জন ও নিঃসঙ্গ পরিবেশ গবেষণাকর্মে ও লেখারও সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আজেবাজে কথাবার্তায় যে বিপুল সময় আমরা নষ্ট করে ফেলি তার নিরিখে 'খেয়ালি' বলে নিন্দিত হয়েও সম্ভবত আমি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সাল অবধি জীবনের বেশির ভাগ সময়ই আমি কাটিয়েছি মাটির ঘরে, খড়ের চালের নিচে। পরে আসবে সেই পাটানগড়ের সুন্দর বসতটির কথা; কিন্তু এ-সময়ের আশ্রমটায় ছিল ঠাসাঠাসি ঘর, একটা ছোট মতো গির্জা, বসবাসের মতো চারটে ছোট ঘর আর বারান্দা। বিড়াল দোলানোর মতো গান্ধীবিরোধী কাজের পরিসরও ছিল না। মাটির ঘরের একটা বড় সুবিধা আছে; কিছুকাল থাকার

পর একঘেয়ে বোধ করলে এক দিকের বেড়ার পার্টিশনটা সরিয়ে ঘরে নতুন বিন্যাস ঘটানো যায়; ইচ্ছে করলে বাঁশ-কাঠ তুলে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র ঘরও বানানো যায়নতুন করে। খড়ের চালা চুঁইয়ে বৃষ্টির জল পড়ে ঠিকই তবে ঘরটা থাকে সর্বদা শীতল— করগেটেড টিনের ছাউনির কর্কশ শব্দও নেই। ইদানীং অবশ্য ভারতরে নানা জায়গায় করগেটেড টিনের চালার খুব প্রচলন হয়েছে। আমাদের ঘরের মেঝেটা ছিল মাটির; প্রতিদিন বা একদিন বাদে-বাদে গোবর দিয়ে সেই মেঝে ধুয়ে ফেলা হত। অনভ্যস্ত মানুষের কাছে ব্যাপারটা বিশ্রী ও কুৎসিত মনে হতেই পারে, আসলে কিন্তু এটা চমৎকার স্বাস্থ্যসম্মত এক রীতি। একবার মানিয়ে নিতে পারলে আর বিশ্রী ঠেকে না। সাধারণ নাগরিক জীবনবৃত্তের বাইরে, আদিবাসীদের মধ্যে— তাদের পাহাড়ে-জঙ্গলেঘেরা গ্রামে বাস করার ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক; অন্যান্য সবকিছুও সেমতো স্বাভাবিকভাবে চলে।

দুই

করনজিয়া নামক ছোট্ট গ্রামটির অবস্থান কিন্তু বিশ্বমানচিত্রেও খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর নয়। পশ্চিম উপকূলের পবিত্র উৎস থেকে বিশাল নর্মদা নদীর ধারাকে অনুসরণ করে পূর্বের সাতপুরা পাহাড়ের বাড়ানো অংশ পর্যন্ত লক্ষ করুন; তার লেজের কাছ থেকে চুল পরিমাণ দূরেই করনজিয়া।

ইতিপূর্বে যে গ্রামটায় আমরা ছিলাম তার একটু উপরে রয়েছে একটা পাহাড় বা 'টিকারা'; এগারো মাইল দূরে অমরকন্টক, তার তীর্থপথের ঠিক উল্টোমুখে রয়েছে টিকারাটা— নর্মদা জেগেও উঠেছে অমরকন্টকের কাছে। তো সেই টিকারাটার ওপর বাঁশ-খড়-মাটি দিয়ে আমরা ছোট ছোট কুটির বানাই— সেটাই আমাদের 'আশ্রম'। তখন চারিদিকে ছিল ঘন রহস্যময় অরণ্য; অরণ্যের সেই প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ হত গভীর রাতে— বাঘের গর্জনে কিংবা হরিণের সুতীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকারে।

আমাদের চারপাশের লোকজনদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল গোণ্ড। গোণ্ডরা এক বড় আদিবাসী জনগোষ্ঠী। প্রায় ত্রিশ লক্ষ গোণ্ড মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে; তাদের সন্ধান মেলে দূরস্থ হিন্দাওয়াড়ার ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত জনবিরল অঞ্চলে, কাঠবোঝাই বেতুল নদীর ধারে; তাদের দেখা যাবে অপূর্ব পর্বতমালা সেওনিতে, যেখানে কিপলিং-এর মাউগ্লি নেকড়ে সাজে সজ্জিত হয়ে শিকার করেছিল; গোণ্ডরা রয়েছে বালাঘাটের বিশাল চিরহরিৎ শালবনে; তারা আজো রয়েছে তাদের প্রাচীন রাজত্ব চান্দায়; রয়েছে বাস্তারে, অন্ধ্রে আর পবিত্র মাইকাল পর্বতের নানা অংশে।

চতুর্দশ শতকের পূর্বে গোণ্ডরা কিভাবে বেঁচে ছিল ইতিহাসের সেই অভিজ্ঞতা

আমাদের খুবই কম। কিন্তু চতুর্দশ শতকে আমরা দেখি মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশে তারা রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত— গোণ্ডয়ানা নামে সেগুলো তখন পরিচিত। ধারণা করা যায়, তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল সহনশীল ও কল্যাণকর। তাদের রাজত্বের উন্নতিও ঘটেছিল; দুর্গ, পুষ্করিণী, ইঁদারা ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছিল; প্রাসাদগুলো ছিল ধনরত্নে সমৃদ্ধ। সম্রাট আকবর চৌরাগড়ের দুর্গেই পেয়েছিলেন কয়েক শত কলসভর্তি স্বর্ণমুদ্রা, অলঙ্কার আর কয়েক হাজার হাতি। রাজ-সমাধিক্ষেত্র, হ্রদ ও প্রাসাদও বানিয়েছিলেন চান্দার রাজারা। নগরকে নিরাপদ বেষ্টনে রাখার জন্যে সাত মাইলব্যাপী বিশাল প্রাচীর গড়েছিলেন। অজস্র মানুষ আসত সেই রাজ্যে,— বণিকরা আসত, সম্পন্ন কৃষিজীবীরা আসত; শোনা যায়, তারা রাজাকে প্রণামী দিত সোনার মোহর বা হাতি।

কিন্তু গোণ্ড রাজাদের কোনো সাংগঠনিক শক্তি ছিল না, ছিল না যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও। ফলে অষ্টাদশ শতকে মারাঠা দলপতিদের আক্রমণের মুখে তাদের রাজ্যব্যবস্থা ধ্বসে পড়ে, প্রায় বিনা প্রতিরোধেই। গোণ্ডরা তখন পালিয়ে যায় গভীর জঙ্গলে। উনিশ শতকের সূচনায় তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায়, কয়েকটি জঙ্গি গোষ্ঠীও গড়ে ওঠে। সুরক্ষিত পাহাড়-জঙ্গল থেকে গোণ্ডদের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো শুরু করে দেয় বাণিজ্যযাত্রিদলের ওপর বা নিকটস্থ শহরগুলোর ওপর হামলা ও লুণ্ঠন। এটাই হয়ে গেল তাদের জীবিকা। ব্রিটিশশাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এরা ক্রমশ শান্ত হয়ে যায়, এবং জমিতে সুস্থিত হয়ে চাষবাসের জীবিকায় ফিরে আসে। আজ তারাই আবার শোষণ বঞ্চনার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে; কারণ বেনিয়া মহাজনরা এসে গেছে, মদের ব্যাপারীরা এসে গেছে। গোণ্ডদের সারল্য ও অজ্ঞতাকে মিষ্টিকথায়, ছলচাতুরিতে ভুলিয়ে হাতড়ে নিচ্ছে তাদের জোতজমি। আর গোণ্ডরা দারিদ্রের অতলান্তে ডুবে যাচ্ছে; বাস্তবিকই দারিদ্র্যকে নিত্যসঙ্গী করেই বেঁচে আছে গোণ্ডরা।

আবার এই দারিদ্র্য শুধু বিষয়গত নিঃস্বতাই নয়, তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য। ফলে গোণ্ডদের সংস্কৃতি বিষয়ে নিশ্চিত প্রত্যয়ে কিছু বলা সহজ নয়। আঞ্চলিক ভিন্নতা তো রয়েছেই তাছাড়া যে স্বরূপে আজ তা বিদ্যমান তা হয়তো মূলের প্রতিচ্ছায় মাত্র। গোণ্ডদের শিল্পকর্ম, কারুকলা খুবই নগণ্য; বয়ন তো তারা করেই না, শুধু কচিৎ পাথরে খোদাই করে থাকে। তাদের তৈজসপত্র— হাড়ি, কলসি, ঝুড়ি সবই অন্যদের তৈরি। অন্যদিকে আবার প্রতিবেশী হিন্দুদের ধর্মাচরণের অনেক কিছুই তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। দ্রাবিড় ধ্বনিপ্রধান তাদের মাতৃভাষাটাও অর্ধেকের বেশি লোক বলে না।

বস্তুত অতীত স্মৃতির অনুষঙ্গেই তাদের সংস্কৃতি বেঁচে রয়েছে; কারণ তাদের মধ্যে রয়ে গেছে এক ব্যাপ্ত মিথেব বা পুরাকল্পের আখ্যান : তাদের রাজরাজড়া আর বীরদের কিংবদন্তি; গোণ্ডদের সংস্কৃতি সপ্রাণ রয়েছে তাদের নাচ ও গানে; এবং এখনো তারা এই দুইয়েই স্বচ্ছন্দ ও পটু। গোণ্ডদের মধ্যে প্রচলিত একটি আখ্যান :

সৃষ্টির উষায় ছিল গোণ্ডরা সাত ভাই। সেই ভাই সাতজন মিলে একদিন তাদের মহান দেবতা বুড়া পেন-এর সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করল। দেবতার উদ্দেশে লোভনীয় সব নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখল তারা; কিন্তু দেবতা হাজির হচ্ছেন না— কোনো নৈবেদ্যই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। অন্যান্য ভাইয়েরা তখন কনিষ্ঠ ভাইকে বলল, তুমি আমাদের হয়ে গান বাঁধো। কিন্তু ভাইটি রাজি হয় না, সে গাইবে না। ছোট ভাইটিকে তখন সোনা-রুপা-মণিমাণিক্য উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিল তারা। তখন ভাইটি সংগীত পরিবেশনে সম্মত হল; এবং একটা লাউয়ের সঙ্গে তার (কারো কারো মতে মাথার চুল) বেঁধে সে বেহালার মতো বাজাতে লাগল। সেই সুরসৃষ্টি এতই মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছিল যে দেবতা অবশেষে ভোজে আসেন এবং তাদের আশীর্বাদ করেন।

কাব্যালঙ্কার ও পরোক্ষোক্তি থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়েও গোণ্ড কবিতা খুবই বলিষ্ঠ ও প্রতীকী। তাদের কবিতা আকাশ-মাটি, অরণ্য-পাহাড় ও নদীর— পরিবর্তমান ঋতুর, মানুষের নানা আবেগ ও ভালবাসায় নিরাবরণ ও লজ্জাহীন— সমস্ত বিধি-নিষেধমুক্ত। বেশিরভাগ কবিতাই নৃত্যের গীতিকা; এবং সম্ভবত তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টটি হল কর্মনৃত্যের গীতিকা। মধ্য ভারতের বহু আদিবাসীদের মধ্যেই এই কর্মনৃত্য প্রচলিত রয়েছে। বসন্তের আগমনে বনের শাখায় যে সবুজের সমারোহ ঘটে তাকেই এই নৃত্যে প্রতীকী রূপে তুলে ধরা হয়। আবার কখনো কখনো একটা গাছকে গ্রামে দাঁড় করিয়ে তাকে ঘিরে চলে এই নৃত্য। মাদলের তালে তালে পুরুষেরা সামনে এগিয়ে যায়, আর মেয়েরা আন্দোলিত হয়ে হয়ে তাদের পিছনে চলে আসে; তারপর মেয়েরা মাটির দিকে ঝুঁকে নাচতে থাকে, তাদের পদবিক্ষেপ নিখুঁত ছন্দে আন্দোলিত হয়; দমকা হাওয়া এসে যেমন গাছের মাথায় ধাক্কা দিয়ে চলে যায় ঠিক সেভাবেই পুরুষ গাইয়ের দল মেয়েদের দিকে ধেয়ে আসে, যেন সেই হাওয়ার ধাক্কার মতোই মেয়েরা এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো এই নাচ চলে সারা রাত ধরে, তারা নাচতেই থাকে অবিরাম— যতক্ষণ না পরমানন্দীয় লীলায়— সৃষ্টিশীলতার গূঢ় উপলব্ধিতে পুলক বোধ না করে, অর্থাৎ সেই আদি-উপলব্ধি যার মহিম প্রেরণায় ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

এই নৃত্য গোণ্ডদের সবিশেষ আকর্ষণের বিষয়। নৃত্যরতা কোনো মেয়েকে গোণ্ডরা মনে করে প্রকৃতির অদৃশ্য বায়ু আন্দোলিত একটি সুন্দর বৃক্ষ। তাদের মধ্যে একটি ধাঁধা আছে : 'বোবা একটা পাখি গাছে বসে আছে, গাছকে ঝাঁকুনি দিলেই দেখবে পাখিটা জেগে উঠে গান গাইছে; বলো তো কী?' উত্তর হচ্ছে : 'যে মেয়ে নাচতে নেমেছে তার পায়েব ঘুঙুর।'

ইতিপূর্বেই বলেছি, গোণ্ডদের সংস্কৃতি আজ যেভাবে আছে তার সম্যক উপস্থাপন সম্ভব নয়। আর সংস্কৃতিই-বা কেন? শিল্পকলা, ধর্ম, ভাষা বা ঐতিহ্যের থেকে

সংস্কৃতিতে কি অতিরিক্ত কিছু নেই? সংস্কৃতির মূল ভিত্তিটাই নির্ভর করে ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ওপর; সেই অর্থে গোণ্ডরা উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন। তাদের ধমনীতে রয়েছে রাজরক্ত; সরল নিঃস্ব গোণ্ড মানুষটির মধ্যে রয়েছে লক্ষ্যপূরণের ইচ্ছাশক্তি, আত্মমর্যাদা ও কৌতুকবোধ; এবং বিপর্যয়ের মুখেও অনড় থাকার মতো সাহস। ক্ষেতের নিষ্ঠাবান চাষী বা ধরিত্রীমাতার পূজারী— প্রত্যেকেই তো প্রকৃতির ভৌতশক্তিতে বলীয়ান। এভাবে দেখলে এরা সকলেই পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীদের মতোই সংস্কৃতিবান।

গোণ্ড ছাড়াও আমাদের প্রতিবেশী ছিল চিত্তবিনোদকারী রোমান্টিক পরধানরা। গোণ্ডদের পুরাণকথা মূলত আগলে রেখেছে পরধানরাই। আর ছিল হিংস্রপ্রকৃতির বাইগা ও আগারিয়ারা। পর্যটকদের ভাষায় যাকে বলে বর্ণময় এমন কোনো জনগোষ্ঠী আমাদের চারপাশে ছিল না। যাদের কথা বলছি তারা তাদের মাতৃভাষাটাও খুইয়ে ফেলেছে। পূর্বভারতের নিরিখে এদের হয়তো আদিবাসীই বলতে চাইবেন না অনেকে; তাছাড়া করনজিয়া ও তার আশপাশের জনসমষ্টি ছিল মূলত মিশ্র ধরনের। নানা জাত- বর্ণের হিন্দুরা তো ছিলই, কিছু মুসলমানও ছিল। তাই প্রথমদিকে আমাদের কর্মতৎপরতা শুধু আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না— প্রতিটি দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের জন্যেই আমাদের কাজ করতে হয়েছে।

তিন

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, জনকল্যাণে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সিসীয় ও গান্ধীবাদী ভাবাদর্শের মিশ্র ভিত্তিতে ছোট একটি আবাসিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা; এবং তারপর জীবনযাপনের দিশা ও উপায় উদ্ভাবন। সেমতোই আমরা শুরু করি, তারপর একটি ক্ষুদ্র সেবাকর্মী বাহিনী গড়ে তুলি; তার মধ্যে ছিল তিন-চারজন ক্রিশ্চিয়ান, একজন মুসলমান, কয়েকজন হিন্দু, অন্যরা সবাই আদিবাসী। ঘোষিত নীতিই ছিল প্রতিটি সেবাকর্মী তার নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে তখন আমরা অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। সবরমতির ধাঁচে আমাদের আশ্রমেও থাকবে প্রার্থনার ব্যাপার। বাস্তবত ক্ষুদ্র একটি সোসাইটির মতোই আমরা নিজেদের সংগঠিত করে নিই; সংগঠনটির নাম ছিল প্রথমে 'গোণ্ড সেবা মণ্ডল'। ১৯৪৯ সালে নিজেদের পুনঃসংগঠিত করে নিই, এবং সংগঠনটির তখন নাম হয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ইউনিট, সংক্ষেপে টি-ডব্লয়ু-আর-ইউ।

ক্ষুদ্র এই সংগঠনটির প্রাণপুরুষ ছিলেন শামরাও হিভালে। করনজিয়ায় এসেই তিনি হয়ে গেলেন এক আলাদা মানুষ। তাঁর ভিতরে তো নিশ্চয়ই উপ্ত ছিল বিরল প্রাণশক্তি আর মানবিকতা, কিন্তু করনজিয়াতে আসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন সকলেরই 'ছোট ভাইয়া' হিসেবে। এবং দেখতে না দেখতে হয়ে উঠলেন প্রত্যেকেরই বন্ধু, নির্দেশক ও পরামর্শদাতা। যে কোনো আদিবাসী মানুষ বিপদে পড়লেই ছোট ভাইয়ার সাহায্য চাইবে— এটাই যেন স্বাভাবিক রীতি হয়ে গেল। একবার তো এক বৃদ্ধা মৃত্যুশয্যায় শুয়েও সে তার আত্মীয় পরিজন কারো সঙ্গেই দেখা করতে চাইল না, শুধু একটানা ডেকে চলছিল শামরাওকে। অন্য একদিন এক গোণ্ড বন্ধু সদর্পে বলেছিল, 'তুমি আসার আগে আমাদের প্রভুদের গোঁফ ছিল আকাশমুখী, আর সেই গোঁফগুলো আজ মাটিমুখী হয়ে গেছে।' শামরাও যেন বাইরের লোক নন, কখনোই কোনোভাবে উঁচু স্তরের মানুষ নন; তিনি নিচের দিকে ঝুঁকে কাউকে দেখতেন না— কাউকে উদ্ধার করা বা 'উপরে তোলা'র মধ্যে ছিলেন না। তাঁর কাছে প্রতিটি স্বতন্ত্র মানুষই যেন এক নতুন জগৎ— প্রতিটি শিশু, উঠতি-যুবক বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেই তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতেন— 'কেস' হিসেবে নয়; তারা যেন এমন পবিত্র সত্তা যাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কর্তব্য— তার দুঃখ ও উদ্বেগ যেন শামরাওয়েরই দুঃখ-উদ্বেগ। সর্বদাই তিনি ছিলেন সকলের ধরাছোঁয়ার মধ্যে; করনজিয়াতে তাঁকে তুলনা করা হত (প্রাচীন ধাঁচের) হিন্দু বিধবার সঙ্গে— তিনি যেন প্রত্যেকেরই আজ্ঞাধীন; যে ডাকছে তার কাছেই যাচ্ছেন; কোনো কাজই তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়, অবহেলার নয়, অপ্রীতিকর নয়।

শেষের আট বছর ধরে শামরাও ও তাঁর স্ত্রী কুসুম সামান্য অর্থ সম্বল করে প্রতিকূল নিরুৎসাহ বাস্তবতায় শুধু নিজেরাই কাজ চালিয়ে যাননি, বরং শত শত দরিদ্র নিঃস্ব মানুষের দুর্দশায় সাহায্য ও সহানুভূতি জুগিয়ে গেছেন। চার্লস ল্যাম্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে : 'মানবতার প্রাচীন প্রশস্ত বাহুতেই শুধু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।' উক্তিটি শামরাওয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দেখে মনে হত, আশ্রমটি গ্রামেরই অংশ; গ্রামের চারিপাশটা যেমন, অবিকল তেমনি। শুরু থেকেই আমরা স্থির করেছিলাম, যা কিছু এখানে বানাব সবই হবে গোণ্ডদের ধাঁচে। সব ঘরগুলোই ছিল মাটি ও খড়ের; দেয়ালগুলোতে ছিল গোণ্ডদের অলঙ্করণ— গ্রামজীবনে যেসব আসবাবপত্র বেমানান তেমন কিছুই ছিল না। আবার এমনও কিছু ছিল যা বুঝিয়ে দেয় আদর্শ-গ্রাম কেমন হওয়া প্রয়োজন। কুটিরগুলো ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থাসংবলিত, সর্বত্র ছিল ফুল ও ফলের গাছ, মুরগী ও গরুর গোয়াল, আবর্জনা ফেলার জন্যে আর সার তৈরির জন্যে গর্ত। আশ্রমে এসে তাই গোণ্ডরা পুরোপুরি সহজ বোধ করত। আবার সেই সঙ্গে বিনাবাক্যব্যয়ে নানা কিছু শিখেও নিত, এবং নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়ে সেগুলো প্রয়োগ করতে উৎসাহ পেত।

আমাদের এই আবাসের প্রবেশমুখে ছিল দীর্ঘ এক সিঁড়িপথ; সেই সিঁড়ি প্রথমে গিয়ে ঠেকেছে ছোট একটি মাটির ঘরে— সেন্ট ফ্রান্সিসের গির্জায়; গির্জাটি শুধু

খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের জন্যে। সেটির জন্যে বেশ বড় একটা উঠোন ছিল, সেই উঠোনের চারিদিক ঘেরা ছিল মাটির প্রলেপ-দেয়া পাঁচিলে— গির্জাটা তার মাঝখানে। সেটি নিতান্তই ছোট্ট একটা কুটির, গোণ্ডদের মন্দিরের মতো। তার সম্মুখে ছিল কতকগুলো কিম্ভুতকিমাকার ঘর, সে-ঘরে আমি কোনোরকমে দাঁড়াতে পারতাম মাত্র। তার একটা ঘরে আমাদের বইপত্র ছিল, এবং অধিকাংশ সময় আমি সেখানেই কাটাতাম। গির্জার বাইরে ছিল একটা পতাকাদণ্ড (গোণ্ডওয়ানার সব উপাসনালয়ের ক্ষেত্রেই এটা অনিবার্য); সেই পতাকাদণ্ডে উড়ত গৈরিক পতাকা গোবরে মেশানো একটি পবিত্র তুলসিমঞ্চে পোঁতা ছিল সেই পতাকাদণ্ডটি। সমস্ত উঠোনজুড়ে আমরা নানা ফুলের গাছ লাগিয়েছিলাম; স্মরণে ছিল সেন্ট ফ্রান্সিসের ইচ্ছার কথা : বাগান বানাতেই হবে, কারণ যারা সেই ফুলের শোভা দেখবে তাদেরই মনে জাগবে অপার্থিব সৌন্দর্যচেতনা। আদিবাসী মানুষ ফুল খুব ভালবাসে, আমি সব সময়েই সচেষ্ট ছিলাম সেই ভালাবাসাকে উৎসাহ দিতে। আবাসের সামনে, পাহাড় প্রান্তে সমতল মতো একটা জায়গা ছিল, সেখানেই আমাদের প্রভাতী ও সান্ধ্য প্রার্থনা হত। ওখান থেকে অরণ্য, উপত্যকা ও পাহাড়শ্রেণীর অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ত।

গির্জা আর উঠোনটা তৈরি করতেই খরচ হয়ে গেল একশ টাকা। তখনকার দিনে দৈনিক মজুরি ছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে আড়াই আনা, আর পুরুষদের ক্ষেত্রে সাড়ে তিন আনা। আমরা সেটা তিন আনা ও চার আনা করে দিই। ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মচারীরা খুবই রেগে গিয়েছিল। কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে, তখন এক টাকায় তেইশ সের চার মিলত; তাই আধআনা বা এক আনার মূল্য আজকের তুলনায় অনেক বেশিই ছিল।

মনে করা যাক, আপনি পাহাড় ধরে এগোচ্ছেন, পাহাড়গুলো যেন আগলে রেখেছে বৃক্ষরাজি, আর তার অধিকাংশ গাছ সুগন্ধি ফুলে ভরা, হাঁটতে হাঁটতে আপনি পৌঁছে যাবেন একটি ডিসপেনসারিতে। থাকে-থাকে ওষুধ সাজানো; চল্লিশ মাইল ব্যাস এলাকার অধিবাসীরা সেখানে ওষুধের জন্যে, চিকিৎসার জন্যে আসে। সত্তর মাইল রাস্তার ওপর ওটাই একমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়; জেলার ওধারে অবশ্য ছোট একটা সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল, সেটা কম করে বিশ মাইল দূরে।

আবাসের রন্ধনশালাটি একেবারে গোণ্ড ধাঁচে তৈরি— ছোট একটা উঠোনের মাঝখানে; তারপর রয়েছে খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, সব্জির ক্ষেত। সীমানার চারধারে লাগানো হয়েছিল ফলের গাছ— আম, পেঁপে, কলা, কমলালেবু, ডুমুর, টক-বাতাবিলেবু, পেয়ারা। এই গাছগুলোর চারা ও বীজ আমরা বিতরণ করতাম। পাশেই ছিল অতিথিশালা— সেখানে রোগী, তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারীরা এসে থাকতে পারত। পাহাড়ের আরো কিছুটা দূরে ছিল সবারই প্রিয় আমাদের মিউজিয়ামটা— সেখানে ছিল ছবি, সাদামাটা বইপত্র, মডেল খেলনা, আর ছোট একটা হর্নবাই ট্রেন। এসব

অতিক্রম করে এলেই চোখে পড়বে আমাদের বৃহৎ আবাস কেন্দ্রটি—স্কুল ও হোস্টেল। সেই হোস্টেলের বড় ঘরটায় জনা পঞ্চাশেক আবাসিক ছাত্র থাকতে পারত, আরো শ'খানেক আবাসিকের থাকার মতো ঘরও ছিল। স্কুলে ছিল সহশিক্ষা ব্যবস্থা; এবং অনেক মেয়েও পড়তে আসত। সেখানে ছুতোরের কাজ ও সেলাইয়ের কাজ শেখানোর বিভাগ ছিল। স্কুলের সীমানা শেষ হতেই ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের একটা সরু পথ, কিন্তু বিনা অনুমতিতে সেটা ব্যবহার করা ছিল নিষিদ্ধ। সেই সরু পথটা গিয়ে মিশেছে কুষ্ঠাশ্রমে। সেখানে সুন্দর একটা প্রশস্ত ঘরে পনের-ষোলজন কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা ও সেবা চলত; রোগীরা সেখানেই থাকত। কুষ্ঠাশ্রমে ছিল একটি বাগান, বাগানটা নিয়ে তাদের গর্বের অন্ত ছিল না।

এটা হল আমাদের আশ্রমের মূলকেন্দ্র বা সদর দপ্তর। উপত্যকার প্রান্তে, দৃষ্টি সীমার বাইরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে কয়েক মাইল ব্যাস দূরত্বে ছিল বেশ কয়েকটি শাখাকেন্দ্র। তার প্রতিটিতেই ছিল সেবাকর্মী, তারা সেখানেই থাকত; হিন্দি লাইব্রেরি, আর সাধারণ ওষুধপত্রসহ ছোট ছোট দাতব্য চিকিৎসালয়। সপ্তাহে একদিন সব শাখাকেন্দ্রের কর্মীরা করনজিয়াতে এসে সমবেত হত, আলাপ-আলোচনা চলত। আদর্শ শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ক্লাশ নেওয়া হত, পরের সপ্তাহে কী করা হবে তা স্থির করা হত। কর্মীরা প্রায় সকলেই ছিল গ্রামের কম লেখাপড়াশেখা মানুষ, তাই প্রশিক্ষণ ছিল খুবই জরুরি ব্যাপার। কিন্তু ক্রমশ এভাবেই এরা শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণে অংশগ্রহণই করল না, তারা হয়ে উঠছিল নিজ নিজ গ্রামের মানুষের নেতা, প্রতিনিধি। আমাদের স্কুলে তিন শ' থেকে চারশ' বালক-বালিকা পড়ত; তাদের বেশির ভাগই ছিল গোণ্ড বা অন্য কোনো আদিবাসীদের সন্তান।

তখন মধ্যভারতের আদিবাসীদের মধ্যে যৌনরোগ স্থানীয় একটা ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সিফিলিস অবশ্য খুব বেশি হত না, হলেও সেটা সাধারণত থাকত প্রাথমিক পর্যায়ের। আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে : উপর্যুপরি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে কি সিফিলিস না-হওয়ার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক আছে? এই প্রশ্ন জাগার একটা কারণ আছে; মনে করা হয়, ম্যালেরিয়া কিছুটা প্রতিষেধকের ভূমিকা নিয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামবাসীরা যে মাত্রায় গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছিল তা দেখে আমরা বিচলিত ও বিষণ্ন বোধ করেছি। বাস্তবিকই রোগটা তাদের মধ্যে সাংঘাতিকভাবে দেখা দিয়েছিল। প্রেমের সহজাত আনন্দে মাতোয়ারা যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ দেখে আমরা ব্যথিত হয়েছি। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর আজ আর ওসব অসুখ আর কোনো ব্যাপার নয়; কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখন সেটা ছিল খুবই নিষ্ঠুর ও পঙ্গুকর ব্যাধি।

পৃথিবীতে আজো এমন কিছু মানুষ আছেন যারা মনে করেন এ ধরনের ব্যাধির চিকিৎসা বা তার উপদ্রবের প্রতিকার করাও নৈতিক অপরাধ; কারণ, তাতে পাপের

পথ সুগম হয়। আমার ধারণা, মাণ্ডলায় যে করুণ দৃশ্য দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম তার এক ঝলক যদি তারা দেখতেন তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাদের ধারণাটা শুধরে নিতেন। যেখানে বিবাহপূর্বেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেলামেশা বিধিনিষেধহীন ও খোলামেলা সেখানে *ব্লেকের সেই বুড়ো নবোড্যাডি অ্যালফ্‌ট*-এর ঈর্ষাতুর চাহনির কথা কল্পনা করা হাস্যকর : বুড়োটি নিজে পুলকানন্দ উপভোগে অক্ষম অথচ সে চাইছে তাদের পুলকানন্দের শাস্তি বিধান করতে।

প্রথমে সালফোনোমাইড ও পরে অ্যান্টিবায়োটিক্স এসে যখন হাজার হাজার মানুষকে রোগমুক্ত করে তুলতে লাগল সে ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তা সত্ত্বেও তখনো বিপত্তি ছিল; ক্ষতগুলো উপর-উপর মিলিয়ে যেতেই রুগীরা সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়েই চিকিৎসা বন্ধ করে দিত। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের রাজি করাতাম সম্পূর্ণ চিকিৎসাটা করিয়ে নিতে।

এই ব্যাধিটির ব্যাপারে আদিবাসীদের মধ্যেও ছিল যথেষ্ট পরিমাণ ভণ্ডামি; ছিল যৌন নৈতিকতা নিয়েও দ্বিচারিতা। কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় কিছু করলে নিন্দার কোনো ব্যাপার ছিল না, কেউ র'াটি পর্যন্ত কাটত না। কিন্তু সেই মেলামেশাটি যদি বহিরাগতের সঙ্গে ঘটত বা তার পরিণতিতে কোনো সন্তান জন্মাত কিংবা কোনোরকম যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হত তাহলে সেটা হয়ে যেত মহা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। আধুনিক সভ্য সমাজেও তো তাই ঘটে। যৌনরোগ যেন পাপের শাস্তি— লজ্জাকর এই ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নিন্দা বর্ষিত হয় এই রোগের শিকার মানুষদের ওপর। আজকাল কুষ্ঠরোগের পরিবর্তে আমরা বলে থাকি 'হ্যানসেনস্ ডিজিস'; কারণ এই ব্যাধির পুরনো নামটিতে যেন রয়ে গেছে কলঙ্কের ছাপ। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে ভাবি, যৌনরোগেরও তেমন কোনো নামকরণ সম্ভব কিনা! বস্তুত আমার ধারণা, সিফিলিসের নিদান হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ট্রেপানোমেটোসিস'কে নির্দেশ করেছে। গনোরিয়া ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার একটি ক্লাসিক উল্লেখ আমরা পাই বসওয়েল-এর 'লণ্ডন জার্নাল'-এ; আমার মনে হয়, এই অতি পীড়াদায়ক ব্যাধিটির জুৎসই নাম দেয়া যেতে পারে 'বসওয়েল ডিজিস'। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বসওয়েলের মতো প্রফুল্লচিত্ত খেয়ালি মানুষ এই নামকরণে ক্ষুণ্ণ হবেন না!

সবকিছুকেই তখন আমরা সহজ স্বাভাবিকভাবে দেখেছি : জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের জন্যে আমাদের কাজ করতে হবে; যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য মজুত আছে কিনা বা খাদ্যসামগ্রী সঠিকভাবে রান্না হচ্ছে কিনা— সে সবের প্রতি আমাদের যেমন লক্ষ রাখতে হবে তেমনি দেখতে হবে লোকজন সঠিক মজুরি পাচ্ছে কিনা, তা থেকে তারা কিছু সঞ্চয় করছে কিনা; সর্বোপরি তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে আমাদের। শিক্ষিত হলেই তবে তারা শোষকদের প্রতিরোধ করতে পারবে— বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা বিস্তৃতি পাবে। এসব উদ্দেশ্য প্রথমে পূরণ করতে হবে দাতব্য চিকিৎসালয়

স্থাপন ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রচারের মাধ্যমে— গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মধ্যে দিয়ে; আর দ্বিতীয়ত আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে— মেয়েদের শিক্ষাদানে বিশেষত গার্হস্থ্য শিল্প ও বিজ্ঞানে তাদের যদি শিক্ষিত করে তোলা যায়। শিক্ষার প্রাপ্তি হিসেবে উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লিখতে-পড়তে জানা এক গোণ্ড বাজারে মাল বেচতে গিয়ে নিশ্চয়ই প্রতারিত হবে না, অন্তত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ছুতোরের বা দর্জির কাজ জানা থাকলে সে কিছু উপার্জন করতে পারবেই; কিছু না পারুক নিজের কাপড়টা তো রিপু বা সেলাই করে বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে।

তবে আমাদের প্রধানতম কাজটি ছিল সর্বব্যাপ্ত নিস্পৃহতা ও ঔদাসীন্যে নিমজ্জিত সব গোষ্ঠীর মানুষকে চাঙা করে তোলা। 'ঈশ্বর আমাদের গরিব করে বানিয়েছেন— কি আর হবে!' এই ছিল তাদের সাধারণ মনোভাব। নিকটস্থ এক গ্রামে চমৎকার একটি পুষ্করিণী ছিল —সেই পুকুর থেকেই সকলে জল আনত। একবার প্রবল বর্ষণে তার একটা পাড় ভেঙে যেতেই সব জল বেরিয়ে যায়। তখন মেয়েদের বাধ্য হয়ে দু মাইল দূরের নদী থেকে জল আনতে হচ্ছিল। গ্রামের সব মানুষ যদি মাত্র কয়েকটা দিন স্বেচ্ছাশ্রম দেয় তো পাড়টা সহজেই মেরামত করা যায়, জল আনার শ্রম ও সময়ের অপচয় বাঁচে। প্রস্তাবটা গোণ্ডদের কাছে তুলতেই তারা বলল, 'আমরা গরিব মানুষ। আমরা কি করতে পারি?' শেষমেশ আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে ভাঙা পাড়টা মেরামত করে দিই।

কিন্তু সময় যত এগোতে লাগল লোকজনও সম্পন্নতা ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় সজীব হয়ে উঠতে লাগল; ক্রমশ নতুন এক ভাবধারা তাদের মধ্যে জেগে উঠল। একদিন— সেটা অবশ্য স্বাধীনতালাভের পর— এক গোণ্ড রমণী চিরভীতিকর পুলিস স্টেশনে সটান ঢুকে গিয়েছিল; তাকে বেরিয়ে যেতে হুকুম দিতেই সেই গোণ্ড রমণী কঠিন স্বরে বলেছিল : 'এটা *আমাদের* পুলিস স্টেশন, তোমাদের নয়। এটা জনগণের।' অন্য একদিন দপ্তরের এক ব্রাহ্মণ রাজস্ব অফিসার এক গোণ্ডকে বলেছিল, তার ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর কোনো মানে হয় না; উত্তরে গোণ্ডটি বলেছিল, 'তা তো আপনি বলবেনই, কারণ আপনি জানেন সেই একদিন আপনার পদটি পেয়ে যেতে পারে।'

করনজিয়ার প্রথমপর্বের সেইসব অভিজ্ঞতার কথা আমি *লিভস ফ্রম দি জাঙ্গল* গ্রন্থে লিখেছি। রোমাঁ রোলাঁর ভূমিকা সংবলিত সেই বইটি প্রকাশ করেছিল জন ম্যুরে, ১৯৩৬ সালে। গর্ববোধ করার মতো বই নয় ঠিকই কিন্তু তা খুব সাফল্য পেয়েছিল তখন। সম্প্রতি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তার পুনঃপ্রকাশও করেছে। তবে সেই বইটিতে ছিল অরণ্যজীবনের প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতা। সেই বইটির সাফল্যের কারণ, আমার ধারণায়, তার বৈপরীত্যের মেজাজটা— অক্সফোর্ড থেকে সদ্য পাস করে

বেরিয়ে আসা এক যাজক যুবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা। পরবর্তীকালে আমি যখন সেই অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অংশভাক হয়ে গেছি— আমি ও অন্যান্যরা সকলে যখন তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছি তখন ব্যাপারটা আর কৌতূহলের ছিল না; আর নর্থ ইস্টর্ন ফ্রন্টিয়ারে পৌঁছতেই আদিবাসী জীবনবাস্তবতায় কৌতুক বা খেয়ালের আর লেশ মাত্র ছিল না। তবে কি, জীবনে আমি বহু কৌতুকেরই মুখোমুখি হয়ে চলেছি; রঞ্জি সাহানি তো বলেছেনই, 'সৃষ্টিসংক্রান্ত বিষয়কে কৌতুককর উপায়ে' আমি নাকি আবিষ্কারে সচেষ্ট।

লিভস ফ্রম দি জাঙ্গল আমার পক্ষে কল্যাণকর যে বড় কাজটা করেছে সেটা হল ম্যুরেদের সঙ্গে আমার পরিচয় ও যোগাযোগ। ১৯৩৬ সালে দুমাসের লন্ডন ভ্রমণকালে আমি তাঁদের নানা কিছু দেখার সুযোগ পেয়েছি। প্রাচীন সেই অনিন্দ্য ম্যুরে হাউস—বায়রন ও থ্যাকারের স্মৃতিবিজড়িত সেই বাড়িটা অবস্থিত ছিল আলবেমারেল স্ট্রিটের ওপর, অফিস নয় যেন দারুণ এক ক্লাব। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমি প্রুপ দেখেছি; কথা বলেছি জক ম্যুরের সঙ্গে; জক ম্যুর আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন জেরাল্ড হার্ড-এর সঙ্গে— আবার তাঁর মাধ্যমে পরিচয় ঘটে অ্যালডাস হাক্সলে-এর সঙ্গে। মাঝে মাঝে পার্টিতেও যোগ দিয়েছি; সেরকম এক পার্টিতেই দেখি অবিস্মরণীয় ফ্রেয়া স্টার্ক-কে। অন্য এক ম্যুরে লেখক, অ্যাক্সেল মান্থে-এর সঙ্গে ততটা ভাব হয়নি। তাঁর লেখা বই 'ব্রিজ অফ স্যান লুইস রে'; 'আপনার গ্রন্থটি বেশ উপভোগ করেছি'— আমার এই কথাটা কেন জানি তাঁর ভাল লাগল না। পরবর্তীকালে আমার *দি বাইগা* ম্যুরেরা প্রকাশ করেছিল; কয়েকজন ডাইরেক্টরের কাছে বইটি শক্ত মনে হয়েছিল, বিশেষত লর্ড গরেল-এর কাছে; তিনি কিন্তু সব সময়েই আমার প্রতি ব্যতিক্রমীভাবে সদয় ছিলেন।

চার

সব সময়েই আমাদের ইচ্ছে ছিল কোনো একটি প্রাণী পোষার। হয়তো সেটা আমার স্মৃতির অনুষঙ্গেই এসেছিল : বায়রনের একটি পোষা ভাল্লুক ছিল; বলতেন, ওকে ট্রেনিং দিয়ে বন্ধু বানাব; হ্যারিকের ছিল পোষা একটি শুয়োর— বড় মগ থেকে বিয়ার খেতেও শিখে গিয়েছিল শুয়োরটি; ওয়ার্ডসওয়ার্থের ছিল একটি সোনালি মাছ— শীতল স্বভাবের হলেও মাছটি ছিল বর্ণসঙ্করহীন; রোসেটির ছিল একটি পোষা অপোস্‌সাম (অতি ক্ষুদ্র অস্ট্রেলীয় দ্বিগর্ভ জন্তুবিশেষ— অনুবাদক) — সেই অপোস্‌সামটি একটি সিগার বাক্সে মারা গিয়েছিল। আমরা অবশ্য অত উচ্চ স্তরের কিছু করতে পারি নি; তবে আমাদেরও ছিল ছোট একটা চিতাবাঘিনী; সেটা নিয়ে ছিল স্থানীয় মানুষের তীব্র কৌতূহল। বিশেষভাবে তৈরি কাঠের গরাদ দেয়া একটা ঘরে সেই মেয়ে-চিতাবাঘটিকে রেখেছিলাম। খুবই পোষ মেনে গিয়েছিল, আমি

ভিতরে ঢুকতাম, ওর আদরও উপভোগ করতাম— কোনো ভয়ডর নয়, যেন আলিঙ্গন করতে উদ্‌গ্রীব। হাজার হাজার মানুষ সেটিকে দেখতে আসত। একবার আমরা যখন দূরে, কোথাও ট্যুরে গেছি, দুর্ভাগ্যবশত ঘরের গরাদ ভেঙে চিতাবাঘিনীটি বেরিয়ে যায়। পালাবার আগে সে একবার গিয়েছিল কুষ্ঠাশ্রমে, কিন্তু নিখাঁদ ফ্রান্সিসীয় অভিভাবে সে যখন কুষ্ঠরোগীদের আলিঙ্গনে উদ্বুদ্ধ তারা খুবই ভয় পেয়ে যায়, এবং তাদেরই একজন গাদাবন্দুকের গুলিতে সেই মেয়ে-চিতাবাঘটিকে কাবু করে ফেলে।

তারপর আসে অপূর্ব এক শিকারি চিতল, শেষে ছোট্ট কোমল আদরের এক সবাক হরিণ।

পাখিদের প্রসঙ্গে বলতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে আভিজাত্য ও সম্ভ্রম নিয়ে পদচারণারত একজোড়া টার্কি পাখির কথা। আশ্রম প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে মার্গারেট ম্যুর বেড়াতে এসে এই পাখিজোড়ার নাম দিয়েছিলেন : ম্যাকবেথস্‌। ছোট ছোট আরো অনেক ম্যাকবেথ ছিল— সেগুলো মারা গেছে, বাচ্চা টার্কির নিয়তি আর কি। আর ছিল দুলকি চালে হাঁটা কতকগুলো পাতিহাঁস, দেখা গেল সবগুলোই মাদি। তাছাড়া ছিল বনকবুতর, সংখ্যায় সেগুলো বাড়ত বটে কিন্তু বিড়াল বা চিতার পেটে চলে যেত তার বেশির ভাগই। আমরা একটা পক্ষীশালাও বানিয়েছিলাম— একটা গাছকে কেন্দ্রে রেখে বেশ আলোকিত একটা ঘর। সেখানে এসে বসত নীলরঙা পালকের একজোড়া জেই পাখি— কিন্তু তাদের অভিব্যক্তিতে সর্বদাই ছিল কুলীনের বিরক্তিভাব। সেই পক্ষীশালায় আরো ছিল তিনটি গুরুগম্ভীর শুকপাখি, কয়েকটি ময়না, আর তিনটি সোনালি-বাদামিরঙা অপূর্ব তিতুর পাখি। সবাক বা ডাকতে-পারা হরিণটি ওখানেই থাকত, পাখিদের সঙ্গে তার খুব সখ্যতা জন্মে; আর সেই ভাব-ভালবাসা এতটাই যে ছোট পাখিগুলোর পালক সে তার জিব দিয়ে চেটে দিত— বেশির ভাগ পালক উঠে গেলেও সেই আদর চলতই।

তারপর বলতে হয় মুরগিছানার কথা। রোহ্‌ড আইল্যান্ড লাল মোরগ নিঃসন্দেহে স্থানীয় প্রজাতির উন্নতি ঘটিয়েছিল। তাদের বেঁচে থাকা বাচ্চাগুলো খুবই উন্নতমানের ছিল। কিন্তু করনজিয়াতে তাদের আণ্ডডিম্বাকার অস্তিত্বই ছিল বিপন্ন। দেখে ভয়ানক দুঃখ হত, লেডি ম্যাকবেথ একটা বড় আকারের (কম করে সাধারণ ডিমের তিন গুণ সাইজের) ডিম পেড়েই মুখ ঘুরিয়ে শীতল হবার আগেই ডিমটা গব্‌গব্‌ করে খেয়ে ফেলছে। অবশ্য কিছুদিন বাদেই আমরা কতকগুলো ছানা বড় করে তুলতে পেরেছিলাম। অর্ধেকটা বেঁচেও গিয়েছিল— বাকিগুলোর কিছু গরমের তাপে বা শীতের ঠাণ্ডায় মারা যায়। কিছু মারা যায় জলে ডুবে বা তাদেরই মা-বাবার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে। এক রাতে এক বিশালাকার গোখরো সাপ মুরগির ঘরে ঢুকে পড়ে। সেই সাপ একটা ছানা গিলে ফেলে আর তার মাকে ভয়ংকর ছোবল মারে। আমি

বিছনার পাশে একটা পুরনো তরবারি রাখতাম; আমি সেই সাপকে তরবারি নিয়ে আক্রমণ করি, কিন্তু সে সুরুৎ করে পালিয়ে যায়। চারদিন ধরে মা-মুরগিটা অচৈতন্য থাকে, তারপর সুস্থ হয়ে ওঠে। কৌতুকের বিষয় হচ্ছে, সে তার পুনর্জন্মলাভ অনুষ্ঠানটিকে পালন করল তারই একটা ছানাকে ঠুকরে খতমের মধ্যে দিয়ে।

আমরা খরগোস ও কবুতর পোষাও শুরু করি। তার কিছু অংশ দিই হোস্টেলের ছেলেদের পুষতে। শিক্ষা দপ্তরের পরামর্শ হচ্ছে, পোষার ব্যাপারটার মধ্যে দিয়ে ছেলেদের মনে কোমলস্বভাব উদয়ের সম্ভাবনা বেশি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ক্ষেত্রে সেটা আশা করা গেলেও করনজিয়ার বালকদের ক্ষেত্রে কিন্তু এ-জাতীয় প্রাকৃতিক উপকরণে চিত্ত বিগলন সম্ভব হয় নি। তাদের একটা ছোট দল মাঝরাতে উঠে কোনো একটি হতভাগ্য পোষা প্রাণীকে স্কুলসংলগ্ন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে খেয়ে ফেলত। আর গল্প ফাঁদত দারুণ রোমহর্ষক : বাঘ এসেছিল, ঘুরঘুর করেছে, পোষা প্রাণীটাকে মেরে গেছে। এক সময়ে আমরা আসল কথাটা জানতে পারি, আর অবশিষ্ট পোষা প্রাণী কটাকে ফিরিয়ে আনি।

এইসব ঘটনা আমাদের মনে দারুণ ছাপ ফেলে। একদিন এক বাইগা জাদুকর মাহাতুকে নিয়ে পাশের গ্রামে গেছি; আশ্রম বিষয়ে তার কথা হল : 'আশ্রমের একটা সুন্দর বাগান আছে। একটা চিতা-দেবী আছে, একটা পাখি আছে, গব্‌গব্ করে হাঁটে, আরেকটা তো কোয়াক-কোয়াক ডাকে, আরো আছে কয়েকটা হরিণ।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'আর কিছু নেই?' 'হ্যাঁ, এই তো আর কি, তাছাড়া—'। তারপর সে বলল, 'ওখানে একটা স্কুলও আছে, একটা হাসপাতাল আছে।' কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না, তার কৌতূহলটা মূলত কোথায়।

পরে সঁহওরোছাপারের আশ্রমে দারুণ এক বাদামি কাঠবেড়ালী ও পণ্ডিত-পণ্ডিত দেখতে এক সারস পাখি ছিল। জঙ্গলের প্রাণীকে পোষ মানানোয় একটা দারুণ তৃপ্তি আছে। মনে হত যেন পরিচিত সামাজিক বৃত্তের বাইরে পা রেখেছি— যেন কোনো কাফে রয়েল-এর প্রধান ওয়েটারের মাথা নত করার সুখ বোধ করছি। আমার ঘরের পাশের একটা গাছে কাঠবেড়ালীটা থাকত, খাবারের সময় হলেই নিয়মিত এসে হাজির হত। কাঁধের ওপর এসে বসত, চায়ের কাপে ভাগ বসাত। সারসটি ছিল আরো বন্ধুভাবাপন্ন— তার আবার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শামরাওয়ের প্রতি— তাঁকেই খুঁজে ফিরত। একদিন তো সেই সারস সোজা চলে যায় ডিসপেন্সারিতে, খেয়ে নেয় অ্যামেনিয়াম নাইট্রেড। তবে তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি; বরং যেন কিছুটা চাঙাই হয়ে উঠল। আমি হয়তো টাইপ করছি, সারসটি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত— কখনো কখনো দু-চারটে টাইপও করতে চেয়েছে। আমি তাকে বেশ উৎসাহ দিতাম; আমারও পরীক্ষা করে দেখার একটা বাসনা ছিল— শেক্সপীয়রের সমগ্র রচনাবলি টাইপ করে ফেলতে ছটা বানরের কত লক্ষ বছর লাগতে পারে!

আমাদের পোষা একটা বানরের প্ররোচনায় বাস্তবতই আমি খ্যাতনামা নৃবিজ্ঞানী মেলনোভস্কির সঙ্গে অপ্রীতিকর এক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেটা ঘটেছিল আমার এক লন্ডন ভ্রমণকালে। আমি তাঁর এক সেমিনারে হাজির হই, এবং শেষে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে উপরে যাই। চিরকালই আমার মধ্যে দুরারোগ্য চপলতা ব্যাধি রয়েছে; তাঁর ভাষণ শুনে সেটা যেন আরো বেড়ে গেল। ভাষণ-বক্তৃতা এগুলো কোনোদিনই আমি গুরুত্ব সহকারে নিতে পারি না। যাক, আমার সেই চপলতাই আমাকে তাড়িত করল তাঁকে একটা ছোট গল্প শোনাতে।

আমি বললাম : 'আমি ভারতবর্ষের একটা গ্রামে মাটির ঘরে বাস করি; কদিন আগে একটা পোষা বানর পেয়েছি, বানরটা সাধারণভাবে সুবোধ স্বভাবের; কিন্তু কেন জানি তার মধ্যে একদিন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা দিল, আর আমার শেলফগুলো খুঁজতে লাগল। হঠাৎ সে পেয়ে গেল আপনার লেখা 'সেক্স অ্যান্ড রিপ্রেশন ইন স্যাভেজ সোসাইটি' বইটি। আপাতদৃষ্টে মনে হল, বইটি তার খুব পছন্দ হয়েছে— কারণ সে দ্রুত বইটি শেলফ থেকে বার করে নিয়েই গব্‌গব্ করে খেতে শুরু করল। আর হয়তো তাতেই বানরটি কদিনের মধ্যে পাগল হয়ে যায়।'

অতঃপর খুব প্রত্যাশা নিয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তিটির দিকে এবং পরিবেষ্টিত শিষ্যবর্গের দিকে তাকাই; সেখানো কোনো কম্পন নেই, জ্বলন নেই, রয়েছে শুধু সমাজবিদ্যানিষ্ঠ কয়েকটি নিরানন্দ বিশুষ্ক মুখ। দেখেই আমি দ্রুত সট্‌কে পড়ি।

সত্যি সত্যি নানা প্রাণী মাঝে মাঝেই পাটানগড়ের আবাসে চলে আসত সাহিত্যের ভোজে; তেমন এক ঘটনার কথা 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট'-এ লিখেছি। ড. পি. জি. উডহাউস (বিষয়টাকে তিনি ড. মেলিনাউস্কির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নিয়েছিলেন) তাঁর গ্রন্থ 'ওভার সেভেনটি'-তে আমার লেখাটির সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'মি. এল্যুইন একটি গোরুর কথা বলেছেন। গোরুটি তার বাংলোতে ঢুকে একদিন তাঁর সেলফ থেকে 'ক্যারি অন জিভেস' বইটি বার করে নিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। সেই সেলফে কিন্তু ছিল অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে গলসওয়ার্দি, জেন অস্টেন এবং টি. এস. এলিয়টের রচনাপঞ্জিও। নির্দ্বিধায় বলা যায়, এটি বরং প্রশংসাজ্ঞাপনই!'

পাঁচ

১৯৩৬-এ আমার মধ্যে গবেষণাকর্মের প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে গেল আমরা তাই বারো মাইল দূরের এক গ্রামে চলে যাই।

তিনটি গ্রাম নিয়ে সেই সঁহওরোছাপার ছিল একটি উপত্যকায়; ছোট একটি নদী মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত; সেখানে আমাদের জুটেছিল প্রচুর বাঁশ আর কাঠ। এবার খুব প্ল্যান করে আশ্রমটি গড়ে তুলি। পাহাড়ের একধারে বানাই আমাদের আবাসগুলো,

স্টাডির মতো একটা ঘরও তৈরি হল। সেটা ছিল পাহাড়ের একটু উপরদিকে, নিরিবিলিতে যাতে আমি লেখালেখির কাজ করতে পারি। বেশ নিচে একটা ফাঁকা জমি ছিল, সাপ্তাহিক হাট বসত সেখানে। তার একধারে স্কুল আর হোস্টেল; আরো নিচে নদীর ধারে ছিল চমৎকার এক মালভূমি, সেখানে গড়ে তুলি কুষ্ঠরোগীদের হোম। অনতিদূরে একটা গ্রাম পত্তনি নিয়ে সেবাকর্মীদের আবাসনের ব্যবস্থা হল। নতুন এই আশ্রমে কিন্তু কোনো গির্জা রইল না।

করনজিয়ার তুলনায় এখানে আমরা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। মূল রাস্তা থেকে একটা প্রাইভেট রাস্তা আমরা বানিয়ে নিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু সেই রাস্তাটা বছরের অর্ধেক সময় অকেজোই পড়ে থাকত। দুটো গ্রামে ছিল গোণ্ডরা আর রাজ-গোণ্ডরা, তৃতীয় গ্রামটিতে যারা থাকত তাদের আজ বলা হয়ে থাকে তপশিলী জাতি—মেহেরা। এবার আমরা বাইগাদের কাছাকাছি চলে এসেছি, আর চারদিকে ছিল আগরিয়াদের বাস।

এখানে আসার পর কালিক-পরিবর্তন ও শোষণ সম্বন্ধে আমরা আরো বেশি ওয়াকিবহাল হই। আমরা ছিলাম বিশাল এক জঙ্গলের খুব কাছে, আর তাই জীবনে প্রথম জানতে পারি, এই মানুষদের স্বাধীনতাহীনতার বঞ্চনা কতখানি। এইসব মানুষ অরণ্যকে আবেগে ও ভক্তিভরে ভালবাসে। তাদের কাছে 'অরণ্য আনন্দময়', 'অরণ্য শুভ আকাঙ্ক্ষার ভূমি'। এই অরণ্য তাদের প্রথমজীবনের প্রেম-ভালবাসার পটভূমিকা; এই সেই ক্ষেত্র যেখানে তারা অকুতোভয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। বাইগারা মনে করে তারাই প্রকৃত *পশুপতি*—সমস্ত প্রকার হিংস্র প্রাণীর দেবতা; অরণ্যকে জাদুক্রিয়ায় বশে রাখার দায়িত্ব তাদের; শত শত বছর তারা ধরে এই অরণ্য থেকেই জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে এসেছে। আর তাই বিশাল অরণ্যাঞ্চলকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল করার অনিবার্য প্রবল ধাক্কাটা এসে পড়ল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর। ঐতিহ্যগত প্রথায় সেখানে চাষবাস করা নিষিদ্ধ হল। তাদের বলা হল, তোমরা গ্রামের চৌহদ্দিতেই থাকবে—এখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। কারো গবাদি পশু থাকলে তো বেচারিকে অষ্টপ্রহর আতঙ্কে থাকতে হত, চরতে-চরতে গরু যদি সীমানা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে পড়ে, তবে তার ওপর চেপে বসবে বিরাট জরিমানা। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যস্থ কোনো গ্রামের বাসিন্দা হলে তাকে যখন-তখন ডেকে নিয়ে গিয়ে কাজ করাতে পারে বন দপ্তর। যদি সে বহিরস্থ কোনো গ্রামের বাসিন্দা হয় তবে বনের প্রতিটি জিনিস সংগ্রহের জন্যে তাকে বিভিন্ন লাইসেন্স নিতে হবে। প্রতিটি আইনি মোচড়ে বন দপ্তর তার জীবন ও জীবিকাকে তছনছ করে দেবার অধিকার রাখে। ফলে এসব অঞ্চলের মানুষের আত্মবিশ্বাস আর থাকল না, তারা হতাশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। একমাত্র ১৯৩৪ সালেই মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ২৭,০০০ বনাপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে; নিঃসন্দেহে তার দশগুণ আইনি প্যাঁচের বাইরে

থেকেছে। এক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বলা যয়, এত বিপুল সংখ্যক বনাপরাধ নিশ্চয়ই ঘটত না যদি বনদপ্তরের আইনসমূহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আবশ্যকতা ও তাদের সংবেদনের পরিপন্থী না হত। বনবিভাগের এক অফিসার একবার আমাকে বলেছিলেন : 'আমাদের আইন এমনই যে প্রতিটি আদিবাসী তার জীবনের প্রত্যেকদিনই তার কোনো না কোনোটা ভেঙে চলেছে।' নিঃসন্দেহে এর অর্থ দাঁড়ায় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা দোষীর দুর্ভোগই চিরকাল বহন করে চলে। সে হয়ে পড়ে ক্রমশ নিস্তেজ, অত্যধিক বশংবদ বা আজ্ঞানুবর্তী; ফলে তার মনে সুনাগরিকের চেতনা বিস্তার অসম্ভব— সে তো তার স্বভূমেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।

এই অঞ্চলের মেহেরা, এমনকি গোণ্ডদেরও মামলামকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হত। পুলিস ও কোর্টের চাপ তাদের ওপর কী পরিমাণ পড়ে তা আমরা দেখেছি; আরো দেখেছি বহু দূরের কোর্টে যাতায়াত, উকিলবাবু ও তাদের টাউট, দরখাস্ত লিখিয়েদের দৌরাত্ম্যের পরিণতিতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে কতটা বিধ্বস্ত হয়। আইন কানুনের জটিল ধাঁধায় তারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়; এসব আইনের মাথামুণ্ডু তারা কিছুই বোঝে না, কারণ এসবই তাদের ঐতিহ্যের, পুরনো জীবনচর্চার বিরোধী। একবার আমরা হিসেব করে দেখেছিলাম, কোনো একটা সাদামাটা মোকদ্দমা রেজিস্ট্রি হলেই অভিযুক্তকে চারজন সাক্ষীকে নিয়ে কম করে তিন হাজার সাতশ মাইল যাতায়াত করে ঝামেলা মেটাতে হয়।

সঁহওরোছাপারের অধিবাসীরা বাস করে দোকান বা বাজার থেকে বহু দূরে, ফলে ব্যবসায়িক বা বাজারি শোষণ তাদের ওপর খুব বেশি চেপে বসে না। কিন্তু এরকম সব বিচ্ছিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলের চালাক-চতুর কিছু মানুষ পুলিস ও রাজস্ব দপ্তরের বনামে সরল মানুষদের কাছ থেকে টাকা তোলে, প্রতারণা করে।

এইসব অভিজ্ঞতা নিয়ে ইচ্ছে করলে আমি একখানা ঢাউস বই লিখে ফেলতে পারি; এবং মনে হয় সেই বইয়ের এই অংশটি একেবারে আজকের বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরবে। আমি এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি কোথায় কিভাবে কী ঘটে তা বুঝবার জন্যে।

মোটামুটি অবস্থাপন্ন এক গোণ্ডের কাছ থেকে কোনো ব্যাপারী দুশো টাকার শস্য কিনল; কিনে সে তাকে একখানা 'দুশো টাকার নোট' হাতে গুঁজে দিল। সেই 'নোট'টি নিয়ে সে গেল নিকটবর্তী থানায়; না, কোনো কেস-টেস করার জন্যে নয়, নোটটা ভাঙাবার জন্যে; আর তখনই ধরা পড়ে গেল ব্যাপারীর প্রতারণা।

একদিন এক দরখাস্ত-লিখিয়ে বাক্‌পটু মানুষ আমার কাছে খুলেই বলে ফেলেছিল কিভাবে ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা উপলক্ষে গ্রাম থেকে আসা আদিবাসীদের কাছ থেকে আদায় করা পয়সায় সে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচেবর্তে রয়েছে। সে বলেছিল : 'খুব শান্তভাবে তাদের নিয়ে আমি একটু দূরে নিয়ে বসাই। অনুমোদিত চার্জ হচ্ছে

আমার দরখাস্ত লেখার পারিশ্রমিক। কিন্তু আমি আমার মক্কেলকে বুঝিয়ে বলি যে শুধু এভাবে এগোলে কোনো ফায়দা হবে না। প্রথমেই জিজ্ঞেস করি : দরখাস্তটা সাধারণ কলম দিয়ে লিখব না ফাউন্টেইন পেন দিয়ে লিখব? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাধারণত তারা চার ফাউন্টেইন পেন দিয়েই লেখা হোক; তার মানে বাড়তি বিশেষ চার্জ চার আনা। তারপর আমার কাছে থাকে দুটো বই— দুটোই আইনের বই। লাল বইটা ভাল, আমি যদি দরখাস্তটা লাল বই থেকে কপি করি তবে হলুদ বইয়ের তুলনায় আট আনা বাড়তি চার্জ পড়বে। সব সময়ে সেটাই তারা দেয়। তাছাড়া আছে আট আনা থেকে বারো আনা এক্সট্রা চার্জ— লেখার ওপর গুড় বা মিষ্টি কিছু লাগানোর জন্যে। তারপরও বাড়তি দু-এক টাকা যাতে আবেদনপত্রটি প্রকৃতই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।'

আবার একথাও সত্য, গোণ্ড আদিবাসী বা নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিঃস্বায়নের ব্যাপারটা যতটা না বাইরের দ্বারা ঘটেছে তার থেকে সম্ভবত বেশি ঘটেছে তাদেরই সংস্কার আন্দোলনের পরিণতিতে।

সেওনি ও মাণ্ডলায় তখন সংস্কারকদের এক সংগঠন ছিল; তার পুরো নাম : 'রাজগোণ্ড ক্ষত্রিয় সূর্যবংশী মহাসভা'। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধনের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য ছিল তাদের। সেই সংগঠনের প্রচারকরা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল; তাদের প্রচারণায় ছিল : গোণ্ডরা গোরুর মাংস খাবে না, এমনকি গোরু দিয়ে হালচাষও করবে না, শুয়োর বা মুরগির চাষ করবে না, মদ্যপান করবে না, মেয়েদের নাচে অংশ নিতে দেবে না। ১৯৩৯-এর ত্রিপুরি কংগ্রেস অধিবেশনে অমরা যখন একদল গোণ্ড বালকদের দিয়ে আদিবাসী নৃত্য পরিবশেন করতে চাই তখন ওই মহাসভা গান্ধীজিকে পত্রে হুমকি দেয় : ছেলেরা নৃত্যে অংশ নিলে আমরা সত্যাগ্রহ করব।

মাণ্ডলায় এক গোণ্ড সংস্কারক তার 'দরবার' বসাল দিন্দেরির কাছে। ১৯৩৬ সালের শেষদিকে লোকটি শুরু করে দিল জেলা জুড়ে সফর; তার সঙ্গে ছিল তিন-চারজন 'চাপরাশি'— তাদের একজন মুসলমান ভবঘুরে, একেবারে নেশারু। সে কতকগুলো বেশ ভারি হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ বইত, নিঃসন্দেহে সে তার একটি লাইনও পড়ে নি। এই দলটি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সভা করতে থাকে। সংস্কারক সকলকেই জানিয়ে দেয়, তার কাজের পিছনে রয়েছে সরকারি সমর্থন। তার আদেশ-নির্দেশ অমান্য করলে পুলিস তাদের শাস্তি দেবে। সে একপ্রকার অত্যাদেশ জারি করে বলতে লাগল : এই হচ্ছে নব গোণ্ড ধর্ম; এবং সকলকে স্মরণ করিয়ে দিল, প্রাচীন গোণ্ডধর্ম বাজে ব্যাপার— এই জন্যেই প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় সেগুলোকে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য করেছে। অর্থাৎ হিন্দুরা যা ঘৃণা করে সবই দোষণীয়, অতএব পরিত্যজ্য। যে কর্মনৃত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে গোণ্ড সংস্কৃতির মৌল উপকরণ, তাকেও পরিত্যাগ করতে হবে। নারী-পুরুষ একসঙ্গে দান্দারিয়া (অসাধারণ অরণ্যগীত) গানের মতো

অনৈতিক গান গাইবে না। একমাত্র করমুক্ত ছিল গৃহপালিত পশু শুয়োর ও মুরগি, তা রাখাও চলবে না; একে তো অপুষ্ট খাদ্য কোনোভাবে জোটে, তাও মহাসভার নির্দেশে হ্রাস করতে হবে। অতি অবশ্য সম্পূর্ণ মদ্যপানবর্জিত হতে হবে গোণ্ডদের। মেয়েদের পর্দার আড়ালে থাকতে হবে। অস্পৃশ্যতার নিয়ম-বিধি মেনে চলতে হবে। হিন্দুদের মতো সন্তানদের শিশু বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। গোরুকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে; আর গোরুর কাঁধে জোয়াল চাপানো চলবে না।

কেউ যদি এই বিধিবিধান লঙ্ঘন করে তবে তার গুরুতর জরিমানা হবে এবং, এই জরিমানার ব্যবস্থা করেছেন সরকার বাহাদুর। কর্মনৃত্যের জরিমানা পঞ্চাশ টাকা, মদ্যপানের জরিমানা পঞ্চাশ টাকা, শুয়োর পুষলে জরিমানা পঁচিশ টাকা, গোরু-বলদের কাঁধে জোয়াল চাপালে জরিমানা দশ টাকা— এরকম সব জরিমানার ব্যবস্থা। প্রতিদিনই জরিমানা আদায় হত। এক পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর এই আন্দোলনে মদত দিয়েছিল। এই আপাত তুচ্ছ ব্যাপারটা পল্লবগ্রাহী গল্পে পরিণত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল : সরকার অমুক গোণ্ডকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেছে একটা কাক মারার জন্যে,—মুরগি মারলে কত টাকা জরিমানা?...

তো এই আন্দোলনটা সমস্ত জেলাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে; দেখা গেল শত শত গোণ্ড পবিত্র পৈতা ধারণ করছে, চার আনা করে প্রণামী দিচ্ছে সংস্কারককে। এই সংস্কারসাধিত গ্রামগুলোয় নেমে এসেছিল অবর্ণনীয় হতাশা ও বিমর্ষতা। 'শিবরাজ' প্রতিষ্ঠিত যেন, মহান নর্তক নটরাজন সকম্পে নাচছেন। দিনান্তের শেষের দীর্ঘ সায়াহ্নে বউদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা ছাড়া পুরুষদের আর কিছু করার নেই; আর বউঝিরাও তাদের এই স্বাধীনতাহীনতায় প্রত্যক্ষত অপমানিত। যেসব অসুস্থ গরিব মানুষ চাঙা হবার জন্যে তাদের একমাত্র সম্বল টনিকের— সামান্য একটু মদের প্রত্যাশা করত তা থেকেও তারা বঞ্চিত। আদিবাসী উৎসবের সেই 'জৌলুস' নেই, 'তেজ' নেই— আদিবাসী ভোজের সেই খুশবুটাও উধাও। গোণ্ডরা ভাবল : 'পশু ছাড়া আমরা আর কি। দুদিনের এই জীবনে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু ছিল তা নিয়েই আমরা মানুষ ছিলাম; আমাদের সুন্দর নাচ ছিল, গান ছিল, আমাদের হাঁড়িয়া-মদ ছিল। এখন সবই চলে গেছে, আমরা এখন পশুরও অধম। আমাদের খাদ্যটা অবধি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে; আনন্দ বিনোদন কিছু নেই— আছে শুধু পরস্ত্রীগমনের মতো পাপাচারের সুযোগ।'

তবে বছর দুয়েকের মধ্যেই এই সংস্কারক লোকটি গ্রেপ্তার হয় এবং প্রতারণার দায়ে তার কারাদণ্ডও হয়। তারপর অনেক গ্রামেই স্বাভাবিক পুরনো জীবনযাত্রা ফিরে আসে, কিন্তু কেমন যেন ছন্দহীন নিরাবেগে। আবার আরো কিছু প্রচারক এদিকে-সেদিকে প্রচার কাজ চালিয়েও যাচ্ছিল; অপরের হিতার্থে পয়সা কামানোটা এক সহজ উপায়। অন্যদিকে গোণ্ড জেলার পুবদিকে নৃত্যগীত সম্ভবত চিরকালের জন্যেই স্তব্ধ

হয়ে গেছে। সামাজিক বিকালের জন্যেই এগুলো পরিত্যাগ করা আবশ্যক— এরকম এক আত্মঘাতী ধারণা থেকেই এটা ঘটেছে।

পরবর্তীকালে একই ধরনের আন্দোলন আমি বাস্তারেও দেখেছি; তার কতকগুলো আরোপিত, বহিরস্থ, আবার অনেকগুলো ভিতর থেকে ওঠা, যেন স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ। সরকারি হিন্দু অফিসারদের পক্ষ থেকে হঠাৎ-হঠাৎ চেষ্টা হয়েছে গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধকরণের। আবার বিপরীতক্রমে, চান্দা বা জয়পুরের সীমান্ত ধরে ঘুরে বেড়ানো এক সমাজকর্মী বাস্তারের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বস্ত্রহীন নিরাবরণতায়, তাদের স্বভাবজ আনন্দ ও স্বাধীনতায়, আর অনিবার্যভাবে, মারিয়া ঘোটুলের সহজিয়া রতিক্রিয়ায় কলঙ্কই বোধ করত।

একবার একটা গুজব সমগ্র কোরাপুটের আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে— সেখান থেকে সেটা বাস্তারে আসে : দেবতা পূর্বঘাটের এক পর্বতে অবরোহণ করছেন; তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য মানুষকে নিষেধ করা যাতে কেউ যেন কোনো কালো মুরগি না পোষে, কালো ছাগল না রাখে, সর্বদা বস্ত্র পরিধান করে থাকে, ছাতা ও কম্বল ব্যবহার করে—(তবে যে কম্বলে কালো পুঁতি আছে সেগুলো বাদ দিয়ে) এবং অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন ব্যবহার করে। দেখতে না-দেখতে কালো ছাগল, কালো মোরগ-মুরগি, ছাতা-কম্বল-পুঁতিতে পথঘাট ভরে গেল। আর সেই সুযোগে একটা গানের বিনিময়েই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সেগুলো হাতড়ে নিতে লাগল।

সঁহওরোছাপারে অবস্থানের শেষপর্বে সেখানকার কয়েকজন উদারমনা সরকারি অফিসারের সঙ্গে আমার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন আর আমার ওপর পুলিসের নজরদারি নেই। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদে আমাকে নিযুক্ত করা হল। সেটা গ্রহণ করা আদৌ সুবিবেচনার কাজ হয়েছিল কিনা, সেই সংশয় আজো আমার মধ্যে রয়েছে। নিঃসন্দেহে কিছু কারণ আমাকে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে আমার পক্ষে বাস্তবত আর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না; কারণ ইতিপূর্বেই ইন্ডিয়া অফিসে আমি সেমতো অঙ্গীকর করেছি। অন্যদিকে পুলিস, বনদপ্তর ও অন্যান্য বিভাগের বাধাদান ও হস্তক্ষেপের ফলে আদিবাসীদের সপক্ষে কল্যাণকর কোনো কাজ করাও ক্রমশ মুশকিল হয়ে পড়ছিল। তবে কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবির ন্যায্যতা নিয়ে আমার মনে কোনো সংশয় জাগে নি; ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাও পাল্টায় নি— তবে তখন তাঁকে ক্বচিৎই দেখার সুযোগ পেয়েছি। আর চূড়ান্তে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শৌখিন কোনো রাজনীতিকের তুলনায় আদিবাসীদের পক্ষের 'লোক' হিসেবে আমি ভারতবর্ষের বেশি সেবা করতে পারব।

গ্রিগসন, তাঁর কথা পরে আরো বিশদভাবে আসবে, তিনিই কয়েকজন সরকারি আমলা ও তাঁদের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা সকলেই আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জন স্টেন্ট

এবং অতুলনীয়া পামেলা স্টেন্ট, বিচারপতি রোনাল্ড পোলক, প্যাট ও মেইত্তি হেমেওন, পুলিসকর্তা ওজেন এবং সি. ডি. দেশমুখ। শেষোক্ত এই সি. ডি. দেশমুখ তখন ছত্তিশগড়ে কর্মরত ছিলেন— পরবর্তীকালে তিনি ভারতের জনজীবনে খুবই খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের এক সময়ের গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস উইলে। একবার তিনি আমাকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করে নিয়ে গিয়েছিলেন পশ্চিম ভারতের ডাং আদিবাসীদের মধ্যে। সেই একবারই আমি জীবনে ওই ধরনের স্পেশ্যাল ট্রেনে চড়েছি। মাননীয় উইলে ছিলেন উদ্যমী আইরিশ, বেশ লেগেছিল তাঁকে। আমার রাজনৈতিক উত্তেজক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছিলেন তা এখনো আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন : 'ভালোবাসায় বা আবেগে তুমি যা একদা করেছিলে তার জন্যে ভেরিয়ার লজ্জা বোধ করো না।'

ছয়

সঁহওরোছাপারে চার বছর ছিলাম। আমাদের শেষতম আবাস পাটানগড়ে। এই স্থানপরিবর্তনের পিছনে স্বাস্থ্যগত কারণ তো ছিলই, তাছাড়া এমন একটা স্থান নির্বাচন করতে চেয়েছি যেখান থেকে অন্যান্য আদিবাসী ভারতে যাতায়াতে সুবিধে হয়; আর পাটানগড়কে একটু বেশিই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

বিস্তৃত উন্মুক্ত পর্বতমালার ওপর উৎক্ষিপ্ত একটা পাহাড়; সেই পাহাড়টির ওপর মনোমুগ্ধকর একটি গ্রাম, পাটানগড়। চারিদিকে মাইকাল রেঞ্জের ঠাসাঠাসি পাহাড়-পর্বত। সামনে লিঙ্গ-পর্বতের প্রতিসম এক অসাধারণ দৃশ্য। পবিত্র নর্মদার দূরত্ব মাত্র আধমাইলের মতো, আবাস থেকে আমরা তার স্বচ্ছ জলধারা স্পষ্ট দেখতে পাই। সর্বক্ষণ নির্মল হাওয়া বইছে। করনজিয়া বা সঁহওরোছাপারের তুলনায় এখানকার তাপমাত্রা অন্তত পাঁচ ডিগ্রি শীতল। শুধু গ্রামটাই সুদৃশ্য নয়, তার অধিবাসীরাও ছিল অনেক বেশি প্রাণবন্ত, আমোদপ্রিয়, অন্যান্যদের তুলনায় বন্ধুবৎসল। প্রতিবাসীদের অধিকাংশই পরধন; আর ছিল স্ফুর্তিবাজ, রোমান্টিক চিত্তবিনোদনকারী কিছু গোণ্ড। 'পাহাড়ের ফুলমত' ছিল এক পরধান।

পাটানগড়ে আমরা দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, দোকান, অতিথিশালা এবং আমাদের মূল দপ্তর গড়ে তুলি। সেই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিল একটা স্কুল, কুষ্ঠাশ্রম, ছোট একটি ডিসপেনসারি। বাজারটা সঁহওরোছাপারে অনেকদিন ছিল; তারপর ধীরে ধীরে সবকিছুই আমরা পাটানগড়ে নিয়ে আসি। আমাদের আবাসের ঠিক উল্টোদিকে পাহাড় শীর্ষের একটা সমতল ভূমিতে কুষ্ঠাশ্রমটি স্থাপন করি।

নতুন এই কেন্দ্র স্থাপনে কিন্তু বেশ ঝামেলা দেখা দিয়েছিল। জমিদার আমাদের প্রথমে যেতে আহ্বান জানালেন, তারপরই কিন্তু এক নোটিশ জারি করে জানালেন, আশ্রম গড়া চলবে না— অবিলম্বে ছেড়ে চলে যেতে হবে। শেষে কিন্তু তিনি মার্জনা

চেয়ে নিজেই আমাদের আশ্রম গড়তে দিয়েছিলেন। আজব মানুষ। তারপরই আশ্রমের জন্যে আমরা এক অসাধরণ সুন্দর জায়গা পছন্দ করে ফেলি; তার চারদিকে রয়েছে প্রাচীন বৃক্ষরাজি। আশ্রম গড়ার কাজ তো শুরু করে দিলাম, কিন্তু দেখা গেল ওই বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটা বৃক্ষ ছিল ঠাকুর দেওর বাড়ি, আর একটি বৃক্ষ গাঁ দেবীমাতার অশরীরী গমানগমনের প্রতীক; একদিন অভূতপূর্ব এক ঘূর্ণিঝড় (অপদেবতার ভর!) আমাদের পাহাড়টার ওপর দিয়ে বয়ে যেতেই গ্রামের মুরুব্বিরা স্বপ্নে দেখল : দেবী বিমূঢ়া, তাঁর চুল আলুথালু, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে— আমাদের আশ্রমের ঘরবাড়ি গড়ে উঠছে আর তিনি পথভ্রান্ত উন্মাদিনীর মতো এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছেন।

আমরা তাই বাড়িগুলো কাঠামোসহ তুলে নিয়ে অন্যত্র বসিয়ে দিই— একইরকমের সুদৃশ্য পটভূমিতে, কিন্তু সেখানে প্রাচীন কোনো বৃক্ষ ছিল না। সেখানেও অবশ্য আমরা ভূতের ঠোক্কর খেয়েছি; তাসত্ত্বেও স্থানীয় মানুষের সংবেদন ও বিশ্বাসের প্রতি মর্যাদা দেখিয়েছি; তাছাড়া তো সরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

পাটানগড়ে নতুন বসত নির্মাণের জন্যে সঁহ্ওরোছাপার থেকে ঘরবাড়িগুলো আমরা তুলে নিয়ে আসি। এতে আমাদের ব্যয় অনেক সাশ্রয় হল। কারণ বেশির ভাগ কাঠ, বাঁশ ও বাঁশের বেড়া আমরা নিয়ে যেতে পেরেছি, অবশ্য খড়গুলো ফেলেই যেতে হয়েছে। ইতিপূর্বেই বলেছি, মাটির ঘরে বসবাসের এটাই মস্ত সুবিধে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়পর্বটাই আমি মধ্যভারতে ছিলাম।

আর্থার কেস্‌লার-এর মতো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে হয়তো আমিও আমার জীবনযাপন পদ্ধতির জন্যে খানিকটা লজ্জা বোধ করতাম। তবু বলতে দ্বিধা নেই, বিচ্ছিন্ন দূর প্রান্তের এক গ্রামে জীবনযাপন খুব সহজ ব্যাপার নয়।

যুক্তিবিন্যাসেও বলা যায়, গ্রামে আমাদের দিনযাপনও ছিল যুদ্ধাবস্থারই মতো। প্রতিরাতেই ছিল ব্লাক-আউট—কারণ লণ্ঠন কেনার সামর্থ গ্রামবাসীদের ছিল না; মেসারকেমিড-এর থেকেও সর্বনাশা ঝাক-ঝাক মশা পরাভুক জীবাণু বহন করে নিয়ে আসত, প্রতিবছরই যার পরিণতিতে হাজার কয়েক মানুষকে মারা পড়তে হয়েছে। খাদ্য সরবরাহে রেশন ব্যবস্থা তো আগাগোড়াই ছিল; সত্যি কথা বলতে কি, গ্রামের মানুষের তো খাদ্যেরই কোনো সংস্থান নেই। বছরের চার মাসই বৃষ্টি, সেই পিচ্ছিল কাদামাটিই বাস্তবত অবরোধ গড়ে তুলত গ্রাম আর বহির্জগতের মধ্যে।

যুদ্ধে-নেমে-পড়া যে কোনো ইউরোপীয়ানেরও জীবন-প্রত্যাশা এক গোণ্ডের তুলনায় বেশি; যে অসুখবিসুখ আমাদের গ্রামগুলোকে তছনছ করে দিত সেগুলো কিন্তু বোমা বা গ্যাসের থেকে কম বিধ্বংসী ছিল না। মানবজাতির চরম শত্রু ক্ষুধা ও ভয়ের, দারিদ্র ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমরা গড়ে তুলছিলাম ভালবাসা ও সহানুভূতির এক বাহিনী। আশ্চর্য এক পাগলামি গোটা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল; আর

তারই জন্যে আমরা যদি আমাদের কাজ থেকে নিবৃত্ত হতাম সেটা হত চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

এই যুদ্ধ বিষয়ে গোণ্ড ও বাইগাদের ধারণাও ছিল বিচিত্র। এক বৃদ্ধা বেশ গুছিয়ে আমাদের সেটা বলে : 'বোঝো, এভাবেই ভগবান তাঁর ন্যায়বিচার করে থাকেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই খিদেতে, অসুখে বা হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে মরে যায়। তোমাদের ইংরেজ ছেলেমেয়েরা সুখে স্বচ্ছন্দে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবান তাদের ওপর পাগলামির অভিশাপ দেন; আর তাই দ্যাখো, শেষমেশ তাদের সব বিদ্যে বুদ্ধি, ধর্ম সবই অর্থহীন হয়ে গেল। বুঝলে, সবাই আমরা সমান!'

কোনো বিবাদ দেখা দিলেই আদিবাসী মানুষ সব সময়ে সাহায্য করতে চায়। তো একদিন একদল বাইগা ছুটে এল আমার কাছে এক বাণ্ডিল তীর-ধনুক নিয়ে— 'যুদ্ধ' নামক এই বিবাদে সাহায্য করতে ওগুলো সরকারকে পৌঁছে দিতে হবে আমাকে। আমি তাদের বলি, আজকালকার যুদ্ধে এসব পুরনো অস্ত্র আর ব্যবহার করা হয় না। শুনে তারা দুঃখ পেল, মন খারাপ হয়ে গেল তাদের; বলল : 'যদি বন্দুক ছোঁড়ে তবে মানুষগুলো তো সত্যি সত্যি মরেই যাবে।' আবার কিছু গোণ্ড নিয়ে এসেছিল তাদের প্রাচীন তরবারি। এক বাইগা জাদুকর তৈরি করেছিল তাদের ভাষায় যাকে বলে 'খুয়া'— বশীকরণের জাদুক্রিয়া। কাঁটা-আগাছা হচ্ছে হিটলার, নদীর তীরে মাটির গর্তে তাকে সমাধিস্থ করা হল; আর গর্তমুখের পাথরটা হচ্ছে তার পুনর্জাগরণ রোধের প্রতীক। একদিন কোনো এক কাজে আমি বাইরে যাচ্ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গুজব রটে গেল, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে গেল, আমাকে বিদায় জানাতে এসে তারা শোনাতে লাগল · হিটলারের বোন, মা-কাকিমা-জেঠিমা-মামি ও পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের প্রতি আমার আচরণ কেমন হওয়া উচিত!

নেফায় যাবার আগে অবধি, এমনকি নৃতত্ত্ব বিভাগে আমি যখন কর্মরত তখনো পাটানগড়ই ছিল আমাদের মূলকেন্দ্র। সেই গ্রামটি আমার মানসপটে এক মধুর স্মৃতি হিসেবে অমলিন গাঁথা রয়েছে এবং চিরকাল থাকবেও। সব সময়েই একটা শূন্যতা বোধ হয়, সেই গ্রামটি নেই, তার মানুষজন কেউ নেই। আমার স্ত্রী লীলার অভিজ্ঞতাও একই রকম; তাছাড়া সে তো ওই গ্রামেরই মেয়ে।

বিশেষ করে আমি তীব্র অভাব বোধ করি সেই মূল আবাসটির জন্যে,— গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই বাড়ি-ঘরগুলো তো আমিই গড়িয়ে ছিলাম। বিশাল বড় একটা মাটির বাড়ি, উপরে খড়ের ছাউনি। এটি নির্মাণের কাজে আমার বাড়তি কৌতূহল ছিল বিশেষ এক কারণে। এই বাড়িটার কোনো বাহিরমুখী দরজা ছিল না, তবে ভিতর ঘরের দরোজাগুলোয় বাইগা কার্ভিংএর দারুণ অলঙ্করণ ছিল। আমাদের আদিবাসী বন্ধুদের উদ্দেশে সে এক শ্রদ্ধার্ঘ্য; শহরাঞ্চলে সেরকম বাড়ি তৈরি সম্ভব নয়। আদিবাসীরা দিন-রাতের যে কোনো সময়ে আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চলে

আসত, থেকে যেত। গোটা বাড়িটাই ছিল একটা মিউজিয়ামের মতো; ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত নানা জিনিস, পাত্রে পাত্রে রেখে সেই পাত্রগুলো মাটির মোটা দেয়ালের খোপে খোপে সাজিয়ে রাখা ছিল। ফলে এই বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল স্থানীয় আদিবাসী শিল্পকলার এক প্রদর্শশালা।

ভারতের এই অঞ্চলের গোণ্ড ও পরধানদের যে শিল্পকলাটি আজো সজীব প্রাণময় তা হচ্ছে মাটির বাড়ির দেওয়াল ভাস্কর্য ও অলঙ্করণ। আজো চোখে পড়বে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির,— সেখানে আর কিছুই নেই রয়েছে শুধু নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা আর অসাধারণ মুরালের অলঙ্করণ। আমরাও তাই স্থির করেছিলাম, আমাদের বসতবাড়ির সব দেয়ালগুলোতেও সেরকম অলঙ্করণ থাকবে। কাজটা ছিল বিশাল, প্রায় ছ'মাস সময় লাগল। কাজ করত যেসব শিল্পী তারা বেশির ভাগই বৃদ্ধা মহিলা; তাদের আরো অনেক গেরস্থালি কাজ থাকে। কিন্তু আদিবাসী শিল্পীরাও অন্যান্য শিল্পীদের মতোই সংবেদনশীল, মেজাজি। তবে কি অন্যদের মতো টাকার বিনিময়ে বা দেখানদারির জন্যে তারা তাদের শিল্পকর্মের উত্তরাধিকার বহন করত না।

এক মহিলা দুদিন কাজে এল, অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য তার, কিন্তু তারপরই সে বেপাত্তা। তার আত্মীয়রা তাকে সতর্ক করে দিয়েছে : এ-কাজ করলে স্থানীয় কোনো হিংসুটে ডাইনি তাকে বশ করে ফেলতে পারে। সত্যিই সে দু-এক সপ্তাহের জন্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমার ধারণা, সেটা মানসিক কারণে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে কাজে ফিরিয়ে আনি, এসেই সে দারুণ সব নকশা তৈরি করল। আর একজন বৃদ্ধা রমণী দূর গ্রাম থেকে আসত, অলঙ্করণের কাজে তারই ছিল সর্বাধিক খ্যাতি; মহিলাটি ছিল খুবই স্নেহময়ী, কাজে ছিল অসাধারণ একাগ্রতা, আর কাজ করে গর্ববোধও হত তার খুব। কিন্তু কিভাবে আমরা তাকে আগলে রাখি! প্রায়ই তার গ্রাম থেকে লোক আসে, তাকে শোনায় অমুকের বিয়ে, অমুকে মারা গেছে,— তার গরু বনে হারিয়ে গেছে, তার নাতনিটা তার জন্যে কেঁদে কেঁদে আকুল— চলো গ্রামে যাই। সে কিন্তু অনড়; যে-কাজে সে হাত দিয়েছে তাতে সে এতই মগ্ন যে কাজ শেষ না করা অবধি সে কোথাও যেতে রাজি হল না। নিঃসন্দেহে তার মধ্যে প্রকৃত সৃষ্টিশীল শিল্পীসত্তা সজীব ছিল। ক্যানভাসে ছবি আঁকার আগে যেমন শিল্পী করে থাকেন ঠিক তেমনি তারও একান্ত বৈশিষ্ট্য ছিল প্রসারিত দু বাহু দিয়ে দেয়ালটিকে আলিঙ্গন করার; যেন সেই দেয়ালটিকে সে ভালবাসে, এবং যে সৌন্দর্য সেখানে ফুটিয়ে তুলবে তাকেও সে ভালবাসে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে বছর দুয়েক বয়সের একটি আদিবাসী শিশুর কথা; গানের খুব অনুরক্ত ছিল বাচ্চাটি; ট্রানজিস্টর রেডিওতে গান শুনতে পেত বলেই প্রত্যেকবারই রেডিওটা পেরোবার সময় শিশুটি রেডিওটাকে চুমো খেত।

দেখতে দেখতে মাটির দেয়ালগুলোর ভরে উঠল আদিবাসী বীর, পাখি, জীবজন্তু, কাঁকড়া-বিছে, পাহাড়-পর্বত, নাচনি আর তীব্র গতিময়তার প্রতীকে প্রলম্বিত পায়ের

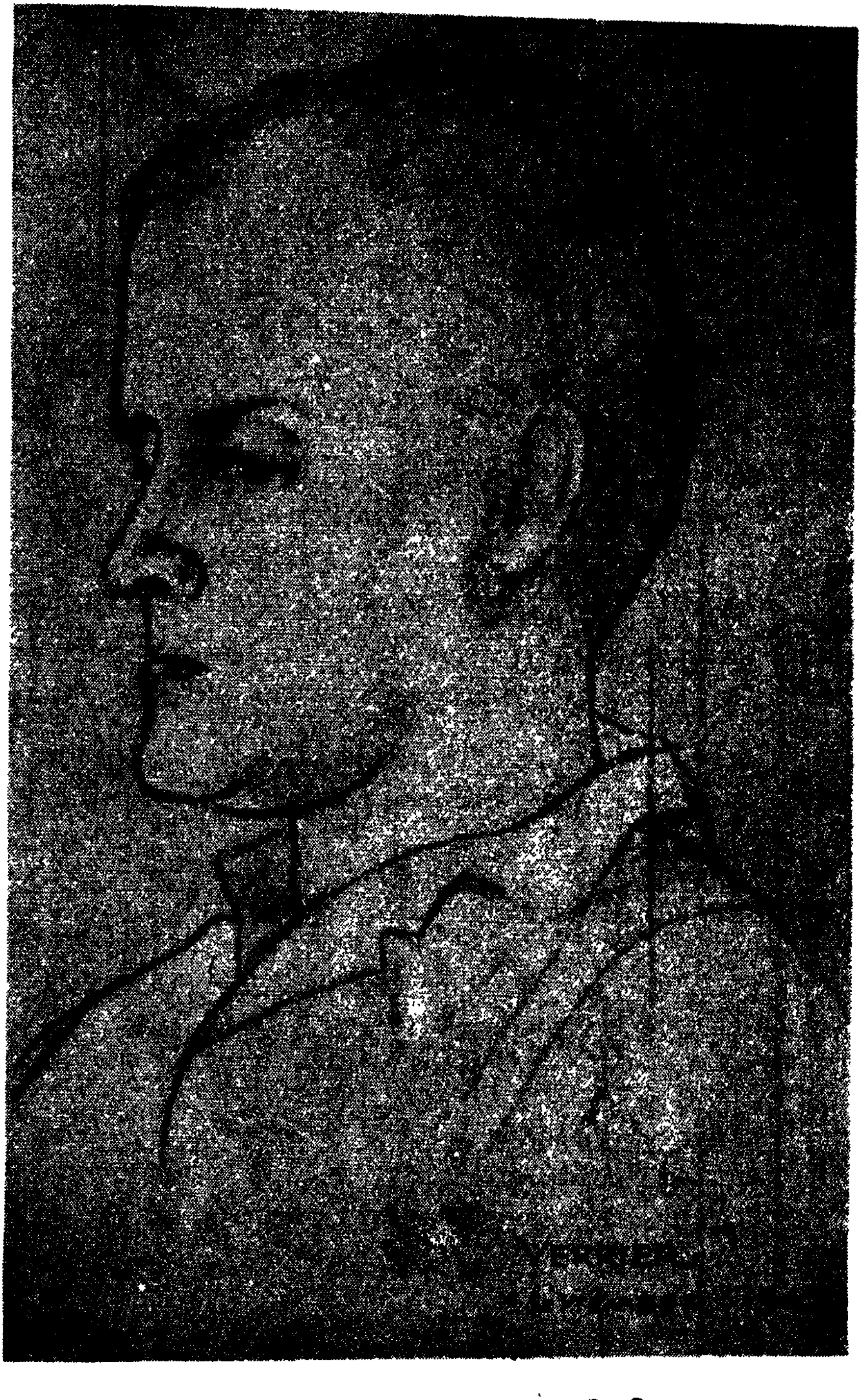

১৯৪২এ লেখক (মেইড উড-এর আঁকা প্রতিকৃতি)

গোন্ড ও পরধান শিশুদের সঙ্গে লেখক, ১৯৪৪

হরিণের সচিত্র অলঙ্করণে। আবাসের ডিসপেনসারি অংশে আঁকা হল কিভাবে আদিবাসী চিকিৎসক তার উপকরণাদি ব্যবহার করত, আবার তার ঠিক বিপরীত দেয়ালে চিত্রিত হল কিভাবে ডাক্তার রুগীর তলপেটে সূঁচ ফোটায়। বাথরুমের দেয়ালে আঁকা হয়েছিল প্রায় ফুট তিনেক উঁচু জলকন্যাদের মূর্তি— তাদের মাথায় কলসি, পায়ের কাছে কুয়ো।

এই গোণ্ড শিল্পকলার বৈশিষ্টে ছিল প্রতীকের ব্যবহার — অতি সরল উপায়ে প্রতিনির্মাণ : পাখি বোঝাতে শুধু ডানা, বা নাচ বোঝাতে শুধু নাচনির পাদুটির উপস্থাপন। প্রতিসাম্য, সামঞ্জস্য কিংবা সরল রেখার ধারণাটা খুব সম্ভব গোণ্ডদের ভাল জানা ছিল না। তো একদিন প্রসঙ্গটি একজনের সামনে তুলতেই সে বলল : 'বনের গাছ তো কখনো সোজা উপরে ওঠে না— গাছের ডালপালাগুলোও তো দুদিকে সমানভাবে বাড়ে না। দেয়ালের নকশাগুলো বনের মতোই।' বাস্তবিকই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই ছিল, এবং তা কম আকর্ষণীয়ও হয় নি।

ঘরের দেয়ালগুলো ছাউনি পর্যন্ত ওঠানো গেল না; শিল্পীরা চাইল, দেয়ালের মাথায় কার্নিশের মতো কারুকাজ করতে। সে ছিল এক দারুণ মজার ব্যাপার। প্রত্যেকেই চাইছে মাটির পশু-পাখির মডেল তৈরি করতে। একদিন সকালে বছর বারো বয়সের এক বালক এসে হাজির; সে তার বালকমনের কল্পনার অসাধারণ সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে লাগল। সে এক মস্ত হাতি গড়ল, হাতির মাথায় মুকুট পরাল, পিঠে হাওদা দিল— একেবারে এক গণপতি। কট্টর মূর্তিবিশারদগণ হয়তো দুঃখ পাবেন, কিন্তু হিন্দুর উপাস্য দেবতা কী রূপে আদিবাসী ধারণায় মূর্ত হয়ে ওঠে তার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল সেটি। তাছাড়াও বালকটি মাটির উট, মোটরগাড়ি, লেজ-গোটানো বাঘের মডেল তৈরি করেছিল। আর পাখির এমনই সব মূর্তি নির্মাণ করল যে মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো বাস্তবিকই আকাশে উড়তে পারে। কিন্তু ভাবুন, সবকিছুই বালকটি তৈরি করেছিল ভিজে নরম মাটি ছেনে, আর তার সঙ্গে ভুট্টার ভুসি মিশিয়ে।

এই বাড়িটা এবং আশপাশের যেসব বাড়িতে আমরা বাস করেছি সেখানে ছিল ভালবাসা ও মমতার এক পরিমণ্ডল; তা শুধু আমাদের তরফেরই নয়, সকলের। দিন বা রাতের যে কোনো সময়ে এসে স্বাভাবিকভাবে উঠত যারা, কোনো সৌজন্য-রীতি নিয়ম যাদের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না, তাদের প্রত্যেকের কাছেও এই গৃহ-পরিমণ্ডলটি ছিল ভালবাসার। এভাবে যে আদিবাসীরা আমাদের এখানে যখন তখন চলে আসে, থাকে এটা কিছু সংখ্যক অফিসার ও অনাদিবাসী ব্যক্তির কাছে ভাল ঠেকেনি; ফলে বর্হিজগতে ছিল ঈর্ষা, এমনকি ঘৃণা ও অবজ্ঞাও। তাদের মনে হত, এভাবে আদিবাসীদের প্রশ্রয় দিয়ে আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বনাশ করছি; এরকম চললে, আমাদের এই প্রশ্রয়ে তাদের উর্ধ্বতনতার বা বড়মানুষির দুর্গ সামলে রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু এহ বাহ্য! চার দেয়ালের ভিতরে কিন্তু আদিবাসী বন্ধুদের

সহজিয়া আচরণ আর প্রাণশক্তির উত্তাপে আমরা বাস্তবিকই ওসব তুচ্ছ ব্যাপার ভুলেই গেছি।

মাঝে মাঝেই আমরা আসরের ব্যবস্থা করতাম; এবং সব আসরের শেষে সাধারণত নাচের আয়োজন থাকতই। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, আদিবাসীরাও আবার আমাদের জন্যে পাল্টা-আসরের ব্যবস্থা করত। মাগুলার গ্রামের তাদের সেই আসরগুলোয় ছিল বাড়াবাড়ি উদ্যোগ ও ব্যবস্থা— আমন্ত্রণকারীরা নিজেদের বাড়িঘর সাফসুফো তো করতই তাছাড়া সারাদিন ধরে চলত ভোজের রন্ধনকর্ম; তবে নিঃসন্দেহে আহার্যগুলো খুবই সুস্বাদু হত। নৈশাহারের সময় হতেই একদল লোক চলে আসত আমাদের নিয়ে যেতে। তাদের মধ্যে বলশালী যুবকটি আমাকে পিঠে তুলে নিত, তেমনি অপর একজন শামরাওকে পিঠে নিত; সামনে হেঁটে চলত মেয়েরা, হাঁটতে হাঁটতে মেয়েরা গেয়ে চলত শুভাগমনের গান; তারপর এক সময়ে আমরা পৌঁছে যেতাম নির্দিষ্ট আমন্ত্রণকারীর বাড়িতে। নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সিতেও গ্রামবাসীদের অতিথি আপ্যায়নের মাত্রা ছিল আপ্লুত হবার মতো। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে একইদিনে ছ-সাতজনের বাড়িতে নিমন্ত্রণে দুপুরের খাবারে যেতে হয়েছে; গ্রামের কোনো মাতব্বরই আমাদের নিষ্কৃতি দিতে নারাজ। এরকম সব অনুষ্ঠানে গিয়ে বিচিত্র সব খাদ্যও আমাকে খেতে হয়েছে : বণ্ডো পাহাড়ে ধেড়ে বা ছোট ইঁদুরের রোস্ট, মুরিয়াদের লাল পিঁপড়ের চাটনি, চর্বিতে ভাজা গুরুপাক তালগাছের শূক ইত্যাদি খেতে হয়েছে; আর কাবুই নাগাদের পাহাড়ি চাল ও কুকুরের মাংসের পোলাও তো অসংখ্যবার খেয়েছি। খুবই সুস্বাদু খেতে।

আদিবাসীদের আতিথেয়তাগ্রহণ (বাড়াবাড়ি ধরনের না হলে) এক ইতিমূলক ব্যাপার। একতরফা সাহায্য, পৃষ্ঠপোষণা বা কল্যাণবিধানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটায়, পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক বিন্দুতে পৌঁছানো যেখানে আদিবাসীরা শুধু আর প্রাপক বা গ্রহীতা মাত্র থাকিবে না, তারা নিজেরাও কিছু করতে চাইবে, করে গর্ববোধ করবে; নিঃসন্দেহে এটা এক বড় পর্যায় অতিক্রমণ। আমাদের আদিবাসী বন্ধুদের আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা ছিল উষ্ণ ও উদ্দীপক; তা বিশেষভাবে দেখেছি মধ্যভারতে ও নেফায় আমার অসুস্থতার সময়ে। পাটানগড়ে থাকতে একবার আমার সেপ্টিক ফোঁড়া হয়, ডিসপেনসারি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে সারাতে চেষ্টা করি। কোনো উপশম হল না; না হবার কারণও ছিল, ডিসপেনসারি ভুলবশত অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেটের পরিবর্তে একইরকম দেখতে মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়ার ট্যাবলেট দিয়ে ফেলেছিল। ফলে অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল— প্রবল জ্বর আর তীব্র যন্ত্রণা। এদিকে তখন বর্ষার প্রবল বর্ষণও চলছে, কোনো মোটরগাড়ির ব্যবস্থা সম্ভব নয়, একমাত্র উপায় আমাকে বত্রিশ মাইল বয়ে নিয়ে যাওয়া, তারপর

হয়তো জুটতে পারে একটা গাড়ি। নিকটতম হাসপাতালের দূরত্বও সেখান থেকে আরো নব্বই মাইল। আদিবাসী বন্ধুরা আমাকে ডুলিতে চাপিয়ে পথে নামল,— কখনো মুষলধারে বৃষ্টি, কখনো রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তারা আমাকে বয়ে চলছিল; তাদের সহৃদয়তার কথা, কোমল চিত্তের কথা আমি কি জীবনে ভুলতে পারব? আমাদের অতিক্রম করে যেতে হয়েছে স্রোতোস্বিনী নদী; ডুলির বাহকরা গলা অবধি জলে নেমে, মাথার ওপর ডুলি তুলে নদী পেরিয়েছে— আমি যেন কোনক্রমে ভিজে না যাই। হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছনোর পর ডাক্তাররা বলেছিলেন, আর কয়েক ঘন্টা দেরি হয়ে গেলেই রক্তে বিষক্রিয়া কিছুটা ঘটে যেত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন হওয়ায় আমি সেরে উঠি। নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেই হয়, আদিবাসী বন্ধুরা সে-যাত্রায় আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

এখানে স্বতন্ত্রভাবে কোনো আদিবাসী বন্ধুর কথা বলিনি, বলিনি ইচ্ছে করেই। তারও বিশেষ কারণ রয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ পছন্দের ব্যাপারটা তো থাকতেই নেই, আর আদিবাসী সমাজে মানুষের সঙ্গে থেকে দেখেছি একেবারে নতুন ধরনের এক সম্পর্ক। যেমন মুরিয়া ঘোটুলে সকলেই বন্ধু— সরদার বা কোটোয়ারের সঙ্গে হয়তো প্রয়োজনের কারণে মেলামেশা একটু বেশি হতে পারে কিন্তু বন্ধুত্বটা হবে সর্বজনীন। প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে নিঃসন্দেহে কিছু ছেলে-মেয়ে রয়েছে যারা অন্যদের থেকে খেলাধূলায়, সৌন্দর্যে, বুদ্ধিতে, কৌতুকবোধে বা নাচের প্রতি আগ্রহে স্বতন্ত্র বা আলাদা। তেমনি কিছু বয়স্ক মানুষও তাদের চেহারা, জ্ঞানবুদ্ধি, বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি আগ্রহ বা আমাদের প্রতি কী করেছেন তার নিরিখে পৃথক সম্ভ্রম দাবি করে। এরকম বহু মানুষের নাম মনের মধ্যে ঘুরপাক খেলেও আমি বলব, সাধারণভাবে সকলেই ছিল আমাদের বন্ধু; আর এখানেই নিহিত রয়েছে আদিবাসী জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য : সাধারণ জীবনযাপনের আত্মসর্বস্বতা, ভোগাসক্তি বা কেতাদুরস্ত আয়াসী মানুষের সাহচর্যের জন্যে ঈর্ষাবোধের থেকে আপনি অনায়াসে সবে যেতে পারেন আরো ব্যাপ্ত ও সর্বজনীন এক জীবনবৃত্তে।

অন্যদিকে আবার, মাণ্ডলার গ্রামে কারো না কারো সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতাতেই হত। কাউকে আপনি মহাপ্রসাদ (যেমন আমার ক্ষেত্রে বাইগা পুরোহিত মাহাতু ছিল) হিসেবে বেছে নিলেন, কাউকে বাছলেন সখী হিসেবে (পাণ্ডাবাবা; *লিভস্‌ ফ্রম দি জাঙ্গল* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে), তাছাড়াও আপনি বেছে নেবেন জাওয়ারা ইত্যাদি। শামরাও এবং আমি এত বেশি সংখ্যক এমতো কুটুম্বিতা পাতিয়েছিলাম যে তার ফলে সাধারণ সম্পর্কটা কখনোই বিঘ্নিত হয়নি: পুরো গ্রামটাই আমাদের সখী বা জাওয়ারা।

আর এজন্যেই আমি (যেহেতু সর্বদাই আমি একটা প্রতীকের খোঁজ করে থাকি) নামী গোষ্ঠীপতি সোগেডার পরিবর্তে সাধারণভাবে সাওরাদের নিয়ে কিংবা

আমোদপ্রিয় মিলিয়ার পরিবর্তে সমগ্র বগোদের নিয়ে লেখা সমীচীন মনে করেছি।

গ্রামে যখন আমরা প্রথম বসবাস শুরু করি তখন শামরাও ও আমার একটাই সাধারণ তহবিল ছিল। আমরা দুজনের কেউই বেতন নিতাম না। বোকামি করে ভবিষ্যতের জন্যে কোনো বিমাও করিনি। যেটুকু দরকার শুধু তাই নিতাম, জীবনযাপন ছিল অতি সহজ, অড়ম্বরহীন। যে টাকাই আসত তা সাধারণ তহবিলে জমা পড়ত। যেমন ধরুন পাঁচ বছর ধরে মার্টন কলেজ থেকে আমি গবেষণার জন্যে ভাতা পেয়েছি; তারপর লেভারহুলমে ফাউণ্ডেশন থেকে অনুদান পেয়েছি; শেষে শিলংয়ে অবস্থানকালে আমার সরকারি সাম্মানিক টাকাও ছিল।

বন্ধুবর্গ উদার ও দয়ালু থাকা সত্ত্বেও অর্থসমস্যাটা সারাক্ষণ লেগেই ছিল। বর্ষার সময়ে সাধারণত আমি বাইরে বেরিয়ে পড়তাম অর্থ তোলার উদ্দেশ্যে। বেশ কয়েক বছর বোম্বেতে আমরা প্রতি বছর সভা করেছি, সেখানকার মানুষজন আদিবাসী সমস্যা বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়েছেন। সুবিখ্যাত টাটা ট্রাস্টের সাহায্য-অনুদান ব্যতিরেকে আমাদের হয়তো কাজ চালিয়ে যাওয়াই সম্ভব হত না। জে-আর-ডি এবং শ্রীমতী টাটা সর্বদাই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন; রুস্তম চোক্‌সি'র বন্ধুত্বের ভিত তো পাহাড়ের মতো অটল, আর তার বোন পিপসি ওয়াডিঁয়া— সকলেই তাঁদের পৃষ্ঠপোষণার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন। গ্রন্থের অন্য অংশে আসবে আমাদের জীবনে জে. পি. প্যাটেলের ভূমিকার প্রসঙ্গটি।

ভিক্টর স্যাসন এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন; শুধু উদারচিত্তে চাঁদা প্রদানই নয়, অর্থসংকট মোচনের প্রয়াসই নয়, তিনি তার থেকে ঢের বেশি ইতিমূলক কাজ করেছেন। একদিকে যেমন ভিক্টর অতি স্বচ্ছন্দে কোটিপতি মানুষের সঙ্গে, অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মিশতে পারতেন অন্যদিকে তেমনি অমায়িকভাবে গ্রামের মানুষের সঙ্গেও মিশতে পারতেন। পাটানগড়ের যত আদিবাসী গ্রামেই তিনি ঢুঁ মেরেছেন সর্বত্র তিনি অর্জন করেছেন সাফল্য। আশ্রমে তাঁর জন্যে স্বতন্ত্র একটা কুটির তৈরি করে দিয়েছিলাম আমরা।

আমার ক্ষেত্রে গ্রামজীবনের অন্যতম অভিজ্ঞতা হল, মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে দৃঢ় বোধের উন্মেষ। যেমন ধরুন, জলের অপচয় দেখলে আজো আমি নিশ্চুপ বসে থাকতে পারি না। কারণ আমি যেখানে বছরের পর বছর কাটিয়েছি সেখানে আমার ব্যবহারের জল নদী থেকে তুলে, খাড়া পাহাড় ভেঙে আনতে হত— প্রতি ফোটা জলের কি মূল্য! আজ আমি কলের জগতে বাস করছি বটে, তাও আমি জলের কলের মুখ পুরো খুলে দিতে পারি না, পারি না দুর্মূল্য জলরাশির অর্থহীন অপচয় দেখতে।

সাত

প্রতিদিনের ডায়েরি লেখা ছিল বলেই *লিভস ফ্রম দি জাঙ্গল* লিখতে পেরেছিলাম; কিন্তু সেমতো কোনো দিনলিপি লেখা নেই বলেই মাণ্ডলার গ্রামগুলোর সম্পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে কি, গ্রামজীবনে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই— একই ধারায় দিন কাটত আমাদের; কখনো সখনো আশ্চর্যজনক বা নাটকীয় ঘটনা এসে ছন্দে-লয়ে কিছুটা বৈচিত্র ঘটাত। ডিসপেনসারি রয়েছে, তার সামনে রুগীর ভিড়, কয়েকটা স্কুল রয়েছে আমাদের। কিন্তু পাটানগড়ে এসে বসতি স্থাপনের পর, এবং সরকার আরো বেশি সংখ্যক স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেবার পর আমরা একটা স্কুলেই আমাদের সমস্ত মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিই। তাছাড়া ছিল কুষ্ঠরুগীরা, তাদের দেখভালও আমোদপ্রমোদে রাখার ব্যবস্থা করতে হত। এছাড়াও নানা ধরনের সমস্যা-ঘটনা প্রতিদিনই এসে আমাদের ওপর চাপত। প্রাত্যহিক বাস্তব ব্যাপার-স্যাপার শামরাওই সামলাতেন; বেশির ভাগ সময় আমি লেখালেখি নিয়ে কাটাতাম। উৎসব, বিবাহ, সৎকারের মতো নানা অনুষ্ঠানে আমাদের যোগ দিতেই হত।

সেই জীবন কী ধরনের ছিল তার মোটামুটি পরিচয় দিতে এখানে আমি কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করব; তাছাড়া পাটানগড় থেকে বেড়িয়ে গিয়ে আমার বোন এলডাইথ যে পত্র লিখেছিল তা থেকেও খানিকটা উদ্ধৃত করব।

কেমন আজব সব ঘটনা প্রায়ই ঘটত তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যাক পাগলা শেয়ালের কাহিনীটা।

একদিন রাতের বেলা একটা পাগলা শেয়াল গ্রামে ঢুকে পড়ে, আর অবাধে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে থাকে; সেই শেয়াল যাকে পেল তাকেই আক্রমণ করতে লাগল। কয়েক ডজন গবাদি পশু, বেশ কিছু কুকুর, বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকা সাতজন মানুষকে শেয়ালটা কামড়াল— ভোরের দিকে সেটাকে মারা হয়। বারো ঘন্টার মধ্যে কেউই আমাদের কাছে এল না, ফলে ইতিমধ্যে ক্ষতগুলো দহন-শোধনেরও সামান্য সুযোগও পাওয়া গেল না। আমরা কিন্তু নিশ্চুপ বসে থাকতে পারলাম না, সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। আমরা তাদের বোঝাই, আক্রান্ত প্রতিটি লোককে জব্বলপুরে নিয়ে গিয়ে পাস্তুর চিকিৎসা করাতে হবে। অনেক বাদ-প্রতিবাদ অনুনয়-বিনয়ের পর আক্রান্তদের তিনজন জব্বলপুর যেতে রাজি হল, বাকিরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে তাদের দেহের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মারণ-জীবাণু; কারণ আমরা জানি, পাগলা শেয়ালের রেবিস্ সব থেকে বিপজ্জনক : বাস্তবিকই সেই না-যাওয়া তিনজনই জলাতঙ্কে মারা গেল; আর এই মৃত্যু ঘটল আমাদের সব চেষ্টার পরেও; অথচ আমরা কিন্তু তাদের পথখরচা, পনের দিনের খোরাকির বন্দোবস্ত, সবই করে দিতে চেয়েছিলাম।

একটি গোণ্ড মেয়েও পরে ঠিক একইভাবে আক্রান্ত হয়ে বহু দূরের এক গ্রাম

থেকে আমাদের কাছে এসেছিল। সে এক সাংঘাতিক ঘটনা; বাচ্চাকে বাঁচাতে মরিয়া মেয়েটি তার হাত ঝাড়িয়ে দিয়েছিল শেয়ালের দিকে, শেয়াল সেই হাত চিবুতে থাকে, আর মেয়েটি আর্ত চিৎকার করতে থাকে। সেই চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে এলে শেয়াল পালায়। কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা হল, এই সাহসী মেয়েটিও কিন্তু চিকিৎসা করাতে চাইল না— আমরা তাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও সে রাজি হল না।

এই যে হাসপাতালে-না-যাওয়া তার মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আদিবাসীদের মধ্যে তাদের নিজেদের মতো একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে— সেই ব্যবস্থাকেই সবাই বিশ্বাস করে।

এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে আবার সাংঘাতিক এক মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। সেই ধারণাটি হল, একজন লোককে যখন একটা পাগলা কুকুর কামড়ায় তখন কুকুরটির লালা আর মানুষের রক্তের মিশ্রণে লোকটির পেটে উৎপন্ন হয় কুকুরছানা। ক্রমশ ছানা-ভ্রূণগুলো বাড়তে থাকে, তারা একটা বাসা বাঁধে, পেটের সেই বাসা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ছানা-ভ্রূণগুলো শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে— দেহের পুরো দখল নিয়ে নেয়। দেখতে না-দেখতে তাদের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যায়, আর চার-পাঁচ সপ্তাহ বাদে দেহস্থ সেই ছানাগুলো ঝগড়াঝাটি শুরু করে দেয়, তাদের ক্ষীণ ডাকও তখন শোনা যায়; তারপর সেই ডাক এসে রুগীর গলায় ভর করে, রুগী লোকটি তখন নিজেই শেয়াল-কুকুরের মতো ডাকতে থাকে, বা কুঁইকুঁই করে কাঁদে। আত্মীয় পরিজনরা তখন সেই ছানাগুলো দেহ থেকে বার করে দিতে ভয়ংকর ওই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নে রুগীর হাত-পা বেঁধে উপুড় করে রাখে।

কিন্তু এত সব ঘটার অনেক আগেই আদিবাসী চিকিৎসক দেহের ভ্রূণাকার ছানাগুলো দূর করার কাজে নেমে পড়ে। আমি নিজেই পাটানগড়ে তার কিছু কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখেছি। চিকিৎসক লোকটি বেশ কিছু লম্বা-শুড়অলা গুবড়েপোকা ধরে, আর ঝোপঝাড় থেকে কিছু শেফালি ফুলগাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ভাল করে পেষাই করে, সঙ্গে সামান্য কিছু গুড়ও মেশায়। এভাবে তৈরি বটিকা করে তা রুগীকে প্রতিদিন একটি করে খেতে দেয় চিকিৎসক। খাবার সঙ্গে সঙ্গে রুগীর বিশোধন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, সে বমি করতে শুরু করে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, দিন দুয়েকের মধ্যেই দুজন রুগীর মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তাদের ভাষায়, প্রসব যন্ত্রণার লক্ষণ। সেই যন্ত্রণাটা আবার মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে প্রবল হয়ে থাকে। এবং অনতিবিলম্বে বেরিয়ে আসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী; শুনেছি সেই প্রাণীগুলো নাকি লাল পিঁপড়ের আকারের— কচি বলেই সেগুলোর কালো মাথা আর লেজ বাদে আর কিছু দেখা যায় না; যদি বড় হবার আরো সময় পেত তাহলে ওদের আকৃতি হত কচি ইঁদুর ছানার মতোই। সেই আজব প্রাণী দেখার অনুমতি বা সুযোগ আমার জোটেনি, কারণ

শুধু বিশ্বাসীর চোখেই তার দেখা মেলে! কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আদিবাসীরা কিন্তু প্রত্যেকেই এ-জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

দেহস্থ ছানা বেরিয়ে গেলে রুগীর আরোগ্যসম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হয়; আর না বেরুলে বলা হত রুগীর অবস্থা খুবই সঙ্গীন।

সাওরা গ্রামে যাবার সময়ে একবার এক আশ্চর্য দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হয়; সব অভিজ্ঞতারই তো একটা প্রতীকী মূল্য থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে বাস্তবত যা ঘটল তার তুলনায় প্রতীকী মূল্যটা ছিল অনেক বেশি দ্যোতনায়।

উঁচু পাহাড়ের ওপর এক গাঁয়ে ক'দিন ছিলাম। ডাইনিবিদ্যার ঘাঁটি বলে সেখানে সাধারণত কেউ যেতে সাহস করত না। সত্যি, সেখানে বেশ কতকগুলো খুন ও আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে গেছে। গ্রামটা কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালই লাগল, চারদিকে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আর উচ্ছল একদঙ্গল শিশু; প্রতিদিনই এই শিশুর দল আমার ক্যাম্পে এসে হুটোপুটি করে।

একদিন একটি ছোট্ট ছেলে, তার বাবা-মা নেই, খাদ্য আর মমতার অভাবে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে— হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, হাসতে পারছে না বেচারা; ছেলেটি আমার ক্যাম্পে এল, আমার গা সেঁটে দাঁড়াল। পাশের বিছানায় ওকে বসিয়ে দিয়ে তার সেবাযত্নে মনোযোগ দিই। ছেলেটির নাম রাইসিগুা। সারস-পা বলতে সাওরারা বলে 'কোডাজঙ'; ছেলেটিরও তেমনি সারস-পা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে নিউমোনিয়া ও নানা রোগে ভুগছে। দুর্বলতা রুগ্নতা সত্ত্বেও ছেলেটি ছিল চমৎকার, চালচলন সুন্দর। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই বিছানা তুলত, চা খাওয়ার পর কাপ ধুয়ে রাখতে চাইত। কিন্তু বাস্তবিকই বেচারা ছিল খুবই অসুস্থ— শুয়েও থাকতে পারত না। শুয়ে থাকলেই তার মনে হত, কানের মধ্যে বুঝি পোকা নড়াচড়া করছে। প্রথম আসার পর শ্বাস নেবার সময়ে বিশ্রী কর্কশ শব্দ বেরুত; কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতেই সে যেন কিছুটা সুস্থ হল। ছেলেটা ছিল একেবারে খাঁটি সাওরা; তাকে যত ভাল খাবারই দিই না কেন, তাড়ি তার চাইই— তাড়ি সংগ্রহের জন্যে লোক পাঠাতে হত; আর সেটা সে খেত পরম তৃপ্তিতে। ছোট চুরুট, যাকে ওরা বলে 'পিকা' তা খেতেও তার বায়নার শেষ ছিল না; আসলে এটাই তো তাদের গোষ্ঠীর সবাই খায়। আমার কোলে বসে থাকতে খুব পছন্দ করত ছেলেটি; শেষের দিকে যখন ওর মাথাটা আর তেমন কাজ করছিল না, ও আমাকে 'মা' বলে ডাকত। আমার পাশে সেঁটে থাকতে থাকতে ও এক নতুন খেলা শুরু করল; আমার পকেট খুঁজত, পকেটে আধখাওয়া চুরুটের টুকরো ঢুকিয়ে রাখত, পাছে হারিয়ে যায়। মৃত্যুর আগে সে দুবার মাত্র হেসেছিল, তারপর ঘুমের মধ্যেই অপার শান্তিলোকে চলে গেল বেচারা।

বাঁচার লড়াইয়ে রাইসিগুা ছিল পরিত্যক্ত, অনাহূত, দুঃখী শিশুর মতো। তারপরই

একরাতে, কাছাকাছি এক কুটিরে এক মায়াবিনী যখন তার জাদুমন্ত্রে অন্ধকারকে ভূতুড়ে করে তুলেছিল আমি যেন তখন স্বপ্ন দেখছি, —দেখতে পাচ্ছি আমি যেন একটা গুহার মধ্যে, চারিদিকে ঘন অন্ধকার, আমার সামনে যম্মাসুম (সাওরাদের যমদেবতা) তার স্বমূর্তিতে উপস্থিত— সে নির্মম অপ্রতিরোধ্য, যেন ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। দিশাহীনভাবে আমি তখন আলোর খোঁজ করি; একের পর এক দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে থাকি; কিন্তু আলো আর জ্বলে না। ঘুম থেকে উঠে ভাবি: 'ভালোবাসাই হল খাঁটি হাতিয়ার, প্রেমই পরিচ্ছদ— প্রেমই আমার কাছে সোনা।'

সেদিনই বিকেলে খবর এল কোরিয়া বিষয়ক বিরোধের, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিতর্কের— আণবিক বোমা নিক্ষেপের হুমকির কথা বলা হচ্ছে। মনে হল প্রেমই একমাত্র হাতিয়ার, আমার অস্ত্র। আমি লক্ষ করেছি, ছেলেটির জন্যে বিছানার একটা অংশ ছেড়ে দেওয়ার পর আমি যেন আরো বেশি উষ্ণতা বোধ করেছি; তাই তো ভালবাসাই সেরা পরিচ্ছদ। তাছাড়া অর্থ নিয়ে আমার যে দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা তাকে যেন সেদিনের স্বপ্নটা ভর্ৎসনাই করল— যেন অন্য এক স্বর্ণভাণ্ডারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

ছোট এই ছেলেটির মৃত্যু আমাদের ওপর, আমাদের সব কর্মীদের ওপর, এমনকি সব গ্রামবাসীদের ওপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রত্যেকের অন্তরে সে উদ্বুদ্ধ করেছিল অপরিমেয় দরদ ও মমতা। দেখে আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছি। সেই সময়ে আমি লিখেছিলাম : 'নিজেকে আমি জিজ্ঞেস করি, এই ছেলেটির জীবনের কী অর্থ? পৃথিবীতে এভাবে আসা, ক্ষুধার্ত হয়ে দিনযাপন, অনাথ হয়ে থাকা,— তারপর সমাজের কোনো কাজে না লেগেই, বহুশ্রুত কথার মতো, ঝরে যাওয়ার কী মানে হয়? তখন স্তিমিত আলোকে আমি যেন দেখি, তার দুঃখ এক বৃহৎ দুঃখেরই খণ্ড প্রতিভাস; এই দুঃখ ক্লেশ বহু মানুষকে পবিত্র করেছে, তাদের কাছে নতুন বার্তা বয়ে এনেছে।'

আরো অনেক প্রতীকী ঘটনার কথা মনে পড়ছে। বহুদিন আগে এক বৃদ্ধ হিন্দু সাধু ব্যক্তি জীবনের শেষপ্রান্তে পৌছে, চূড়ান্ত অসুস্থতা ও বার্ধক্য নিয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি প্রকৃতই সাধুব্যক্তি ছিলেন বলেই মৃত্যুকে নির্ভয়ে গ্রহণ করলেন; সুভদ্র, নিরাসক্ত এক নির্ভীক মানুষ। তাঁর শবদেহের কাছে কেউ গেল না, আমরাই সেই মৃতকে স্নান করিয়ে শুইয়ে দিলাম; তারপর বনের মাঝখানে নিরিবিল একটা ফাঁকা জায়গায়— যেখানে কুষ্ঠরোগীদের আমরা মৃত্যুর পর সৎকার করতাম, সেখানে নিয়ে গিয়ে চিতায় শুইয়ে দিই। লাল অগ্নিশিখা উদিত সূর্যের দিকে উঠছে, চারিদিকে নীরব শান্ত বৃক্ষরাজি আর মৌন পর্বতমালা— সব মিলিয়ে পূর্বরাত্রির ব্যাধি ও মৃত্যুর দুঃসহ বাস্তবতার বিপ্রতীপে এক অনিন্দ্য চিত্র বিনির্মিত হল।

আরেকবার এক সিফিলিস রোগে আক্রান্ত ক্ষৌরকার তার অন্তিম দশায় আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এল। সে একা মানুষ, ঘরে আছে শুধু পঙ্গু বাপ। যথাসাধ্য চেষ্টা

সত্ত্বেও লোকটি মারা গেল। তার দেহটা বাস্তবিকই বিকৃত ও ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। এক্ষেত্রেও কোনো গোগুই তার শবদেহে স্পর্শ করতে রাজি নয়; তবে সেটা কুৎসিত সিফিলিস রোগের কারণে নয়, মৃত লোকটি নাপিত ছিল বলে। অগত্যা আমি ও শামরাও আর বেপরোয়া গ্রামের দুজন মানুষ লোকটির শবদেহ— অনাহারে-অপুষ্টিতে একেবারে হাল্কা শবদেহটি নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করি। কিন্তু আমাদের সঙ্গী গ্রামের মানুষ দুটি কিন্তু জাতখাওয়ানোর ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করে নি।

আজো বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি, কত সামান্য কাজ, কত ক্ষুদ্র আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে অপরের জন্যে কত কিছু করা সম্ভব হয়েছিল! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মধ্যে দিয়ে কী প্রাপ্তি লাভ সম্ভব হয়েছিল তা ভাবলে আজ অবাক লাগে। বাস্তবিকই শামরাও তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন একদিন ব্লেকের কথার সত্যতা শনাক্ত করতে পেরে : যদি ভাল কাজ করতে চাই তবে কাজটা করতে হবে অনুপুঙ্খভাবে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অনুসারে।

যখন করনজিয়াতে ছিলাম একদিন এক পরধান কুষ্ঠরোগী এল। চূড়ান্ত খারাপ অবস্থা তার, পুরো বিকৃত হয়ে গেছে, দৃষ্টিশক্তি নেই— নিজে সে কিছুই করতে পারে না; সে এল আমাদের আশ্রমে থাকতে। তার সঙ্গে রয়েছে যুবতী স্ত্রী, নাম সতুলা। দাম্পত্যজীবনের এক অতুলনীয় প্রতীক হয়ে ওঠে সতুলা। যেমন লাবণ্যময়ী, তেমনি রূপসী— এক অনবদ্য যুবতী সতুলা। অনেক তরুণের মনে আলোড়ন তুলল সে; তারা সকলেই চাইছে এই মৃতপ্রায় বিকৃতদর্শন স্বামীকে ছেড়ে সতুলা অন্য কাউকে বিয়ে করে সুখী হোক— বাস্তবিকই সে সম্মত হলে যাকে পছন্দ তাকেই সে বরমাল্য পরাতে পারত—এই আতঙ্কজনক দুঃখময় জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারত। কিন্তু সতুলা তার বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গেই রয়ে গেল, মনপ্রাণ দিয়ে মৃতপ্রায় গলিতদেহ মানুষটির সেবাযত্ন করে চলল। এবং এভাবেই স্বামীর শেষদিন অবধি তার পাশে রইল। লোকটি মারা তো গেলই কিন্তু ততদিনে সতুলার দেহেও ওই ভয়ানক ব্যাধির লক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে; বেশ কয়েক বছর বাদে সেও স্বামীর পাশে সমাধিস্থ হল।

ছোট ছেলেমেয়েদের দেহে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ আবিষ্কারের মতো মর্মস্পর্শী বেদনার ঘটনা আর নেই। বছর পনের বয়সের অপূর্ব সুন্দরী এক পরধান মেয়ের মুখখানা মনে পড়ছে। প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল সুখী এই মেয়েটিকে ইতিমধ্যে কেউ প্রেম নিবেদন করেছে, সেও প্রেমে মাতোয়ারা। তো এই মেয়েটিই একদিন এসে আমাদের দেখাল তার গাত্রচর্মের ওপর নিঃসাড় দাগগুলো— ওই দাগগুলোই কুষ্ঠরোগের প্রথম লক্ষণ।

পাটানগড়ে অবস্থানপর্বে কবিতাচর্চার একটা পর্যায় গেছে আমার। সেই কবিতাবলি একটি পুস্তিকায় ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশও করি; নাম দিই '*28 পোয়েমস*'। কবিতা লেখালেখির এই 'নিঃসরণ' যেমন ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, তেমনি

সংখ্যায়ও কম; এবং এই পর্যায়টি দ্রুত কেটেও যায়। তারপর থেকে আর কবিতা লিখিনি। অথচ, স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, সেদিনের সেই কবিতায় গ্রাম ও গ্রামের মানুষের যে অভিজ্ঞতা ও অনুভবগুলো বিম্বিত হয়েছিল আজকে যেভাবে লিখছি বিষয়টি তাতে সে যাত্রায় উঠে আসছে না। তার একটি কবিতার শিরোনাম ছিল :

'এক আদিবাসী রমণীর দেহে কুষ্ঠের প্রথম লক্ষণ দেখে'।

তোমার নিপাট নিষ্পাপতায়ও কেন এমন নিয়তি!
চামড়াভর্তি সূক্ষ্ম কঠিন ধ্বংসচিহ্ন
যৌবনময় সোনালি সুরূপ অবয়ব এত অনন্য
বোঝাই যায় না ভেতরে লুকিয়ে শয়তান!

ছোট মেয়ে, ছোট মিষ্টি মেয়ে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
চাঁদবদনের আড়ালে গোপন হিংস্র নখের সন্ধান,
হাত দুটো যেন বদলে যাচ্ছে থাবায়, যে কণ্ঠ এত অনুপম সংগীত
তারও স্খলন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তোমাকে দেখলে।

মোহন আঙুল আহা যা তৈরি পাণিপীড়নের জন্য
বেপরোয়া পা, যা অনুপম শুধু প্রমোদক্রীড়ায় নাচে,
একজোড়া ঠোঁট তৈরি শুধু যা প্রেমিক যুবার চুম্বনটির জন্য
অনিবার্যত ধ্বংস এবং পচনের দিকে চলেছে।

অন্ধ সে বনরক্ষী তবুও চলেছে যে কান্তারে—
ফিরে নেবে নয় ধ্বংস করবে যখন যেমন ইচ্ছে,
সে ইচ্ছেতেই রূপায়িত হয় শ্বেত মিশুলের অনন্যতা
মেহগিনি সেও কালো হয়ে যায় তারই ইচ্ছার তাপে।

যত সে রোপণ করেছে কোমল অঙ্কুর
নূতন কুঁড়িকে ফুটিয়ে তুলেছে মুগ্ধ শিশিরে,
কচি পাতাগুলি করেছে ফলের আশায় উজ্জীবিত
এসব থেকে কেন সে তোমাকে, শুধু তোমাকেই, এসে ছুঁলো!

করুণা, ফসল ক্ষেতগুলি ঘুরে যাও,
ছুঁয়ে যাও নত শশ্মরাজির শিস,
দ্যাখো ক'টুকরো শস্যদানার ভিক্ষা আদায় করতে
হলরেখা জুড়ে তার কঠিন মরিয়া লড়াই,
দ্যাখো সকালের মুখোমুখি হতে চাষীদের ভয়।

মেশো, ও করুণা, সেই জনতার সঙ্গে,

যারা ভিড় করে খনিতে, কারখানায় অথবা কারায়,
সবার অপরাধ যন্ত্রণাময় জীবনে কঠিন শাস্তি পোহায়
ভগ্নহৃদয় সবাই যেখানে গভীর বেদনাদীর্ণ।

করুণা, সেসব ভাগ্যবিহীন দূরের গ্রামেও যেও,
যেখানে করুণ মৃত্যু ঘনায় সময়ের বহু আগে,
ভালোবাসো সেই শিশুদের যারা ঘোর জ্বরে অচেতন
বুকে কর্কট যন্ত্রণা নিয়ে যাদের মায়েরা কাৎরায়।

কিন্তু সবার আগে মানুষের মনকে বানাও প্রাজ্ঞ,
কেননা কেবল মানুষেরই দুই হাতে,
কেননা কেবল মানুষেরই দুই চোখে
করুণাই পারে শুশ্রূষা দিতে আনন্দহীনতায়
সারা দেশজুড়ে মমতাকে পারে অঢেল ছড়িয়ে দিতে।

আট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে আমার বোন এলডাইথ পাটানগড়ে আসে; এবং কয়েক মাস আমাদের সঙ্গে কাটায়। এখানকার লোকজন সকলেই তাকে খুব ভালবাসত। তার ছোট কুটির তো সব সময়েই থাকত দর্শক-শ্রোতার ভিড়ে ঠাসা। এখানকার গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখতে বাস্তবিকই আমার অসুবিধা হচ্ছে; বরং এলডাইথ যেসব চিঠিপত্র লিখেছিল তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি :

'কুষ্ঠাশ্রমটি খুবই কাছে, খুব চমৎকার জায়গা। ছোট ছোট সাদা বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে কলাগাছ, নানা ফুলের সমারোহ। বাড়িগুলো খুবই আরামদায়ক, বিশেষত সন্ধ্যার পর, যখন ছোট ছোট আগুনের কুণ্ডলী জ্বলে ওঠে। এই আশ্রমে রয়েছে স্কুল, ডিসপেনসারি। সেই ডিসপেনসারির সামনে আশা ও ভালোবাসার বিচ্ছুরণ নিয়ে দাঁড়িয়ে শামরাও একের পর এক রুগীকে সূঁচ ফুটিয়ে চলেছেন। কদর্য ফোলা ফোলা পা নিয়ে কত মানুষ আসছে, তাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্প করে চলেছেন শামরাও—লোকগুলোর ভাঙাচোরা মুখে হাসি খেলে। কুষ্ঠরোগীদের পাঁচটি প্রাণবন্ত শিশু কেবল তার দিকে ছোটে। সম্প্রতি ছোট একটি বাচ্চার মধ্যেও কুষ্ঠের লক্ষণ ধরা পড়েছে, তাকে প্রথম ইঞ্জেকশনটি দেওয়া হচ্ছে। তার বাবা চিৎকার করে বিলাপ করে চলেছে। এই পরিবেশ নিঃসন্দেহে বিষাদময়, তবুও তো তাদের প্রতি যত্ন নেওয়া হচ্ছে, তাদের খাদ্য ও বস্ত্রও আছে— আছে হাঁস, মুরগি এবং বন্ধুও।

চারদিকেই ক্লেশ-যন্ত্রণার জ্বলন, যাদের সঙ্গেই দেখা হচ্ছে প্রায় প্রত্যেকের

মধ্যেই তার উত্তাপ। ব্যাধি তাদের অতল হতাশায় নিমজ্জিত রেখেছে, আর কনকনে ঠাণ্ডা তীরের মতো দেহে বিঁধে দেহকে অসাড় করে দিচ্ছে— এক টুকরো সুতির কাপড় সে-হিমকে ঠেকাবে কিভাবে? আর ক্ষুধা হচ্ছে সেখানে শীর্ণ হাত-পা ও নষ্ট শরীরের একটা 'স্টকিং হর্সে'র [অশ্ব বা অশ্বাকৃতি যে মূর্তির আড়ালে লুকিয়ে শিকারি শিকার করে থাকে; লক্ষণায় : ছল, ব্যাজ, ছদ্মভাব ইত্যাদি— অনুবাদক] মতো। আশ্রমের পাহাড়ে যে বাজার বসে সেখানে এলেই সেই দৃশ্য প্রকট হয় : তরুণ মেয়েদেরও বয়স্কা ও কুঞ্চিত-ত্বক দেখায়, প্রায় প্রত্যেকেই শীর্ণ। তাদের পসরা বলতে তো মাত্র বিন, লঙ্কা বা শুটকি মাছের ছোট ছোট স্তূপ, কিছু মিষ্টির দোকান বা তামাকের দোকানও রয়েছে; কিছু পসরা আবার কাপড় ও চুড়ির। দোকান-পসরা সবই বাহ্যিক ব্যাপার, বাজারটা হচ্ছে আসলে এক সামাজিক মিলনক্ষেত্র; দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এই বাজারে আসে শুধু কিছু বেচতে বা কিনতেই নয়, আসে আপনজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেও।

আমার একান্ত ইচ্ছে, আপনারা একবার সেই গ্রামটা দেখুন— দেখুন সেখানকার নিঃস্ব অথচ সদয় নম্র গ্রামবাসীদের। এরা 'উন্নতি' চায় না। কিন্তু অচিরেই আপনার হৃদয়ে জায়গা করে নেবে। আপনাদের দেখাতে চাই ভেরিয়ার ও শামরাওকে; হতাশ নিরুৎসাহিত হবার মতো অসংখ্য বাস্তব কারণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে কল্যাণকর কাজ করে চলেছেন— দুহাত বাড়িয়ে বন্ধুত্বের নিদান করে চলেছেন।

নিউমোনিয়া থেকে হাম— অসংখ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত সব রুগী। সারাক্ষণ রুগীর ভিড় ডিসপেনসারিতে। রোগ নির্ণয়ের জন্যে শামরাও তাকিয়ে থাকেন, অনেকেরই আশ্চর্যজনক অচেনা রোগ। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠতেন, 'সব্বাই রোগে রোগে ঝাঁঝড়া হোক!' রোগ শনাক্ত করা গেলেও কী করা যায় সেই সিদ্ধান্তগ্রহণই ছিল মুশকিলের। তবে সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা চালিয়ে গেছি। এমনও একটা পরিবার দেখেছি যার প্রত্যেকেই অসুস্থ। জাদুকর বাপ শীর্ণ হতে হতে হাড্ডিসার হয়ে গেছে, আর অবিরাম কেশে চলেছে। বড় ছেলেটি মূক ও বধির— জণ্ডিসে সে কঙ্কালসার। বছর পনের বয়সের সুশ্রী মেয়েটার হার্টের অসুখ দেখা দিয়েছে। ছোট ছেলেগুলোর বাজে জ্বর আর সারা গায়ে ফোঁড়া আর চুলকানি। আর একেবারে কচি মোটাসোটা বাচ্চাটার গলায় জড়ানো রয়েছে অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্যে সাপের শিরদাঁড়ার মালা— যেন মন্বন্তরে বিপন্ন আর্ত শিশু— এই করুণ দৃশ্যরূপকে বাঙ্ময় করার মতো শব্দবন্ধ আমার জানা নেই। হতভাগিনী মা দিশাহীন, সাহায্য ও চিকিৎসার জন্যে এক জাদুকর থেকে অন্য জাদুকরের কাছে ছুটে

বেড়িয়েছে, তবু আমাদের কাছে আসে নি। বরং আমরাই ওদের কাছে যাই; দেখি ঘরের মধ্যে সবাই বসে আছে, বাইরের আগুনের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে ঢুকছে। কঙ্কালসার ছেলেটাকে বাইরে এনে দেখা হল, তখন আর কিছু করার নেই। সে মারা গেলে আমরা যেন একটু স্বস্তিই পেলাম। অন্যরা শামরাওয়ের ইঞ্জেকশনে কিছুটা সুস্থ হল, তবে কোলের বাচ্চাটাকে কৌটোর দুধ খাওয়ানো সত্ত্বেও বাঁচিয়ে রাখা গেল না। বাস্তবিকই এরা সবাই আজীবন চূড়ান্ত দারিদ্র আর অপুষ্টিতে দিনাতিপাত করছে।

আর একটি কচি শিশু জন্মের পর থেকেই ভুগছিল। তার মাথাটা ছিল অতি বিশাল আর দেহটা অতি ক্ষুদ্র— কিন্তু তার বাদামি চোখদুটি ছিল দারুণ। মা কাছাকাছি না থাকলে বাচ্চাটা তার ন'বছরের কাকার পাছায় চড়ে বেড়াত। কাকা যখনই ওকে নামিয়ে রেখে মার্বেল খেলতে যেত ও ক্ষীণ স্বরে চিৎকার করত। বাচ্চাটার বাপ ছিল দূরে, আমরা ধরে নিয়েছিলাম বাচ্চাটা আর বাঁচবে না, কিন্তু অচিরেই সে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল, হাসতে-খেলতে লাগল। হাত বাড়িয়ে দিত, একদিন তার বাপ তার হাত ধরল, আর তাকে নিয়ে গেল; পরে একদিন এসে ওরা জানাল 'বাচ্চাটা মারা গেছে।' খবর পেয়েই আমরা ছুটে গেলাম। দেখি মৃত শিশুটিকে ঘিরে সকলে খুব কান্নাকাটি করছে। মেয়েদের কান্নার ধরনটা ছিল বিস্ময়কর, যেন গান গাইছে তারা; কাঁদছে আর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে শোকগীতও রচনা করে চলেছে।

শিশুটির মা কাঁদছে : 'বাছা তুই এত ছোট্ট ছিলি যে তোকে আমি সারাক্ষণ বুকে আগলে রেখেছি, এখন যে তোকে ঠাণ্ডা মাটিতে শুইয়ে দিতে হবে। তোর জন্মের আগে আমি কুরূপা ছিলাম, তুই এলি আর আমাকে রানি করে দিলি। আমার দুই স্তনের মধ্যেই তোর সিংহাসন; কিন্তু আমি যে আবার আগের মতো কুরূপা হয়ে যাব বাছা!'

মৃত শিশুটিকে এক টুকরো সাদা কাপড়ে জড়ানো হল। তার বাবা তাকে কোলে নিয়ে একদল সঙ্গীসহ হেঁটে চলল পাহাড়ধারের জমির দিকে। সেই শবযাত্রায় শুধু পুরুষরাই গেল। আমাকে অবশ্য কিছুদূর অবধি যেতে দিয়েছিল তারা। মাঠের মধ্যে আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। কবর খোঁড়া হল ছোট একটা গুহার পাশে। বাবা মৃত শিশুটিকে সেই গর্তে অতি কোমলভাবে শুইয়ে দিল, তারপর নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, যেন বুঝতে চাইছে, বাছা আরামে শুতে পেরেছে কিনা। তারপর সে বাছাটির মুখ ঢেকে দিল। শেষে কুয়োর জলে সকলে প্রথাগত স্নান করতে গেল।

একদিন ছেলেদের হৈ-হল্লা শুনে বাইরে তাকিয়ে দেখি, সমভূমি ধরে এগিয়ে আসছে প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের মতো কুড়িটা হাতি। কংগ্রেসের

শোভাযাত্রার জন্যে সারগুজা থেকে তারা ত্রিপুরি যাচ্ছে। আমাদের সবার সে কি উল্লাস। জয়গোপাল ছুটল তাদের সঙ্গে দেখা করতে; বড় হাতির মাহুতকে সে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার এখানে? বড়ভাই এখানে আছেন, চলে আসো, তাড়াতাড়ি চলে আসো।' ভেরিয়ারও বেরিয়ে এলেন, এবং আমাদের গ্রামে রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ জানালেন। তারাও রাজি হয়ে গেল। গোটা দিন ধরে তারা ঘাসের স্তূপের ধারে মজুত জঙ্গলা চালের এক বিরাট অংশ খেয়ে ফেলল, তাছাড়া আরো সাবাড় করে দিল দশখানা বড় বড় চাপাটি ও ঘি। দেখে আমাদের লোকজনের মুখে জল এসে গিয়েছিল। এত সব খাবার! গ্রাম উজিয়ে লোকের ভিড়, যেখানে-যেখানে হাতি যাচ্ছে পুরো ছাত্রাবাসটিও তার পিছনে ছুটছে। সন্ধ্যার সময়ে মাহুত একবার আমাদের হাতির পিঠে চড়াতে সম্মত হল। কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আমি রাজা হাতির পিঠে চাপলাম— ফুট বারো উঁচু এক সাংঘাতিক প্রাণী; বাকি হাতিগুলোতে দুষ্টু বালকের দল আর গ্রামবাসী। দু মাইল দূরের নদীর ধার অবধি গেলাম, বিশাল সেই জন্তুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে জল খেল। তারপর আবার গান গাইতে গাইতে, চেঁচামেচি করতে করতে ছোট ছোট কুটিরের মাথা ডিঙিয়ে হাতির পিঠে চেপে হেলতে দুলতে ফিরে এলাম। বয়স্ক মাহুতরা সব মজাদার মানুষ; প্রতিটি হাতিরই ছিল আলাদা আলাদা নাম। ভোর হতেই তারা চলে গেল, মনের গভীরে রেখে গেল এক দুর্লভ স্মৃতি।...

ভুলানোর ব্যাপার থাকলে নৃতত্ত্বের কার্যাবলি সম্পাদন কঠিন হয়ে পড়ে। একরাতে দুজন পরধান ও এক পাঙ্কারের এখানে নৈশাহারের ব্যাপার ছিল। প্রথমে আপাত অপ্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য তারা দেয়, কিন্তু ভেরিয়ারের নতুন পরিকল্পিত বইয়ের বিষয়ে তার মধ্যে কিছু মূল্যবান উপদানও ছিল। মূল কথায় ফিরিয়ে আনার পর প্রধান বক্তা-মহিলাটির বাচ্চার কান্না শুরু হল, তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিতে বাচ্চাটা শান্ত হল। বাচ্চার বাপটি এড়ানো স্বভাবের, তার মাথা-মুখ এক বড় বস্ত্রখণ্ডে জড়ানো, পাশের একটা ডেকচেয়ারে বসে তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে আর আগে খাওয়া নানা আহার্য বিষয়ে নানা মন্তব্য করছে। 'কতটা খান আপনি!' কফির স্বাদ কেমন লাগে তা বুঝতে শেষে এক কাপ কফি খাওয়ালাম তাকে।

'এত কিছু সুস্বাদু খাবারের পর এই তেতো পদার্থটা। সব নষ্ট হয়ে গেল!' উচ্চারণে বিরক্তির লক্ষণ থাকলেও কফিটা কিন্তু পুরোই নিরাসক্তভাবে খেয়ে নিল সে।

খাদ্যের দিকে এখানকার মানুষ কী দৃষ্টিতে তাকায় দেখলে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে যেদিন পাঠার মাংস বরাদ্দ হয় সেদিন

দেখেছি পাঠাটা যখন কাটা হতে থাকে তারা ঘিরে দাঁড়ায়, মাংসের প্রতিটি টুকরোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের ক্ষুধাই উৎস সেই দৃষ্টির। আবাসিক ছেলেদের জিজ্ঞেস করি, বিদায় উৎসবের ভোজে তারা কী খেতে চায়? তারা বলল, 'আলু আর চাপাটি!' এইটুকুই তাদের চাহিদা।

গ্রামজীবনের টুকরো টুকরো ছবি মনে গেঁথে রয়েছে উজ্জ্বলভাবে। মনে পড়ে, সঁহওরোছাপারের গ্রামের পথ ধরে হাঁটছি, রাস্তাটা গিয়ে নেমেছে একটা কুয়োর ধারে। পথের বাঁকে একটা বিশাল গাছ। সেই গাছে কয়েক ডজন কবুতর, তাদের ডানা বেগনি বর্ণের, পালক উজ্জ্বল হলুদ ও হাঁসরঙা ধূসর। পাহাড়ের মাথায় দু-তিনটে ঘর, গ্রামের মেয়েরা একটা খাটিয়া এনে আমাকে বসতে দিল। চারিদিকে অনিন্দ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য— সোনালি সবুজ পিছনে, সামনে কিছুটা সমভূমি, তারপর পাহাড়রাজি; আর সামনের পাহাড় ভেঙে ধীরে ধীরে উঠে আসছে কলসিমাথায় একদল রমণী। আমি একটা বাড়ির উঠোনে চলে যাই; সেখানে বসে মেয়েদের জাঁতা ঘুরনো, কুলোতে শস্য ঝাড়াই, খুদ ও ময়লা বাছাইয়ের কাজ দেখতে থাকি। কেউ চাল ঝাড়ছে, পাথরকুচি বাছছে। দিশি মুরগি ও ছানাগুলো তা খেতে মেতে রয়েছে, একটা বাছুর বিহুল হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে; পড়ন্ত সূর্যে নেংটো শিশুরা টানটান হচ্ছে, একজন বয়স্কা রমণী মাটির পাত্র বানাচ্ছে— মাটিটা যতক্ষণ না মসৃণ হচ্ছে ততক্ষণ তা ছেনেই চলেছে। এ ধরনের অবসর কাজের মধ্যে কী যেন এক সখ্যভাব বা রয়েছে, আমার সঙ্গেও; অথচ আমরা কেউই কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি নি।

পাটানগড় থেকে বিদায় প্রসঙ্গে আমি বিশেষ কিছু লিখতে পারব না। সেটা ছিল খুবই বেদনার ব্যাপার। সবাই মিলে আমরা কাঁদলাম, একদল মানুষ অঝোরে কাঁদছে,— তাদের পিছনে রেখে আমি বিদায় নিলাম। পাহাড়ের কোণে বাঁক নেবার মুখে দেখি পাচক ব্যক্তিটি দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে,— আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

এলডাইথ এবং তার সঙ্গে শামরাও ও আমি যখন ইংল্যান্ডে যাচ্ছি তখনই একটি বছর ষোল বয়সের তরুনী সুদূর এক গ্রাম থেকে আমাদের ডিসপেনসারিতে এসে হাজির হল। মেয়েটি অনবদ্য রূপসী, কিন্তু তার তরুণ দেহপিঞ্জরে বাসা বেঁধেছিল আতঙ্কজনক এক ব্যাধি— দ্বিতীয় ধাপের সিফিলিস। এ-জাতীয় বহু সংক্রমণ ইতিপূর্বে দেখার অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু বীভৎসতার মাত্রায় তার কোনোটির সঙ্গেই এর তুলনা চলে না। এলডাইথ তার নিজের ঘরেই তার জন্যে একটি শয্যার ব্যবস্থা করল। কিন্তু চিকিৎসার তেমন সুযোগ তো আমাদের নেই। দুদিন বাদেই আমরা যখন রওনা হচ্ছি,

মেয়েটিকে গড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। এই মেয়েটিকে ইতিপূর্বে আমি কোনোদিন দেখিনি, আর পরেও কোনোদিন তার দেখা পাই নি; কিন্তু মেয়েটির কথা আমি কোনোদিন ভুলতেও পারব না।

ইংল্যান্ড থেকে ফিরবার মাস তিনেক বাদে আমি জানতে পারি, স্থানীয় কিছু ভদ্রলোক মেয়েটিকে প্রভাবিত করে এক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নিয়ে যায়; সেখানে মেয়েটি তার বিবৃতিতে জানায় যে গত দু'বছর ধরে সে আমার রক্ষিতা ছিল। আদালত ওই বিবৃতিকে কোনো গুরুত্ব দিল না, ফলে কিছু ঘটলও না। কিন্তু গ্রামজীবনে কাজ করার ক্ষেত্রে বিপজ্জনকতার দৃষ্টান্ত হয়ে রইল ঘটনাটি— বিশেষত কাজটি যদি কোনো কায়েমি স্বার্থের পরিপন্থী হয়। হতাশ না হবার ক্ষেত্রে আপনি যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন এবং ক্ষমা করে দেবার অপার শক্তি বিষয়ে যদি আপনি নিশ্চিত না হন, কিংবা এ-জাতীয় ঘটনা আমাকে বিচলিত করতে পারবে না— এই বিশ্বাসে আপনি যদি অটল না থাকেন তাহলে গ্রামজীবনে আপনি কোনো কাজই করতে পারবেন না। কিন্তু যদি সম্ভব হয় ' যারা ঘৃণা করছে তাদের অবজ্ঞা না করেও সুখে বাস করা; যারা ঘৃণা করে থাকে তাদের সঙ্গে ঘৃণামুক্ত ভাবে বাস করা... তাহলে আমরাও হয়তো হয়ে উঠতে পারি দেবতাদের মতোই আনন্দিত।'

নয়

গোণ্ড গ্রামজীবনে বসবাসের বছরগুলো আমাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে; কিন্তু আজ অতীতের দিকে ফিরে তাকালে আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কোনোকিছুই তো আমি অতি দ্রুত শিখিনি। জীবন অভিজ্ঞতার আখ্যান শোনাতে গিয়ে বাধা-বিপত্তি, অসুবিধা-অস্বস্তির কথাগুলো আমি ইচ্ছে করেই নিম্নস্বরে ব্যক্ত করেছি। সিডনি স্মিথ বলেছিলেন, 'অসুখী হওয়ার কোনো মানে হয় না'। তাই অপ্রীতি বা নিরানন্দের কথা স্মরণ করা বা সেগুলো ব্যক্ত করারও কোনো মানে হয় না। কঠিন রূঢ় বাস্তবকে যারা সহ্য করতে পারে না, আমার স্মৃতি কিন্তু তাদের প্রতি ক্ষমাশীল; কারণ সেগুলোই তো আমাদের জীবনের সংকটমুহূর্তের বহু হতাশাজনক স্মৃতিকে উস্কে দেয়। যদি ভেবে নিই সেগুলো সবই ফেলে-আসা দিনের কথা, তা থেকে পেরেছি মাত্র কিছু শিখতে তার বেশি নয়, তাহলেই সব চুকে গেল। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির তুলাদণ্ডে দেখলে গ্রামের জীবনটা আমার সুখেরই ছিল— আবেগ-উত্তেজনা ছিল, তৃপ্তি-প্রশংসা ছিল। আবার পাঠককে যদি বোঝাতে চেষ্টা করি, সবকিছু গোলাপের মতো— কণ্টকহীন গোলাপের মতো মসৃণ ছিল তাহলে সেটাও হবে অসত্য ধারণার উপস্থাপন।

প্রকৃতপক্ষে শামরাও ব্যতীত আমার একার দ্বারা কিছুই করে ওঠা সম্ভব হত না; চিন্তন ও ধারণার ক্ষেত্রে আমি যদি কোনো দিশার সন্ধান দিয়ে থাকি তবে তাকে কার্যকর করতে সচেষ্ট ছিলেন শামরাওই।

প্রথাগত ধর্মাচরণের কঠিন বৃত্ত থেকে স্ব-অধীনতায় পৌছনোর লড়াই বাস্তবিকই কঠিন কাজ। এবং অপরদের মতামতের ক্ষেত্রে তখন আমি কি পরিমাণ স্পর্শকাতর ছিলাম তার নমুনা বুঝতে করনজিয়ায় থাকাকালীন আমার চিঠির ঝাঁপিটা খুলতে আজ ভয়ই করে। যে ঈর্ষা ও অবজ্ঞার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়েছিল তা আমাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল— আমার সমস্ত রকম আনন্দবোধেব ওপর কালো মেঘের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। কোনো একটি লক্ষ্য সাধনে নিজেকে নিবেদিত করে এগিয়ে যাওয়ার পথে দুঃখ-আঘাতকে আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। সত্যি, আমিও সাংঘাতিক দুর্ভাবনায় ভেঙে পড়েছিলাম, রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না; আদিবাসীদের জীবন ও তাদের ভাগ্য নিয়ে আমার দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। যখনই কোনো আদিবাসী বন্ধুকে জেলে পাঠানো হত কিংবা মাছ ধরতে বা শিকার করতে গিয়ে তারা যখনই তাদের অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হত বা জমি খোওয়াতো তখনই আমি দারুণ পীড়িত বোধ করতাম। আদিবাসীদের শত্রু বস্তুত আমারই শত্রু হয়ে গিয়েছিল; এবং তা আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল আমাদের অক্ষমতায়; বাস্তবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতাই ছিল না আমাদের।

একশ্রেণীর মানুষ তখন আমার ঘোর বিরোধী ও বিদ্বেষী ছিলেন। আমার মতো নগণ্য এক সাধারণ মানুষের প্রতি সংবাদমাধ্যমের কি মাত্রাতিরিক্ত নজর! কেউ অসম্ভব সহানুভূতিশীল, আর একদল চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক। প্রথম-প্রথম এগুলোয় আমি খুব স্পর্শকাতর ছিলাম। তারপর ক্রমশ উদাসীন নিরুদ্বিগ্ন থাকতে শিখেছি।

আমার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ কিন্তু আমার ভিতর-মনটাই; হয়তো সবার ক্ষেত্রেই তাই। কাউকে অপছন্দ থেকে দেখা দিত দুর্বলতা, কারো ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ার কারণে জাগত ঔদাসীন্য, নিজের কাছে নিজে বাঁধা পড়ে যাওয়া থেকে দেখা দিত অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা। আর আমার প্রথম বিবাহের চরম ব্যর্থতা তো ছিলই।

পাটানগড়ে বসতি স্থাপনের পর আমি এক সুন্দরী গোণ্ড মেয়ে, কোশীকে বিয়ে করি। করনজিয়ার কাছাকাছি এক গাঁয়ের মেয়ে ছিল কোশী। প্রথমদিকে বহুবার সে আমার সঙ্গে ট্যুরে গেছে; সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়; ছেলের নাম রাখি জওহরলাল। এই নামকরণের পিছনে একদিকে যেমন ছিল গোণ্ড রাজাদের স্মৃতির অনুষঙ্গ, অন্যদিকে ছিল জওহরলাল নেহরুর ব্যাপার। সাধারণভাবে তাকে ডাকা হত কুমার বলে— সেটাই ছিল সহজ।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিবাহটি সুস্থিত হল না; এবং কয়েক বছর বাদে আমাকে বিবাহবিচ্ছেদ নিতেই হল। আজো পিছন ফিরে তাকালে আমার জীবনের ওই পর্বটির জন্যে গভীর বেদনা ও ব্যর্থতা বোধ করি; বস্তুত ওই প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু লিখবার ভারও আজ আমি বহন করতে পারছি না।

পরে আমি লীলাকে বিয়ে করি। এই পরধান মেয়েটি পাটানগড়েরই। এই বিবাহটি

অপ্রত্যাশিতভাবে বা আচমকা ঘটে গেলেও বাস্তবত খুবই কার্যকর হয়েছিল।

ভারতীয় গ্রামের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে আমরা বহু মানুষের কথা, বিশেষত আদিবাসী মানুষের কথা— কোথায় তারা মুক্ত, কোথায় তারা জীবনকে আদর্শায়িত করতে সমর্থ, সে-কথা আমরা ভুলেই যাই। যেমন ধরুন নিচের গোণ্ড লোকগীতিটির কথা। আমার অভিজ্ঞতারও প্রতিফলন রয়েছে এখানে :

একটি গোণ্ড লোকগীতি

সারা দুনিয়ায় এ গ্রামটি কেবল আনন্দনিকেতন।
প্রতি ঘরে ঘরে লাঙল ও বলদ, রয়েছে,
প্রত্যেকেই যায় চাষের কাজে খাটতে।
যখন গ্রামের প্রত্যেকে খাটে মাঠময়,
উৎসব বলে মনে হয় যেন আমাদের কাছে।
সকলের সম্মতি নিয়ে বীজ বোনা হয়,
কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া হয় শেয়ালের পাল রুখতে।

ধীর নিশ্চিত বৃষ্টির ধারা ভরে দেয় যত
ডোবা ও পুকুর কুয়ো খানা-খন্দ
যখন আকাশে মেঘ ডাকে আর বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যায় সব ভয়ে
কেউ গান করে দাদারিয়া আর কেউ নাচে সায়লাও,
মাঠে মাঠে যারা গোরু চরাচ্ছে, বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ লাগায়।
লাঙল দেবার পরে মাঠগুলি ঘন হয়ে ওঠে কাদায়।
কিন্তু মেয়েরা নাচে ধানগাছ রোয়ার সঙ্গে সঙ্গে।
বন্ধুরা সব খেলা করে, খুব কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে
কেউ বিড়ি খায়, পান খায় কেউ, আবার দু-চারজন
হাঁ চোখে চেয়ে থাকে সেই কর্মীদের দিকে, বাকি প্রত্যেকে গায়,
সারা পৃথিবীতে গ্রামই তো অপার আনন্দনিকেতন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোকহিতবিদ্যা

'তাঁর নৃবিদ্যাকে বলা যায় লোকহিতবিদ্যা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব হচ্ছে, বাস্তব ও সুষ্ঠু প্রণালীর ওপর স্থাপন করে নৃবিদ্যার নতুন ভিত্তিস্থাপন ও কাঠামোনির্মাণ; আর বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে তাঁর বড় অবদান হল, কেশবিন্যাসবৈশিষ্ট্য, গাত্রবর্ণ বা করোটির আকৃতিনির্বিশেষে মানুষকে এক মানবসত্তা হিসেবে আবিষ্কার করাই যে 'মানবজাতি বিষয়ক প্রকৃত অনুসন্ধান' সেই সত্যটির উন্মোচন।'

—এ. এইচ. কুইগ্‌গিন, *হ্যাডন দি হেড-হান্টার*

এক

একবার এক ককটেল পার্টিতে জনৈক ব্রিটিশ কর্নেলের পত্নীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল একজন নৃতত্ত্ববিদ হিসেবে। একই সোফায় দুজনে আমরা বসে ছিলাম; দেখি ভদ্রমহিলা যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে আড়ষ্ট বসে আছেন, আর চোরাদৃষ্টিতে আমাকে আপাদমস্তক দেখছেন। তারপর এক সময়ে পেগ তিনেক লালচে জিন পান করার পর, ভদ্রমহিলা যেন কিছুটা বুকে বল পেলেন; এবার সামান্য ঝুঁকলেন আমার দিকে, সংকোচ ও অপরাধবোধ থেকেই যেন নিচুস্বরে বললেন : 'বলুন তো ড. এল্যুইন, আপনার জেলায় নৃতত্ত্ব কি খুবই ব্যাপক?'

আদপে আমি একজন পড়ুয়া, গবেষণাকর্মী মানুষ। একটা মূল্যবান পাদটীকা পাওয়া গেলে কিংবা গ্রন্থপঞ্জির কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ধরিয়ে দিতে পারলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না; আবার না শোধরানো একটা প্রমাদও যদি ছাপার পর চোখে পড়ে হতাশায় বুক ভেঙে যায়। অথচ আমাকে থাকতে হয়েছিল বইপত্র-লাইব্রেরির জগৎ থেকে অনেক দূরে। তথাপি আমার কিছু পুরনো বন্ধু—বি. এস. কেশভন, বিদগ্ধ ও অমায়িক সৌরীন রায়-এর মতো ব্যক্তি আমাকে সর্বদাই বইয়ের জগতের সঙ্গে পরিচিত রেখেছিলেন। আমাকে বহু দুষ্প্রাপ্য বই জুগিয়ে গেছেন তাঁরা। বি. এস. কেশভন কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিটি পুনর্গঠন করেছিলেন, আর সৌরীন রায় ছিলেন জাতীয় মাহ্‌ফেজখানায়।

বনে-জঙ্গলে বেরিয়ে না পড়লে হয়তো আমি একজন আকাট পণ্ডিতই হতাম মাত্র; তবু বলব, যা কিছু আমি লিখি তার প্রত্যেকটির জন্যেই আমি যথেষ্ট পরিশ্রম করি; তাছাড়া শিলংয়ে আসার আগে পর্যন্ত যা কিছু আমি লিখেছি তা নিজের হাতেই

লিখেছি বা টাইপ করেছি— বারবার টাইপ করতে হয়েছে আমাকে। আমার সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে ছিলেন অ্যাডিসন; তুচ্ছ একটা চিঠির প্রুফ সংশোধনের জন্যেও তো ম্যাগডালেনের নিজ কক্ষ থেকে অ্যাডিসিন তড়িঘড়ি ছুটে যেতেন ক্লারেণ্ডন প্রেসে! অবশ্য ভুলচুক আমারও হত, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করতাম যাতে ভুল না থাকে। প্রতিটি তথ্য একাধিকবার মিলিয়ে দেখতাম : নাগাল্যান্ডের ওপর লেখা আমার বইটি কম করে তেরোবার আমি পুনঃসংশোধন করেছি।

বিগত তিরিশ বছর ধরে নৃতত্ত্বের ওপর পড়াশুনার চর্চা করে চলেছি; কিন্তু আজকালকার নৃতাত্ত্বিকদের মতো কখনোই গোড়া থেকে তার চর্চা শুরু করি নি। মানবসত্তা বিষয়ক আগ্রহটা জন্মেছে সাহিত্যপাঠের সূত্রে; আর সেখানে আমার প্রথম শিক্ষকরা হলেন জেন অস্টেন এবং স্যুইফট্। প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস বা গালিভার ট্রাভেলস-এ কী পরিমাণ সমাজবিজ্ঞানের উপকরণ আছে, বিশ্লেষণের সম্ভার আছে ভাবা যায় না। পরবর্তীকালে আবার, কিছুটা আশ্চর্যজনকভাবেই, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আমার পড়াশুনা মানুষ সম্বন্ধে মনে কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছিল। বস্তুত ঈশ্বর বিষয়ক বীক্ষা আমাকে মানবসত্তা বিষয়ক বিজ্ঞানের দিকে চালিত করেছিল। ইতিহাস-দর্শন-মনস্তত্ত্বের ওপরও কিছুটা পড়াশুনা করতে হয়েছে : আমার চলার পথ তৈরিতে এসবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

পুণেতে হিন্দু ধর্মতত্ত্বের ওপর আমি যে পাঠ নিয়েছিলাম তার সুফলও কম ছিল না। আসামের বাইরে অধিকাংশ আদিবাসীর ওপরই এই বিশাল ধর্মের প্রভাব অপরিসীম; ফলে সেই হিন্দুধর্মটা কী তা ভালভাবে না বুঝে সেই আদিবাসীদেরও জানা সম্ভব নয়।

নৃতত্ত্ব এক খুবই বড় বিষয়— মানুষের বিজ্ঞান, মানুষ মানে সমগ্র মানবগোষ্ঠী। সেই বিজ্ঞানচর্চার জন্যে আবশ্যক নানা ধরনের ব্যক্তি। প্রাক্-ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, মানবদেহের আকৃতির সঠিক পরিমাপ গ্রহণ, প্রাণিবিদ্যা কিংবা পরিসংখ্যানের মতো বিষয়ে আবশ্যক প্রশিক্ষিত পণ্ডিতবর্গের। আবার এমন মানুষেরও প্রয়োজন রয়েছে যাঁরা এসেছেন মানবতার পটভূমিকা থেকে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, ব্যবহারিক নৃতাত্ত্বিকগণ মানবতাবাদী এই নৃতাত্ত্বিকগণকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। আমার বিবেচনায় এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আবার একথাও অনস্বীকার্য, বিপরীতটাও ঘটে, শেষোক্তগণ অবজ্ঞা দেখান প্রথমোক্তগণকে।

সূচনায় আমিও বাস্তব ব্যবহারিক নৃতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, এবং কেমব্রিজের এ. সি. হ্যাডন-এর জীবন আমাকে উজ্জীবিত করেছিল; নিঃসন্দেহে তৎকালে তাঁর সমতুল্য যথার্থ নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী আর কেউ ছিলেন না। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের সূচনায় যে-উদ্ধৃতিটি আমি রেখেছি তা থেকেই বোঝা যায়, মানব-বিজ্ঞান অনুশীলনের মমার্থ হচ্ছে মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ ও মমতাবোধ তাদের, কল্যাণসাধণ ও উন্নতি

কামনা, মানুষকে লেবোরেটরি-নিদর্শনের পরিবর্তে মানবসত্তা হিসেবে গণ্য করা; এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের বিরুদ্ধ কোনো ব্যাপার নেই।

নৃতত্ত্বের নির্যাস ও রসকলা হচ্ছে ভালবাসা; ভালবাসাহীনতায় তার কোনো সার্থকতা নেই, তার মধ্যে সত্য কিছু নেই।

নৃতত্ত্ব আমার কাছে কোনো 'সমীক্ষণ'-এর বিষয়মাত্র ছিল না, তা ছিল আমার কাছে গোটা জীবন। আমার পদ্ধতিটা ছিল, যে-মানুষদের নিয়ে আমার সমীক্ষণ তাদের মধ্যে গিয়ে বাস করা, তাদের সঙ্গে জীবন কাটানো, একজন বহিরাগতের পক্ষে যতটা সম্ভব তাদের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাক্রমে অংশগ্রহণ; তারই মধ্যে একই সঙ্গে কয়েকটি গ্রন্থের কাজ করে যাওয়া। আমার *বাইগা* বইটি প্রণয়নে লেগে গেছে সাত বছর, *দি আগারিয়া* গ্রন্থের জন্যে ব্যয় হয়েছে দশ বছর। লোকগাথার প্রথম সংকলনটির জন্যে লেগেছে আমার দশটি বছর; আর *ফোক সঙ্স অফ ছত্তিশগড়* বইটির জন্যে ব্যয় হয়েছে আমার চোদ্দ বছর। কিন্তু উপরোক্ত সব বইগুলোরই কাজ চলছিল একই সঙ্গে। অর্থাৎ বলতে চাইছি, কোনোরকম প্রশ্ন আর উত্তরের ওপর নির্ভর করিনি আমি; জনগোষ্ঠী বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে আমার জীবনেরই অংশ হয়ে গিয়েছিল।

আর এই অভিজ্ঞতা যতই বিস্তৃত হতে লাগল ততই বেড়ে গেল সেই অভিজ্ঞতাসমূহের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। বাইগাদের অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দারিদ্র বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাই আমাকে উদ্দীপিত করেছিল বদলি-চাষের ক্ষেত্রে অরণ্য-নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে; এই বদলি-চাষের ব্যাপারটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে এখন আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। একটা সময়ে আগারিয়াদের ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প প্রায় বিলোপের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল; প্রথমে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কুটিরশিল্পকে উৎসাহদানের আশু আবশ্যকতায়। একইভাবে সাঁওতাল ও ওঁরাওদের বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল তাদের অবশিষ্ট শিল্পসমূহের গুরুত্ব কতটা। বণ্ডো বা সাওরাদের মতো কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী বহিরাগতদের সম্পর্কে সন্দেহ ও বৈরী মনোভাব পোষণ করে থাকে, ফলে সরকারি আমলারা তাদের ওপর খুবই বিরক্ত। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে তাদের বিষয়াদি জানবার পরই আমি বুঝেছি, তারা মোটেই খুনীস্বভাবের নয়; তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের মূলে রয়েছে তাদের গভীরে প্রোথিত ধর্মবিশ্বাস ও জাদুধারণা। এমনকি লোকগাথা ও মিথের পাঠ,— অনেকেই যাকে নিবিষ্ট পণ্ডিতের আধেয় বিষয় বলেই মনে করেন না, সেসবের পাঠও আমার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে ওইসব গোষ্ঠীর আশঙ্কা ও ভীতির গুরুত্ব; বরং আমাদেরই উচিত তাদের কাছে স্বচ্ছ করে তোলা যে আমরা কোনোপ্রকার আশঙ্কাকর বা ভীতিপ্রদ কাজ করছি না।

নিঃসন্দেহে কিছু অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আছেই যা একান্তভাবে অ্যাকাডেমিক; কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে (১৯৬৫ সালের ভারত— অনুবাদক) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিণতিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাধারণ গণসমাজে পরিবর্তিত হয়ে গেছে বা মিশে যাচ্ছে। আমার তো মনে হয়, আমাদের কর্তব্য হল সম্ভাব্য প্রত্যেক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীকে বিকাশের শর্তে নির্দেশদান করা ও তাঁদের এজেন্টদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। এই উদ্যোগ কিন্তু গবেষণার মান হ্রাসের ব্যাপার নয়, বরং কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বিষয়ে পক্ষপাতহীন থাকা। কারণ মানবজীবনের তামস অংশে আলোকপাত ঘটানো, তার রূপান্তর সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিজ্ঞানের মহিমা।

দুই

আমাকে নিয়ে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছিল অন্য এক কারণে : কবিতার পথরেখ ধরে নৃতত্ত্বে আমার প্রবেশ। সত্যি কথা বলতে কি, আজো আমি বুঝে পাই না এর মধ্যে দোষণীয় কী আছে। মানবজীবন বিষয়ক প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে উপরিতলের নিচে কী আছে,— মানুষকে 'খনন' করে এগিয়ে চলা। কবিতা সেই রহস্যের উদ্‌ঘাটক, সেই সত্যের উন্মোচক; মানুষের নিজস্ব সূক্ষ্ম অনুভবনশীলতার বিস্তার ঘটিয়ে, তার সামনে কল্পনার ভাণ্ডার মেলে ধরে কবিতা মানুষের প্রতি মানুষের উপলব্ধি ও সহমর্মিতা বোধকে বাড়িয়ে দেয়। আর যে অঞ্চলের মানুষ নিজেরাই কবিস্বভাবের (যেমন মাইকাল হিলের মানুষ ছিল) সেখানে একের সঙ্গে অপরের একটা মেলবন্ধন গড়ে ওঠে; তারা একই ভাষায় কথা বলে, একই জিনিস ভালবাসে।

অক্সফোর্ড ছেড়ে আসার দিন থেকে কবিতা আমার অবিচ্ছেদ্য সাথি। কবিতা নিয়ে এসেছিল 'শ্রান্তিকালে মধুর সংবেদন'; ঝড়ঝঞ্ঝায় কবিতা আমাকে প্রশান্তি দিয়েছে, আমাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে; আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোকে ভরিয়ে রেখেছে, আর যা কিছু বিরক্তিকর ও তামস তাকেই আলোকিত করেছে। কীটসের মতো আমিও অমর কবিতা ব্যতিরেকে দিনাতিপাত করতে পারি নি।

আজ সেদিনের অনুভূতির কথা ভাবি; প্রথমে যে-দিন ভারতবর্ষের আদিবাসী পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করতে যাই সেদিন সঙ্গে ছিলেন আমার ওয়ার্ডসওয়ার্থ, আমার টি. এস. এলিয়ট. আমার ব্লেক ও শেক্সপীয়ার— আমার ক্ষুদ্র মাটির ঘরে তাঁরা মশালের মতো আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাতেন; কবিতার আরশিতেই যে আমি নিজেবে দেখব এটাই ছিল স্বাভাবিক। সজ্জন রোমান্টিক আদিবাসী মানুষের মধ্যে থাকতে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই আমি লক্ষ করি : কবিতারই স্ফুরণ ঘটছে। সর্বত্রই কবিতা— তাদের চোখের মণিতে, তাদের অধরে, এমনকি তাদের কাজকর্মের ছন্দেও। আর তাই, তখন থেকেই কবিতা আর কোনো বহিরস্থ প্রশান্তির ব্যাপার রইল না, কবিতা হয়ে গেল

আমারই এক অংশ, এক ব্যক্তিগত অর্জন। আর সেই কবিতার উদ্দেশ্যে যা-কিছু করেছি তা সবই এসেছে আমার আদিবাসী কবিবন্ধুদের কাজের সূত্রে।

বাস্তবিকই আমি দেখেছি মানুষকে কবিতায় কথা বলতে। এক বৃদ্ধা আগুনের কথা বলতে গিয়ে বলছিল, যেন শুকনো গাছে ফুল ফুটেছে; ছাতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, যেন এক পায়ে দাঁড়ানো একটা ময়ূর। আগুনের চারধারে রাতের বেলা খেলা করতে করতে শিশুরা একে অপরকে যে ধাঁধা জিজ্ঞেস করত সেগুলোও মাঝে মাঝে কবিতার মতো হয়ে উঠত। ঝোপে বসে-থাকা লাল ও সবুজ পাখি হচ্ছে লঙ্কা; ছোট্ট এক চড়ুই তার পালক বাড়ির আশেপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে লম্ফ-বাতি। একজন লোক তার গর্ভবতী স্ত্রী সম্বন্ধে আমাকে বলেছিল : 'ওকে ফুলের মতো শুশ্রূষা করতে হবে, না হলে তার কুঁড়ির আলোক মিলিয়ে যাবে।' তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকারা মাঠের এ-ধারে ও-ধারে দাঁড়িয়ে কবিতায় গান গায়; কবিতার ছন্দেই পালাবার ফন্দি আঁটে— কবিতার রূপকে-প্রতীকে ভালবাসার বিনিময় করে চলে। মাঠের শস্যদানাও সৌন্দর্যায়িত হয় তাদের বাচনে : ক্ষুদ্রতম বাজরাটি হচ্ছে পদ্মের মতো মিষ্টি; যতই ক্ষুদ্র হোক দুধের সঙ্গে রাঁধলে তার দম্ভই আলাদা। বনের ওষধিগুলোকে পর্যন্ত ব্যক্তিক করে তোলা হত; কারো মাথা নেড়া, কারো লম্বা বেণী মাটি ছুঁয়ে ঝুলছে, যেন তিন-তৃতীয়াংশই চুল। আবার কোনো রূপসী যখন ঘুমায় তখন ভাঙাচোরা খাটিয়ার পায়াগুলোও হয়ে যায় সোনার, কাঠামোটা মণিমাণিক্যের।

আদিবাসীদের নিয়ে আমার প্রথম বইটি ছিল যৌথ উদ্যোগের—শামরাও এবং আমার; বইটির নাম : *সঙ্স্ অফ দি ফরেস্ট*; প্রকাশক ছিলেন অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন। সেই বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে বাধিত করেছিলেন স্যার ইয়ংহাজবেণ্ড। লেখালেখির কাজ শেষ হয়ে গেলে সাধারণত আমি আর বইগুলোর দিকে ফিরে তাকাই না, কিন্তু এ-বইটি এবং আরো কিছু অনুবাদ পড়ে আমি যথেষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছি; যে কোনো বিচারে সেগুলো ছিল উৎকৃষ্ট। মাণ্ডলা পাহাড়ি অঞ্চলে থাকার সময়ে স্থানীয় হিন্দিভাষা ছত্তিশগড়িতে কথা বলার অবাধ সুযোগ পেয়েছিলাম। এই ভাষাটা শিখে নেওয়াও সহজ। আজো বাড়িতে আমরা এ ভাষায়ই কথা বলি। এ-কথা উল্লেখের অর্থ, জনসাধারণের সঙ্গে দ্রুত ও আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপনে সব সময়েই আমরা সমর্থ হয়েছি।

পরে আমি আরো দুটি লোকগীতির সংকলন প্রকাশ করেছি; তার প্রথমটি হল ১৯৪৪ সালে *ফোক সঙ্স্ অফ দি মাইকাল হিলস* (শামরাওয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে); আর দ্বিতীয়টি হল দুবছর বাদে প্রকাশিত *ফোক সঙ্স অফ ছত্তিশগড়*। দুটি বইই বেশ মোটা, একটি ৪৩৯ পৃষ্ঠার, অন্যটি ৫২৭ পৃষ্ঠার। প্রথম বইটি আমরা ডব্লয়ু আরচারকে উৎসর্গ করি; দ্বিতীয় বইটি নিয়ে মিঃ আরচার বিশদ আলোচনা করেছিলেন। আমার ধারণায়, আদিবাসী কবিতা নিয়ে এত নিখুঁত গভীর আলোচনা আর কেউই অদ্যাবধি করেন নি।

আমার অনুবাদের পদ্ধতিটা ছিল অত্যন্ত সহজ, মূলানুগ। আগাগোড়া খুব সতর্ক থেকেছি যাতে মূলের সঙ্গে অ-স্বভাবী নতুন চিত্রকল্প জুড়ে না যায়। আর্থার ওয়েলে তাঁর নিজের পদ্ধতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন : 'যেহেতু কবিতার প্রাণই হচ্ছে প্রধানত চিত্রকল্প, তাই আমার নিজস্ব চিত্রকল্প আরোপ করা যেমন পরিহার করেছি তেমনি মূলের কোনো চিত্রকল্পকেও চেপে রাখতে চাই নি।' এই রীতির বিচ্যুতিজনিত বিপত্তির আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে ড্রাইডেনের অনুবাদকর্মে। তাঁর অনুবাদগুলো নিঃসন্দেহে অসাধারণ মৌলিক কবিতা, যেন ক্লাশিক্যাল বিন্যাসে নির্মিত। তাঁর *ফরচুন* কবিতার বিখ্যাত স্তবকটি ছিল এইরকম :

যখন সে নম্র তাকে আমি উপভোগ করতে পারি,
কিন্তু সে যখন বাতাসে নাচে, এবং
ডানা ঝাপ্টায় আর কিছুতেই নামে না
আমি ফুৎকারে উড়িয়ে দিই গণিকাকে।

অনুমান করা যায়, হোরেস-এর থার্ড বুক-এর উনত্রিশ সংখ্যক গাথার অনুবাদ এটি। কিন্তু যে অনবদ্য পংক্তিটির এত গুণগাণ করেছেন থ্যাকারে— 'আমি ফুৎকারে উড়িয়ে দিই গণিকাকে'— সেটি কিন্তু মূলে সহজভাবে শব্দান্বিত হয়েছে 'উদ্দেশ্যে নিবেদন' হিসেবে। অনাবশ্যকভাবেই নতুন একটি চিত্রকল্প কবিতাটিতে যুক্ত হয়ে গেছে। লোককবিতায় প্রতীকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাই সেইসব কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের আরো বেশি সতর্ক থাকতে হয়।

অনুবাদকর্মে যতটা সম্ভব আর্থার ওয়েলে-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ এবং ডব্লুয়ু. জি. আরচার প্রবির্তত নীতিমালাকেই মান্য করে গেছি। অর্থাৎ ধ্বনি-সাদৃশ্য পরিহার এবং মূল আঙ্গিককে পুনর্সৃজন থেকে সম্ভবপর মাত্রায় বিরত থেকেছি। কবিতার মর্মার্থ, কবিতা যা দাবি করে, তাকেই যতটা সম্ভব আক্ষরিকভাবে উপস্থাপনে সচেষ্ট থেকেছি; আর বিশেষভাবে সতর্ক থেকেছি যাতে নতুন কোনো চিত্রকল্পের অনুপ্রবেশ ঘটে না যায়।

বিল আরচার তাঁর ওঁরাও *লোক* কবিতার বই *দি ডোব অ্যান্ড দি লিওপার্ড*-এ আমার অনূদিত বাইগা, পরধান ও গোণ্ড কবিতার নানা তুলনামূলক উপস্থাপনা রেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, বিভিন্ন আদিবাসী মানুষের এই কবিতা একই ধাঁচের কিন্তু সেখানেও রয়েছে আঙ্গিকগত উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা। বাইগাদের মধ্যে যেমন সাধারণভাবে রয়েছে দুই পংক্তির কবিতা, ওঁরাওদের কবিতায় তা নেই। তেমনি নেই মিলনাত্মক চিন্তনের রীতিও (হিব্রু কবিতায় যা সচরাচর দেখা যায়)— অর্থাৎ প্রথম পংক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পংক্তির সমান্তরাল ধারাগত মিল নেই। প্রেমের কবিতাকে আমরা যদি ভাবাবেশের প্রকাশ মনে করি তবে বাইগা কবিতায় তার উপস্থিতি

১৯৫০-এ সিংহলে ভেড্ডাদের সঙ্গে লেখক

বণ্ডো পাহাড়ে ; (উপরে) শামরাও ও কুসুম হিভালে ১৯৪৬ ; (নিচে) ভিক্টর স্যাসুন, ১৯৪৭

স্পষ্টতই চোখে পড়ে; কিন্তু ওঁরাও কবিতায় তা হয় না। 'প্রেমের মাধুর্য নয়, যৌনতার আবশ্যকতাই ওঁরাও কবিতার বৈশিষ্ট্য।'

খুবই পরিতাপের কথা, আমরা এসব কবিতা তার স্বরূপে প্রকাশ করতে পারি নি; এবং এই ব্যর্থতার দায়ে আমি যে কোনো কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে রাজি আছি। আমরা যদি অতি দ্রুত কাজটা করে ফেলতে পারতাম তাহলে বইটি সম্ভবত আরো বেশি আকরমূলক ও গ্রহণযোগ্য হত। বিপুল সংখ্যক কবিতা আমরা দেবনাগরী অক্ষরে টুকে নিয়েছিলাম— শামরাও সেগুলো প্রেস-কপি হিসেবে তৈরিও করে চলছিলেন। একবার ট্যুরে যখন আমরা বাইরে গেছি, দুর্ভাগ্যক্রমে এক প্রবল ঝড় এসে আমাদের অনুপস্থিতিতে ঘরের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেলে; আর তার মধ্যেই ছিল দুর্মূল্য 'মূল' কবিতাগুলো। গানগুলো কোনো নির্দিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্টের নয়, কোনোটাই অজানা আদিবাসী গোষ্ঠী ভাষা থেকে সংগৃহীত নয়; অথচ সেই গানগুলোতে একই সঙ্গে থাকত শৈল্পিক ও সাহিত্যিক প্রসাদগুণ। মূলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবার পর ওইসব খণ্ডের অনুবাদকর্ম নিয়ে বিশেষ কিছু দাবিও করতে পারি না; তথাপি বলতে পারি, সেইগুলোতেও প্রচুর পরিমাণ ভাষ্য ও টীকা রয়েছে; সেইসবের নিশ্চয়ই কিছু সমাজতাত্ত্বিক মূল্য আছে।

তিন

আমার প্রথম উল্লেখযোগ্য বড় কাজ *দি বাইগা*। দোয়াবজি টাটা ট্রাস্টের অনুদানে বইটি প্রকাশ করে জন ম্যুরে। স্মৃতিচারণ করলেই এক্ষেত্রে মনে পড়ে যায় ড. সি. জি. সেলিগম্যান এবং তাঁর স্ত্রীর অনুপ্রেরণার কথা; গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই *ব্রিটিশ জার্নাল অফ মেডিকেল সাইকোলজি*-তে বাইগা-স্বপ্ন নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে এঁরা দুজনেই অশেষ সাহায্য করেছিলেন। পরে ওই জার্নালে 'সদন্ত্য-যোনিবর্ত্ম' বিষয়ে আরেকটি প্রবন্ধ লিখি।

দি বাইগা লেখার ব্যাপারটা ছিল খুবই উত্তেজনাকর। পত্রপত্রিকায় গ্রন্থটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও পেয়েছিল; তবে আমার মনে হয় সেটা বাস্তবত একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু তখনকার এ-জাতীয় সব কাজের সময়ই বিরাজ করত প্রবল আগ্রহ ও উত্তেজনা; আর মনে হয় সেই উত্তেজনাও ছিল সংক্রামক।

বাইগাদের মধ্যে থাকাটা যেন এক রূপকথার দেশে থাকা। যত আদিবাসীদের কথা আমি জানি তার মধ্যে বাইগারাই সর্বাধিক পৌরাণিক কাহিনীতে সংবদ্ধ, বলা যায় আচ্ছন্ন। আর এইসব পুরকাল্প বা মিথ শুধু তাদের জীবনের ঝালরে সাঁটা মজাদার গল্প মাত্র নয়। এইসব মিথ জীবন্ত : ধারাবাহিকভাবে তার প্রতিটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষখেকো কোনো বাঘকে বশ মানাতে যখন কোনো বাইগাকে আদেশ করা হয়, সে তখন এই বিপজ্জনক কাজটির মুখোমুখি হয় আরো বেশি সাহসের সঙ্গে; কারণ সে

জানে এই কর্তব্যের দায় সে বহন করে এসেছে আদিকাল থেকেই। গোণ্ড চাষীদের হয়ে সে যখন জাদুক্রিয়া করে তখন সে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলীলার বর্ণনা করে, সে তার শ্রোতাদের শুনিয়ে দেয় তার গোষ্ঠীর কি অসাধরাণ ভূমিকা এক্ষেত্রে ছিল। আদিম প্রথার মধ্যে মিথ জীবনের শ্বাস নিত— দুবোর্ধ্যকে বাস্তব করে তুলত; মিথই আদিম বীরপুরুষকে সমসময়ের প্রেক্ষায় নিয়ে আসত।

এই আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বীরপুরুষের নাম নাঙ্গা বাইগা। তার জন্ম হস্তিপাহাড়ে, ধরিণীমাতার গর্ভে, বাঁশঝাড়ের নিচে; এক ঈশ্বরী বাঁশ-মেয়ে তার দেখভাল করেছিল; সেই মেয়েই তার হাতে খেলনা হিসেবে তুলে দিয়েছিল সোনালি কুঠার; যখনই সংকট দেখা দেয়, তাকে খুব দরকার পড়ে তখনই নাঙ্গা বাইগার আবির্ভাব ঘটে। বিশাল, চাপাটির মতো চেটাল এক আদিযুগীয় সমুদ্রমুখে স্রষ্টা এই বিশ্ব সৃষ্টি করলেন। পবনকে ডেকে স্রষ্টা বললেন, মাটি মজবুত করো, কিন্তু পবন ছিল অন্ধ (তাই তো পবন সবকিছুকে ধাক্কা মারে, মানুষকে দুমদাম আঘাত করে), তাই পবন কাজটা শেষ করতে পারল না। স্রষ্টা ভীমসেনকে ডেকে বললেন, পাহাড়গুলো যথাস্থানে বসিয়ে দাও; কিন্তু ভীমসেন পাঁড়ে মাতাল আর বিপুলাকৃতি। তাই তার পা পড়ল নরম কোমল জায়গায়। ফলে কোনোকিছুই আর ধরিত্রীকে মজবুত ও কঠিন করে তুলতে পারল না; ধরিত্রী নড়াচড়া করতে লাগল। ধরিত্রীটা যেন হয়ে গেল একটা ছিন্ন উর্ণনাভ।

স্রষ্টা তাই নাঙ্গা বাইগাকে পাঠালেন। সে এসে যখন এক প্রান্তে পা রাখল ধরিত্রী কেঁপে উঠল; যেমন শোনা যায়, বার্নাড শ নিউ ইয়র্কে নামতেই আমেরিকা কেঁপে উঠেছিল। সে যাক, নাঙ্গা বাইগা অতি দ্রুত সবকিছু যথাস্থানে স্থাপন করল। চারটে বড় পজাল জোগাড় করে সে পৃথিবীর চার কোণে পুঁতে দিল। তারপরই পৃথিবীটা সুস্থির ও মজবুত হল। নাঙ্গা বাইগা অতঃপর অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টিকর্মে সাহায্য করা শুরু করল। নাঙ্গা বাইগাই সেই আদিপুরুষ যার সূত্রে বীজ পৃথিবতে আসে; সে জাদুক্রিয়ার প্রবর্তন করল; মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে নাঙ্গা বাইগাই সংগঠিত করল; হিংস্র পশুর ওপর সে কর্তৃত্ব বিস্তার করল। নাঙ্গা বাইগাই প্রথম খাঁটি মানুষ।

এরকম এক অসাধারণ পূর্বসূরির গোষ্ঠীধারা থেকে যে বাইগাদের আগমন তাদের মধ্যেও যে নাঙ্গা বাইগার কিছু পরিমাণ গন্ধবাতাস থাকবেই তাতে আর আশ্চর্যের কি। কোনো রাজা (অথবা বলা যায়, একজন আর্চবিশপ) একটা ফুটো বা গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মেরে সব দেখে থাকেন। আর সেখানে নাঙ্গা বাইগাই হচ্ছে জাদুকর ও চিকিৎসক— সেই ক্লাসিক ধরনের এক মানুষ যে অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও দেবতাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে থাকে। অসার বীজে উর্বরতা সৃষ্টির জন্যে গোণ্ডরা তাকেই ডেকে পাঠায়; ব্যাধিগ্রস্ত হলে ব্রাহ্মণরাও তার পরামর্শ নিয়ে থাকে; বিশ্বাস

রয়েছে, শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ক্ষেত্রের ওপর থেকে নাঙ্গা বাইগাই পারে শিলাবৃষ্টিকে অন্যত্র চালান করে দিতে; হাতে-ধরা দিব্য-দণ্ডের সাহায্যে পুলিসের থেকেও দক্ষতায় সে হারানো মোষ বা চোরাই ছাগলের হদিশ বলে দিতে পারে।

বাইগাদের ঐতিহ্যচেতনা ও শ্লাঘাবোধ তাদের দুভাবে সরকারবিরোধিতায় নিয়ে এসেছিল। প্রথমত, যেহেতু তারা বিশ্বাস করত যে মাতা ধরিত্রীর জঠর থেকেই তাদের জন্ম, তাই লাঙ্গল চালিয়ে সেই মাতার বুক ক্ষতবিক্ষত করা খুবই গর্হিত কাজ মনে হয়েছিল তাদের। আর দ্বিতীয়ত, তাদের বিশ্বাস ছিল তারাই 'পশুপতি'— পশুদের রাজা; তাই অরণ্যে অবাধ শিকার করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মিথ বিষয়ে অজ্ঞতা, তাদের জীবনচর্যা ও রীতিপ্রথা বিষয়ে ঔদাসীন্য পূর্বতন ব্রিটিশ সরকারের কতখানি ছিল তা বাইগাদের সমস্যা মোকাবিলায় যেভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে তার থেকে বিস্তৃত করে আর বলা যায় না।

১৮৬৭ সাল থেকে শতাব্দীর অন্তিমকাল পর্যন্ত পর্বটি জুড়ে বনবিভাগে অত্যুৎসাহী ও সক্রিয় অফিসাররা বাইগাদের ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করতে থাকে; কুঠান নিড়ানি চাষের পরিবর্তে লাঙ্গল চাষ করতে হবে। আবার একই সঙ্গে তাদের শিকারের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হল। অনেককে বাধ্য করা হল তাদের অমূল্য তীর-ধনুকগুলো এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলতে।

বদলি-চাষ ভাল নয় ঠিকই কিন্তু কখনো কখনো সেটাই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র উপায়। বাইগারা সাধারণত বনাঞ্চলের একাংশ কেটে-ছেটে সাফ করে নিত, তারপর মাটি শুকনো হলে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিত আর সেই ছাইয়ের মধ্যে কৃষিবীজ বপন করত। পর-পর এক জায়গায় এভাবে চাষ করার পর তারা অন্য একটা বনাঞ্চল খুঁজে নিত। ধর্মীয় সংবেদন থাকা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে আদিবাসীদের এভাবে স্থানান্তরে গিয়ে ব্যাপকভাবে চাষ করতে দেওয়া যায় না, অনন্তকাল ধরে তো নয়ই, কিন্তু যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র সেটা করছে, যেখানে বদলিটা ঘন-ঘন নয়, অন্তত বছর বিশেকের ব্যবধানে সেখানে বনের ক্ষতিটা খুব বেশি ঘটে না। বেশ অতিরঞ্জিত করেই প্রচার করা হয়। মাণ্ডলা ও বালাঘাটে বাইগারা এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে চলেছে কয়েক শতাব্দী ধরে; কিন্তু অন্যত্র কোথায়ই বা ভাল অরণ্য আছে?

কিন্তু বাইগাদের বাধ্য করানো হল লাঙল-চাষে; ফলে তারা অনেকেই আরো নিঃস্ব হয়ে গেল, কারণ এই অপবিত্র ব্যবস্থাকে তারা ঘৃণা করত— সকলেই মনের গভীরে এক মনস্তাত্ত্বিক সংকটে ভুগতে লাগল। তারা আজ নামতে নামতে নিঃস্বতম চাষী, ব্যর্থ চাষীর অবস্থানে এসে ঠেকেছে। তীর-ধনুক তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর তারা আর আজ পশুপতি নয়, অরণ্যের রাজা নয়— অতীতের মতো কুশলী শিকারিও আর তারা নয়। জীবনে সুখকর ও উপভোগের যা কিছু ছিল সবই আজ তারা খুইয়ে ফেলেছে।

আমার অনেক বাইগা বন্ধু ছিল; তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটলে তারা এসে আমাকে খবর দেবে। সেমতো কোনোদিন হয়তো খবর আসত তিরিশ মাইল দূরের কেউ মারা গেছে, তার শেষকৃত্য দেখার জন্যে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কোনোদিন আবার খবর আসত কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানের; অন্য একদিন ঘটনা সূত্রে মৌমাছিদের সম্মানে আয়োজিত 'মধু উৎসব' দেখতে বিশাল এক পাহাড় চড়তে হয়েছিল আমাদের। এই মধু উৎসব কোনো তুচ্ছ ব্যাপার নয়, প্রতি ন'বছর অন্তর একবার করে এই উৎসব পালিত হয়। এছাড়াও বাইগারা হরহামেশা আমাদের গ্রামে আসত, গ্রাম-সীমানায় গজাল পুঁতে জাদুক্রিয়া দ্বারা গ্রামটিকে সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছে।

বহি নামক দূর প্রান্তের এক গ্রামে আমরা এক রোমহর্ষক বিস্ময়কর উৎসব দেখেছিলাম; এক মানুষখেকোর চোয়ালদুটোকে বন্ধ করা আর যে ডাইন তাকে পাঠিয়েছে তার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবার আয়োজন চলছিল। বাস্তবিকই এক সাংঘাতিক বেপরোয়া কাজ; দুরাত্মার সঙ্গে লড়াই চালাতে সাত-সাতজন অতি ক্ষমতাবান জাদুকর এসে হাজির হয়েছে। একজন দর্শকের ওপর 'ব্যাঘ্র আত্মা' ভর করল; লোকটিও বাঘের মতো আচরণ করা শুরু করে দিল— যেন বাঘে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সে। শুরু হয়ে গেল উত্তেজনাকর ব্যাঘ্র-শিকার; পরিশেষে পাহাড়ের গায়ে, গাছের গুড়িতে গজাল পোতা হল।

পরদিন সকালে আমি বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে মস্ত এক শুয়োর ক্লান্ত পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। শুয়োরটার মুখে ছিল একটা গাছের পাতা, পাতাটা সে আমার সামনে ফেলে দিল। আমি যেন বিহ্বল হয়ে পড়ি— মনে পড়ল, পাখির ছোঁয়ায় এমনই বুঝি হয়েছিল ফ্রান্সিসের, তারপর আর কিছু মনে নেই। কিন্তু বাড়ি এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে আমার প্রচণ্ড জ্বর উঠে যায়, আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। স্থানীয় জাদুকররা আমার ওপর নজর রাখছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারা কারণটা ধরে ফেলল— বহি'র সেই ডাইনি আমার উপস্থিতিতে বিব্রত হয়ে পড়েছিল; তাই একটা পাতায় জাদুক্রিয়া ঘটিয়ে সে তার পোষা শুয়োরের মাধ্যমে আমার কাছে পাতাটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। অতি দ্রুত তারা ব্যবস্থা নেয়, এবং আমিও সুস্থ হয়ে উঠি।

বাইগারা শুয়োর খুব ভালবাসে। একদিন একটি লোক এসে আমার কাছে অভিযোগ জানাল যে তার স্ত্রী অন্য এক পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। সে বলছিল : 'তাও আমি সহ্য করতাম, কিন্তু ওরা আমার আদরের শুয়োরটাকেও নিয়ে গেছে।' ভাবলে বাস্তবিকই এক চমৎকার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে : চন্দ্রালোকিত অরণ্যের নিরিবিলি দিয়ে এক জোড়া সুখী প্রেমিক-প্রেমিকা পালিয়ে যাচ্ছে— প্রেমিকের কাঁধেব লাঠিতে বাঁধা এক শুয়োর প্রতিবাদ ও চিৎকার করছে।

একবার আমরা যখন কপিলদাড়া পেরিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি

তখন পথের ওপর এক বিরাট বাঘের মুখোমুখি হলাম। গাড়িটা ছিল হুড-খোলা, আমি নিজেই খুব ঘাবড়ে যাই। কিন্তু আমার পাশে বসে-থাকা বৃদ্ধ বাইগা লোকটি এক চুলও নড়ল না; সে বিড়বিড় করে জাদুমন্ত্র পড়া শুরু করে দিল; আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঘটি নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। বৃদ্ধ বাইগাটি নিস্পৃহ কণ্ঠে জানাল : 'ও কিছু নয়; ডুগরু নামে এক লোক ছিল, তার কাছে এক সঙ্গে তিন-চারটে বাঘ চলে আসত। বাঘগুলো তার হাত-পা চাটত, থাবা দিয়ে চাপড় মারত। মাঝে মাঝে ডুগরু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ত বাঘেদের এই উৎপাতে। তখন সে হুকুম করত, যা, চলে যা, পালা। বাঘগুলো তার আদেশ সব সময়েই মান্য করত।'

আরো একটা গল্প শোনায় সেই বৃদ্ধ। অরণ্যের ওপর অধিকার খর্ব হওয়ায় বাইগারা যখন খুব ক্ষুব্ধ তখন একবার তারা এলাকার সব বাঘকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল : গভর্নর বাঘ শিকার করতে আসছে, সাবধান! আর তার ফলেই মহামহিম গভর্নর সাহেব একটা প্রাণীও পায় নি অরণ্যে শিকার করার মতো।

নৃতত্ত্ববিদ তাঁর উচ্চাসন থেকে যতটা সম্ভব নেমে আসবেন, এটা এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।; জি. কে. চেস্টারটনের ভাষায় 'এক অদৃশ্য ব্যক্তি' হয়ে উঠবেন তিনি। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেন ফাদার ব্রাউনের গোয়েন্দা গল্পের মতো : যেখানে খুনী, সব সময়েই সেখানে আছে ডাকপিওন! সাক্ষীরা সবাই বলছে, খুনের জায়গায় কাউকে দেখা যায় নি, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই ভুলে গেছে ডাকপিওনের কথা—পরিবেশের সঙ্গে সে এতই অঙ্গাঙ্গি বা অবিচ্ছেদ্য যে তার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি আর পৃথকভাবে চোখেই পড়েই না। এই স্তরে ওঠা, এই মানে উত্তরণ খুব সহজ কাজ নয়, কিন্তু চেষ্টা করে গেছি সব সময়েই। মানববিজ্ঞানী হিসেবে যতটা মর্যাদা পাওয়া সম্ভব তা আমি পেয়েছিলাম এক বাইগার কাছ থেকে। আমি একবার তাদের গ্রামে যাই, বন্ধুর মতোই আমাকে আপ্যায়ন করা হয়; কিন্তু সফরকারি অফিসারদের ক্ষেত্রে সাধারণত যে অভ্যর্থনা ও সমাদরের আয়োজন ঘটে, আমার বেলায় তেমন ছিল না। আমার এক সঙ্গী এতে খুব অসন্তুষ্ট হয়, সে গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বলে : 'এক সাহেব এসেছেন, তিনি একজন গণ্যমান্য মানুষ, তাঁর অভ্যর্থনার উপযুক্ত আয়োজন কেন করলে না?' শুনে বাইগাটি হেসে ফেলল, 'অমরা জানি উনি বড়াভাই!' আমাকে আর শামরাওকে আলাদা করে শনাক্ত করার জন্যেই 'বড়াভাই' আর 'ছোটাভাই' পরিচিতি আমাদের। বড়াভাই ও ছোটাভাই— তৈরি-করা এই নামের শব্দবন্ধেই বস্তুত আমরা সবার কাছে পরিচিত ছিলাম। 'আরে উনি তো আমাদের বড়াভাই, তাঁকে নিয়ে আবার এত ভাবনার কী আছে?'

চার

পরবর্তী গ্রন্থের জন্যে আমি আগারিয়াদের দিকে দৃষ্টি দিই। ছোট এই আগারিয়া

গোষ্ঠীটি কামারের কাজ করে, লোহা গলায়। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাণ্ডলা ও বিলাসপুর জেলার সর্বত্র; তাদের শাখা-উপশাখা মধ্যভারত ছাড়িয়ে বিহার পর্যন্ত চলে গেছে। তাদের উপর সমীক্ষণের ক্ষেত্রে আমি নিজেকে মনোযোগী ও নির্দিষ্ট রাখতে চেয়েছি মূলত তাদের কারিগরি বিদ্যার উপর, আর যে-মিথ তাদের সজীব রেখেছে তার ওপর। এই সমগ্র বিষয়টা আমাকে খুবই আকৃষ্ট করে, এবং বুঝতে পারি গবেষণার ক্ষেত্রে আমার পক্ষে এক ভাল কাজ হবে। কিন্তু বাইগাদের তুলনায় আগারিয়ারা নিস্পন্দ ধরনের আদিবাসী মানুষ। আর প্রকল্পগত গ্রন্থের জন্যে প্রয়োজন প্রচুর ঘোরাঘুরি—অপ্রত্যাশিত জায়গায় তাদের ছোট ছোটো গোষ্ঠীর হদিশ করে বেড়ানো।

লৌহ বিষয়ক আমার এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ পনের বছর বাদে লেখ্যরূপ পেয়েছিল। টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানির শতবার্ষিকীতে তাঁদের আমন্ত্রণে লিখি *দি স্টোরি অফ টাটা স্টিল*। সত্যি কথা বলতে কি, এই লেখাটিই যথোচিত সম্মান-দক্ষিণাপ্রাপ্ত আমার একমাত্র কাজ (এই লেখাটির জন্যে তাঁরা আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন) আর বইটিও খুব সুদৃশ্যভাবে প্রকাশিত হয়।

শুধু এই বইটি লেখার সময়ই নয়, যে কোনো বই লেখার সময়ই আমি গল্প সংগ্রহ করে বেড়াতাম। এরকম শ' দেড়েক গল্প আমি গ্রথিত করেছি *ফোক-টেলস অফ মহাকোশাল* গ্রন্থে; সেটি ছিল মধ্যভারতের শ্রুতি-সাহিত্যের নিদর্শনের প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডটিতে সংযোজন হিসেবে ছিল ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় লোককথার প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি— আর সব কিছুই তুলনামূলক উপাদানে, টীকাভাষ্যে সন্নিবিষ্ট ও পরিমার্জিত করা হয়েছিল। এই বিষয়ক দ্বিতীয় খণ্ডটির শিরোনাম *মিথস অফ মিড্‌ল ইন্ডিয়া*। এই খণ্ডের গল্পাংশ তেমন আকর্ষণীয় নয় ঠিকই কিন্তু কিভাবে আদিবাসী মিথ বা পুরাকল্পের বিকাশ ঘটেছিল— কখনোই-বা তা প্রাচীন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের সমান্তরালে চলে এসেছিল, সেই বিকাশধারা, —সেসব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের উৎপত্তি ও কার্যকারিতা বিষয়ব অধ্যায়টিই সম্ভবত এই গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেশ কিছু পাঠকের কাছে হয়তো এই অধ্যায়টি নীরস ঠেকেছে; কিন্তু *আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজিস্ট* যখন এই অংশটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল : 'মানবজাতির বৌদ্ধিক ইতিহাস আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এটি এক উল্লেখযোগ্য কাজ', তখন আমি কিন্তু যারপরনাই আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

অনেকদিন বাদে ওই বৃহৎ সংকলন থেকে লোককথার দুটি নির্বাচিত সংকলন করি। প্রথমটির নাম *স্টোরিস ফ্রম ইন্ডিয়া*— ছোট ছোট চার খণ্ডে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বেরোয়; অন্য সংকলনটির নাম *হোয়েন দি ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ইয়ং*— এটি প্রকাশ করে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। দুটি সংকলনেরই আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

ছিল তাদের চিত্রাঙ্কন ও অলঙ্করণ। অনন্য সুন্দরী লীলা শিভেশওয়ারকার প্রথমটির এবং মেধাবী ও প্রাণবন্ত জয়াল দ্বিতীয়টির অঙ্কনের কাজ করেছিলেন।

অন্য আরেকটি বইয়ের প্রস্তুতিতে আমি গভীর আনন্দের মধ্যে ছিলাম; সেটির নাম *ট্রাইবাল আর্ট ইন মিডল ইন্ডিয়া*, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সে-সময়ে এতই উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম যে বইটি প্রকাশে তর সইছিল না, তড়িঘড়ি প্রকাশও করে ফেলি। পরে বুঝেছি, আমি যদি আরো দু-এক বছর অপেক্ষা করতাম বইটি আরো উন্নতমানের হয়ে উঠতে পারত। যেমন পরে আমি পাই কাঠ-খোদাই বা কারভিংয়ের এক মূলব্যবান সংগ্রহ— সাঁওতাল পরগণা থেকে। পেয়েছিলাম অনেকগুলো যদুপাড়ুয়া স্ক্রল, যার নাম দিই কমিক স্ট্রিপ— ছবির ভাষায় প্রাচীন যুগের গল্প বলছে সেগুলো। এসব সংযোজিত না হওয়া সত্ত্বেও বইটিতে ছিল অনেক অপ্রত্যাশিত সম্পদ। আর নানা অঞ্চলের চিত্রকরদেরও উজ্জীবিত করেছিল বইটি।

এই পর্বেই আমি দুখানা উপন্যাস লিখে ফেলি; এবং দুটি বইই প্রকাশ করেছিল ম্যুরে। তার প্রথমটি, *ফুলমত অফ দি হিলস*-এ রয়েছে এক পরধান মেয়ের প্রেমাখ্যান— অন্তিম পর্যায়ে মেয়েটির সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় কুষ্ঠরোগে। দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম *আ ক্লাউড দ্যাটস ড্রাগোনিস*; এটি আদিবাসী অপরাধ-কাহিনী, সেই আখ্যানের গোয়েন্দারা সব গোণ্ড ও বাইগা। দুটি উপন্যাসই ইংল্যান্ডে যথেষ্ট সমাদৃত হয়, ভারতে অবশ্য তেমনভাবে কেউ পড়েন নি। তবে কি, গত বিশ বছর ধরে দুটি উপন্যাসের কোনোটিই মুদ্রিত অবস্থায় নেই, আর প্রকাশিতও হয় নি। পরে আমি আরেকটি উপন্যাস লিখি, *ট্রেইটরস গেইন*, যার বিষয় ছিল আদিবাসী মানুষের ওপর অবিচারমূলক শোষণ। সেই উপন্যাসটির কোনো প্রকাশক জোটেনি। পরে আরো দুটি রোমাঞ্চ-কাহিনী লিখি; কিন্তু তাদের পরিণতিও একই হল। তার একটির বিষয়বস্তু ছিল এক জাঁদরেল দুর্বৃত্তের কাহিনী, মিঃ গোলাঞ্জ সেটি প্রায় নিয়েই নিয়েছিলেন; দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তুতে ছিল, ভিক্টর স্যাসন ও আমি যে ১৯৪৯ সালে ফরাসি কলোনী পশ্চিম-আফ্রিকা ভ্রমণে গিয়েছিলাম তার অভিজ্ঞতা। এই বইগুলোর ব্যর্থতা আমাকে বেশ হতাশ করেছিল; কারণ লেখার সময় তো আমার ধারণাই জন্মে গিয়েছিল : এগুলো হবে সব বেস্টসেলার, আমার অর্থকরি সমস্যা সব একেবারে ঘুচে যাবে।

এ-বাদে আর একখানা উপন্যাস আমি লিখি, ভিক্টরের খুব ভাল লাগল সেটি। কিন্তু আমার সাহসে কুলোয় নি তা সাহিত্যে সমালোচকদের সামনে তুলে ধরতে। উপন্যাসটি ছিল একটি মেয়ে-চরিত্র নিয়ে— মেয়েটি বাস্তবত চব্বিশ ঘন্টার জন্যেই গণিকায় পরিণত, চারজন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে সে তার দেহ বেচে। তাদের কোনো একজনের মাধ্যমে তার দেহে সিফিলিস রোগের সংক্রেমণ ঘটে। সেই রোগ চরম আকার নেয়, তার মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়; মেয়েটিকে পাঠানো হয় একটি সেবাকেন্দ্রে। সেখান থেকে মেয়েটি পালিয়ে আসে, আর তার পূর্বতন প্রেমিকদের

খুঁজে বেড়াতে থাকে। সে যেহেতু জানে না ওই চারজনের মধ্যে কোনজনের মাধ্যমে রোগটা এসেছে, তাই সে একে-একে ওই চারজন পূর্বতন প্রেমিককেই খুন করে। পুলিস এই খুনে বিভ্রান্ত হয়, আপাতদৃষ্টে খুনের কোনো উদ্দেশ্য তারা দেখে না, খুনগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্রও খুঁজে পায় না।

পেনিসিলিনের আবিষ্কার কিন্তু গল্পের মূল নির্যাস অনেকটাই শুষে নেয়; আর আমিও এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলেছি।

দি বাইগা সূত্রে বহু বন্ধু পেয়েছি; তাঁদের মধ্যে প্রধানতম হলেন ডব্লয়ু. জি. (বিল) আরচার। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের একটা সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে, তার সদস্যরা অনমনীয় ও উদ্ধত। ধারণাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এই আই. সি. এস.দের মধ্যেও রয়েছেন বেশ কিছু সজ্জন ও সংবেদনশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি; সেখানেই রয়েছেন স্বয়ং বিল-এর মতো মানুষ, কিংবা এন. আর. পিল্লাই, ভি. বিশ্বনাথন (বর্তমানে স্বরাষ্ট্র সচিব), জে. এইচ হাটন (বর্তমনে আসামের গভর্নর) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ; তাঁদের কথা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বলেছি।

দি বাইগা প্রকাশের কদিন বাদেই বিল আরচার এক চিঠিতে আমাকে বিহারে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তখন বিহারের সেন্সাস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট। আমি শামরাওকে নিয়ে সেখানে গেলাম কয়েকদিন কাটাতে। সেখানে সুযোগ মিলল ওঁরাও, মুণ্ডা, হো ও অসুর'দের অনেকগুলো গ্রাম পরিদর্শনের। পরে বিল যখন সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার হলেন তখনও তাঁর সঙ্গে প্রচুর ঘুরেছি। পরেও বহুবার সাঁওতাল ও ওঁরাওদের গ্রামে গিয়েছি। এইসব সব সফরের অভিজ্ঞতা মুরিয়াদের ওপর গ্রন্থরচনায় আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছিল, এবং আদিবাসী শিল্পকলা বিষয়ক আমার প্রথম বইটির ক্ষেত্রেও সেই অভিজ্ঞতার প্রভাব ছিল।

এই সফরের প্রথম যাত্রায় আমার সুযোগ ঘটে প্রবীণ লোকহিতবাদী শরৎচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের। বিহারের আদিবাসীদের ওপর তিনি শুধু ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থই রচনা করেন নি। এইসব মানুষের পক্ষে নির্ভীকভাবে আদালতে ও আদালতের বাইরে লড়াই চালিয়ে গেছেন। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর ছেলে রমেশের সহযোগিতায় বিল আরচার ও আমি তাঁর *ম্যান ইন্ ইন্ডিয়া* জার্নালটি বেশ কয়েক বছর ধরে সম্পাদনা করি।

পাঁচ

সে সময়ে সেন্ট্রালে প্রভিনস্ বলে পরিচিত প্রদেশটির দক্ষিণে ছিল বাস্তার রাজ্য— বেলজিয়ামের সমান আয়তনের এক ভূখণ্ড। ছত্তিশগড়ের বিস্তৃত সমভূমিটি একটানা উত্তপ্ত ও ধূলিময় রায়পুর ও ধামতারি অবধি প্রসারিত হওয়ার পর কাঙ্কের পাহাড়গুলোর মুখে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর থেকে যাত্রাটা নির্বিঘ্ন আনন্দের;

বাস্তার মালভূমির দিকে পর্যটক যতই এগোতে থাকেন ততই গ্রামগুলো গানের কলির মতো তার মধ্যে খেলে যায়; তাকে আপ্যায়ন জানায়— কাজের অবসরে সংগীতরত কোনো বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত কাঠুরিয়া; আকাশ অনন্য সীমা বারবার ভেঙে গেছে অনন্য উঁচু পাহাড়ে-টিবিতে; চারিদিকে শুধু চিরসবুজ শালগাছ। হয়তো সে দেখছে তার সামনে একসারি খাড়া পাহাড়— মুরিয়া দেশের প্রবেশদ্বারে তারা যেন সান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে আছে দলবদ্ধভাবে প্রহরায়। কেশকাল ঘাটের খাড়া চড়াই পথটা যেন করে নিতে হবে এবার। শীর্ষদেশ থেকে তাকালে সে এক অনবদ্য দৃশ্য : নিচে পাহাড়ের এক বিশাল সমুদ্র আর বিস্তৃত অরণ্যভূমি।

বাস্তারের প্রতি আমাকে প্রথমে আকৃষ্ট করেন প্রয়াত স্যার ডব্লয়ু. ভি. গ্রিগসন, বন্ধুমহলে তিনি পরিচিত ছিলেন ফ্রিটিলস নামে। তাঁর মতো খ্যাতনামা এক ব্যক্তিও ভারতের আদিবাসী সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন; তিনি ছিলেন কৌতুকপ্রিয়, সদাহাস্যময় ও বন্ধুবৎসল। আমার বিরুদ্ধে যে পুলিস রিপোর্টটা ছিল তা কিন্তু প্রথম থেকেই আমার প্রতি তাঁর মনোভঙ্গির ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে নি। এটা যেমন প্রথম ব্যাপার তেমনি দ্বিতীয়ত আমিও তাঁর মতো একদা অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলাম। আদিবাসী বিষয়ক তাঁর সব রকমের উদ্যোগ-উদ্দীপনায় আমিও সাথি হতে পেরেছি। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ সাল অবধি তিনি বাস্তারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক ছিলেন; বাস্তারের ওপর তিনি একখানা গ্রন্থও রচনা করেন, *মারিয়া গোণ্ডস অফ বাস্তার*। একবার জ্বরে পড়ে ফ্রিটলেস-এর বাড়িতে শয্যশায়ী থাকতে হয়েছিল আমাকে, তখনই তাঁর ওই বইটি আমি পড়ি। বইটি পড়ে আমি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ি যে আমার জ্বরও কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেল। তারও অনেকদিন বাদে, সময়-সুযোগ ও অর্থের বন্দোবস্ত হবার পরেই আমি বাস্তারের আদিবাসীদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করার সুযোগ পাই। প্রথম বছরগুলোতে স্থানীয় প্রশাসক ওই রাজ্যে আমার যাতায়াতকে সুনজরে দেখেননি; তাঁর আশঙ্কা ছিল, আমি হয়তো কংগ্রেসি বিদ্রোহ চাঙা করতেই যাচ্ছি। পরে, অনেক পীড়াপীড়িতে সংক্ষিপ্ত বাস্তার সফরের অনুমোদন জুটল শামরাও ও আমার। রাজ্যটির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে আমরা যতটা সম্ভব দেখে নিচ্ছিলাম।

পরে আমি বিখ্যাত ভাস্কর প্রয়াত মিসেস মারগুয়েরাইট মিলওয়ার্ডকে নিয়ে বাস্তারে যাই; তিনি এই ভ্রমণের প্রসঙ্গটি তাঁর *আর্টিস্ট ইন ট্রাইবাল ইন্ডিয়া* গ্রন্থে বিবৃত করেছেন।

মারগুয়েরাইট প্যারিসে *বুর্দেল*-এর কাছে শিক্ষানবিশ ছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে বহু বছর কাজও করেছিলেন। এবং তাঁর, সঙ্গেই তিনি বিদেশভ্রমণে বেরিয়ে প্রথমে যান সিংহলে। সিংহলে গিয়েই তিনি শুরু করেন আদিম জনজাতির ওপর ভাস্কর্যের কাজ; এবং এই কাজেই তিনি তাঁর জীবনের বাকি মূল্যবান বছরগুলো ব্যয় করেন। তিব্বত,

বার্মা, জাভা, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, ফরাসি ইন্দো-চিন এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন এই উদ্দেশ্যেই। মাঝে মাঝে নৃতত্ত্বের ওপর বক্তৃতাও দিতেন। তিনি প্রায়শই বলতেন, 'রাজনীতি বিভেদ সৃষ্টি করে, শিল্পকলা করে তোলে ঐক্যবদ্ধ'। ভারত সরকার তার সৃষ্ট মুখ-ভাস্কর্য অনেকগুলোই কিনে নিয়েছিল; কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে এখনো তার অনেকগুলো দেখা যাবে। আশি বছর বয়সে তিনি মারা যান; মৃত্যুর কদিন আগে গোণ্ড মেয়ের একটি অসাধারণ মস্তক-ভাস্কর্য উপহার দিয়েছিলেন আমাকে। তিনি যখন আমাদের মধ্যে এসে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তখন ওই গোণ্ড মেয়েটিকে তিনি দেখেন, তার ভাস্কর রূপ তৈরি করেন; আর আমাকে উপহার দেবার আগে সেটি রক্ষিত ছিল লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের জানলার তাকে।

মারগুয়েরাইট ছিলেন কর্মঠ মহিলা আর দশাসই চেহারার। সিমেন্ট ও মাটির পাত্রাদিসহ মারগুয়েরাইট আমাদের পুরনো গাড়িটার ভার বহন-ক্ষমতার পক্ষে বেশ অতিরিক্তই হয়ে পড়েন। ফলে কাঙ্কের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে পাত্রগুলো সব গাড়ির তলা গলে পড়ে যায়। জগদলপুরে লোক পাঠিয়ে সেগুলো উদ্ধার করে আনতে হয় আমাদের।

অবশেষ ১৯৪০ সালের মে মাসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু-একটা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাস্তারে যাই; সেখানকার সেন্সাস অফিসার হিসেবে সরকারি নিয়োগপত্রও পাই; মাসিক বেতন একশ টাকা। সত্যি কথা বলতে কি, বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে তখনও আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে বুঝতে পারি নি, একজনের ঘোরাঘুরির খরচ আর ভারতীয় অফিসার হিসেবে তার পদের দক্ষিণা— এই দুটো মিলেই যে এই বেতন-নির্ধারিত। সে থাক, বাস্তারে চলে গেলাম; তখন নর্ভাল মিচেল সবে মাত্র দায়িত্বভার পেয়ে সেন্সাস বিভাগে এসেছেন, তিনি ছিলেন প্রকৃত ভালমানুষ। কোনো এক ব্যতিক্রমী ব্যবস্থায় আমার সেন্সাস কাজের দরুনে তিনি থোক পনের শত টাকা দেবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। অন্যদিকে আমারও দরকার ছিল একটা সরকারি পদমর্যাদা; কোনো পদমর্যাদা ব্যতিরেকে ভারতীয় রাজ্যসমূহে কাজ করাই ছিল প্রায় অসম্ভব। পরে আবার এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালাম আমরা; আমাকে বাস্তারের অবৈতনিক জাতিবিজ্ঞানী নিযুক্ত করা হল। একটি স্থানীয় পত্রিকা 'এথনোগ্রাফার' শব্দটিতে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোষণা করেছিল : আমাকে অবৈতনিক 'স্টেনোগ্রাফার' পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার স্বাভাবিক পদ্ধতি মতোই আমি জনসাধারণরে মধ্যে বসবাস করব এখানেও। আশ্চর্য সুন্দর চিত্রকূট জলপ্রপাতের বিপরীতে দারুণ এক পাথরের বাড়ি বানিয়ে নিলাম— খরচ পড়েছিল মাত্র দু'শ টাকা। আর মারিয়া গ্রামে মোটামুটি বাসযোগ্য কয়েকটি মাটির কুটির তৈরি করিয়ে নিই; প্রতিটির জন্য খরচ হয় চল্লিশ টাকা। আমাদের মূলকেন্দ্র তখনও রইল পাটানগড়ে; যখন আমি থাকতাম না, শামরাও সেটা সামলাতেন।

সে-সময়ে বাস্তার ছিল এক পরমানন্দের জায়গা। আদিবাসীরা গরিব ছিল বটে কিন্তু তারা ছিল মুক্ত সুখী মানুষ। তাদের জীবনযাত্রায় ছিল কৌতুক আর প্রাণপ্রাচুর্যের উপাদান। তাদের নৃত্য ছিল গোটা ভারতবর্ষের নিরিখেই অনুপম; আর তখন পর্যন্তও শুদ্ধবাদীদের প্রচারে তাদের সুন্দর দেহকাঠামোটা যে কুৎসিত, এমন ধারণা তাদের মনকে মলিন করে তোলে নি।

সমগ্র রাজ্য জুড়ে আমি সফর করি; আর সংগ্রহ করতে থাকি প্রচুর তথ্য আর ফোটো; আবুঝমারের পাহাড়ি মারিয়াদের মধ্যে যাই হাতির পিঠে চেপে; এছাড়াও তথ্য ও ফোটো সংগ্রহ করতে গিয়েছি কোয়া, ভাত্‌রা, ডোর্‌লা ইত্যাদি আদিবাসীদের মধ্যে। কিন্তু মূলত আমার আগ্রহ নিবদ্ধ থাকে দুটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর— দক্ষিণের বাইসন-হর্ন মারিয়া আর উত্তরের মুরিয়াদের ওপর। মারিয়াদের নিয়ে আমি একটি বই লিখি, *মারিয়া মার্ডার অ্যাণ্ড সুইসাইড*। সেই বইয়ে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, কী কারণে এইসব মানুষ হন্তারক হয়ে ওঠে; জগদলপুরের যে-জেলটির উন্নতিকল্পে আমি চেষ্টা করেছি সেখানেও এই বিষয়গত দিকগুলো আমি বিশ্লেষণ করেছিলাম।

যেসব আদিবাসী মানুষ নিয়ে বিশ্লেষণের কাজ করেছি তার মধ্যে মারিয়াদেরই আমার মনে হয়েছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়; আর তাদের মধ্যে সমীক্ষার কাজও করা যায় খুব সুষ্ঠুভাবে, পরমানন্দে। বাইসন-হর্ন মারিয়াদের এলাকায় এমনকি ১৯৪১ সালেও বছরের ভাল সময়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়া যেত; আর প্রতিটি গ্রামেই পর্যটকদের জন্যে ছিল সুনির্মিত পান্থনিবাস। সেখানকার মানুষজন চমৎকার বন্ধুবৎসল, আবহাওয়া ভাল— জীবনের বেশ কয়েকটা বছর দারুণ উপভোগ করেছি ওখানে।

বাস্তারে আসার পরই বিভেদের প্রাচীর বিলোপ এবং একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক পরিবেশ রচনা করার উদ্দেশ্যে আমি গ্রামোফোনের ব্যবহার শুরু করি। বেশ কিছু মজাদার হিন্দি কৌতুক রেকর্ড সংগ্রহ করেছিলাম; কয়েকটা মোৎসার্ট ও বিঠোফেনের রেকর্ডও চালাতাম। একটু সংকোচের সঙ্গেই স্বীকার করি, সেগুলো তেমন সমাদৃত হয় নি।

কয়েকদিন বাদে, একটা সফরের মাঝখানে, একদিন এক যুবক বিপুলাকৃতি একটা বাক্স নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে এসে হাজির হল। জগদলপুর থেকে পুলিস সেটা পাঠিয়েছে। সেই বাক্স খুলে দেখি তার মধ্যে রয়েছে দারুণ সব যন্ত্রচালিত খেলনা— এগুলো উপহার পাঠিয়েছেন বোম্বের দুজন বন্ধু। গোটা এলাকাজুড়ে এই খেলনাগুলো এমনই পুলক, কৌতূহল ও উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিল যা কোনো খেলনা-সংগ্রহ কোথাও করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তার কিছু খেলনা বছর আষ্টেক পর্যন্ত টিকে ছিল; তাদের দু-একটা, কলকব্জা জীর্ণ হয়েও সেগুলো সক্রিয় ছিল, তা আমি আমার নেফা-যাত্রার সময়েও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে যাক্‌, মারিয়াদের মধ্যে সংযোগ

বিস্তারে এই খেলনাগুলো নিঃসন্দেহে বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

তবু সাধারণভাবে, যা-কিছু অ-স্বাভাবিক তাই সন্দেহজনক। যেমন, সেন্সাস বিষয়ে মারিয়ারা খুবই সন্দিগ্ধ ছিল। তাদের মনে পড়ল ১৯৩১ সালের সেন্সাসের পর জঙ্গলে প্রচুর বাঘ দেখা গিয়েছিল। গণনা ও মাপ-জোক নেওয়ার কাজটা সব সময়েই ঝুঁকির; কারণ 'মানুষ গণনার পাপে' প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। তাই ১৯৪১ সালের সেন্সাসের পর অধিকাংশ গ্রামেই বাড়ির সামনে নম্বর-বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হল; আর সেই বোর্ডগুলোর সামনে শুয়োর বলি দেওয়া হতে লাগল।

মারিয়ারা ছিল কঠোর জেদী আদিবাসী গোষ্ঠী; খুনো-খুনির ব্যাপারটা তাদের মধ্যে লেগেই ছিল— তার মাত্রা প্রতিবেশী মধ্য প্রদেশের তুলনায় প্রায় ছয়গুণ বেশি। জগদলপুর জেলটা ঠাসা ছিল হত্যাপরাধী মারিয়া কয়েদিতে। প্রশাসন এ-বিষয়টায় খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কেন এমনটা ঘটে, এ-ব্যাপারে খোঁজ নিতে আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে যাই। রেকর্ড-রুমে ঢুকবার অবাধ অনুমতি পেয়ে ধূলামলিন ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করি; এবং প্রায় শতাধিক খুনের ঘটনার প্রত্যাশিত তথ্য আমি সংগ্রহ করি। আমি আরো খুঁজছিলাম আত্মহত্যার রেকর্ড, কিন্তু সেগুলো পাওয়া খুব সহজ ছিল না; সেগুলো হেডকোয়ার্টারে থাকে না, থাকে সংশ্লিষ্ট থানায়। কিন্তু পুলিস সুপারিন্‌টেনডেন্‌ট্‌ আত্মহত্যার সব ফাইল চেয়ে পাঠালেন; সেখান থেকে মারিয়াদের আত্মহত্যার গোটা পঞ্চাশেক ঘটনার রেকর্ড সংগ্রহ করি।

তথ্য সংগ্রহের পর যেসব জায়গায় ঘটনাগুলো ঘটেছে তার একটা মানচিত্র এঁকে নিই, এবং পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ি যতগুলো সম্ভব সেই গ্রামগুলোতে। হত্যাকারী ও যারা নিহত হয়েছে— উভয়পক্ষের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলি, গ্রামের প্রবীণদের মতামত শুনি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিই গ্রামের আর পাঁচজনের কী ধারণা; তাছাড়াও মাঝে মাঝে জেলে গিয়ে নির্দিষ্ট খুনী কয়েদিটির সঙ্গে কথা বলি (হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড তাদের খুব কমই হত), আর যারা সাজা খেটে স্বগ্রামে ফিরে এসেছে তাদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করতাম।

কাজটা ছিল দারুণ রোমাঞ্চকর। সম্প্রতি জেলে ফাঁসি হয়ে গেছে বার্‌সে চিউয়া'র, গ্রামে তার পোশাক-আশাকের প্রথাগত সৎকার হল— আরণপুরে সেই উত্তপ্ত ভস্মরাশির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি; খুটেপালে আমি দেখেছি, যে মেঝেটা কদিন আগে ওয়েমি'র স্ত্রীর হত্যাকাণ্ডে রক্তাক্ত হয়েছিল আজ সেখানে তার ছেলেরা খেলা করছে। রিউয়ালিতে দেখেছিলাম এক নিষ্ঠুর-চোখ যুবককে; হত্যাপরাধে যে দু-দুবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল, এবং দুবারই সে জীবন বাঁচাতে পেরেছিল।

এখানেই আরেকটি যুবকের সঙ্গে কথা হয়; ঈর্ষা ও ক্রোধবশত মুহূর্তের মধ্যে সে তার স্ত্রীকে খুন করে ফেলেছিল। আর এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই সে কোনো মেয়ে

পাচ্ছে না বিয়ে করার। দরিয়াসে নিহত বতি'র কবরটা আমি দেখি। ঘাসিয়ারা সেই কবরটা অপবিত্র করে ফেলেছিল টাকার লোভে; কারণ ভূত-প্রেতকে খুশি করে বতির আত্মার অন্যলোকে পাঠাবার উদ্দেশ্যে তার শবদেহের সঙ্গে কিছু টাকা-পয়সাও কবরস্থ করা হয়েছিল। সেই গ্রামেই আমি কাওয়াসি বোরগার বাড়িতে যাই, তার নিরীহ ছেলেদের সঙ্গে, তাদের দুখিনী মায়ের সঙ্গে কথা বলি।

এইসব হত্যার কারণ ও উদ্দেশ্যসমূহের বিশ্লেষণ অনেক কিছুই তুলে ধরে। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে পনের শতাংশ; পারিবারিক বিরোধের ফলে ষোল শতাংশ; ঈর্ষা, ব্যভিচার, যৌন-উদ্দেশ্যে মোটামুটি সতের শতাংশ খুনের ঘটনা ঘটে। মাতাল অবস্থায় বা ছোটখাটো অপরাধের কারণে ঘটে উনিশ শতাংশ হত্যা। মাত্র পাঁচ শতাংশ খুনের পিছনে থাকে ডাইন বা জাদুক্রিয়ার সন্দেহ বা অভিযোগ। দেখা গেছে ছটা খুন হয় প্রতিশোধস্পৃহায়, গালিগালাজ বা 'শব্দ-জাদু'র মুহূর্তিক উত্তেজনায় খুন হয় নটা। এই শেষোক্তটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ : কোনো একটা ভুল কথা বলে ফেলা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার— শুধু যে অনুভবকে অপমান করা হয় তা নয়, ব্যক্তিটির পক্ষে (জাদুগতভাবে) বিপজ্জনকও।

হনন-রহস্য উদ্ঘাটনের অন্যতম প্রতিপাদ্য হচ্ছে, হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্রান্তি বা অবসাদ কী ভূমিকা নিয়ে থাকে তার অনুসন্ধান। এটা শুধু আমারই কথা নয়, (আমি শুনেছি) অনেক সেশন জজসাহেবরাও এ-ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। অ্যালকাহল বা সুরা যেমন একটা স্তরে নেশাগ্রস্ত করে ফেলে তেমনি অবসাদ-প্রমত্ততা ধরনেরও কিছু একটা থাকা সম্ভব। শ্রান্তি বা অবসাদ থেকে আসতে পারে অনীহা, অসহিষ্ণুতা, উদ্বেগ, বেপরোয়া মনোভাব— যে বাস্তবতা অসহনীয় মনে হচ্ছে তা থেকে পলায়নের ইচ্ছা। অন্যান্য চাষীদের মতো মারিয়া চাষীরাও প্রায়শ ক্লান্ত বোধ করে; সারাদিনের শ্রমে ক্লান্ত, বিকেলে সে ঘরে ফিরে এসেছে, রাত্রের খাবার তখনও তৈরি হয় নি, বাচ্চা কাঁদছে— মুহূর্তের মধ্যে কী যেন ঘটে যায় তার মধ্যে, সে সজোরে একটা আঘাত করে বসে বউকে, তার আদরের বউটি মরে যায়, তার ঘর সংসার ছারখার হয়ে যায়।

জগদলপুর জেলে ঘন্টার পর ঘন্টা থেকেছি, মারিয়া কয়েদিদের সঙ্গে কথা বলেছি। বিস্মিত হয়েছি তাদের বেশির ভাগেরই সরলতা দেখে। তারা মনে করত, এক অনির্ণেয় ভাগ্যের পরিহাসের শিকার তারা; নিজেদের দুষ্কৃতী বলে ভাবত না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অপরাধগুলো ট্রাজিক ঘটনা মাত্র। তাদের সান্নিধ্য ছিল বেদনার, বিষাদের।

জেল বিষয়ে আমার কৌতূহল প্রথম দেখা দেয় সেই সত্যাগ্রহপর্বে; রাজবন্দিদের প্রতি জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের বিরুদ্ধে তখনই আমি জোরালো প্রতিবাদ জানাই। তারপর মাণ্ডলায় আমার অভিজ্ঞতায় দেখা দেয় পুলিস সংক্রান্ত আতঙ্ক। অপরাধ

নিবারণের ক্ষেত্রে যে-ধারণার ওপর নির্ভর করে, যে পদ্ধতি অনুসরণ করে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে বাস্তবিকই তা আতঙ্কজনক।

কোনো আদিবাসী গ্রামে পুলিস আসা মানেই এক সাংঘাতিক ব্যাপার। দিনের পর দিন লোকজন কর্মক্ষেত্র থেকে সরে থাকে, মুখে দেবার কোনো খাদ্যও জোটে না তাদের। এসব কতবার দেখেছি! সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব এলেন, গ্রামের সব থেকে ভাল বাড়িটায় ক্যাম্প বসালেন। তাঁকে এবং তাঁর কনস্টেবল বাহিনীকে এতই উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় জোগাত বিনা পয়সায় যা গ্রামবাসীরা নিজেরা কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে খেয়েছি কিনা সন্দেহ। সাক্ষ্য-প্রমাণ আদায়ের জন্যে চলত থার্ড-ডিগ্রির অত্যাচার; বলতে দুঃখ হয়, স্বাধীনতার পরেও তা চলে আসছে। কেউই নিরাপদ নয়; নিস্তেজ লাজুক আদিবাসীরা তখন আতঙ্ক ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটায়। গোপনে চলে বড় রকমের টাকা পয়সার লেন-দেন; অবশেষে যখন গ্রেপ্তারের পালা আসে তখন নেমে আসে হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য : আসামীকে হাতকড়া পরিয়ে কঠোর পাহারায় গ্রাম পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর তার পিছেনে পিছনে ছুটছে ক্রন্দনরত একদল আত্মীয় পরিজন।

বেশ কিছু জেল পরিদর্শনের সুযোগ ঘটেছে আমার; সেখানে দেখেছি কীভাবে আদিবাসীরা দিনযাপন করে। আর বাস্তারে এসে সেই আগ্রহটা আরো বেড়ে গেল। কিছু নাটকীয় ঘটনা আমার মানসপটে গভীর রেখাপাত করে; আর আমি বুঝতে পারি যে তদন্ত ও তল্লাশি চালাবার পদ্ধতি এবং অপরাধীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে পরবর্তন আনা কতটা জরুরি। সাঁহ্ওরোয়াছাপারের কাছাকাছি এক গ্রামের এক মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল যে সে, তার স্বামীকে বিষ খাইয়েছে। যেমন চলে থাকে তেমনভাবেই তদন্ত করা হল; গ্রামবাসীরাও আমাদের মতোই নিঃসন্দেহ যে মেয়েটি নির্দোষ। সাধারণত এরকম ব্যাপারে গ্রামবাসীরা খুব কমই ভুল করে থাকে। তা সত্ত্বেও মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হল। এবং বিচারেও তার মৃত্যুদণ্ড হল। তখনো আমরা বুঝতে পারি নি, এই মৃত্যুদণ্ডে কোনো প্রকৃত ভয়ের ব্যাপার আছে। আমরা নিঃশঙ্কই ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন ফ্রিটলস্ গ্রিগসনের এক তারবার্তা এল। তিনি জানালেন, কোনো উদ্যোগ না নিলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েটির ফাঁসি হয়ে যাবে। জীবনে কখনো যে গতিতে গাড়ি চালাই নি সেই গতিবেগে ছুটলাম তিনশ মাইল দূরের পাচমারহি অভিমুখে। সেখানে তখন গ্রীষ্মকালীন সরকারি দপ্তর চলছে। ফাঁসির ওপর স্থগিতাদেশ পাবার উদ্দেশ্যেই ছুটছি। কিন্তু যখন গিয়ে পৌঁছলাম, আমাকে বলা হল বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা হাল ছাড়লাম না; শেষপর্যন্ত মেয়েটির জীবন বাঁচাতেও সমর্থ হই। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তার হল অসহনীয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

একবার জেল পরিদর্শনকালে দুজন গোণ্ডকে হাতকড়া-পরা অবস্থায় দেখেছিলাম; দৃশ্যটা আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে। এক কাবুলিওয়ালা তাদের জীবন

অতিষ্ঠ করে নিঃস্বতার চূড়ান্তে নিয়ে গেলে ওই দুই গোণ্ড তাকে খুন করে ফেলেছিল। অরণ্যচারী মনোরম অথচ সন্ত্রান্ত হরিণের মতোই ছিল তাদের আয়ত চোখে অবাক বিস্ময় ও ভীতি; আর সেই ক্ষুদ্রাকায় দুটি গোণ্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশালাকার কন্‌স্টেবলরা।

জেলে আদিবাসীরা অশেষ কষ্ট ভোগ করে। গ্রিগসন বলেছিলেন : 'কোনো মারিয়ার দীর্ঘমেয়াদি সাজা হলে সে দীর্ঘকাল চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি থাকার পরিবর্তে সকাতর প্রার্থনা জানায়, ফাঁসিতে লটকে আমাকে মেরে ফেল! বাস্তবিকই আদিম প্রকৃতির খুব কম বাইসন-হর্ন মারিয়াই দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের পর বেঁচে থাকে।' নির্দয় উঁচু প্রাচীরের বেষ্টনী, পাথুরে শয্যা, নীরব থাকার আদেশ, অচেনা ভাষা ও খাদ্য, সরকারি অফিসারদের সামনে মাথা হেঁট করে থাকা ও কিছু প্রার্থনা জানানো, বিনোদনহীন দিনযাপন— ধর্মীয় স্বস্তি থেকে, মানবিক মেলামেশা থেকে বঞ্চিত থাকা, আর অসহনীয় একঘেয়ে দিনাতিপাত তাদের জীবনের ওপর চরম পীড়ন চালায়— তাদের সত্তাকে ধ্বস্ত করে ফেলে।

এটা আরো বেশি প্রকট ফ্রন্টিয়ার অঞ্চলে। নেফার আদিবাসীদের পাহাড়ের উপর থেকে নামিয়ে এনে সমতল ভূমির কোনো জেলে বন্দি রাখা হলে একাকিত্বের স্বাভাবিক শূন্যতার অতিরেকেও তারা ভোগ করে থাকে চরম মানবিক অসম্মান— তাদের নিঃসঙ্গতা ও হতাশা সমস্ত কয়েকদিদের মধ্যেই জাগিয়ে তোলে সবিশেষ বঞ্চনাবোধ। সমতল ভূমির তাপমান পাহাড়ি মানুষের সহ্যের বাইরে। কেউই সাধারণত তার ভাষা বোঝে না; সে নিজে হয়তো দু-চারটে হিন্দি বা অসমিয়া শব্দ বলতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাড়ির কোনো খবরই পায় না কোনো আদিবাসী বছরের পর বছর ধরে; আর দূরে আছে বলেই দেখা-সাক্ষাতেরও কোনো সুযোগ জোটে না তাদের।

আমাদের কেউ কেউ আদিবাসীদের জন্যে স্বতন্ত্র জেলব্যবস্থা একান্তভাবে চেয়েছিলেন। শাস্তিদান ও প্রতিশোধের কোনো ব্যাপার সেখানে থাকবে না, বরং হয়ে উঠবে শুদ্ধি ও বেদনা প্রশমনের কেন্দ্র। অবশ্য যতই বিস্ময়কর হোক, আজো বহু আমলা সেভাবে ভাবেন। একজন জেল সুপরিন্‌টেনডেন্ট্ আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের পরিবেশে থাকলে ওদের ওপর চাপ বাড়ে।' আরেকজন বলেছিলনে, 'আমরা যেমন বোধ করি ওরা তেমনি করে না।' আবার কেউ কেউ শুনিয়ে দিয়েছেন যে নিকৃষ্টতম জেলেও একজন আদিবাসী যে-জীবন কাটায় তা তাদের বাড়ির জীবনের থেকে ঢের ভাল।

সভ্য মানুষের তুলনায় 'আদিম' মানুষের বেদনা-সহন ক্ষমতা বেশি— এই অনুমানের ওপর একটা তত্ত্ব গড়া হয়েছিল। অন্যভাবে যদি বলা হয়, একই মুহূর্তে

একজন বিশপ আর এক মারিয়াকে খোঁচা মারা হলে দেখা যাবে বিশপই আগে লাফিয়ে উঠেছেন। বিশপ মহাশয় অনেক বেশি স্পর্শকাতর : খোঁচাটা তাঁকেই আহত করবে বেশি। আমি কিন্তু কথাটা একেবারেই মানতে রাজি নই।

সত্যাগ্রহী হিসেবে জেলে যেতে পারি নি বলে আমার মনস্তাপের সীমা ছিল না; কিন্তু ইতিপূর্বেই বলেছি, সেই সুযোগ ব্রিটিশ সরকার কখনোই আমাকে দিত না; বরং বড়জোর তারা আমাকে সোজা দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিত। জগদলপুরে থাকার সময়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাধারণ এক কয়েদি হিসেবে আমি জেলে ঢুকে যেতে পারি কি না। তিনি কিন্তু যথার্থই বুঝেছিলেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যে হলেও আমার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে খুব বেশি দিনের জন্যে কয়েদ রাখার হুকুম বার করা যাবে না।

ছয়

মারিয়া

মারিয়াদের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল তাদের অনবদ্য বিবাহ-নৃত্য। সেই নৃত্যানুষ্ঠানে পুরুষেরা মাথায় পরে মোষের শিঙের শিরস্ত্রাণ, গলায় ঝোলায় ঢোলক; তারপর তারা ঘুরতে থাকে এক বড় বৃত্ত রচনা করে; আর মেয়েরা সেই বৃত্তের মধ্যে পাক খায়, ঘোরে। আদিবাসী ভারতবর্ষে এ এক অতুলনীয় নৃত্য, আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

একদিন আলামি মাতা নামক এক যুবক মারিয়া জঙ্গল থেকে বাড়ি ফিরে দেখে তার অতি সুন্দর শিঙ ও পালকযুক্ত নাচের পুরুষানুক্রমিক শিরোভূষণটি চুরি হয়ে গেছে। দুর্মূল্য সম্পদ হারানোর চাইতেও এটা ছিল তার এক চরম ক্ষতি। পাশের গ্রামের এক সুন্দরী অবিবাহিতা মেয়ে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, আলামি মেয়েটির মন জয় করেছিল নাচের মাধ্যমে; সত্যি কথা বলতে কি, তার শিরস্ত্রাণের মহিমায়! প্রেমিকার সামনে সে তার শিরস্ত্রাণের শিঙজোড়া নাচাতো কামাতুর এক মহিষের মতো, সেই আকর্ষণ প্রতিরোধ করা ছিল বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু এখন স্যামসনের মতো ছাটা তার চুল— তার মধ্যে কোনো তেজ নেই, বল নেই। শ্রীহীন এই অনাকর্ষণীয় বেশে সে এখন কিভাবে তার প্রেমিকার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে!

আলামি বিষণ্ণ চিত্তে বসে আছে, তার বাবা এসে তাকে ওই অবস্থায় দেখে খুবই বকাবাকি করল : এভাবে সময় নষ্ট করার কি মানে হয়? এই বকুনি তরুণ আলামির কাছে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি বলে মনে হল; গান নেই, ছন্দ নেই, প্রেম নেই— এমন এক নিরানন্দ জীবন নিয়ে সে কী করবে? আলামি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, আর আত্মহননে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাল।

এক আগারিয়া খনি থেকে আকর লোহা তুলে আনছে

বাস্থাৰৰ মৰিয়া চেলিকৰা

এই ঘটনা সূত্রে বোঝা যায়, মারিয়াদের জীবনের সঙ্গে এই বিশেষ নৃত্যের এবং নৃত্যের কলা-উপকরণের সংযোগ কতটা নিবিড় ছিল। মহিষ-শিঙের শিরস্ত্রাণ ছিল প্রতিটি পরিবারের এক অমূল্য সম্পদ। তার প্রতিটি অংশ খুলে খুলে বাঁশের ঝুড়িতে সাজিয়ে অতি যত্নে সেগুলো রক্ষিত হত; সেটা জুড়তেও আবার কম করে ঘন্টাখানেক সময় লেগে যেত।

এই শিরস্ত্রাণ এবং তা মাথায় পরে নৃত্যেই ছিল মারিয়াদের নান্দনিক চেতনার অভিপ্রকাশ। কারভিং বা খোদাইয়ের কাজ তারা করে না, ছবি আঁকে না, প্রাচীরে কোনো চিত্রকল্পও সৃজন করে না; প্রতিবেশী অন্যান্য মারিয়াদের মতো তারা সুন্দর-সুন্দর চিরুনি বা তামাকের হুকোও বানায় না। অন্তঃস্থ সব অভিভাব ও শিল্পচেতনা তারা বাঙ্ময় করে তোলে তাদের নৃত্যে।

আর কি অসাধারণ দৃশ্যরূপ তারা তৈরি করত! ছেলেদের মতো মেয়েরা সাজে না বটে কিন্তু তারাও তখন পরে সুন্দর-সুন্দর পোশাক— পুঁতি ও পিতলের নেকলেসে তাদের বুক পুরো ঢাকা পড়ে যায়; পিতলের খোপার জাল আর রিবনের দীপ্তিতে ঝকমক করে উঠত তাদের মাথা। সরকারি অফিসাররা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে এখন 'সঠিকভাবে' তাদের লজ্জানিবারণ করতে শিখিয়ে ফেলেছে— শাড়ি পরাতে শুরু করেছে।

বিরাট একটা ঢোলক ঝুলিয়ে পুরুষেরা নানা কসরতে দারুণভাবে পাক খায়, এদিক-সেদিক ছোটে— একটা 'মোষ' আরেকটা মোষকে তাড়া করছে, তার সঙ্গে লড়ছে, শিং দিয়ে পাতা কুড়িয়ে নিচ্ছে— নর্তক এভাবে তাড়া করে বেড়ায় নর্তকীদের।

ডান হাতে নাচের কাঠি নিয়ে মেয়েরা লম্বা সারি তৈরি করে, তারপর নর্তকদের বৃত্তে ঢুকে পড়ে নানা বিভঙ্গে, নানা পদসঞ্চারে। গান তারা সাধারণত গায় না, ঢোলকের সুউচ্চ ধ্বনির নিচে চাপা পড়ে যায় যাবতীয় শব্দ। নাচতে নাচতে হাতের কাঠি দিয়ে তারা মাটিতে মৃদু ঠোকর দেয়— 'ডাম্-ডাম্-ডাম্, ডি-ডাম, ডাম্-ডাম্।' নৃত্যের আনন্দের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তোলে মুখোশপরা বহুরূপী, খড়ের সাজে সজ্জিত ভাড়, আর কাঠের বন্দুক, মুগুর জাল হাতে ন্যাংটো দড়িবাজিকররা।

এসব নৃত্য দেখা এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। 'যে কখনো নাচে নি, জীবনের কিছুই সে উপভোগ করেনি।' আর অন্যদিকে এরা— দরিদ্র, নিঃস্ব আদিবাসী মানুষ নৃত্যের ছন্দে পরমাবিষ্ট হয়ে খুঁজে পায় জীবনের এক তাৎপর্য। বিশেষ এক ধরনের বৈশিষ্টে সেই খুঁজে-পাওয়াটাই সাধারণের থেকে তাদের উপরে তুলে এনেছে।

সাত

মুরিয়া

বাস্তারে কিন্তু আমার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ মুরিয়া ছেলে ও মেয়েদের ঘোটুল বা বিচিত্র ডরমিটরি-ক্লাবের ওপর সমীক্ষা। মারিয়াদের উত্তরে থাকত এই মুরিয়ারা। ঘন অরণ্যবেষ্টিত বৃহৎ এক মালভূমি, বেশ সম্পন্ন সব গ্রাম—আমার সময়কালেও সেইসব গ্রামে গাড়ি চালিয়ে যেতে পেরেছি। জলবায়ু ভাল, মানুষজন সজ্জন ও বন্ধুবৎসল, অঞ্চলটাও সুন্দর; তাছাড়া আমার কাজটাও ছিল নতুন ধরনের, দারুণ উত্তেজনাকর।

তখন মুরিয়ারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছিল। সফরের একটা পর্যায়ে আমি মূলকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়েছিলাম; প্রশাসনিক ছোট ছোট কেন্দ্রগুলো থেকেও দূরে, সরকারি কোনো কর্মচারীর দেখাও মেলেনি। তখন দেখেছি, মুরিয়া লোকজন তাদের মতো জীবন কাটায়; সেই জীবন অনুন্নত ছিল ঠিকই কিন্তু তা ছিল বাধাবন্ধহীন— সুখেই জীবন উপভোগ করছিল তারা। আমি তাদের সম্বন্ধে যা-কিছু বলব, সবই আজ অতীত ইতিহাসের অংশ; সেটা তাই লিখতেও হচ্ছে অতীত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে।

ঘোটুল ছিল মুরিয়া জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু; এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বীর পূর্বসূরি লিঙ্গো থেকে অদ্যাবধি সেই ধারা চলে আসছে।

আদি ঘোটুল সম্বন্ধে বর্ণনায় সেটি ছিল মোষের শিঙের মতো অনবদ্য, ঘোড়ার গলদেশের মতো অনুপম। তার ভিত অজগরের, খুঁটি গোখুরার; চালার কাঠামোটা বিষধর ভাইপার সাপে বাঁধা ক্রেইটের, আর ছাউনিতে ময়ূরের লেজ; বারান্দার ছাউনি বুলবুল পাখির পালকের; দেয়ালগুলো সব মাছের কাটা দিয়ে তৈরি; দরজাটা ছিল গাঢ় রক্তিম ফুলের মতো, আর সেই দরজার ফ্রেমটা ছিল রাক্ষসের হাড়ে তৈরি; মেঝেটা তৈরি ছিল বেসন দিয়ে; আর বসার জায়গাগুলো কুমিরের।

সেই ঘোটুলের মালিক মাথায় পরতেন সাদা লাউ ফুলের মতো একটা শিরোভূষণ; তার ধুতি ছিল রেশম রঙের, তার গায়ের কোর্তাটা সূর্যের আলোয় ঝকমক করত; তার পায়ের খড়ম বা কাঠের পাদুকা তৈরি হত চন্দনকাঠে, তার মোজা ছিল বেজির লোমে তৈরি, তার কোমরবন্ধটি ছিল সরু লম্বা সাপের; প্রতি পদবিক্ষেপে তাকে ঝকমকে দেখাত; তার হাতে থাকত আঠেরো রকমের সংগীত-যন্ত্র— সে-যন্ত্র মোহাবিষ্ট করত নিমেষে।

হ্যাঁ, এরকমই ছিল প্রথম ঘোটুল আর লিঙ্গোর কিংবদন্তি।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক সংস্কৃতির বহু জনগোষ্ঠীর মধ্যেই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল এ-জাতীয় বহু প্রথা; কিন্তু আমার মনে হয়, মুরিয়া ঘোটুলই সারা বিশ্বের মধ্যে এক্ষেত্রে

সর্বোত্তম ও সযত্নলালিত। নাগাদের কাছে যা গ্রামের পাহারা-ঘর, ওঁরাওদের কাছে যা ছেলেদের একটি ক্লাব, ইন্দোনেশিয়ায় যা একটি যৌন-মিলনের অস্থায়ী ক্লাব মাত্র সেটাই মুরিয়াদের কাছে সামাজিক-ধর্মীয় জীবনচর্চার এক বিশেষ কেন্দ্র। ঘোটুলগুলো যদিও তরুণদেরই স্বশাসিত সংগঠন ছিল, কিন্তু বয়স্কদের ওপরেও সেগুলোর প্রভাব খুব কম ছিল না— ঘোটুলকে বাদ দিয়ে বয়স্করা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানই করতে পারত না।

গোষ্ঠীর প্রতিটি অবিবাহিত তরুণ-তরুণীই ছিল ঘোটুলের সদস্য। এই সদস্যপদের ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত। কিছুদিন শিক্ষানবিশ থাকার পর ছেলে ও মেয়েদের উদ্দীপিত করা হত, বিশেষ পদমর্যাদা দেওয়া হত, এবং সেই পদাধিকারের শর্তে তাদের ওপর ন্যস্ত থাকত বিশেষ বিশেষ সামাজিক কর্তব্য। সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখা ও নেতৃত্বদানের জন্যে নেতা নিযুক্ত করা হত। ছেলেদের নেতাকে সচরাচর বলা হত সর্দার; মেয়েদের নেত্রীকে বেলোসা। ছেলে-সদস্যরা পরিচিত ছিল 'চেলিক' নামে, আর মেয়ে-সদস্যরা 'মোতিয়ারি' নামে।

যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে এই চেলিক ও মোতিয়ারিদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করতে হত। উৎসবাদিতে ছেলেরা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করত, আর বিবাহোৎসবে মেয়েরা হত কনের সহচরী। গোষ্ঠী দেবতার সামনে, বড় মেলায় তারা সম্মিলিতভাবে নাচত; বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রয়াণে তারা শবগান গাইত। তাদের খেলাধূলা ও নৃত্য গ্রামজীবনকে সজীব প্রাণবন্ত করে রাখত। একঘেয়ে নিরানন্দ জীবন কাটাত ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের আদিবাসীরা কিন্তু সেই অবসাদ আনন্দহীনতা থেকে মুরিয়া গোষ্ঠীকে মুক্ত রাখত তাদের এইসব ঘোটুলের ছেলেমেয়েরা।

খুবই স্বাভাবিক যে ঘোটুল, 'শিল্পের প্রিয় বিকাশকেন্দ্র' সব ধরনের শিল্পেরই লালন করবে। কারণ এখানে তো প্রতিটি ছেলেমেয়ে সদা উদ্‌গ্রীব পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে; সুন্দর-প্রাণবন্ত-উদ্দীপনাময় করে তুলতে চাই প্রত্যেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত জীবনকে তাই তো ছেলেরা মেয়েদের উপহার দেবার জন্যে ছোট ছোট চিরুণি বানাত, তাতে নানা অলঙ্করণ করত, আর নিজেদের জন্যে বানাত তামাকের সুদৃশ্য বাক্স। আবার মেয়েরা নিজেদের জন্যে বানাত নেকলেস, লকেট, কড়িও পুঁতির মালা। ছেলেরা ঘোটুল বাড়িটার কাঠের স্তম্ভে খোদাইয়ের কাজও করত। প্রায়শই দেখা যেত ঘোটুল-বাড়িটাই গ্রামের সর্বোত্তম গৃহ। এছাড়াও ছেলেরা বানাত নানা ধরনের খেলনা, মুখোশ ইত্যাদি। আর সবকিছুর ওপরে ছিল তাদের নাচ।

অন্য অনেক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এটা এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঘোটুলের বিশেষ গুরুত্বটা অন্যত্র; তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সম্পর্কটা এখানে স্বীকৃত ও অনুমোদিত।

ঘোটুল দু ধরনের। প্রথমটা, সম্ভবত সেটাই প্রাচীন, সচরাচর সেগুলোকে বলা হয় 'সংযোজক' বা 'জোড়-লাগা' ঘোটুল। সেই ঘোটুলের নিয়ম ছিল, বিবাহপূর্ব

পুরোসময় জুড়ে একজোড়া তরুণ-তরুনী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। প্রতিটি চেলিক জোড় বাঁধবে কোনো এক মোতিয়ারির সঙ্গে; প্রথাগতভাবে একে অপরের সঙ্গে 'বিবাহিত'— তরুণীটি প্রেমিকের পদবিও গ্রহণ করবে। বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি ছিল, কিন্তু অবিশ্বস্ততার জন্যে ছিল কঠোর শাস্তির বিধান।

আর দ্বিতীয় ধরনের ঘোটুলে চেলিক ও মোতিয়ারির মধ্যে পাকাপাকি বা স্থায়ী সম্পর্ক একেবারে নিষিদ্ধ। ভাবা যেতে পারে, এটা প্রাচীন ব্যবস্থারই আধুনিক সংস্করণ। এক্ষেত্রে কেউই বলতে পারবে না, অমুক মোতিয়ারি তার পাত্রী; তাদের সম্পর্ক এক টানা মাত্র তিনদিনের জন্যে বরাদ্দ।

বাইরের দিক থেকে দেখলে এই দু ধরনের ঘোটুলকেই একজাতীয় মনে হতে পারে; কিন্তু পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে তাদের ভিন্নতা— আধুনিক ঘোটুলের রীতি-প্রথা ও পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। স্থায়ী বন্ধনের তীব্র আসক্তি প্রতিরোধের— ঈর্ষা-দ্বেষ বা মালিকানা বোধের ধারণা নির্মূলের সব রকম ব্যবস্থাই এক্ষেত্রে গৃহীত বরং বিপরীতে জাগ্রত করা হত গোষ্ঠী মালিকানা বোধ— গোষ্ঠীতান্ত্রিক চেতনা। কোনো ঘোটুল-বিবাহ নেই, নেই কোনো ঘোটুল সঙ্গীত। ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড-এর চেতনায় 'প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্যে'। এক চেলিক ও মোতিয়ারি তিন রাত্রি এক সঙ্গে শুতে পারে; তারপরই তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়; যদি না শোনে বা একসঙ্গে থাকে তবে তারা শাস্তি পায়। কোনো বিশেষ চেলিক-তরুণের মধ্যে যদি কোনো মোতিয়ারি-মেয়ের প্রতি মালিকানা বা স্বামিত্ব বোধ দেখা দেয়— অন্য কোনো যুবকের সঙ্গে মেয়েটির প্রেমপর্বে যদি সে বিষণ্ণ হয়, অন্য এক চেলিকের সঙ্গে সেই মেয়েটি শয্যাসঙ্গিনী দেখে সে যদি বিপন্ন বোধ করে, মেয়েটি আর তার অঙ্গমর্দন করছে না বলে কিংবা তার মনোযোগ অপর কোনো যুবকের প্রতি বলে সে যদি হতাশ হয়ে পড়ে তার সাথিরা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, ওই মেয়েটি তার বিবাহিত স্ত্রী নয়— মেয়েটির ওপর তার কোনো অধিকার নেই; বাস্তবত মেয়েটি ঘোটুলেরই সম্পত্তি। অন্যথা ভাবলে বা করলে সে যথাযোগ্য শাস্তি পাবে।

ঘোটুলের এই আধুনিক সংস্করণকে মাঝে মাঝে 'আঙুল বদলানো আংটি'র ঘোটুলও বলা হয়ে থাকে। আংটি যেমন এক আঙুল থেকে অন্য আঙুলে বদলানো যায় এক্ষেত্রে এক মেয়ে থেকে অন্য মেয়েতেও বদল ঘটতে পারে।

ঘোটুলকে আক্ষরিক অর্থে বলা যায় 'নাইট ক্লাব'। শুধুমাত্র সায়াহ্নেই সেখানে 'হাতির পেটের শব্দ শোনা যায়'; উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির কথা বাদ দিলে দিনের বেলা ঘোটুল থাকে জনহীন। আগুনের আলোতেই ঘোটুলের প্রকৃত জীবন।

রাতের খাবারের পর মাদুর হাতে নিয়ে, কখনো বা একটা ঢোলক নিয়ে একে একে চেলিকারা এসে জড়ো হয় ঘোটুলে। তাদের আগেই সরকারি দায়িত্ব পালনের মতো 'হাজিরা' দেয় ছোট ছোট ছেলেরা। 'অর্ঘ্য' হিসেবে তারা জোগায় কাঠ;

প্রত্যেকেই কিছু কাঠ নিয়ে এসে ঘরের কোণে স্তূপ করে। বড়রা আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসে; কেউ হয়তো পাগড়ি থেকে আধ-খাওয়া একটা পাতার পাইপ বার করে জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে সেটা ধরায়, কেউ বাঁশিতে কোনো সুর তোলে, কেউ-বা মাদুর বিছিয়ে শুয়েই পড়ে। বেলোসা ঘোটুল পরিদর্শনে বেরিয়ে দেখে মেয়েরা তাদের নির্ধারিত কাজগুলো যথাযথ করে রেখেছে কিনা। একে-একে সব ছেলেরাই এসে যায় ঘোটুলে।

তারপর মেয়েরা ঝাঁক বেঁধে এসে পড়ে এক সঙ্গে; তারা জড়ো হয় তাদের আগুনের কুণ্ডলীর চারদিকে। তারপর এক সময়ে তারা উঠে গিয়ে যে যার মতো ছড়িয়ে পড়ে; কেউ গিয়ে ছেলেদের পাশে বসে, কেউ এক কোণে গিয়ে গান ধরে, কেউ আবার শুইয়ে পড়ে।

বাদবাকি অন্যরা তখন সময়টা ছন্দময় করে তোলে মহানন্দে; কখনো কখনো তাদের নৃত্যগীত চলে ঘন্টা দুয়েক; ছোটরা তখন ছুটোছুটি করে খেলে। আগুনের চারধারে বসে গল্প করে। গরমের দিন হলে চাঁদের আলোয় ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। দুটি ছেলে-মেয়ে, চেলিক-মোতিয়ারি কখনো শুয়ে গান গায় একান্তে, কখনো-বা দলবদ্ধভাবে। কোনো এক বালক হয়তো একটা গল্প শোনায়, শ্রোতারা ধাঁধা জিজ্ঞেস করে; নিত্যদিনের কথা একে অপরকে শোনায়। কখনো আবার ঘোটুল-বিচার বসে; কখনো নাচের পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় কিংবা কারো বিয়ের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব বিলি-বন্টন হয়। বড় বড় ঘোটুলে এভাবে নিজেদের নিযুক্ত রাখে ষাট-সত্তরটি ছেলেমেয়ে। সেইসব অভিজ্ঞতা কোনোদিনই আমি বিস্মৃত হব না।

ঘন্টা দুয়েক নাচ-গান-গল্প বা খেলাধুলোর পর, রাত দশটা বাজার মধ্যেই শুরু হয়ে যায় প্রধান নৈশ কর্মকাণ্ড। ছোট ছেলেরা বড়দের অভিবাদন জানিয়ে ঘরে ফিরে যায়; তখন শুরু হয় মেয়েদের আচার। ঘোটুলের ভাঁড়ায় গ্রামবাসী সব পিতামাতারা তামাক যোগান দেয়; সেই তামাকের মিহি গুঁড়ো মেয়েদের কেউ একজন নিয়ে এসে উপস্থিত সবার মধ্যে বিলি করে দেয়। তারপর মেয়েরা তাদের যে যার সেদিনের সঙ্গীর কাছে চলে যায়; তার পাশে গিয়ে বসে। মেয়েটি প্রথম ছেলে সঙ্গীটির মাথা ধরে ঝাঁকায়, চুলে বিলি কাটে, চিরুণি দিয়ে আচড়ায়। পরবর্তী ধাপে সে তার অঙ্গ মর্দন করে, কখনো তৈলবীজ বা চিরুণির পিঠ দিয়ে ঘষে, আঙুল মটকায় একটি একটি করে।

এভাবে অনেক সময় কেটে গেলে জোড়া জোড়া ছেলে-মেয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা শুয়ে পড়লেও যাদের স্থায়ী বা অস্থায়ী সঙ্গী রয়েছে তারা তাদের নিয়েই স্বতন্ত্র শোয়— মাদুরের শয্যায় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে।

প্রতিরাতে, শৃঙ্গার ও রমণের চূড়ান্ত পরিবেশ রচিত হলে, একটা সময়ে আমাকে

ঘোটুল ছেড়ে চলে আসতেই হত। হয়তো আমি একজন দর্শকের মতোই ওখানে থেকে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারতাম কোনো একটি বিষয়ের অনুসন্ধানে, (শৃঙ্গারের বিস্তার পর্বে পর্বে দেখে) হয়তো পৌঁছে যেতে পারতাম গল্পের ভাবারোহ মুহূর্তে। কিন্তু বিধান ছিল অলঙ্ঘনীয়, জানতাম যদি কোনো কারণে একবারও আমি সেই বিধান ভাঙি তাহলে তথ্য অনুসন্ধানের সব সুযোগই আমি হারিয়ে ফেলব। অনেকটা বাধ্য হয়েই তাই আমাকে ফিরে আসতে হত শীতল নিরানন্দ ক্যাম্পে; আর ফেলে-আসা সুখবোধ ও উত্তেজনার জন্যে থাকত স্মৃতিমেদুরতা।

অতি প্রত্যূষে বেলোসা উঠে ঘোটুলের চারিদিক ঘুরে সব মেয়েকে ঘুম থেকে জাগাত; সূর্যের আলো ফোটার আগেই ঘোটুল ছেড়ে মেয়েদের যে যার বাড়িতে ফিরে যেতে হত। একটি ছেলে আমাকে বলেছিল, 'অত আগেভাগে মোতিয়ারিদের চলে যাবার প্রধান কারণটা হল, চেলিকদের মধুর বাহুবন্ধন থেকে স্মিত হাস্যে-নিজেদের বিমুক্ত করতে তারা জেগে উঠে খুবই লজ্জা পায়।'

অন্তত যে-পর্বে আমি মুরিয়াদের দেখেছি জেনেছি তখন অবধি যৌনতা বিষয়ে তাদের ছিল সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গি। আর কোনো ধরনের পাপবোধের লেশমাত্র না থাকায় কিংবা বহিরস্থ প্রভাবমুক্ত থাকার কারণে ঘোটুলে সেটা আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠত। যৌনমিলন একটা ভাল জিনিস, তা মানুষের উপকার করে; যৌনমিলন শুধু সুখকর নয়, স্বাস্থ্যকরও— এরকমই ধারণা ছিল মুরিয়াদের। যৌনসম্ভোগ যখন দুটি মানব-মানবীর মধ্যে সঠিকভাবে ঘটে (যেমন চেলিক ও মোতিয়ারির মধ্যে এক জাতিভুক্ত যারা নয়), যথাযথ সময়কালে ঘটে (ঋতুকাল বা নিষিদ্ধ সময়কে বাদ দিয়ে) এবং যথার্থ স্থানে ঘটে (যেমন ঘোটুলের চার দেয়ালের মধ্যে, যেখানে কোনো 'পাপাচার' সংঘটিত হতে পারে না) তখন সেই যৌনসম্ভোগ সবচেয়ে সুখকর— জীবনের এক পরম প্রাপ্তি।

যৌনতাকে স্বাভাবিক ও ভাল বলে মনে করার কারণেই মুরিয়াদের জীবন ছিল স্বচ্ছন্দ। তাদের মধ্যে প্রবাদ ছিল তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকারা হল 'হাসি কি নাত'— পরস্পর কৌতুক সম্পর্কে বিজড়িত। এই প্রবাদ থেকেই যৌনতা বিষয়ে তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। যৌনসম্ভোগ এক মজার ব্যাপার, তার চরমটা মেলে ঘোটুলের রতিক্রীড়ায়— আসক্ত দেহের নৃত্যময়তায় ও প্রিয়তমের বাহুবন্ধনে পরমানন্দে দোল খাওয়ায়। সেই আসক্তি কখনো আবার অতিরিক্তও হতে পারবে না; তা যেন কখনোই ঈর্ষা বা অধিকার স্বত্ববোধে কলুষিত না হয়। সবার মধ্যে বিশ্বাস ছিল, আধুনিক ঘোটুলে— যেখানে সঙ্গী-সঙ্গিনীর পরিবর্তন ঘটে, সেখানেই স্থাপিত হতে পারে সফল ও সর্বোত্তম যৌনসম্পর্ক।

চলিত-রীতির মানুষের কাছে অবশ্য এসব ব্যাপার খুবই ন্যক্করজনক মনে হবে। কিন্তু মুরিয়াদের সপক্ষেও কিছু বলার আছে। প্রথমত চেলিক ও মোতিয়ারিরা খুবই

সুখী; তাদের জীবন পরিপূর্ণ, আনন্দময় ও উদ্দীপনাময়। তারা তো প্রায়ই বলে, 'ঘোটুল হচ্ছে একটা ছোট পাঠাশালা'। এক গ্রামে গিয়ে শুনেছিলাম, চেলিকরা হচ্ছে অনেকটা 'বয় স্কাউট'-এর মতো; সেই গ্রামের স্কুলেই ছিল এক স্কাউট বাহিনী। একই সাংস্কৃতিক মানসম্পন্ন অন্যান্য অঞ্চলের করুণ চাহনি, মলিন পোশাকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের কোনো তুলনাই চলে না। ঘোটুল-জীবনে ছেলেমেয়েরা শেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে, শেখে নিয়মানুবর্তিতা, কঠিন শ্রমের অধ্যবসয়; এই শিক্ষা আজীবন তাদের মধ্যে থেকে যায়। তাদের শেখানো হয় কিভাবে নিজেকে সগর্বে হাজির করতে হয়, আত্মমর্যাদা রক্ষা করা, বড়দের সম্মান করার রীতি-প্রকরণ। আর সব থেকে বড় কথা : তারা দীক্ষিত হয় শৃঙ্খলায়, সেবাধর্মে। বাস্তবিকই মুরিয়াদের এসব ছেলেমেয়ে সকলের কাজের জন্যে কঠিন শ্রম স্বীকার করে থাকে। সরকারি আমলাদের যে কোনো দরকারে বা রাস্তাঘাট মেরামতির কাজে ডাকলেই তাদের পাওয়া যায়। তাছাড়াও আছে সামাজিক অনুষ্ঠান— বিবাহ বা শ্রাদ্ধ, কিংবা নীরেস একঘেয়ে উৎসবাদি; সবটাতেই তাদের হাজির থাকতে হয়। লক্ষ করেছি, মধ্য প্রদেশের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েরাই শ্রমবিমুখ, অপরিচ্ছন্ন, শৃঙ্খলাবোধহীন এবং জনচেতনারহিত; সেখানে মুরিয়া ছেলেমেয়েরা বাস্তবিকই একেবারে ব্যতিক্রম।

এ-ব্যাপারে হয়তো মিশনারি বা সমাজসংস্কারকরা ঐকমত্যে আসতেও পারেন; তবু তারা বলবেন, 'আমাদের কথা কিন্তু তা নয়। আমাদের প্রধান অভিযোগটা হচ্ছে, ছেলে ও মেয়েদের সহবাস।' আবার মুরিয়াদেরও এক্ষেত্রে কিছু বলার রয়েছে; ঘোটুল-জীবনের এই সহবাস আপাতদৃষ্টে তাদের ছেলেমেয়েদের বড় রকমের কোনো অনিষ্ট ঘটায় না— এর মধ্যে অনাচার বা বাড়াবাড়ির কিছু নেই। প্রফুল্লবদন, দীপ্ত চাহনি মুরিয়া যুবক-যুবতীর দিকে তাকিয়ে কখনোই মনে হবে না, তারা কোনো সংগুপ্ত কামনার শিকার; বরং বিপরীতটাই মনে হবে : তারা যেন এক সুতৃপ্ত পরিপূর্ণ জীবন কাটাচ্ছে; এই ঘোটুল ব্যবস্থা যেন 'তাদের কল্যাণই করছে।

ছেলেমেয়রা এক শয্যায়ই শুতো (হয়তো এখনো শোয়) কিন্তু সেটা তারা করত কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় ও সংযমে। যৌনসম্ভোগ অন্যান্য গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যেও প্রতুল পরিমাণে রয়েছে; কিন্তু সেখানে সেগুলো আছে অনাচার হিসেবে, সংযমহীনভাবে। মধ্যভারতের নানা জায়গায় আদিবাসী ও অনাদিবাসী অসংখ্য ছেলেমেয়েকে বহু বছর ধরে আমি দেখেছি। লক্ষ করেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ছেলেমেয়ের যৌন জীবন শুরু হয়ে যায় বছর বারো বয়েস হতে না হতে। আর বেশ খোলামেলাভাবেই তারা রতিক্রিয়ায় মগ্ন হয়ে থাকে প্রাক্‌বিবাহ কাল অবধি; কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহের পরেও। আর আমাদের সকলেরই জানা আছে, যৌনরোগ আদিবাসী ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত; এবং এই রোগের পরিণতিগত যেসব করুণ দৃশ্য আমি দেখেছি তার মধ্যে করুণতম হল তরুণ ছেলেমেয়েদের এই ভয়কর রোগের

কবলে পড়তে দেখা। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, যেসব অঞ্চলকে আমি ভালভাবে জানি সেসব সাধারণ গ্রামের তরুণদের মধ্যে যৌনতার বাড়াবাড়ি ঘোটুল-গ্রামগুলোর তুলনায় ঢের বেশি।

আরো একটা বিস্ময়কর ও কৌতূহলকর ঘটনা রয়েছে। মুরিয়াদের মধ্যে যে গার্হস্থ্য নৈতিকতাবোধ ও দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা রয়েছে তা খুব কম সমাজের মধ্যেই দেখা যায়। ব্যভিচার খুবই বিরল ঘটনা; আর ঘটলে অস্বাভাবিব শাস্তিও জোটে তার। মুরিয়া পরিবারের মতো এমন সুখী পরিবার খুব কমই চোখে পড়বে। তার একটা কারণ আছে; ঘোটুলব্যবস্থা থাকার ফলে বাল্যবিবাহ প্রথা কখনো প্রসার লাভ করতে পারে নি। আশ্চর্যের বিষয়, অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে এই বাল্যবিবাহ প্রথা অতি দ্রুত বিস্তৃতি পাচ্ছে। রোমান্টিক মানসিকতার আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ মানেই আরো বেশি গার্হস্থ্য অবিশ্বস্ততা ও লাম্পট্য। দুটি বালক-বালিকা বিবাহসূত্রে বাঁধা, অথচ কেউ কারো প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না; স্বাভাবিকভাবেই তাই তারা পরপুরুষ বা পরনারীতে আসক্ত হয়ে পড়ে। মুরিয়াদের মধ্যে যে অভাবনীয় দাম্পত্য নিষ্ঠা রয়েছে তার প্রধান কারণই হল ঘোটুলের শিক্ষা; সেখানে তারা শেখে তথাকথিত 'বিবাহিত' হয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি বিশ্বস্ততার আবশ্যকতা। আর অস্থায়ী ঘোটুলে তারা শেখে অবিবাহিত জীবনে সঙ্গী সাময়িক মাত্র, স্থায়ী সঙ্গী বা সঙ্গিনীই হচ্ছে প্রথাগত বিবাহিত জীবনের বৈশিষ্ট্য। কোনো মেয়ের ওপর হক বা স্বামিত্ব জন্মানোর অর্থই হল মেয়েটি তার সঙ্গে থাকবে, সেও তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।

আজ আধা-আদিবাসী ভারতবর্ষের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে গার্হস্থ্য নিষ্ঠাহীনতা ও লাম্পট্য। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটছে সবার মধ্যেই হরহামেশা, পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া তো সাধারণ ঘটনা, ব্যভিচার হয়ে উঠেছে প্রতিদিনের ব্যাপার। অন্যদিকে ঘোটুল গ্রামগুলো কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক উচ্চমান বজায় রেখে চলতে পারছে। বাস্তারে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা শতকরা তিন ভাগেরও কম। পঞ্চাশটি বিবাহের ওপর সমীক্ষা করে অন্যত্র কিন্তু দেখা গেছে তেইশটি, অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে।

আরো অভিনিবেশ সহকারে আমাদের দেখতে হয়, কিভাবে ঘোটুলের ছেলে বা মেয়েরা নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত রাখতে পারে গোপন ও অপ্রীতিকর যৌন-অনাচার থেকে— আধুনিক সভ্যতার কালিমা থেকে। হস্তমৈথুন খুবই বিরল ঘটনা; একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, যেখানে তা রয়েছে সেটাও চলছে ঘোটুলব্যবস্থার সংস্কারের নামে— তথাকথিত সমাজসংস্কারদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার পরিণতিতে। মুরিয়াদের এসব গ্রামে গণিকাবৃত্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত, একেবারে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। কোনো মোতিয়ারিই কখনো অর্থের বিনিময়ে নিজের দেহ বিক্রি করবে না।

ঘোটুল বা গ্রামের ডরমিটারি হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিকাশমানের দ্যোতক। আমরা আত্মসন্তুষ্টিতে ভেবে নিই, আমরা সেই মান ডিঙিয়ে এসেছি; আমরা কিন্তু তার মধ্যে আবারও বিকশিত হতে পারি। যে সময়-পর্বে আমি মুরিয়াদের মুক্ত সুখী জীবনের সান্নিধ্যে যেতে পেরেছিলাম তখন মাঝেমাঝেই আমি ভাবতাম, আমি কি সমসময় থেকে একশ' বছর পিছনে চলে গেছি?— না কি একশ' বছর আগে চলে এসেছি? আমি কিন্তু এমন পরামর্শ দিচ্ছি না যে আমাদের পাবলিক স্কুলগুলোর জায়গায় ঘোটুল আসুক,— আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা সবাই চেলিক আর মোতিয়ারি হোক; আমি বলতে চাই, ঘোটুল জীবনে ও শিক্ষায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা প্রণিধানযোগ্য— যা ভেবে দেখতে হয়। আর মুরিয়া চেতনার সংক্রমণ কারোর যে তেমন ক্ষতি করবে এমনও নয়।

ঘোটুলের মর্মবার্তা হচ্ছে যৌবনকে কার্যকর করে তোলা— বস্তুগত চাহিদার চাইতে মুক্তি ও সুখকে বড় করে দেখা— বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা, পরোপকারিতা ও ঐক্যচেতনাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া। সর্বোপরি মানবিক যাবতীয় ভালবাসাকে এবং তার শারীর প্রকাশকে সুন্দর, অমলিন ও অমূল্য বলে গণ্য করা একেবারেই ভারতীয় ঐতিহ্য। সুতরাং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ঘোটুলব্যবস্থা কোনোভাবেই অস্ট্রো-এশিয়াটিক বিরোধী বা পরস্ব কিছু নয়; বরং ঘোটুলেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বোত্তম অভিরূপক পরিবেশ রয়েছে; যেমন অজন্তায় রয়েছে জীবনের প্রতিরূপ (খুব ছোট মানের হলেও) তেমনি ঘোটুলেও তা আছে; এই ঘোটুলে এমন কিছু আছে (অবশ্যই যা এখন মানবিক ব্যাপার) যা কৃষ্ণ-আখ্যানের ও তার বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। এই জীবনচর্চা ও ঐতিহ্যই পাহাড়ি শিল্পকলাকে সঞ্জীবিত করেছে। এসব নিয়ে *দি মুরিয়া অ্যান্ড দেয়্যার ঘোটুল* নামে ৭৫০ পৃষ্ঠার একটি বিপুলাকৃতি বই লিখেছি। সেখানে প্রথমে আদিবাসী জীবনকে আমি সমগ্রতায় পর্যালোচনা করেছি, তারপর প্রবেশ করেছি ঘোটুল ব্যবস্থাপনার অনুপুঙ্খ বর্ণনায়।

ওই গ্রন্থের সূচনায় আমি তিনটি চমৎকার উদ্ধৃতি রেখেছি : প্রথমটি সেন্ট পল থেকে 'পবিত্রজনদের কাছে সবকিছুই পবিত্র; কিন্তু যারা অশুচি ও অবিশ্বাসী তাদের কাছে কোনো কিছুই পবিত্র নয়; এমনকি তাদের মন ও বিবেকও অপরিশুদ্ধ।'

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি ছিল হিরজ্‌ফেল্ড থেকে : 'হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মূঢ়তা প্রেমকে আবর্জনায় পরিণত করেছে, প্রেমের ওপর কালিমা আরোপ করেছে। সেখান থেকে প্রেমকে কলুষমুক্ত করতে হলে তার সঞ্জীবনী মানবিক মূল্যকে— সর্বোত্তম মানবিক মূল্যকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।'

আর তৃতীয়টি ছিল ওয়েস্টারমার্ক থেকে : 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব থেকে অসুন্দর বিষয় হচ্ছে সত্যকে গোপন করা; শীতল, নিরাবেগ বিস্তারের মধ্যে কোনো কিছু গোপন রাখাটা যেন হয়ে ওঠে অনেকটা শালীনতার দোহাই পেড়ে নগ্ন মূর্তির গায়ে

বস্ত্রখণ্ড ছুঁড়ে দেওয়ার মতো।'

এসব ভাল-ভাল উদ্ধৃতির সমর্থন সত্ত্বেও আমার মনে সংশয় ছিল, বইটি ভারতীয় পাঠক কিভাবে নেবেন। কিন্তু পাঠকবর্গ বেশ ভালভাবেই নিয়েছিলেন। বোম্বের এক প্রকাশক আমার পিছনে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন যাতে আমি *আ স্যাক্সুয়াল লাইফ অফ ট্রাইবাল ইন্ডিয়া* নামে এক বইয়ে বাইগা, মুরিয়া ও অন্যান্য আদিবাসীদের অন্তরঙ্গ ও যৌনজীবন বিষেয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখি। কিন্তু আমি সম্মত হই নি। তার প্রধান কারণ, কখনোই আমার উদ্দেশ্য ছিল না পাঠকের কল্পনা ও অভিভাবে সুড়সুড়ি দেওয়া; বিপরীতে আমি চেয়েছিলাম যৌনতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও তথ্য জোগাতে। আর সেটা শুধু সম্ভব, যৌনতাকে জীবনসমগ্রতার অংশ হিসেবে দেখলেই। যৌনতাকে জীবন-বিযুক্ত বা অ-সম্পর্কিত হিসেবে তুলে ধরে বিবৃত করা, অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সে-প্রসঙ্গ থাক; মুরিয়া ঘোটুল-এর ওপর লেখা আমার বইটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন ড. আ. বাইগত, তার নাম *মেইসোঁস্ দে জিউনেস সেজ লে' মুরিয়া*; গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় গালিমার থেকে। ড. বাইগতের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে যোগাযোগ থাকলেও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, হয়ও নি। ইতিমধ্যে ইংরেজি সংস্করণটি নিঃশেষিত হয় গেল, বহুদিন বাজারে নেই; তখনই আসে বইটি ইটালি ভাষায় অনুবাদের প্রস্তাব। অনেক চেষ্টা করেও আমরা ইংরেজি সংস্করণের একটা কপিও জোগাড় করতে পারলাম না; ফলে বাধ্য হয়েই রোমের প্রকাশককে আমাদের পাঠাতে হল ফরাসি অনুবাদের একটা কপি। তবে সত্যি কথা বলতে কি তাতে আখেরে লাভই হয়েছে। কারণ ড. বাইগত মূল গ্রন্থটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনায় আরো বেশি পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। মুরিয়াদের যৌন-জীবন ও আচরণ ইংরেজির তুলনায় ফরাসি অনুবাদে আরো ভালভাবে উঠে এসেছে।

আট

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি প্রথম ওড়িশায় যাই। নরভাল মিচেল সবেমাত্র তখন ইষ্টার্ন স্টেটস্ এজেন্সির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনিই আমাকে আমন্ত্রণ জানান বোনাই, কেওনঝড় ও পাল লাহারা রাজ্যগুলোর দরাবারসমূহে সফরের জন্যে। আমার কাজটা ছিল মূলত এই রাজ্যগুলোর আদিবাসী অঞ্চল পরিদর্শন করে সেখানকার মানুষের জীবন ও চর্চার ওপর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা। এবং তাদের বদলি-চাষের সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করে সেগুলো সরকারের কাছে সুপারিশ হিসেবে রাখা। বদলি চাষের সমস্যাটা তখন বাস্তবিকই সেখানে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে ব্রিটিশ সরকার কখনোই ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় নি। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আমি শুধু রেখাচিত্রে তুলে ধরতে পারি, কী ছিল আমার সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের বিষয়। বলাবাহুল্য, আনুসন্ধেয় সমগ্র বিষয়টিই ছিল স্বাভাবিকভাবে এক লোকহিতবিদের কার্যক্রম।

> মিঃ এল্যুইনের দায়িত্ব হচ্ছে : আদিবাসী মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শারীরিক শর্তসমূহ অনুপুঙ্খ বিচার করে এমন এক কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করা যার পরিণতিতে বদলি-চাষ ব্যবস্থা থেকে স্থায়ী চাষব্যবস্থায় ফিরে এসে মানুষ স্থিত জীবন যাপন করতে পারে। ব্যাপারটা অন্যভাবেও বলা যায়; এক লোকহিতবিদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে বন দপ্তরের অফিসারদের বিশেষ জ্ঞানের সংশ্লেষণ ঘটানো। মিঃ এল্যুইনই বিচার করে দেখবেন, আদিম জীবন ও সংস্কৃতির কী কী উপকরণ সংরক্ষিত রাখতে হবে, আর কোনগুলোই বা অ-সামাজিক বিবেচনায় বর্জন করতে হবে। পর্যবেক্ষণের পর তিনিই পরামর্শ দেবেন, বদলি-চাষ বাতিলের জন্যে আদিম অধিবাসীদের জন্যে ক্ষতিপূরণ বা সান্ত্বনা হিসেবে কী করতে হবে। এক্ষেত্রে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে তাদের চারু ও কারু শিল্পের ওপর। লক্ষ রাখতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক স্বার্থে ওইসবের সংরক্ষণ ও বিকাশ কতখানি আবশ্যক। এছাড়াও মিঃ এল্যুইন আদিম মানুষের অন্য যে কোনো সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করবেন; যেমন, মেডিকেল সার্ভিস বা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়। এ-জাতীয় অনুসন্ধানের পরিণতিতে সমস্যাবলির একটি সামগ্রিক চিত্র উঠে আসবে। আর তখন সেটিকে একাধারে প্রয়োগিক অন্যধারে মানবিক হিসেবে সন্নিবিষ্ট করা যাবে; এবং তার প্রেক্ষিতেই আগামীদিনের নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

আমার কর্তব্যকর্মের সনদটি ছিল খুবই নির্দিষ্ট; একবার তাই এক যথেষ্ট উদারমনা ব্রিটিশ রাজকর্মচারী সহাস্যে আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার কাজটাই হচ্ছে নিজেকে জঘন্য উপদ্রবের মধ্যে ফেলা যাতে আমরা বাধ্য হই আপনার লোকজনদের জন্যে কিছু অন্তত করতে।'

এই পরিদর্শনের কাজটা আমার কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছিল; যদিও সফরকালে বেশ কয়েকবার আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু আমাকে সাহায্য করা হয়েছিল কয়েকটা হাতি জুগিয়ে। আমার ধারণা, আমার রিপোর্টটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে হয়; আদিবাসীদের মধ্যে আমার এত বছরের কর্মকাণ্ডে এই প্রথমবার আমি তাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হই। কারণটা ছিল বিচিত্র ও কৌতূহলকর; গ্রামবাসীরা ভেবে

নিয়েছিল, আমি তাদের মধ্যে এসেছি বদলি-চাষপ্রথা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে— তাদের জমি কেড়ে নিতে। অথচ আমার প্রকৃত সুপারিশটা ছিল একেবারেই ভিন্ন।

নানা গুজব লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল। আমার যাবার আগের বছর এক ব্রিটিশ অফিসার একজন বন উপদেষ্টাকে নিয়ে ভুইএঞা পিরহাতে গিয়েছিলেন; গ্রামবাসীরা ভাবল, সম্ভবত পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা সেই দুজন নির্বাসিত ইউরোপীয়কেই খুঁজতে এসেছি আমি। জনপ্রিয় গুজবটা ছিল, আমিও সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে এসেছি। বোনাইতে আবার জনসাধারণ বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে 'যুদ্ধের জন্যে' আমরা মেয়ে রপ্তানি করছি; ফলে এমন কোনো মেয়েরই দর্শন পাই নি যার বয়স সামরিক বয়ঃসীমার মধ্যে রয়েছে। কেওনঝড়ের গহন জুয়াঙ পাহাড়মালায় অবশ্য কারো কারো মনে ছিল প্রাক্তন প্রশাসক ম্যাকমিলানের কথা (তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়, প্রায় কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, তিনি বিয়ে করেছিলেন এক ভুইএঞা মেয়েকে); কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই কোনোদিন কোনো সাদামুখো মানুষ দেখে নি। আমাকে দেখেই তাই কোনো দুরাত্মা মনে করে সবিস্ময়ে আর্ত চিৎকার তুলে অরণ্যের মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এই সন্দেহ দূর হতে বেশি সময় লাগল না, আর অনতিকালের মধ্যেই বিশেষত পান লহরায় ও জুয়াঙদের মধ্যে আমাকে ঘিরে খুবই বন্ধুসুলভ পরিবেশ গড়ে উঠল। এই পরিবেশ গঠনে আমাদের হাতিটির এবং আমার ছোট্ট ছেলে কুমারের অবদান ছিল অনেকটা। কদিনের মধ্যেই আমি সম্বোধিত হতে লাগলাম 'রুশি সাহেব' হিসেবে। রুশি হল গোষ্ঠীটির কৌম নায়ক। আবার একবার বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে জুয়াঙরা তাদের নজরদারিতে বেশ অস্বস্তিকরও হয়ে ওঠে। আমার জীবনযাত্রার খুঁটিনাটির ওপর তাদের তীব্র কৌতূহল, যে কোনো সময়ে হুটহাট ঢুকে পড়ছে তাঁবুতে; এমনকি আমার বাথরুমেও (পাতার ছাউনি দেওয়া ছোট ঘরে) উঁকি দিয়ে তারা দেখে কি করছি আমি। বলতে দ্বিধা নেই, মাঝে মাঝে চরম অস্বস্তিতে আমার মনে হত, আমি বুঝি মিউজিয়ামের কোনো নিদর্শন বস্তু। অন্যদিকে তখন জাতিতাত্ত্বিক সমিতির জুয়াঙ সদস্যবর্গ এক বিচিত্র প্রাণীর উদ্ভট আচরণসমূহ পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।

একদিন সকালবেলা একটা এরোপ্লেন সুদূরে মাথার ওপর বন্‌বন্ শব্দ করছিল। আমার এক জুয়াঙ্ বন্ধু বলল, 'প্লেনটা দেখলেন? ওটায় চেপে রানী ভিক্টোরিয়া এসেছেন তার রাজত্ব দেখতে, দেখছেন তার রাজত্বটায় কাজকম্মো কেমনধারা চলছে।' আমি মনে মনে ভাবলাম, যদি তিনি ওই প্লেনে থাকেনও এবং দেখেন কিভাবে চলছে তাঁর রাজত্ব, তাহলে নির্ঘাৎ তিনি ভিমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়তেন। এদিকে শুরু হয়ে গেল বিমান নিয়ে গভীর আলোচনা! কেউ কেউ বলছে, আকাশে আড়াআড়ি টান করে বাঁধা সরু তারের ওপর দিয়ে প্লেনগুলো চলে। কেউ আবার

বলছে, ওর মধ্যে মানুষ আছে, আজব মানুষ, তারা আমাদের মতো সাধারণ খাবার খায় না, ওরা হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকে। পরবর্তীকালে সাওরারা আমাকে শুনিয়েছিল এরোপ্লেন বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে যায়; যে-পথ ধরে বিমান যায় তার নিচের গ্রামগুলোর শিশুরা ওই নিঃসৃত গ্যাসে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

সাওরাদের কথা থাক; জুয়াঙ্‌দের উপরিউক্ত কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, বহির্বিশ্বের সঙ্গে তারা কতখানি যোগসূত্রহীন— কতটা বিচ্ছিন্ন। এই জুয়াঙ্‌দের সম্বন্ধেই ডালটন বলেছিলেন, 'আমার দেখা ও পড়া আদিমতম জনগোষ্ঠী'।

আর এই সময়েই জুয়াঙ গ্রামদেশে আমাদের একটা ট্যুর হয়ে উঠেছিল খুব চিত্তাকর্ষক। সে এক অবাধ সুন্দর গ্রামদেশ। সফরটা প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছে : কখনও তার অপূর্ব ভূ-দৃশ্যে, কখনও মাল্যগিরিবেষ্টিত তালবীথির চাতালের ভূমি-সৌন্দর্যে; সেই পাহাড়ে সূর্যের প্রতিফলিত বিচিত্র রঙের খেলায়। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্যশোভা। আর ডিসেম্বর মাসের সূচনায় গ্রামদেশটি যেন হেমন্তের নতুন সাজে ঝলমল করে ওঠে— সমগ্র পাহাড়ভূমি জুড়ে তখন ছড়িয়ে পড়ে হরিৎ ফুলের আভা।

জুয়াঙ্‌দের দুটি বিষয় আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। প্রথমটা তাদের দারিদ্র, আর দ্বিতীয়টা তাদের মাধুর্য ও সৌন্দর্যবোধ যার প্রতিরূপ উদ্ভাসিত হয় তাদের 'পশু-নৃত্যে'। প্রকৃত জুয়াঙ গ্রামদেশ দেখতে হলে চলে যেতে হবে কেওনঝড়ের উঁচু অংশে। ভারতের এই মালভূমিতে রয়েছে ছবির মতো কিছু গ্রাম; সেই গ্রামগুলোর শুধুই তুলনা চলে কোরাপুট পাহাড়ের প্রাণময় বণ্ডো গ্রামগুলোর সঙ্গে। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে নির্বাচিত জায়গা জুড়ে বিশাল ঘের দেয়া এক একটি গ্রাম, গ্রামগুলো সবই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারগুলোই আদ্যতা পায় নি, সৌন্দর্যের ব্যাপারটাও ছিল। গ্রামের সেই লাল মাটির ছোট ছোট কুঁড়েগুলো কোথাও-বা ছিল একটার গায়ে আরেকটা জড়িয়ে, আবার কোথাও-বা ছিল সংকীর্ণ রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ। বাড়ির গা-ঘেঁষে ছিল গোরু-ছাগলেব পরিচ্ছন্ন গোয়াল। গ্রামের মাঝখানে থাকত একটা উন্মুক্ত জায়গা, সাধারণত ডরমিটারি, ক্লাব বা দরবারের সম্মুখে, যেখানে হয় অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর রাত্রিযাপন না হয় বয়স্কদের বিভিন্ন উপলক্ষে সমবেশ। আর উন্মুক্ত জায়গাটি ব্যবহৃত হত নাচের জন্যে। ওইসব গ্রামের মানুষজন মোটামুটি সচ্ছলই ছিল।

কেওনঝড়ের বিপরীতে পাল-লাহরার জুয়াঙরা ছিল খুবই নিস্তেজ, বিষাদক্লিষ্ট। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মালয়গিরির উপত্যকা পরিবৃত অরণ্যভূমিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে আচমকাই জুয়াঙরা বঞ্চিত হয় জীবনযাপনের সাধারণ উপকরণ থেকে। পাহাড়তলিতে তাদের জমি ও গবাদি পশু দেওয়া হল; কিন্তু তারা লাঙল-প্রথায় কৃষিকাজে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিল না, তাছাড়া হাতির

পাল নেমে এসে শস্য নষ্ট করে যেত। ফলে দেখতে না দেখতে জুয়াঙরা প্রতিবাসীদের কাছে ভূমিদাস সম্পর্কে বাঁধা পড়ে গেল, ধার-কর্জে আকণ্ঠ ডুবে গেল, তাদের জমিগুলোও সব অন্য হাতে চলে গেল। আর আমি যখন তাদের দেখা পাই তখন তারা ঝুড়ি বানিয়ে কোনোভাবে জীবন নির্বাহ করছে। ভারতের গ্রামীণ কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সব থেকে করুণ ও অ-লাভজনক কাজই হচ্ছে ঝুড়ি বোনা। দিনভর খেটে একজন মানুষ দিনে বড়জোর একটা বড় ঝুড়ি বানাতে পারে; সেই ঝুড়িটা বিক্রি করে সে পায় আধ-আনা (ষোল আনায় এক টাকা— অর্থাৎ এক টাকার বত্রিশ ভাগের এক ভাগ— অনুবাদক)। যে অরণ্যকে একদা সে নিজের বলে ভাবত সেখান থেকেই আজ ঝুড়ি বানাবার বাঁশ আনতে তাকে বছরে আট আনা বা ষোল দিনের শ্রম নিবেদন করতে হয়।

এই জুয়াঙদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছিল চরম। সেই মর্মান্তিক দৃশ্যটার কথা জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারব না। রাতের বেলা জুয়াঙদের গ্রামে গেছি; দেখি বৃদ্ধা মহিলারা কটিদেশে এক টুকরো নেকড়া জড়িয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় মাটির মেঝেতে কুঁকড়ে শুয়ে আছে—কম্পমান অগ্নিশিখা থেকে যৎকিঞ্চিৎ উত্তাপ সংগ্রহে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই জুয়াঙদের প্রায় সকলেরই শরীর-স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ, নানা ব্যাধিতেও তারা আক্রান্ত। প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াইয়ে কেওনঝড়ের জুয়াঙদের পেশী মজবুত, দেহে বল আছে; কিন্তু পাল লাহরায় ঝুড়ি বোনাটা তো নিছক বসে থাকার কাজ।

অর্থনৈতিক এই বিপর্যয় থেকেও সাংঘাতিক হল পাল লাহরার জুয়াঙদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। কেওনঝড়ের পাহাড়ি দরবার হলগুলোতে সচরাচর যে খোদাইয়ের কাজ দেখা যায় সেগুলোর কথা না হয় থাক। গ্রামদেবতার উদ্দেশে পাথরের স্তম্ভগুলোর কথাও ওঠে না। কারণ যেদিন থেকে জুয়াঙরা তাদের জমি হারাল সেদিন থেকেই দেবতার উদ্দেশে নৈবেদ্য দেওয়ার বা পূজা করার ক্ষমতাও আর তাদের রইল না; বাইরের পুরোহিত বা জাদুকরকে ডেকে আনতে হয় (অবশ্যই দক্ষিণা দিয়ে) তাদের। মনোমুগ্ধকর ফ্যাশনের ডিজাইন-করা চিরুণি, তামাকসেবনের নানা সুদৃশ্য উপকরণ, জমকাল নেকলেস— এমন যেসব লক্ষণ কেওনঝড়ের জুয়াঙদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য সেসবের কথা পাল লাহরার জুয়াঙরা হয়তো কোনোদিন শোনেই নি।

কুড়াল-চাষ প্রথা নিষিদ্ধকরণ অথবা পাহাড়ি মানুষকে নিচে ঠেলে নামানোর নীতির মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যায় পাল লাহরার জুয়াঙদের জীবন। বন-প্রশাসনের নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে খুঁতখুঁতে সমালোচকবৃন্দ এতকাল যে অভিযোগগুলো তুলে ধরেছেন সম্ভবত তার সবটাই এক্ষেত্রে স্থূলাক্ষরে উদ্ধৃতিযোগ্য। উচ্চভূমির মানুষকে জোর করে যখন নিচে নামিয়ে আনা হয় তখন কী ঘটতে পারে

তার দুঃখজনক দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই পাল লাহ্‌রার জুয়াঙরা।

জুয়াঙ রমণীদের পরম্পরাগত পরিচ্ছদ ছিল গলায় একগুচ্ছ পুঁতির হার আর মাটির তৈরি শুকনো শিঙার কোমরবন্ধনীর সঙ্গে আঁটা পাতার স্কার্ট। আদিবাসীদের মিথোলজিতে এই পরিচ্ছেদেরই উল্লেখ রয়েছে; এবং ধর্মীয় অনুমোদনে তা চলেও আসছে।

১৮৭১ সালটি আদিবাসী মানুষের কাছে এক অশুভ বৎসর। এই বছরেই মধ্য ভারতে লাঙল চালিয়ে ধরিত্রীমাতার বক্ষ ছেদনের মতো অশুভকর্মে ব্রিটিশ অফিসাররা বাইগাদের বাধ্য করেছিল। এই ঘটনার পরিণতিতে তারা এমন এক মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রমে নিক্ষিপ্ত হল যেখান থেকে আর তারা উঠে আসতে পারে নি পুরোপুরিভাবে। আর একদল অফিসার আবার ওড়িশায় জুয়াঙদের পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টানোর জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিয়েছিল। একটা সভা ডাকা হল; সেই সভায় জুয়াঙদের মধ্যে হাজার দুয়েক বস্ত্র বিতরণ করা হল; শুধু তাই নয়, এখান-সেখান থেকে পাতা জড়ো করে তাতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হল। এ-জাতীয় প্ররোচনা চলতেই থাকে; আর তার পরিণতিতে অধিকাংশ জুয়াঙ তাদের সুদৃশ্য স্বাস্থ্যসম্মত পাতার পোশাক ছেড়ে অচিরেই নোংরা নেকড়া পরা শুরু করে দিল।

সভ্যতার মর্মবস্তুকে অনুপ্রবিষ্ট না করিয়ে তার বহিরস্থ আচ্ছাদন প্রবর্তন করার অর্থহীন কাজের পরিণতি কী ঘটতে পারে তা জুয়াঙদের দৃষ্টান্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই জুয়াঙ আদিবাসীদের স্মৃতিতে আজো রয়ে গেছে সেই দিনটির কথা যেদিন তাদের পবিত্র পাতা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; প্রত্যেক বিজিত জাতি যেমন মনে রাখে তাদের পরাজয়ের দুঃখময় দিনটির কথা, জুয়াঙরাও তেমনি মনে রেখেছে সেই দিনটির স্মৃতি।

জুয়াঙরা বলে থাকে, সেদিন থেকেই 'সৎ'— সততা—সত্য ও ধর্মের মর্মবস্তু— মায়াময় এই প্রতিকূল দুনিয়ায় নিরাপদে বেঁচে থাকার শক্তি আদিবাসীরা হারিয়ে ফেলেছে, সেদিন থেকে বাঘ বিনা-দণ্ডে গরুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর ক্ষুব্ধ ধরিত্রীমাতা যৎকিঞ্চিৎ শস্য জোগায়।

এসব কথা আজ অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে; কিন্তু নিতান্ত সরল কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর উন্নয়নের ব্যাপারটা চাপিয়ে দেওয়ার সময়েই যদি তাদের বিকাশের— তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ ও সুখময় করে তোলার সুসামঞ্জস্য কোনো কর্মসূচি না থাকে তাহলে তার পরিণতি হতে পারে বিপর্যয়কর। বাস্তবত, জুয়াঙ পাহাড়ি অঞ্চলে যা দেখেছিলাম তা আমাকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল। সেইসব বিষয় নিয়ে অনেক প্রতিবাদী জোরালো লেখাও লিখেছি।

আমাকে শোনানো হয়েছিল জুয়াঙদের প্রাচীন রীতির এক নৃত্যের অনবদ্য নান্দনিক অভিজ্ঞতার কথা।

বহুদিন আগে জুয়াঙদের পশু-নৃত্যের অসাধরণ বিবরণ লিখে রেখে গেছেন

ডালটন; আর ১৯৪৩ সালে যেসব নৃত্য আমি বহুবার দেখেছি সেগুলোও ছিল ডালটনের দেখা সেই ১৮৬৬ সালের নৃত্যগুলোরই অনুরূপ। আজো কিছু জুয়াঙ-রমণী সব সময়ে তাদের ঐতিহ্যগত পাতার পোশাক পরে থাকে— পালাপার্বণে উৎসবে তো সকলেই তারা পাতার পোশাক পরে নেয়। আজ সেই প্রথাটা কোথায় কেমন স্বরূপে আছে,— তারা তাদের পরম্পরাগত নৃত্যটা কতটাই বা ধরে রাখতে পেরেছে আমি বলতে পারব না। কিন্তু একটা বেদনার কথাও সত্য : সভ্যতার আগ্রাসন অরণ্যভূমিতে যে মাত্রায় প্রবেশ করছে তার অনিবার্য পরিণতিতেই বহু ধরনের শিল্পকলার যে অপমৃত্যু ঘটবে তা স্বাভাবিক; এবং সেটা ঘটেও চলেছে। কিন্তু আমি যে-সময়ে সেই নাচগুলো দেখেছি সেগুলো ছিল তখনও অনুপম, প্রকাশাতীত সুন্দর। মেয়েদের সোনালি-বাদামি গাত্রবর্ণের ওপর উজ্জ্বল সবুজ পাতার সমাহার একঘেয়েমির নিরসন ঘটাত; মেয়েদের সৌন্দর্য হয়ে উঠত আরো মাধুর্যময়। বিশেষ করে আমার মনে পড়ছে মেয়েদের ময়ূর ও হরিণ নৃত্যের কথা। অরণ্যে এই দুটি প্রাণীর মাধুর্যময় পদবিক্ষেপ ফুটে উঠত মেয়েদের নাচের মুদ্রায়। হাতি ও শকুনির অনুকরণের ক্ষেত্রেও ছিল তাদের নিপুণ দক্ষতা; মাটির ওপর তিতির পাখির মতো ছড়িয়ে পড়ে তারা যখন চঞ্চু দিয়ে দানা খুটে খাবার দৃশ্যরূপ নির্মাণ করত তখন তাদের দেহ-আন্দোলন একদিকে যেমন হয়ে উঠত ছন্দোবদ্ধ, অন্যদিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পরিদর্শনের শেষে অন্যান্য প্রসঙ্গের পাশাপাশি এই বিষয়টার উল্লেখ সূত্রে আমি লিখেছিলাম :

> 'আজ জুয়াঙ্‌রা ক্ষুদ্র ও নিঃস্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তাদের ওপর শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে আবশ্যক আরো বেশি সহানুভূতি ও তাদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা। তারা অরণ্যে বসবাস করে, সেই অরণ্য প্রচুর সম্পদশালী। সেই সম্পদের কিছু অংশ তাদের হাতে যাওয়া উচিত; তাহলেই তারা সুখী ও পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করতে পারবে।'

এত বছর বাদে আজ সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে; এমনকি আজো আমি আশা করব, এই কাজটা সুষ্ঠুভাবে হোক।

ক্রিস্টফ ফন ফুয়্যের্-হেমেনডর্ফ ছিলেন সব সময়েই এক প্রায় সফল অভিযাত্রী; আমি যখন বাস্তারে তখন তিনি গাদাবা ও বণ্ডোদের মধ্যে এসেছিলেন। এবং উত্তেজনা-আবেগে এই অঞ্চলের সৌন্দর্য ও মানুষজনের মনোহারিত্ব বিষয়ে আমাকে চিঠিতেও তিনি নানা কথা লিখেছিলেন। মুরিয়াদের ডরমিটারি (ঘোটুল) বিষয়ে আমার বইটির কাজ শেষ হলে আমি ভাবলাম জুয়াঙদের বিষয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার অনুপ্রেরণায় তার বিস্তার ঘটানো যাক ওড়িশার গঞ্জাম ও কোরাপুটের ক্ষেত্রে। সেই প্রথম সফরকালে আমার পথনির্দেশক ছিলেন কাঠ-ব্যবসায়ী ভাল্ ব্লাকবার্ন; তিনি

বাস্তারের বাইসন-হর্ন মারিয়া মেয়ে

সাওরা যুবকরা

ছিলেন সত্যিকারের সহৃদয় ও বন্ধুবাৎসল ব্যক্তি; থাকতেন রায়পুরে। তিনিই আমাকে দুর্গম অরণ্য অঞ্চল—কুট্রিয়া কোণ্ডে নিয়ে যান। বাদে আমরা দুজনে একসঙ্গে নিমগিরি পাহাড়ে উঠি; তারও কিছুদিন বাদে আমরা উচ্চ বণ্ডো মালভূমি সফর করি। সেটা ছিল প্রথম সফর; পরবর্তীকালে বহুবার আমি সেখানে গেছি। তারই গা-লাগোয়া গাদাবা অঞ্চলের ওপরেও কিছুটা সমীক্ষার কাজ করি। সেখান থেকে আমি চলে যাই পারলাকিমেডি ও গুনপুরের সাওরা অঞ্চলে। অসাধারণ এক আদিবাসী অঞ্চল। গিলবার্ট ম্যুরের ভাষায় সেখানে আমি পেয়েছিলাম 'আপেল বৃক্ষ, গায়ক পাখি আর স্বর্ণভাণ্ডার'।

সফরের ব্যাপারটা দিনে-দিনে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠছিল; অবশ্য আজকের মতো এতটা সাংঘাতিক তখনও হয় নি। তবে বোঝা যাচ্ছিল, সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকলে আমার কাজের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবেই। ওড়িশার কিছু অফিসারের সঙ্গে আমার সখ্যতা জন্মে; প্রথম-প্রথম তাঁরা প্রত্যেকেই আমার অতীত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কিছুটা সংশয়ী ছিলেন; পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছেন, আমি তেমন কোনো সাংঘাতিক কিছু নই। সেই পরিচয়ের কল্যাণে অবশেষে আমি ওড়িশার অবৈতনিক নৃতত্ত্ববিদ হিসেবে নিযুক্ত হই। যে-সম্মানদক্ষিণাটা আমি পেতাম তাতেই আমার সফরের ব্যয়টা উঠে যেত। বহু বছর বাদে প্রয়াত এস. ফজল আলি আমাকে বলেছিলেন, যে, তিনি যখন ওড়িশার গভর্নর তখনই একবার স্থির হয়েছিল যে আমাকে ওই প্রদেশের আদিবাসী বিষয়ক উপদেষ্টা পদে নিয়োগের আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু তিনি যখন সেটা করতে চলেছেন তখনই জানতে পান যে প্রধানমন্ত্রী আমাকে নর্থ ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ারে পাঠচ্ছেন।

সে যাই হোক, আমার ওড়িশা-সফরের ফলস্বরূপ প্রকাশিত হয় তিনখানা গ্রন্থ : *বণ্ডো হাইল্যাণ্ডার, দি রিলিজিয়ন অফ অ্যান ইন্ডিয়ান ট্রাইব* (সাওরাদের নিয়ে) এবং *ট্রাইবাল মিথস অফ ওড়িশা*। এছাড়া জুয়াঙদের ওপর বিশেষ রচনা হিসেবে লিখি 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া; এ বাদেও সরকারের জন্যে অনেকগুলো রিপোর্ট লিখেছি, আদিবাসীদের কল্যাণের জন্যে নানা সুপারিশ করেছি। আরো একটু বেশি উদ্যমী হলে কম করে আরো দুখানা বই লিখে ফেলতে পারতাম। কারণ গাদাবা ও কোণ্ডদের বিষয়ে আমার সংগ্রহে ছিল অসংখ্য তথ্য ও ফোটো।

এবার আমি আমার দেখা তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠী কুট্রিয়া কোণ্ড, বণ্ডো ও সাওরাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখব। এই বিবরণ নৃতাত্ত্বিক নয়; নৃতত্ত্ব বিষয়ে কৌতূহলী পাঠক অন্যত্র দেখবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে এই অধ্যায়ে আমি যা বলছি এবং নবম অধ্যায়ে নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রসঙ্গে যা লিখব তা আত্মজীবনীতে সঙ্গতভাবে স্থান পেতে পারে কি না। আমার ধারণায় পারে। আদিবাসী মানুষ আমার জীবনের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল— তারা আমার জীবনে এত কৌতূহল, আগ্রহ ও

আনন্দ নিয়ে এসেছিল যে তাদের কথা ব্যতিরেকে— বাইগা, মুরিয়া, কোণ্ড ও সাওরাদের কথা বাদ দিলে আমার জীবনকথাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাইগারা আমাকে গহীন অরণ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে; কুট্টিয়া কোণ্ড ও মারিয়ারা আমার মধ্যে সৌন্দর্যচেতনার প্রজ্বলন ঘটিয়েছে— আমাকে শিক্ষিত করে তুলেছে। সাওরাদের নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি; তাদের ভালবেসেছি; সাওরাদের মধ্যে আমি বহু বছর কাটিয়েওছি। আর মুরিয়াদের মধ্যে তো মনেই হত নিজেকে বিলীন করে ফেলেছি— তাদের অ-স্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থাপনা শুধু আমার মধ্যে একাডেমিক কৌতূহলই জাগায় নি, মানবিক সমস্যা নিয়ে ভাবতেও আমাকে তাড়িত করেছে। এদের সম্বন্ধে যাদের সামান্যতম অভিজ্ঞতাও আছে তারা আমার কথার যথার্থতা বুঝবেন। অন্যদিকে জীবন বিষয়ক আমার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটাই নেফার প্রীতিকর মানুষদের সান্নিধ্যে গিয়ে আমূল বদলে গিয়েছে। এই যে আদিবাসী মানুষ, একের পর এক যারা আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে, এদের কথা বাদ দিলে আমার কোনো জীবনকথাই থাকে না। জীবনের প্রতিটি বড় বড় ঘটনার মুহূর্তে সব সময়েই আমি ছিলাম নিতান্ত এক দর্শক; বস্তুত খুব কম ক্ষেত্রেই আমি নামী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি; আদিবাসী মানুষই আমার জীবন; আর সেজন্যেই তাদের কথাই আমাকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হচ্ছে।

নবম

কুট্টিয়া কোণ্ড

প্রথমেই বলা যাক বন্য, প্রান্তিক ও দারুণ আকর্ষণীয় কুট্টিয়া কোণ্ডদের কথা।

কোণ্ডরা এক বিশাল আদিবাসী জনগোষ্ঠী; গোষ্ঠির অনেকটা কাছাকাছি দ্রাবিড়ীয় ভাষায় তারা কথা বলে; তারা ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র ওড়িশাজুড়ে, কিন্তু কুট্টিয়া কোণ্ডরা গঞ্জাম জেলার উত্তর-পশ্চিম দিকের পাহাড় ও অরণ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। এই কুট্টিয়া কোণ্ডরা অত্যন্ত দরিদ্র, ভীরুস্বভাবের অথচ দেখতে ভারী সুদর্শন। চেনা-পরিচয় একবার কারো সঙ্গে হয়ে গেলে তারা তার খুব অনুরক্ত বন্ধু হয়ে ওঠে।

তাদের ভীরুতার নানা কারণ আছে। ডোম মহাজন ও পাত্র জমিদারদের দ্বারা তারা নিদারুণভাবে শোষিত ও নির্যাতিত; বনবিভাগের অফিসারদের হাতেও তারা এক সময়ে খুব হেনস্তা হয়েছে; যেসব অসৎ কারবারি বা কালোবাজারিরা তাদের এলাকায় যেতে পারত তারাই তাদের সারল্যের পুরো সুযোগটা নিত। অবশ্য তাদের এলাকায় প্রবেশ নিরাপদ ছিল না, মাঝে-মধ্যেই সেখানে হিংস্র জন্তু এসে হামলা চালাত।

তাদের পাহাড়ে আমার প্রথম সফরকালে একটা ঘটনা ঘটে; আমার চিঠি পোস্ট করার জন্যে একজন কোণ্ড রেলওয়ে স্টেশন অভিমুখে যাচ্ছিল, পথে বাঘের আক্রমণে সে প্রাণ হারায়। পরদিন সকালে আমরা সেখানে গিয়ে দেখি, চারদিকে থক্‌থক্ করছে রক্ত আর আমার চিঠিগুলো জঙ্গলময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সারাক্ষণের এক আতঙ্ক হিসেবে বন্য হাতিও ছিল, তারা শস্যও নষ্ট করত খুব। সফরে বেরুলে আমরা মাঝে-মাঝে কনভয়ের মতো একটা ব্যবস্থা করে নিতাম— আমাদের নিরাপত্তার জন্যে বিপজ্জনক পথে সব ধরনের মানুষই সামিল হত।

কোণ্ডরা অবিরাম তাদের গ্রাম পাল্টাত; সেই গ্রামগুলো সাধারণত এমনই দুর্গম স্থানে অবস্থিত হত যে তাঁবু খাটাবার মতো সমতল ভূমিও জুটত না আমাদের। বাইগাদের মতো তারাও বদলি-চাষপ্রথায় একান্তভাবে নিবেদিত ছিল; কিন্তু বাইগাদের তুলনায় তারা ছিল চাষের পর্যায়ক্রমের বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন— কোনোভাবেই যেন অরণ্যের অপবিনাশ না ঘটে। প্রতিটি গ্রামেরই সম্ভবত ভজনখানেক পরম্পরাগত কৃষিক্ষেত্র ছিল; নিকটস্থ অরণ্যের চাষযোগ্য ভূমি নিঃশেষিত হয়ে গেলে তারা আবার নতুন পর্যায়ে ওই জমিগুলোতেই কৃষিকাজ করত। তাদের কুটিরগুলো ছিল খুবই ছোট ও নিচু, দরজাগুলো অতি ক্ষুদ্র। একবার আমি তাদেরই এক কুটিরে আস্তানা করে কয়েকদিন ছিলাম; সেই ঘরের দরজাটা এত নিচু ছিল যে আমাকে হাতে পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ির মতো কসরতে ঘরে ঢুকতে হত।

কিন্তু গ্রামগুলো ছিল একেবারে ছবির মতো; দুই সারি কুটিরে সাজানো, প্রতিটি বাড়ি প্রতিবাসী বাড়িটির লাগোয়া। গ্রামের মাঝখানে ছিল কাঁটার মতো দেখতে একটা বলির স্তম্ভ, আকাশমুখী সেই গর্বিত স্তম্ভটার মুখে থাকত একটা মহিষের শিং। ধরিত্রীমাতার প্রতীকী থানের সামনে ছিল আরো তিনটে পাথর, যেন তার সুরক্ষার বেষ্টন। প্রায়শ চোখে পড়ত, বলি-স্তম্ভের গায়ে রয়েছে নিপুণ খোদাই— মহিষের খুলি, সডাক হরিণের লেজ, সাম্বারের হাড় কিংবা মহিষের ক্ষুর ইত্যাদি। সাধারণত গ্রামগুলো থাকত ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন।

১৯৪৪ সালেও নরবলি প্রদানের মানসিকতা কোণ্ড আদিবাসী মনস্তত্ত্বের একেবারে মূলে প্রোথিত ছিল। এখানে মনে রাখতে হবে, মাত্র শ'খানেক বছর আগে মেরিয়াহ্ স্যাকারিফাইস বা নরবলি প্রথা সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ধরিত্রীমাতার উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ছিল এই নরবলি প্রদানের প্রথা। বিশ্বাস করা কঠিন, এইসব নিরীহ মানুষই একদা এমন এক বর্বর প্রথা মেনে চলত; কিংবা এখনো এরা অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সেই প্রাচীন প্রথাটির পুনঃপ্রবর্তনার বাসনা বহন করে চলেছে। কিন্তু বাস্তবিকই তারা তাই বহন করে চলছিল। প্রায় প্রতিটি গ্রামের কোনো এক পুরোহিতের বাড়িতে লুকোনো থাকত নরবলির কোনো বিশেষ উপকরণ বা

অবশেষ — ছুরি, শেকল, রক্ত ধরার বাটি। আর পুরোহিতরাও আমাকে জানাতে দ্বিধা করে নি যে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে, আকাশে পূর্ণ শশী উঠলে এসব ভয়ংকর হাতিয়ারগুলোর করুণ বিলাপ ও কান্না তারা শুনতে পায়; ওই অস্ত্রগুলো কাঁদছে রক্তের পিপাসায় অথচ নরবলির সেই রক্ত তারা পাচ্ছে না!

আমার সফর সময়েও তারা সযত্নে আগলে রেখেছে শ'খানেক বছরের প্রাচীন কিছু অমূল্য মনুষ্য-করোটি, অথবা মানুষের দেহের কোনো হাড়ের অংশ; সেই হাড় আবার বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সাধারণ্যে বার করা হত, কখনো আবার মন্ত্রপূত কবচে ব্যবহার করা হত। সেখানকার এক নামী শিকারির হেপাজতে ছিল কোনো বলিপ্রদত্ত মানুষের আঙুলের এক টুকরো হাড়; সেই শিকারি লোকটি আমাকে সগর্বে বলেছিল যে তার শিকার- সৌভাগ্যের নেপথ্যে রয়েছে ওই পবিত্র হাড়-ধারণ।

নরবলি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হবার পর থেকে বহুদিন ধরে মানুষের পরিবর্তে মহিষ বলি প্রদান শুরু হয়। কিন্তু মহিষবলির সময়েও মানুষের একটা করোটি বা মুখোশ এনে প্রতিমার সামনে রাখা হয়। সেখানে আমার অবস্থানকালেই একবার শুভবোধের তাড়নে মহিষবলি রোধের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; অবশ্যই নিরামিষবাদের দিকে ঝুঁকেই। কিন্তু সেই উদ্যোগের পিছনে তেমন বুদ্ধিমান মাথা সক্রিয় ছিল না।

'আজেবাজে লতাপাতা' নিয়ে চার্লস ল্যাম্ব তো কত বাগবিন্যাসই না করতেন! অথচ কোণ্ডরা সেই জাতীয় লতাপাতার প্রতি ছিল দারুণ আকৃষ্ট। ছেলেরা বিষমাকৃতি বা ত্রিভুজাকৃতি নকশায় তামাকের সব টিউব বানাত। তামাকের উৎস বিষয়ক তাদের কিংবদন্তিটা তো গোটা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বহুল প্রচলিত; এমনকি নেফাতে গিয়েও আমি তা শুনেছি। কিংবদন্তিটি এরকম : এক সময়ে এক অতি কুরূপা মেয়ে ছিল, কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। বর পাবার জন্যে মেয়েটি নানা প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যায়; কিন্তু কেউই তাকে স্ত্রীরূপে চায় না। চূড়ান্তে বেপরোয়া হয়ে মেয়েটি সোজা চলে গেল জগৎ-স্রষ্টার কাছে; সেখানে পৌঁছে সে প্রার্থনা জানাল : আমাকে মরতে দিন, প্রভু! মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে আমি যেন এমন কিছু হই যাকে সব পুরুষই ভালবাসে। স্রষ্টা প্রভু তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন; এবং মেয়েটির মৃত্যুর পর তার বিগলিত দেহের কবরস্থ উপরকার মাটিতে একটি তামাক চারা জন্মিয়ে দিলেন। তারপর যে-মেয়েটিকে একদা কেউই পছন্দ করত না, তো এখন দুনিয়ার সকলেরই চাই তাকে।

কুট্টিয়া কোণ্ডদের বাস্তবত কিছুই ছিল না, আবার বলতে গেলে সবই ছিল। তাদের নিয়ে একটা কবিতা বহুদিন আগে আমি লিখেছিলাম। তাদের সম্বন্ধে আজ আমি যতটা বলতে পারব তার থেকে অনেক বেশি কথা বলা হয়েছে ওই কবিতায়।।

কবিতাটি পুরোপুরি তুলে ধরছি :

প্রকৃত সম্পদ

দুনিয়া গণ্য করে এমন কোনো ধনরত্ন নেই তাদের!
কয়েকটা ক্ষুধার্ত গোরু; সামান্য এক কৌটো শস্যদানা;
কিছু ছেঁড়া মলিন বস্ত্র; পুঁতির একটা মালা;
একটা মাদুর, ছেঁড়াফাটা বিছানা, এক কলসি বীজ;

এক ঝুড়ি শেকড়-কাণ্ড, কয়েক টুকরো মাংস,
তীর আর ধনুক, কাঠের একটা জলচৌকি—
নিচু নিচু কুঁড়ের এই তো আছে গৌরবের সম্পদ।
এ-মতোই দারিদ্রের হিসাব-নিকাশ।

তাদের কি কোনোই ধন-সম্পদ নেই? খুঁজে দেখি তো।
দেখা যাক কিভাবে তারা বেদনাভার বহন করে;
কী ধৈর্যে তারা প্রতিবছর শস্য বপন করে চলে;
কী স্বচ্ছন্দে তারা প্রাত্যহিকতার মুখোমুখি হয়।

মনের এই ঐশ্বর্যই তাদের শক্তির উৎস।
আর তারপর— নিখুঁত পুষ্পের মতো সৌন্দর্য,
পাঁক-মাটিতে যেন পদ্ম ফুটে উঠেছে
কোরক বেলায় যেন শিশুদের দীপ্তি।

দেখো, সাজসজ্জাহীন তাদের অনুপম দেহকাঠামো,
কিশমিশ-কালো চুলের বিনুনি প্রলম্বিত বক্ষজুড়ে,
চোখে তাদের আন্দোলিত জোনাকির সুষমা,
উজ্জ্বল শুভ্র দন্তরাজি, ভালবাসা মন্থন করে যে বক্ষটি।

দেখো তাদের বিহ্বলকর কালো চেহারাগুলো,
আর আনন্দময় সাংগীতিক কণ্ঠস্বর শোনো; শোনো
তাদের ধ্বনিলহরির সুমিষ্ট কোয়েল-সংগীত—
ওই কালো পাখিটির সঙ্গে নাচছে, রঙ্গ করছে।

মানব-মৃত্তিকার প্রতিমার সৌন্দর্য যদিও ক্ষণস্থায়ী,
কঠিন দিনকে যদিও রূপান্তরিত করে; অথচ
তাদের গরিব বলি কিভাবে?— যাদের ঐশ্বর্য কেনা নয়,
ধনীর স্বর্ণকে যা শূন্যয় পরিণত করে।

দশ

বণ্ডো

কয়েক বছর আগে *জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন*-এর জন্যে মাইকেল হাক্সলে আমাকে বলেছিলেন 'আমার নিকৃষ্টতম সফর' বিষয়ের ওপর একটি লেখা লিখতে। সেই লেখাটির ছোট একটি অংশ এখানে আমি উদ্ধৃত করছি। শুরুতেই লিখেছিলাম যে আমার নিকৃষ্টতম সফর অভিজ্ঞতার কথা লেখা আমার পক্ষে কঠিন। তার কারণ, এমন কোনো সফর আমি করি নি যা পুরোটাই নিকৃষ্ট। আসামে যাবার আগেই এই পর্বের অভিজ্ঞতাসমূহের সারসংক্ষেপ আমি করতে থাকি। আমি লিখি :

> 'সামগ্রিকতার বিচারে আদিবাসী ভারতবর্ষে আমার সফরগুলো খুবই ফলপ্রদ হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তার অনেকগুলোই সুখকর ছিল না; সামনে এগিয়ে যাওয়া, পাহাড় চড়ার ধকল যথেষ্ট বেশি মাত্রায় ছিল; মাঝে মাঝেই আমার খুব জ্বর হত, আনুষাঙ্গিক আরো অনেক কিছু— আবার কোনো চিকিৎসারও বন্দোবস্ত ছিল না; খাদ্যের যোগানটাও মাঝে মাঝে জটিল আকার নিত। কিন্তু আজ পিছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, সাধারণভাবে প্রতিটি স্মৃতিই সুখের : পল্লীদেশের সৌন্দর্য, সেখানকার মানুষের আন্তরিক ব্যবহার ও বন্ধুত্ব, বিজ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণার উদ্দীপনা, সহায়কবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, খাঁটি বন্ধুদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন ইত্যাদি ঘটনা গোটা এক শতকের এক- চতুর্থাংশ সময়পর্বকে করে তুলেছিল অনন্য এক সুখময় অভিজ্ঞতা। আর ওই সময়ের বেশির ভাগটাই কেটেছে সভ্যতার কল্পিত স্বাচ্ছন্দ্য আর তথাকথিত শিক্ষাসূত্রে দীক্ষান্তরণের অহংবোধ থেকে দূরত্বে থেকে।
>
> কিন্তু এ কথাও সত্য, আমার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বাধা বিপত্তি ঘটেছে। বিলম্বের কারণে কখনো অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছি, ক্লান্তিকর আমলার আচরণে বিরক্ত হয়েছি, শুচিবায়ুগ্রস্ত পাদরি আর পুলিস দ্বারা হেনস্তা হয়েছি— নিরাশ হয়েছি, হতাশা এসেছে, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি; যেমন প্রতিটি সফরকারি হয়ে থাকে। আবার সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য, কোনো সফর বা অভিযানই ষোল আনা ব্যর্থ হয় নি, কিছু না কিছু প্রাপ্তি বা পুরস্কার জুটেছেই।'

যে কোনো স্থানে প্রথম সফরটাই অসুবিধার : আপনি সেই দেশটা চেনেন না, তাদের ভাষা জানেন না; দোভাষী নিয়োগও ঝামেলার; আর সেই দোভাষী যদি প্রশিক্ষিত না হয়ে থাকেন তবে কাজের থেকে অকাজটাই তারা বেশি করেন; একে আপনি নিজে অপরিচিত, তার ওপর সেখানকার মানুষ জানেও না, কী কাজে আপনি সেখানে গেছেন; ফলে জীবনের যাবতীয় ছোটখাটো বিরক্তিগুলো তখন খুব বড়

আকার নিয়ে দেখা দেয়। সেরকম প্রথম সফরগুলোর মধ্যে, আমার মনে হয়, সবচেয়ে কঠিন ও ক্লেশকরটা ছিল যেবার ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ওড়িশার বণ্ডো অঞ্চলে যাই।

বণ্ডোরা একটি ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী; আজকাল প্রায়শই তাদের অভিহিত করা হয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক হিসেবে। ১৯৪১ সালের সেন্সাসে বণ্ডো জনসংখ্যা ছিল মাত্র দু'হাজার পাঁচশ পঁয়ষট্টি জন। তাদের সুউচ্চ গ্রামদেশটা ছিল প্রান্তবর্তী ও সৌন্দর্যময়— মাচকুণ্ড নদীর উত্তর-পশ্চিম দিকে। সাধারণ্যে তারা কুখ্যাত ছিল হিংস্র ও অতিথিবিদ্বেষী বলে; আর এই কুখ্যাতির কারণেই সভ্যতার অগ্রগমন সত্ত্বেও তারা নিজেদের গোষ্ঠীবৈশিষ্ট্যকে তুলনামূলকভাবে অপ্রভাবিত ও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। বস্তুত সমতলবাসী মানুষ ও আমলারা বণ্ডোদের পুরোপুরি বর্বর জনজাতি বলে গণ্য করে থাকত। তারা যেন একেবারে আদিম বন্য মানুষ : বিচিত্র তাদের পোশাক আর মেয়েরা সব মুণ্ডিত মস্তক ও অত্যল্প স্কার্ট পরিহিত; পুরুষদের মেজাজ চড়া— তারা খুবই আবেগপ্রবণ ও হিংস্র; ভাষার দুর্বোধ্যতা ও বাসস্থানের দুর্গমতার কারণে প্রতিবাসী অনুগ্র আদিবাসী গোষ্ঠীদের থেকেও তারা বহুদিন ধরেই বিচ্ছিন্ন। ইদানীং তাদের কী অবস্থা আমি বলতে পারব না, কিন্তু ১৯৪৭ সালেও আমি যখন শেষবার তাদের ওখানে যাই তখন অবধি তাদের মধ্যে মাত্র একটাই পরিবর্তন আমি লক্ষ করেছি : আমার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সব সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটে আমার প্রতি তখন উপচে পড়ছে সখ্যতা।

১৯৪৩ সালের শেষ দিকটা সফরের পক্ষে নিতান্ত খারাপ সময়ই ছিল। যাবতীয় মানচিত্র তখন খুব সুষ্ঠুভাবে সামরিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত; ফলে কোথায় কী আছে তার ন্যূনতম ধারণা করারও সুযোগ ছিল না আমার। একইভাবে খাদ্য সামগ্রীও তখন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। আর পর্যটনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহের জন্যে তাপ-উত্তাপহীন অফিসগুলোয় অপেক্ষা-প্রতীক্ষার সীমাহীন ধৈর্যের পরীক্ষা তো দিতেই হত। রেশন বিলি হচ্ছিল সপ্তাহন্তের; আমার খাদ্য দরকার কয়েক মাসের। কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই তা অনুমোদনের; তাই আমার সফরের প্রস্তাবটা কটকের অফিসে পাঠানো হল জানতে চেয়ে আমার সফরের উদ্দেশ্য কী?

অনেক কিছুই আবার একেবারেই জুটত না। কৌটোর খাবার নিয়ে আমার তেমন ভাবনা ছিল না, বস্তুত সেটা আমার একদম ভালই লাগত না। কিন্তু যে-দেশে দুধ একটা নিষিদ্ধ খাদ্য সেখানে কণ্ডেন্‌স্‌ড মিল্কটা তো নিশ্চয়ই এক আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী। তাছাড়া পেট্রল তো ছিলই না।

গাড়ি চালাবার মতো পেট্রল না থাকলে বণ্ডোদের এলাকায় পৌঁছতে হলে কলকাতা থেকে ভিজিয়ানাগ্রাম ট্রেনে যেতে হত; সেখান থেকে দিশি বাসে চেপে প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভা দেখতে দেখতে নব্বই মাইল অতিক্রম করে কোরাপুট পৌঁছতে

হত। রাস্তাটা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে দুরারোহভাবে ধাওয়া করে গেছে। এই বাস-যাত্রায় বেশির ভাগ যাত্রীই অসুস্থ হয়ে পড়ত। তখন কোরাপুটের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমার অক্সফোর্ড-জীবনের একই ব্যাচের এক ব্যক্তি; কিন্তু মহাশয় প্রয়োজন মনে করেন নি আমার দিকে একটু তাকানোর; ফলে আমার আশ্রয় জুটল জানলা-কপাটভাঙা একটা ডাকবাংলোয়। সেখানে পোকা-মাকড়-ইঁদুরের মধ্যে বসে অক্সফোর্ডের স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠল; আজকের এই আমলাটির কথাও মনে পড়ল, সে ইতিহাসে তৃতীয় শ্রেণী পেয়েছিল।

সে-সময়ে ভারতবর্ষে কেউ যদি বড় আমলা বা ধনী ব্যক্তি না হতেন, কিংবা হাতে যদি না থাকত বড়ো সড়ো কারো অনুজ্ঞাসূচক পরিচয়পত্র তাহলে কেউই তাকে পাত্তা দিতেন না, তার দিকে ফিরে তাকাতেন না। সেটা প্রকট হয় আরো চোদ্দ মাইল ভিতরে যাবার পর, জয়পুর অভিমুখে গিয়ে। সেই জয়পুরে ছিল মহারাজার এক বিসাসবহুল গেস্ট হাউস। যাক গে, সেই জয়পুরে প্রত্যেকেই যেন উঠে-পড়ে লেগে গেল আমার কার্যক্রমকে দুঃসাধ্য করে তুলতে— ভেস্তে দিতে। তবে আজ বলতে ভাল লাগছে, স্থানীয় লোকজন প্রথমবার যেমন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল পরবর্তীকালে তেমনি আবার অশেষ সহায়তাও করেছিল।

প্রথমে আমাদের পৌঁছনোর কথা চল্লিশ মাইল দূরবর্তী গোবিন্দপল্লে নামক একটা জায়গায়। সেখানে বাস ছিল বটে কিন্তু ওই সপ্তাহটায় বাস বন্ধ ছিল— বাস-মালিকের ভাগ্নের বিয়ে! কি আর করা; কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর মালপত্র ও যন্ত্র-উপকরণাদি একটা গোরুর গাড়িতে চাপালাম। গোরুর গাড়িতে চড়াটা আমি বেশ উপভোগ করতাম। তবে গোরুর গাড়িতে চড়ার একটাই মস্ত অসুবিধে; সর্বদাই পাঁচটা মানুষের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় : আমি কে, আমি কী করছি, বণ্ডোদের কাছে যাবার আমার কী উদ্দেশ্য— পথ-চলতি সকলেই সেই বৃত্তান্ত জানতে চায়। সে যাই হোক, আমি নিরাপদে গিয়েই প্রথম বণ্ডো গ্রামে পৌঁছলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখি, সুউচ্চ পাহাড়বাসী কোনো মানুষই আমার কাছে ঘেঁষছে না। অপরের মাল বহন করার রেওয়াজ বণ্ডোদের নেই— তাদের দোষ কি। ডজন খানেক কুলি সংগ্রহ করতে প্রচুর সময় লেগে গেল, অনেক অনুরোধ-উপরোধ করতে হল; শেষ অবধি তা জুটেওছিল। তারপর একদিন এক অনবদ্য প্রভাতে একটা খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা গিয়ে উঠলাম বিচিত্রভাবে অবস্থিত এক গ্রামে; মনে হল যেন পৃথিবীর শেষ গিরিশৃঙ্গে উঠে এসেছি আমরা।

সেই গ্রামটা চমৎকার, রোমান্টিক ধরনের, কিন্তু গ্রামবাসীরা একেবারেই অতিথিবৎসল নয়। আবার স্পষ্ট কোনো বিরোধিতার ভাব বা বিদ্বেষও নেই। ডালপালা-পাতা জড়ো করে আমরা যখন একটা কুঁড়ের ছাউনি বানাতে লেগে পড়েছি তখন দেখি কাতারে কাতারে মানুষ— পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা এসে আমাদের

চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে; সকলেই অমায়িক দৃষ্টিতে দেখছে আমাদের কর্মকাণ্ড কিন্তু কেউই আমাদের সাহায্যে কড়ে আঙুলটিও লাগাল না। কাঠ ও জলের জন্যে পাঁচ গুণ দাম দিতে চেয়ে অনুরোধ জানালাম, জবাবে ওরা শুধু মুচকি হাসল— কাজের কাজ কিছু হল না। তারপর প্রধান এল, সেও তার সাধ্যমতো সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু বণ্ডো-প্রধানের কর্তৃত্ব খুবই সামান্য। তারপর দেখা গেল ওদের মধ্যেই চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছে, শেষমেশ কয়েকটি ছেলে এগিয়ে এসে রান্নার মতো জল এনে দিল।

বস্তুত কাউকে বাধিত করার ক্ষেত্রে বণ্ডোদের মধ্যে ছিল আশ্চর্যরকম অনীহা। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ঘিরে বসে থাকতে, হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজব করতে তাদের কোনো আপত্তি নেই, সংকোচ নেই; কিন্তু যেই মুহূর্তে তাদের কিছু করতে বলা হল তখনই আর তারা নেই। খোঁজখবর দিতে সব সময়েই তারা প্রস্তুত, কিন্তু অন্য কিছু দেবার ক্ষেত্রে তাদের ঘোরতর অনীহা-আপত্তি। অর্থোপার্জনের ইচ্ছেও আপাতদৃষ্টে তাদের মধ্যে ছিল না। একটা গ্রামের কয়েকটি ছেলেকে অনুরোধ করলাম, কয়েকটা মাছ ধরে দিতে; তিন শ্রমদিনের সমপরিমাণ পয়সা দিতেও চাইলাম; তারা রাজি হয় নি। তাদের কোনো সামগ্রীই তারা বেচতে চাইত না। এরকম এক গ্রামে বাস করা সত্যিই এক প্রকৃত সমস্যা। এটা কোনো বিরক্তিকর ব্যাপার নয়; কেন তাদের কিছু করতেই হবে? আবার আমাদের সমস্যাটাও একেবারে বাস্তব সমস্যা।

সেই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সাহায্য জুটল একেবারে অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে। ঘটনাক্রমে বা সৌভাগ্যক্রমে বহু খুনী-মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তারা অধিকাংশই তখন জেল খাটছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বণ্ডো অঞ্চলেই খুনখারাবির শতকরা হার সর্বাধিক; তাই এই অঞ্চলের খুনের ঘটনায় সাধারণত স্বল্প মেয়াদের শাস্তি হয়ে থাকে— পাঁচ-সাত বছরের কারাদণ্ড। সেদিন সেখানে যে সাহায্যকারী অমায়িক মানুষটির সন্ধান পেয়েছিলাম সেও ছিল তেমন এক সাজাখাটা খুনী মানুষ। তবে মনের মধ্যে একটা আশঙ্কাও দেখা দিত, না জানি পুরনো অভ্যেসটা আবার আমাদের ওপর না ফলিয়ে বসে। আরো একটা সুবিধা ছিল; এই চমৎকার কিন্তু একদা হিংস্রস্বভাবের প্রাক্তন কয়েদিরা সাধারণত কিছুটা হিন্দি বা ওড়িয়া ভাষা জানত; ফলে আমরা তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারতাম, কোনো দোভাষীর প্রয়োজন পড়ত না।

আমাদের পরবর্তী গ্রামটার নাম বান্দাপাদা; খুবই নিস্তেজ গ্রাম সেটি। আমি রাস্তায় বেরোতেই মায়েরা তাদের বাচ্চাদের টেনে-হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল, মেয়েরা ভয়ে-আতঙ্কে কান্না জুড়ে দিল, দরজা-কপাট দড়াম-দড়াম বন্ধ হতে লাগল, মোরগ-শুয়োর নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে পালাল; এক যুবক তো ভয়ে তর্‌তর্‌ করে গাছে উঠে

গেল। কয়েকজন বৃদ্ধি অতি সাহসে ভর করে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এল। সব কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু আমি রাক্ষসের মতো দেখতে, এমন অভিযোগ মানতে পারি না। পরে শুনেছি ওরা ভেবেছিল আমি সব মেয়েদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে এসেছি, আমি সব শিশুদের ধর্মান্তরণের জন্যে আমেরিকায় পাঠাতে এসেছি; আর সব থেকে কৌতুকর হল, আমি বোধহয় কোনো এক আবগারি অফিসার হব— মদ্যপান নিষিদ্ধকরণের জন্যেই গ্রামে এসেছি। সে যাই হোক, কিছুক্ষণ বাদে একজন প্রাণবন্ত মানুষ এসে উপস্থিত; লোকটি খুনের অপরাধে উপর্যুপরি দুবার জেল খেটে এসেছে; শুনছিলাম সে তখন তৃতীয় খুনের ছক কষতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল; সে আর কি করা, তবে এই লোকটির সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায়ই মাথার ওপর একটা কোনোরকম ছাউনির বন্দোবস্ত হল, কিছু খাদ্য সামগ্রীও জুটল।

তারপর আমি গ্রামোফোনটা বার করলাম। সাধারণত সেটা খুব কার্যকর হয়ে থাকে। যেই না আমি কিছুটা ভীতিপ্রদ রেকর্ড 'ফান উইথ দি কনসারটিনা' চালিয়েছি দেখতে না দেখতে এক বয়স্কা মহিলা মূর্ছা গেল, আরো কিছু লোক ধুপধাপ মাটিতে বসে পড়ল ভক্তি ভরে পূজার উদ্দেশ্যে; সংকোচের সঙ্গে জানাই, এই রেকর্ডটি কিন্তু ইতিপূর্বে সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছিল। বয়স্কদের এক প্রতিনিধি দ্রুত চলে এল আমার কাছে : সংগীত বন্ধ করুন। গানের ওই কথাগুলো যদি সত্যি সত্যি মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে থাকে—আপাতভাবে তাই মনে হচ্ছে, তাহলে ওই বাক্সটার মধ্যে সাংঘাতিক কিছু লুকোনো আছে। এক্ষেত্রে তারা আর কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

বণ্ডো ও সাওরা গ্রামগুলো সফরের সময়ে কারো বাড়িতে থাকার ব্যাপারটা আমি পরিহার করেছি; এটাই ছিল আমার অভ্যাস বা রীতি। নিজেদের জন্যে আমরাই একটা ছোট কুঁড়ে বানিয়ে নিই :

> বাম—বু—বামবুর তলায়।
>
> (ছ্যা-ছ্যা-ফাঁকা— বাঁশগাছের তলায়।)

সেই কুঁড়েগুলো বানানো হয়েছিল পাতাবহুল ডালাপালা দিয়ে; মেঝেতে ছিল পুরু খড়ের আস্তরণ, আর মাথার উপরেও খাড়ের ছাউনি। কুঁড়েগুলো সত্যিই আশ্চর্যরকম আরামদায়ক ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহোপকরণের সমস্ত কিছুই ছিল তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্যবস্তু; তাই প্রতিরাতে গরু এসে মহানন্দে খেতে শুরু করে দিতে দেয়াল বা ছাউনির নিচু অংশ। এটাই ছিল এক ঝামেলা।

পরবর্তী সফরগুলোয় বণ্ডোদের সঙ্গে বহু সুন্দর মুহূর্ত কেটেছে। সেরকম এক সফরে শামরাও আর তার স্ত্রী তাদের ছোট্ট দুই ছেলে— সুরেশ ও রামুলাকে নিয়ে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। আর শেষবার যখন আমি সেখানে যাই, সঙ্গে ছিলেন

ভিক্টর স্যাসন। তিনি দারুণ উপভোগ করেছিলেন বঙ্গো পল্লীদেশের পরিবেশ। আর ভিক্টর সেখানে বহু উচ্চমানের ফোটো তুলেছিলেন; *বঙ্গো হাইল্যাণ্ডার* বইয়ে তাঁর তোলা কয়েকটা ফোটোও ব্যবহার করেছি।

আর সত্যিই বঙ্গোরা ফোটোতে ধরে রাখার মতোই; কারণ তারা দেখতে মোটামুটি সুদর্শনই— বিশেষ করে বালক ও তরুণরা। তাদের সুন্দর চালচলন, সুঠাম দেহ, নির্মল প্রসন্ন মুখভাব, মধুর স্মিত হাসি সবই মনে কেড়ে নেবার মতো। তাদের চুল-বাঁধা সবিশেষ দর্শনীয়। বয়েস বাড়লে অবশ্য তারা একটু ভেঙে পড়ে, মুখভাবে রুক্ষতা আসে, দেহে নোংড়া জমে, চুলবাঁধা হয় অন্য ধাঁচে— তেমন আর মনোহারিত্ব থাকে না তখন। একটা বয়ঃসীমা পেরিয়ে গেলে অন্যান্য আদিবাসীদের মতো বঙ্গোরাও যেভাবে হোক দিনাতিপাত করে। জেলের মধ্যে তাদের দেখায় করুণ, ভয়ানক অসহায়।

বঙ্গো রমণীদের প্রথম-দর্শনেই যে কোনো পর্যটক শিউরে উঠবেন হয়তো; ভাববেন, এমন কুরূপা কদাকার মহিলা আর জীবনে দেখি নি। কিন্তু কদিন গেলে, সেই মেয়েদের জড়তাহীন চালচলন দেখার পর নিশ্চয়ই প্রথম অভিজ্ঞতার ধাক্কাটা তাঁরা সামলে উঠবেন, পূর্বতন মতামতটাও হয়তো শুধরে নেবেন। বঙ্গো রমণীদের কেন্দ্র করে কুরূপের বিভ্রমটা ঘটে প্রধানত তাদের মুণ্ডিত মস্তকের কারণে। কিন্তু যখন কোনো তরুণীর মাথাটা ঢাকা থাকে— মাছের একটা ঝুড়ি বা বাঁকা কাস্তের মতো এক বোঝা গাছের ছালে তখন তার মুখখানা হয়ে ওঠে দুনিয়াকে দেখাবার মতো, বড় সুশ্রী দেখায়। দশ-বারো বছরের বালিকাদের দেখতে লাগে চমৎকার মিষ্টি; বিশেষ করে তারা যখন মাথার ফিতেটা সাজায় নবশ্যাম পল্লবের কারুকাজে; সাদা, বেগনি বা রক্তিম কোনো ফুল গুঁজে দেয় সেই চুলে। যুবতীদের আরো একটা বড় খামতি আছে; সেটা হল (মস্তক মুণ্ডনের কথা বাদ দিলে) সব কিছুতেই যেন তাদের বাড়তির দিকে ঝোঁক। দোহারা সুডৌল হওয়ার পরিবর্তে তাদের ঝোঁক গোলগাল, পৃথুল হওয়ার দিকে— ভারি মোটা ঠোঁট, ঝুলে-পড়া স্তনযুগল, মোটা পায়ের ডিম, 'কদলীবৃক্ষের দণ্ডের মতো মোটা' বৃহদাকার উরুদ্বয়। অথচ বয়স্কা মহিলাদের দেখতে প্রায়শই চমৎকার, তাদের দেহকাঠামোও ভাল। তাদের মধ্যে বর্ণনাতীত একটা অভিব্যক্তি আছে, যা মুহূর্তের মধ্যে তাদের অঙ্গগত যাবতীয় অসামঞ্জস্যকে ঢেকে ফেলে।

নারীজাতির সৌন্দর্য বিষয়ে বঙ্গো ছেলেদের একটা সুনির্দিষ্ট মনোভঙ্গি আছে। একদিন প্রেমসংগীতের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একদল ছেলে সেই সৌন্দর্যবোধের কিছু কাব্যিক প্রকাশ ঘটিয়ে ফেলেছিল। তাদের বাগ্‌ধারাটা সম্ভবত ছিল পরম্পরাগত, অথবা অন্তত সাংগীতিক কৃৎকৌশলমন্থন ভিত্তিক। মেয়েদের দেহকে তারা বর্ণনা

করছিল, 'সাদা মেঘের মতো সুন্দর', তাদের বাহু ও পদদ্বয় 'বাঁশের মতো সুগোল, সুঠাম,' তাদের স্তনদ্বয় যেন 'দুটি মাছের মতো ঝকমকে,' তাদের ছায়া 'মোষের মতো স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ'। সর্বোপরি, সুন্দরী একটি মেয়ে 'বিশাল এক লতানে গাছের পাতার মতো জরুরি'— সেই পাতা থেকেই তো প্রয়োজনীয় কাপ, প্লেট তৈরি হয়ে থাকে।

বণ্ডোদের যৌনতার পরম্পরা মুরিয়াদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বণ্ডোদের কাছে যৌন অভিজ্ঞতা হল বিপজ্জনক, ব্যয়সাপেক্ষ ও কঠিন এক ব্যাপার। গোণ্ড বা বাইগারা যৌনমিলনকে পরমানন্দ অভিজ্ঞতারও অতিরিক্ত কিছু বলে মনে করত, সেখানে বণ্ডোরা এটাকে সাংঘাতিক বলে ভাবত। তারও নানা কারণ আছে। পবিত্রতা রক্ষার কঠোর অনুশাসনের শর্তে বণ্ডো যুবকরা স্বগ্রামের মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাতে পারত না; অন্য গ্রামের মেয়েদের সঙ্গেও তাদের দেখা সাক্ষাৎ করতে হত জনসম্মুখে, কঠোর রীতি-প্রথা মেনে। ফলে আদিবাসী ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তরুণসমাজের মধ্যে যে বিনোদন বা আনন্দলাভের ব্যাপার ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এক্ষেত্রে সেখানে তাদের স্বাভাবিক জীবনচর্চার ওপর বাস্তবত এক কার্যকর প্রতিরোধই সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাছাড়া যৌনমিলনকে তারা মনে করত এক বিপজ্জনক ব্যাপার— যৌনমিলনের দ্বারাই ঘটে দুর্লভ অহং সত্তার সঙ্গে অজানা অপর এক জগতের পরিচয়। এটা আদিবাসী মনস্তত্ত্বের এক মৌলিক বিষয়; বহির্জগতে পা বাড়াবার ব্যাপারটাও বণ্ডোরা মেনে নিতে পারত না। কারাবাসের ক্ষেত্রে তাদের তীব্র যন্ত্রণার উৎসও সেখানে; আবার সেজন্যেই বণ্ডোরা আমাদের মালপত্র নিয়ে ভিন গাঁয়ে যেতে চাইত না। একদিন দেখি কয়েকজন মহিলা হা-হুতাশ করে কান্নাকাটি করছে। কান্নার কারণটা ছিল, তাদের বাড়ির কেউ একজন আমার মালপত্র নিয়ে চার মাইল দূরের একটা গ্রামে রওনা হয়েছে। আবার অন্যান্য আদিবাসীদের মতো বণ্ডোদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল সেই বিস্ময়কর আশ্চর্য সদন্ত্য-যোনিবর্গের কিংবদন্তি; এই কিংবদন্তিটির সঙ্গে পুরুষত্বহীনতার ভীতিটাও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। এ-জাতীয় যেসব কিংবদন্তি বা লোকবিশ্বাসের ব্যাপার আমি ভারতের বহু আদিবাসী সমাজে দেখেছি, উত্তর আমেরিকা ও আইন্সে যা সংগৃহীত হয়েছে সেগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো শুধু ডরমিটারি বা ঘোটুলের হেঁচকিতোলা বা চাপাহাসির গল্পই নয়, যৌনমিলনের বিপদ বা ঝুঁকির কারণটা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এই বণ্ডো আখ্যানগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বাছবিচারহীন বা অবাধ যৌনতার ক্ষেত্রে কার্যকর উপায় হিসেবে ভাবা হয়েছিল মেয়েদের অংশগ্রহণে বিরত রাখা। কিন্তু অন্যান্য আদিবাসী সমাজে সাধারণভাবে মনে করা— আমার ধারণায়ও, মেয়েরাই রতিক্রীড়ার চালিকা শক্তি। কিন্তু দেখা গেছে, বণ্ডো মেয়েদের ক্ষেত্রে এ-কথা খাটে না। তাদের ক্ষেত্রে প্রাক্‌বিবাহ পর্বের

যৌনমিলনের মধ্যে নিহিত থাকে গূঢ় এক উদ্দেশ্য; এই যৌনমিলন যেন অনেকটা বাগদানের মতো ব্যাপার। প্রেমিকা যে ঘরে থাকে সেই ঘরের কোনো খুঁটির গায়ে স্তন খোদই করে কোনো সাওরা যুবক সেটিকে তীরবিদ্ধ করে ফেলতে পারলেই মেয়েটি হয়ে যায় তার। কিন্তু কোনো বণ্ডো যুবক যদি এরকম প্রতীকী ব্যাপার বাস্তবে ঘটিয়ে ফেলে তাহলে তাকে পাকড়াও করা হবে; সে হয়ে যায় মেয়েটির অধীন।

এসবই পূর্ব প্রান্তের আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের বৈশিষ্ট্য; যৌনতা বিষয়ক স্বপ্নভাবিতার জন্যে এই গোষ্ঠীগুলো সবিশেষ পরিচিত। সাওরাদের দৃষ্টিভঙ্গিও একই রকমের— জুয়াঙ, গোদাবা, মারিয়ারাও একই ধাঁচের। কিন্তু গোণ্ড আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে একেবারে ভিন্নতর পরম্পরা। যৌনতার আবেশ অভিভাব যতই পরমানন্দীয় হোক না কেন গোণ্ড, পরধান, কোণ্ড বা এ-জাতীয় অন্যান্য আদিবাসীরা তাকে তুলনামূলকভাবে অপ্রধান বিষয় বলে মনে করে থাকে। যৌন মিলন যেন চলতি-জীবনেরই একটা বিনোদন, (কিছু-কিছু রীতি-প্রথা মেনে চললে) তার পরিণতিও তেমন ক্ষতিকর নয়। এ-কথার অর্থ এই নয় যে তারা প্রেমে পড়ে না; বরং খুবই গভীরভাবে, সাংঘাতিকভাবে তারা প্রেমাসক্ত হয়ে থাকে; কিন্তু একই সঙ্গে অতিরিক্ত জড়িয়ে না পড়ে যৌনসম্ভোগের মধ্যে দিয়ে আনন্দ ও সুখ পাবার একটা আলাদ পন্থাও যেন তারা খুঁজে পায়।

ক্রমশ বণ্ডোদের সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা বেড়ে গেল; অনেকেই আমার ব্যক্তিগত বন্ধুও হয়ে গেল। তারা শুধু ভালবাসবার মতোই মানুষ নয়, অস্বাভাবিক প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা উদ্দীপনাময় মানুষও। এর পিছনে রয়েছে তাদের চড়া মেজাজের ব্যাপারটা; তা এমনই যে পরবর্তী পর্যায়ে কী ঘটতে যাচ্ছে তার পূর্বাভাস মেলা ভার। বণ্ডোরা নিজেরাও তাদের এই চারিত্রিক খামতিটার কথা জানে; আর জানে বলেই আপসমূলক মীমাংসার এক বিচিত্র ও বিস্ময়কর পন্থা তারা আবিষ্কার করে নিয়েছিল। তার জন্যেই দরকার ছিল মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার একটা শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের। হিংস্রতা ও সহনশীলতা— এই দুয়ের সামঞ্জস্যে এক পাঠক্রম শুরু হত বালকবয়েস থেকেই। ধামসার উত্তেজনাকর বাজনার তালে তালে বালকরা হাতে তুলে নিত লম্বা নমনীয় গাছের ডাল; দুটি বালক একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়াত, তারপরই শুরু হয়ে যেত সজোরে একে অন্যকে পেটানো। এক্ষেত্রে কোনো ভান বা ফাঁকিবাজির ব্যাপার ছিল না। দেখতে না দেখতে বালকদের পিঠ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেত, অথচ দুটি বালকই সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে ঠোঁট কামড়ে সব যন্ত্রণা সহ্য করে যেত। এক-জোড়ার যখন ঢের মার খাওয়া হয়ে গেছে তখন তারা একে অপরকে পারস্পরিক সম্ভ্রমে অভিবাদন জানাত, আলিঙ্গন করত। তারপর সরে গিয়ে অন্য বালকদের দ্বৈরথের জায়গা করে দিত। একে-একে সমগ্র বালকদের মধ্যে এই বিস্ময়কর অনুশীলনটা শেষ হলে পুরোহিত 'বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে' বালকদের মধ্যে বিশেষ

এক ধরনের পিঠে পরিবেশন করতেন; ছোটখাটো উপদেশমূলক ভাষণও দিতেন তিনি: 'ক্রোধবশত কাউকে মারবে না। অপরকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখবে। কখনো অন্য কারো মনে ক্রোধ সঞ্চার করো না।'

এ-পর্যন্ত তো ঠিকই আছে। কিন্তু দুর্ভাবনা দেখা দিত তখনই যখন কোনো ত্রিভুজ প্রেমে এক প্রেমিকার ঈর্ষান্বিত দুই যুবক দ্বৈরথে নামে কিংবা কয়েক বছর জেল খেটে কঠোর নির্দয় হয়ে ওঠা মানুষরা পরস্পর মারামারি পেটাপেটি শুরু করে দেয়—সত্যি, তখন চরম উদ্বেগজনক এক অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। তবু আমার মনে হয়েছে, ওই অস্বাভাবিক ভাল শিক্ষাপ্রণালী কিছুটা পরিমাণ সাফল্য পেয়েছিল তার উদ্দেশ্য পূরণে— বণ্ডোদের মেজাজ আচমকা যন্ত্রণার আবেগে চড়ে যাওয়া কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে; আর তা মজুত রাখে বৃহত্তর আবেগের মজুত চালিকাশক্তি হিসেবে।

তা সত্ত্বেও বণ্ডোদের মধ্যে নানা ধরনের ঝগড়া-বিবাদ লেগেইছিল; তার কিছু স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা আমার আছে। একদিন এক গাদাবা আদিবাসীকে এক বণ্ডো সাংঘাতিক আক্রমণ করে বসে; আমি তখন সেখানে। ঘটনাটা হল, অনুমান করা হয়েছে যে গাদাবাটি বণ্ডো লোকটির কাপড় খুলে দিয়ে গোপনাঙ্গ উন্মুক্ত করে ফেলেছে। তখন দুজনার মুখের হাবভাবের পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতো; বণ্ডোটির উগ্রমূর্তি, সে তিনটে ভাষায় (তার মধ্যে দু-চারটে ইংরেজি শব্দও ছিল) অবিশ্রান্ত গালিগালাজ করে চলেছে, আর বিপরীতে নম্র গাদাবাটি যেন ঝড়ের মুখে অবনত মস্তকে করজোড়ে দণ্ডায়মান; আশ্চর্য বৈপরীত্য! আর একদিন দেখি একদল বণ্ডো ছেলে এক গাদাবাদের গ্রামে হানা দিয়ে তাদের সাগু গাছের সুখাদ্য সব রস খেয়ে নিয়েছে। রাগে-ক্ষোভে গাদাবারা বকবক করছে আর দেখছে তাদের মহার্ঘ সুরা বণ্ডোদের গাল বেয়ে গড়াচ্ছে অথচ তারা কেউই কোনো কথা বলতে পারল না, প্রতিবাদ জানাতে পারল না। পেটপুরে সুরা পানান্তে বণ্ডো ছেলেরা গ্রামের পথ ধরে হেঁটে ফেরে বুক উঁচিয়ে, মনোহর ভঙ্গিতে। ক্রোধ সত্ত্বেও গাদাবা মেয়েরা বাড়ির বাইরে এসে তাদের ওই মনোহর চলনভঙ্গি দেখে মনে মনে পুলক বোধ করে। তারপর বণ্ডো ছেলেরা গ্রামবাসীদের স্বস্থানে রেখে দেবার জন্যে ছোট একটা অশ্লীল নৃত্যও করল; শেষমেশ তারা গাদাবা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে গ্রামটা একটা অসাড় মানুষের মতো পড়ে রইল—মারাত্মক না হলেও একটা শোকের তীব্র শিহরন যেন বয়ে গেছে তার মধ্যে দিয়ে।

বণ্ডোদের ঝগড়া-বিরোধ দেখাটা এক বিরল অভিজ্ঞতা। প্রথমে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে ইঙ্গিত, বোনের ছেনালি গুণপনার সদৃষ্টান্ত উল্লেখ; তারপরই বণ্ডোটি ফুটতে থাকে : ফুটন্ত জল কখনো উপচে পড়ছে, কখনো-বা নিচে নামছে। সে রাগে গোঁফ পাকায়, বিরোধী পক্ষের দিকে থুথু ছিটোয়। আচমকা কয়েক

গাছা চুল ছিঁড়ে নিয়ে বিরোধীর দিকে ছুড়ে দেয়। উগ্র মেজাজে বিড়বিড় করতে থাকে; তারপরই সে ছুরিটা বার করে নেয় কিংবা তীর-ধনুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিন্তু এই মারামারিই বণ্ডোজীবনের শেষ কথা নয়। তাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়েছে সাহস, স্বাধীনতা, সাম্য, স্বনির্ভরতা ও শ্রমপরায়ণতা। কিন্তু এই গুণসমূহের ত্রুটিগুলোও সমপরিমাণে প্রকট : সাহস হয়ে গেছে মানবজীবন বিষয়ে উদাসীন, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা অবক্ষয়িত হয়ে দাঁড়িয়েছে অভব্য কলহপরায়ণতা; আর অতিরিক্ত সাম্যবোধের ধারণাটাও হয়ে উঠতে পারে মন্দ নাগরিকত্বের ব্যাপার। বণ্ডোরা অতিরিক্ত মদ খেত, আর প্রায়ই আলস্যে দিন কাটিয়ে মেয়েদের কঠিন শ্রমে বাধ্য করত; বণ্ডোরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও নয়। কোনো অনুষ্ঠান সুচারুভাবে করতে, বা পুনর্বার করতে, কিংবা হুটপাট করে করতে গিয়ে বণ্ডোরা প্রচুর সময় নষ্ট করে ফেলত। কিন্তু এসব খামতির কথা বাদ দিলে তাদের সপক্ষেও বলার মতো অনেক কিছু রয়েছে। যদি বণ্ডোদের কেউ বন্য বলতে চান, তাকে বলতে হবে মহান বন্য মানুষ। যদি সে গরিব হয়ে থাকে তবে সে কিন্তু তার দারিদ্রের বিষয়েও সহনশীল ও সাহসী। যদি সে সভ্যতার মূলধারার বাইরে থেকে থাকে— হয়তো সে সেই ধারার পশ্চাতেই আছে, তবু সে কিন্তু ওই তথাকথিত সভ্যতার বহু হীন কলঙ্কের কালিমা থেকে অন্তত মুক্ত রয়েছে।

উত্তর থাইল্যান্ডের চিয়েংমাইয়ের যে-হোটেলটায় গিয়ে আমি উঠেছিলাম সেখানে একটা নোটিশ টাঙানো ছিল : তরুণী মহিলা এবং 'অমিতচারী ব্যক্তিদের' রাত্রে কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অথচ অমিতচারী মানুষ বলেই বণ্ডোরা আমাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল; তাছাড়াও তো ব্লেক একদা বলেছিলেন যে 'অমিতাচারের রাস্তাটা জ্ঞানের প্রাসাদের দিকেই চলে যায়'।

এগারো

সাওরা

সাওরাদের ওপর আমার সমীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চলেছে সাত বছর ধরে। বিশাল এই আদিবাসী গোষ্ঠীটির একটি অংশের ওপরই আমি মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলাম; সেটা হল গঞ্জাম ও কোরাপুটের পাহাড়ি সাওরা— বিশেষত গুনপুরের উপরস্থ পাহাড়ি গ্রামবাসী সাওরাদের ওপর। ওই গ্রামগুলোয় তখন অবধি কোনো মিশনারি প্রবেশ করে নি— বহির্জগতের কোনো প্রভাবও পড়ে নি। ফলে সেখানেই সম্ভব ছিল প্রাচীন জীবনচর্চাকে— শত-শত বছর ধরে চলে আসা ওই সাওরাদের জীবনযাপনকে অনুপুঙ্খ দেখা।

আর এ-কারণেই পাটানগড় থেকে মাঝে মাঝে আমি ওখানে চলে যেতাম, কিছুদিন ওখানে থাকতাম। কোনো একটা গ্রামে গিয়ে টানা দু-তিন সপ্তাহের জন্যে

ক্যাম্প তৈরি করে নিতাম; সঙ্গে থকাত বই, খাতাপত্র; যেন বাড়িতেই আছি এভাবেই সেখানে গিয়ে স্থিত থাকতাম। সত্যি কথা বলতে কি, সাওরাদের ওপর লেখা আমার বইটির বেশ খানিকটা অংশ এখানে বসেই লিখেছি। পরবর্তী সময়ে সংশোধন করেছি, মিলিয়ে দেখেছি। সেখানে আমার প্রতি লোকজন খুব সদয় ছিল— আমার জন্যে তারা তৈরি করে দিত ডালপালা আর পাতা দিয়ে দু-কামরার কুঁড়ে, তার সঙ্গে আবার বেশ চমৎকার একটা বারান্দাও থাকত। দেশী সিগার, ওখানে যার নাম 'পিকা', একটা উপহার দিলেই চটপট লোকজনের মন জয় করে নেওয়া যেত। এসবের ফলে তাদের মনে আমার প্রতি একটা সহৃদয় আপনত্ব বোধ ছিল; মনে হয়, সেটা হয়তো আজো আছে। চা তারা খুব ভালবাসত, দু-এক কাপ চা খেতে যখন-তখন তারা এসে হাজির হয়ে যেত। প্রভাতী চায়ের সময়ে প্রায়ই আমার বিছানার চারপাশে ছ-সাতজন ভিড় করত।

তখন অবধি কিন্তু বাস্তবত সাওরারা পর্যটকদের আগমন পছন্দ করত না। বাইরের কোনো মানুষ গ্রামে ঢুকলেই সম্ভাব্য জাদু-দূষণ থেকে মুক্তি পেতে তারা বিশেষ বলিদানের ব্যবস্থা করত। একটা জায়গায় আমি দেখেছি ট্যাক্সের মতো বলির ব্যবস্থা; বনবিভাগের অফিসারের জন্যে ছাগল বলি, পুলিস সাব-ইন্সপেক্টরের জন্যে মোরগ বলি, নৃতাত্ত্বিকের জন্যে বড় একটা শুয়োর বলি।

সাহিবসুম নামে তাদের এক উপাস্য দেবতা ছিল; রাজকর্মচারীদের সফর থেকে বিরত রাখতে তাকে প্রসন্ন রাখা ছিল একান্ত আবশ্যিক কর্ম। সাহেব বলতে নিঃসন্দেহে বোঝাত ট্রাউজার আর টুপি পরা কোনো মানুষ। ফলে সেরকম প্রতিরূপ তৈরি করে তারা গ্রামের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখত। সেখানে 'মেমসাহেব' অপদেবীও বাদ যেত না; সাধারণত সেই দেবীর প্রতিরূপটি আকারে বড় হত, দশাসই আকৃতির হত—আর অনিবার্যভাবে তার মস্তকে একটা শোলার টুপি চাপানো থাকতই।

এক্ষেত্রে ব্যক্তিক কোনো সম্পর্কের ব্যাপার ছিল না; ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও হয়তো শান্তিকল্যাণের জন্যে বলিদান করছে, প্রতিরূপ গড়ছে। সোজা ব্যাপারটা হল, আপনি যদি বাইরের জগৎ থেকে এসে থাকেন তবে আপনি বহন করে নিয়ে আসতে পারেন কোনো আত্মিক সংক্রমণ— হয়তো সেটা অদৃশ্যভাবেই রয়ে গেছে আপনার মধ্যে— হয়তো কোনো অপশক্তি আপনাকেই বাহক করে নিয়েছে তাদের সুন্দর গ্রামগুলোয় ঢুকে পড়তে।

এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যেভাবেই হোক পাহাড়ি-সাওরাদের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সফরের সুযোগ করে নিয়েছিলাম। তার কোনো কোনো গ্রামে গিয়ে মনে হয়েছে, আমিই বুঝি এই গ্রামের আবিষ্কারক। পাহাড়ের দূর দূর প্রান্তের সেই গ্রামগুলোতে কোনো বহির্জগতের মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছে বলে স্মরণকালের স্মৃতিতে নেই; সেখানে মাসের পর মাস কাটিয়েছি কিন্তু কোনো সরকারি কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাইনি :

সাহিবসুম সত্যিই কার্যকর। প্রচণ্ড শীতে বা তীব্র গরমেও সেখানে ছিলাম; বলতে গেলে প্রবল বর্ষণের ঋতুকালটা বাদ দিয়ে সব সময়ই থেকেছি।

সেই সাওরা গ্রামদেশটির সৌন্দর্য অনবদ্য। যৌবনে প্রকৃতির প্রতি আমার একটা অনুরাগ ছিল— তরুণ ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতোই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়জ আবেগের মতোই আমাকে তাড়িত করত। সেই 'এক ক্ষুধা; এক অনুভব, এক ভালবাসা'— 'দৃষ্টি-জাত সেই নিখাদ' বস্তুটির জন্যে কোনো সুদই গুনতে হয় না।

কিন্তু আমার ধারণা, আদিবাসী ভারতবর্ষে পা রাখার প্রথমদিন থেকেই আমি এক ধাপ এগিয়ে চলে গিয়েছি ওয়ার্ডসওয়ার্থের পরবর্তী পর্যায়ে— প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে 'মানবতার নিথর করুণ সংগীত' পুনঃপুনঃ শুনবার পর্যায়ে। আমার বাস্তারের বছরগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথাটা সবিশেষ প্রযোজ্য।

পরবর্তীকালে নেফার উত্তর পর্বতমালায়, তাদের রহস্যময়তা ও মহত্ত্ব আমার মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল বিশ্বজনীন চেতনায়— 'উন্নত চিন্তনের আনন্দে'— এই শব্দবন্ধও ওয়ার্ডসওয়ার্থের।

কিন্তু সাওরা পাহাড়গুলোতে প্রকৃতির আবেদন ছিল অনেকটাই ইন্দ্রিয়গত। নিঃসন্দেহে প্রকৃতির সব কিছুর বিন্যাসই মানুষের জন্যে, কিন্তু তার অভিঘাত সম্পূর্ণত শারীরগত। তার জন্যে আমি কষ্ট বোধ করতাম; আর যখনই সেই অনন্য পরিবেশ ছেড়ে আসতে হত তখন মন খারাপ হয়ে যেত।

পাহাড়ি-সাওরাদের বেশ বড় ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; তারা স্মৃতিস্তম্ভ গড়ত এবং মৃতদের উদ্দেশে মোষ বলি দিত; তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো পুরুষ বা নারী পিশাচপূজারীরাই সম্পন্ন করত। তারা সারিবদ্ধ ও বদলি চাষ প্রথায় নিযুক্ত ছিল। তাদের পুরুষেরা পরত লম্বা রঙিন কটিবস্ত্র, আর তাদের মেয়েরা পরত হাতে বোনা বাদামি পাড়ের স্কার্ট; এছাড়া আর কোনো পোশাক চাপাত না। সাওরা মেয়েরা তাদের কানের লতিটাকে খুব বড় করে নিত, তাদের কপালের মাঝখানের একটু নিচের দিকে থাকত একটা বিশেষ ধরনের উল্কি চিহ্ন। সাওরারা তাদের ভাষাটাকে জিইয়ে রেখেছিল। তাদের খুব কম লোকই অন্য ভাষায় কথা বলত।

সাওরাদের ঘরবাড়ি যথেষ্ট মজবুতভাবে তৈরি, আর বাড়িঘরগুলো ছিল বড় বড় বাস্তার ধারে। কয়েকজন সাওরা গোষ্ঠীপ্রধান তো বেশ ধনবানই ছিল। সাওরারা খুবই পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান; ফলে যদি জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণের শিকার না হতে হত তাহলে তারা সম্ভবত প্রত্যেকেই সচ্ছল জীবন কাটাতে পারত।

সাওরাদের ধানভানার চাতালে দাঁড়ালে দেখা যেত এক মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য : পাওনা পরিশোধের নামে মহাজন ও পরজীবীরা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ শস্য। ভাবতে কষ্ট হত, ওই শস্য উৎপাদন করতে বেচারি সাওরা চাষীটিকে কি

পরিমাণ ঘাম ঝরাতে হয়েছিল।

সাওরাদের সব থেকে বড় কৃতিত্ব সারিবিন্যাসের ক্ষেত্রে। হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ঢালে তারা কৃষিক্ষেত্রের সারি তৈরি করে। সারিবিন্যাসে একটা সারির উপরে আর একটা সারি, একেবারে নিখুঁত। এতই মনোযোগ দিয়ে সারি বিন্যাস ঘটায় যে এক ফোঁটা জলেরও অপচয় ঘটে না, আর ভূমিক্ষয়ের সর্বপ্রকার প্রতিরোধও থাকে। কখনো কখনো দেখা যায়, ফুট পনের উঁচু একটা পাথরের পাঁচিল আগলে রেখেছে শৈলশিরাস্থ মাত্র ফুট তিনেক প্রস্থ কোনো কৃষিক্ষেত্রকে। এই সারিবিন্যাসকে উচ্চতর প্রকৌশল হিসেবে নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত করা যায়।

আমার অন্বেষণের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল সাওরা-ধর্ম; তার কারণ, যত আদিবাসী মানুষ আমি দেখেছি তার মধ্যে সাওরারাই নিঃসন্দেহে সর্বাধিক ধর্মপ্রাণ। সুখের কথা, আমার অন্বেষণে তারা আপত্তি করে নি, বাধাও দেয় নি; বরং এর জন্যে তারা বেশ গর্বই বোধ করেছিল। অন্যান্য আদিবাসীরা বাইরের কোনো লোক এসে পড়লে তাদের অনুষ্ঠান সাধারণত স্থগিত রাখত; কিন্তু সাওরারা চাইত, আমি যেন তাদের অনুষ্ঠানে হাজির থাকি। তারা আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মেঝেত বসাত, একেবারে পূজারীর কাছেই, আর তারপর যতক্ষণ ধরে তাদের অনুষ্ঠানের আচার চলত সারাক্ষণ আমাকে প্রতিটি বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝাত।

বাস্তবিকই একটা প্রবাদের সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম : সাওরাদের দেশে কোনো নৃতাত্ত্বিকের ছুটির দিন বলতে কিছু নেই। প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটত। হয়তো আপনি দুপুরের দিকে গা এলিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন আর ঠিক তখনই হয়তো আপনার কানে ভেসে এল নিকটস্থ উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত কোনো গুলির গর্জন; আপনি জানলেন যে কোনো মৃতের সৎকারের আয়োজন চলছে, আপনাকে সেই সৎকার অনুষ্ঠানে হাজির থাকতেই হবে। আবার কোনোদিন হয়তো কাকডাকা ভোরে কেউ এসে খবর দিল, মাইল পাঁচেক দূরের এক গ্রামে দারুণ এক উৎসব হচ্ছে, আধ ঘন্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে হবে আপনাকে।

আমি আবার সাওরাদের এলাকায় থাকাকালীন কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছি; কারণ ম্যালেরিয়ার কঠোর শাস্তিটা সেখানে ছিল বিপজ্জনক মাত্রায়; তাছাড়া কয়েকবার অসহ্য রকমের দাঁত ব্যথায়ও ভুগতে হয়েছিল আমাকে। অবশ্য এসবের সমাধানও ঘটে গিয়েছিল চমৎকারভাবে। আমার ক্ষুদ্র কুঁড়েতে এসে তখন ভিড় জমাত পূজারীরা, এমনকি পূজারিণীরা পর্যন্ত; তারা এসে আমার বিছানার পাশে বসত, এবং তাদের পদ্ধতি অনুসারে আমার ব্যাধি নিরাময়ের চেষ্টা চালিয়ে যেত। বলতে দ্বিধা নেই, নিরাময় বা প্রশমন ঘটেওছে; তাদের পদ্ধতি ছিল যেমন কোমল স্বভাবের তেমনি তাদের মধ্যে আমার জন্যে উদ্বেগ ও মমতাও ছিল— সজীব করে তোলার

মতোই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাদের মানসপরিচয় ও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমি জানতে পেরেছিলাম; অন্যভাবে হয়তো তা জানা সম্ভবই হত না।

সুখের এই পর্বেই আমি দেখলাম, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আমি অক্সফোর্ডে যে পড়াশুনো করেছি তা এতদিনে অভাবনীয় মূল্যবান ও কার্যকর হয়ে উঠেছে। অথচ এক সময়ে এই পাঠকে পুরো অপচয় বলে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম। যেমন ধরুন, প্রার্থনা বিষয়ক হেইলার-এর আকর গ্রন্থ, উইলিয়াম জেমস-এর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈভিন্ন্য, অট্টো'র ধর্মীয় উপাদানের বৈচিত্র্য ইত্যাদির মতো আরো কিছু গ্রন্থ সাওরা-ধর্ম বুঝবার ক্ষেত্রে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল।

ধর্মকে ভিত্তি করেই সাওরা জীবন চালিত; তাদের ধারণায়, এই জীবন ও দৃশ্যমান জগতের নেপথ্যে ও চতুর্দিকে রয়েছে অদৃশ্য এক সপ্রাণ বাস্তব অঞ্চল; সেখানে বাস করছে অসংখ্য আত্মা; সেই আত্মার কার্যকলাপ সংঘটিত হয় স্বাভাবিক অস্তিত্বের প্রতিটি পর্যায়ে।

ভূত-প্রেত-পিশাচরা প্রতিপাদ জগতে বা পাতালপুরীতে বাস করে; সেই জগৎটাও আমাদের এই জগতের মতো; কিন্তু সেখানে সবকিছু ক্ষুদ্রাকার বা লিলিপুটের মতো। তাদের ঘরবাড়ি ছোট ছোট; সেখানে মেঘ থাকে মাটি ছুঁয়ে; সেই নরকের চাঁদের নিচে সারাক্ষণই সন্ধ্যালোক। প্রেতরা খুবই দুঃখী অসম্পূর্ণ জীবন কাটায়— খাবার জোটে না, পরনের কাপড় থাকে না; পুনর্বার তাদের মৃত্যু ঘটলে এবং যথাবিহিত প্রথায় সমাধিস্থ হলে পরেই তারা তাদের দুঃখময় অস্তিত্ব থেকে চিরকালীন মুক্তি পেতে পারে।

কিন্তু সেই পাতালপুরী বা প্রতিপাদ জগতের শাসকেরা, রক্ষাকারী আত্মারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। তাদের রয়েছে বড় বড় বাড়ি, ভাল সুস্বাদু খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ; আর রয়েছে অগুনতি পরিচারক। [মানুষ যেমন কুকুর পোষে] তারা পোষে বাঘ ও চিতা। ভল্লুক সেখানে পূজারী; আর সেই আজব জগতে শুয়োর হচ্ছে কবরেজমশাই।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই আত্মারা জীবিতজনদের মধ্যে থেকেই খুঁজে বেড়ায় তাদের জীবনসঙ্গী। জীবিতজনদের কাছে তারা স্বপ্নে এসে হাজির হয়, তাদের বিয়ে করার সকাতর মিনতি জানায়। বিশেষ এক ধরনের মেয়ে আছে যারা তাদের রজোদর্শনারম্ভ বয়েসে স্বপ্নে এইসব অতিজাগতিক প্রেমিককে দেখতে পায়; এবং প্রেম-যাঞ্ছার সুতীব্র পর্বশেষে এইসব মেয়ে তাদের বিয়ে করতে সম্মতও হয়ে যায়।

সেই বিবাহও এক দারুণ ব্যাপার; সাধারণ বিয়ে-শাদির মতোই বিধিসম্মত ও ব্যয়সাপেক্ষ। আর বিবাহন্তে মেয়েটি হয়ে যায় পূজারিণী, 'কুরানবই'। অতঃপর সেই মেয়েটি ঈশ্বরীয় সব কাজকর্ম করবে; দৃশ্যাতীত স্বামী-আত্মার সাহায্যে সে ব্যাধি

নিরাময় করবে। সাওরারা বিশ্বাস করে, এ-জাতীয় অদৃশ্য স্বামীর সঙ্গে সহবাসের মধ্যে দিয়েও এই মেয়েরা সন্তানের মা হতে পারে। আমি নিজেই এরকম অনেক মহিলার দেখা পেয়েছি যাদের এই জগতে ও অতিপ্রাকৃত জগতে সংসার রয়েছে। তাদের কথার ধরন শুনে মাঝে মাঝে আমার মনেও সংশয় জাগত : কোন জগৎটা তাদের কাছে প্রকৃত জগৎ?

কিন্তু এবম্বিধ উদ্ভট কল্পলোকে বাস করা সত্ত্বেও এই মহিলারা বাস্তবানুগ ছিল— তাদের গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্যে নিবেদিত সেবিকা ছিল। যে কোনো ব্যাধিগ্রস্ত বা ব্যথিতজনকে সেবা করা বা সান্ত্বনা প্রদানের জন্যে তারা সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। কিছু পুরুষেরও এই অভিজ্ঞতা ছিল; ফলে তারাও হয়ে উঠেছিল গোষ্ঠীর অতি গুরুত্বপূর্ণ কবিরাজ।

বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এইসব সরল আদিবাসী 'ডাক্তার'দের গুরুত্ব ছিল অসীম। রোগীর মনে একটা ধারণা জন্মাত, কেউ তার সেবা করছে, তার জন্যে ভাবছে। তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগত যে সুস্থ সে হয়ে উঠবেই। আর তথাকথিত 'ডাক্তার'রাও তাদের কাজটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করত; এবং এই কাজে তারা প্রচুর পরিশ্রমও করত।

এরকম একটি অভাবনীয় অন্বেষণের ক্ষেত্রে কোনো গবেষক যখন কাজ করার সুযোগ পান তখন তার থেকে অধিকতর কোনো সুখ নেই, গভীরতর কোনো ভালবাসা নেই, তার থেকে বেশি কোনো পুলক ও উদ্দীপনা নেই। শুধু সাওরাদের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও দেখেছি, এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন সবকিছু যথাস্থানে ঘটে যায়; এবং জনগণের জীবনকে দেখা যায় এক সুবিন্যস্ত সমগ্র হিসেবে— বুঝতে পারা যায়, তা কিভাবে চলছে। এই নিষ্পত্তিমূলক মুহূর্তটির আয়ত্তি সম্ভব কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে; আর একথাও সত্য, এই মুহূর্তটিই হচ্ছে একজন বিশারদের কাছে অন্যতম দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রচুর সময় লাগত। আমার এক বন্ধু পাণ্ডুলিপি অবস্থায় এই বইটি পড়েছিলেন; তাঁর মন্তব্য ছিল, এই গ্রন্থে আমার কিছু সদ্‌গুণের উল্লেখ থাকলে ভাল হত; আবার সাধারণত আমার অন্যান্য বন্ধু আমার দোষের সমালোচনা করে থাকে। তো আমি পাণ্ডুলিপি-পাঠক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি : 'থাকলে ভাল হত ঠিকই কিন্তু আমার কি সদ্‌গুণ আছে?' প্রশ্নটা শুনে ভদ্রলোক প্রথমে হতভম্ব হলেন, তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় আপনার সর্বোত্তম সদগুণ হচ্ছে ধৈর্য।' হয়তো সেই ধৈর্যের কিছুটা প্রকাশ এখানে আছে; কারণ সব সময়েই আমি খুশি চিত্তে কাজ করে গেছি— স্বীকৃতি বা পুরস্কারের কোনো প্রত্যাশা না রেখেই। বস্তুত সত্যান্বেষণের ক্ষেত্রে যে কোনো কষ্ট স্বীকারে আমি সর্বদা প্রস্তুতও

বণ্ডো মেয়ে রেড়ি শস্যের দানা পাড়ছে

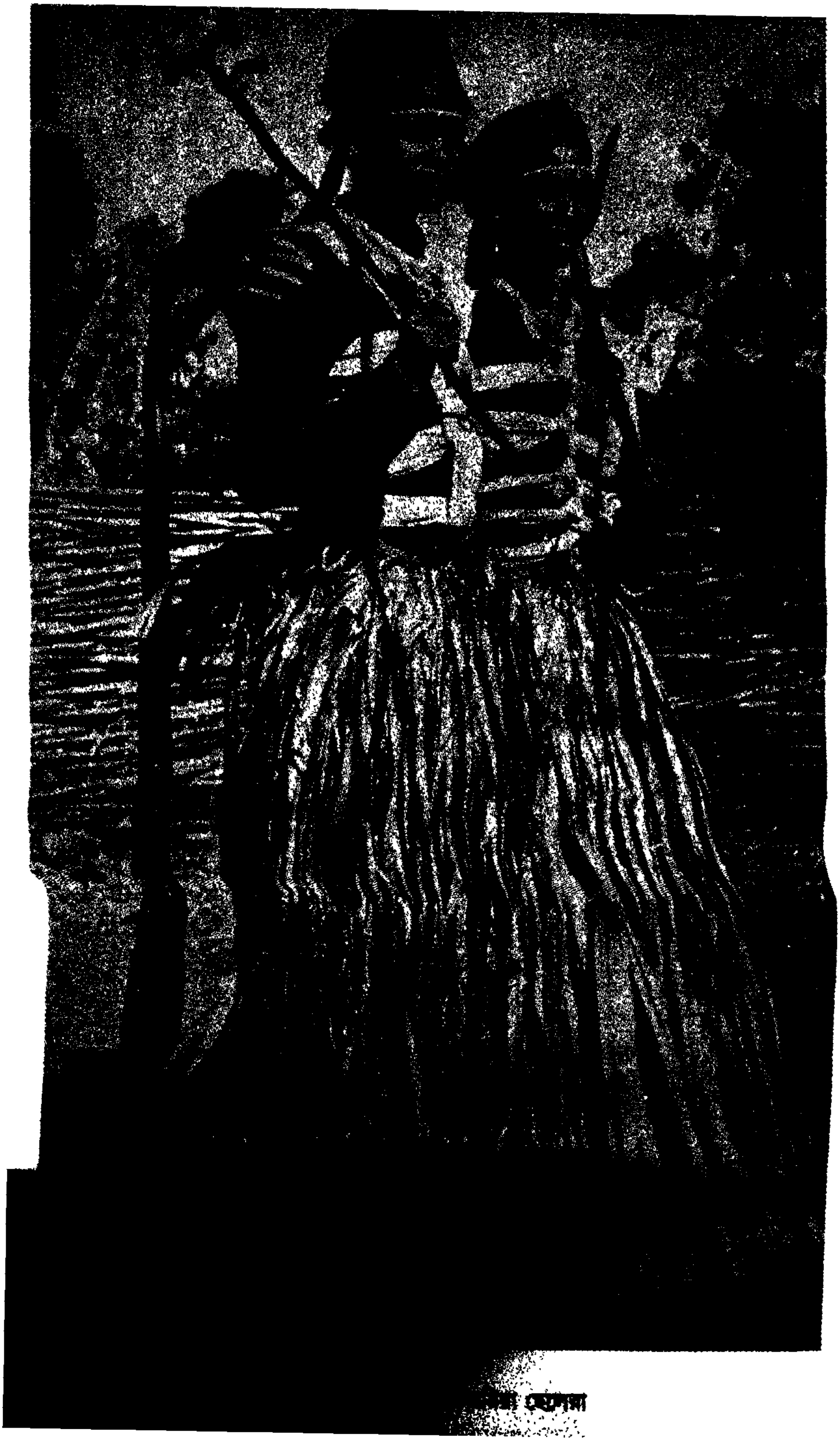

ছিলাম। সেই সত্যকে খুঁজে পাবার জন্যে যে কোনো পরিমাণ সময় ব্যয় করতেও হয়েছে আমাকে। বিষয়সমূহই আমাকে লম্বা সময় ধরে টেনে নিয়ে গেছে; অপেক্ষা করে করেই আমি খুশি থেকেছি।

মাঝে মাঝে কেউ উল্লেখ করেছেন যে আদিবাসী ভারতবর্ষে গিয়ে আমি অনেক আত্মত্যাগ করেছি। কিন্তু এটা এমন কোনো সদ্‌গুণ নয় যার জন্যে কৃতিত্ব দাবি করতে পারি। সাওরা পাহাড়শ্রেণীর সুন্দর পরিবেশে কিংবা পাটানগড়ের মনোরম বাতাবরণে আনন্দে বাস করার মধ্যে কি আত্মত্যাগ নিহিত থাকা সম্ভব? বস্তুত আত্মত্যাগের কোনো মুহূর্তই আমার জীবনে কখনো আসে নি; যা কিছু আমি দিয়েছি তার দশগুণ আমি ফেরত পেয়েছি; এবং আমার বিষয়ে আমি বলতে পারি :

ভালবাসা সে পেতে পারত গরিবের কুঁড়েঘরে;
তার শিক্ষক হয়ে উঠত বন আর শীর্ণকায় নদী,
তারকাখচিত আকাশের নৈঃশব্দ্য,
নিঃসঙ্গ পাহাড় কোলের নিদ্রা।

আমার জীবনে বাস্তার ও ওড়িশার স্মৃতি আমার অক্সফোর্ডের স্মৃতির মতোই চিরজাগরূক, সান্ত্বনাতীত। আমি আর কখনো দেখব না, কেউই হয়তো আর কোনোদিন দেখতে পাবেন যেভাবে আমি মুরিয়া ঘোটুল দেখেছিলাম— অথবা যেভাবে আমি সাওরাদের দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এমনও হতে পারে, আমার উপস্থিতির মধ্যে দিয়েই আমি যার এত গুণগান করেছি তারই ধ্বংসকর্মে অংশও নিয়েছিলাম। কিন্তু সমগ্র আদিবাসী ভারতবর্ষ জুড়েই তাদের প্রাচীন স্বাধীনতা হারিয়ে যাচ্ছে; সেই সঙ্গে লোপ পাচ্ছে তাদের পুরনো সুখ ও আনন্দও। পরিবর্তন এক অনিবার্য ব্যাপার; আমার মনেও কোনো সংশয় নেই যে গ্রামীণ কল্যাণ প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যেই কিছু মানুষের অন্তত কিছুটা উপকার সাধন করেছে; এবং সময়কালে তাদের সকলের মধ্যেই নতুন জীবনপ্রবাহ নিয়ে আসবে। অবশ্য তাদের সুখ ও আনন্দের ওপর এই কল্যাণ প্রকল্প শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি ঘটাবে সেটা এই বিষয়ের ওপর যাঁরা গভীর চিন্তাভাবনা করছেন তাঁদের কাছে এক উদ্বেগজনক সমস্যা।

সে যাই হোক, একটা বিষয় অন্তত পরিষ্কার। সেই পুরনো রোমান্টিক উত্তেজনাকর দিনগুলো, সেই সৌন্দর্য ও উদ্দীপনা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে। যদি কোনো শিশুর কাছেও তা একটা ক্ষতি বলে মনে হত তাহলে আর আমি এমতো স্মৃতিচারণ করতাম না। তবু বলব যার জন্যে এত আকুতি তার জন্যে স্মৃতিমেদুর না হয়ে পড়া খুবই কঠিন শক্ত কাজ।

শুনি এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করছে,
সুন্দর বলদার
মারা গেছে, সে মৃত।

বারো

ফেটোগ্রাফি গবেষণাকর্মের এক বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ : এই ফোটোগ্রাফি আমাকে নানা প্রতিকূল, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলেছিল, বিশেষত প্রথম দিকে এবং প্রান্তিক এলাকায়। সেখানে ফোটো তোলাটা খুব সহজ ছিল না।

অধিকাংশ আদিবাসী মানুষের কাছেই ক্যামেরাটা শুধুমাত্র বিব্রতকর নয়, একটা ভীতিকর যন্ত্র। রহস্যময় সেই যন্ত্রের ছিদ্রমুখটা এমন অশুভভাবে তাদের দিকে তাক করা হয়ে থাকে— সহজতম ছবি তোলার ক্ষেত্রেও যে অনিবার্য প্রস্তুতিটা আগে নিতে হয়, তেপায়ার ওপর ক্যামেরাটাকে ঠিকভাবে দাঁড় করাতে হয়, অবস্থাটা সামলে নিতে হয় যে তারা তার উপস্থিতি টের পেয়ে যায়ই। মাণ্ডলা জেলার বাজারে আমি এক দারুণ ফোটোজেনিক কামারকে দেখতে পেয়েছিলাম— তখন আমি আগারিয়াদের ওপর বইটা লিখছি; কিন্তু যে মুহূর্তে আমি তার দিকে ক্যামেরাটা নিশানা করেছি অমনি দেখি চতুঃপার্শ্বস্থ উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে ভীতি-আতঙ্কের এক তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে। স্থানীয় কনস্টেবলটি আমাকে অভিবাদন জানিয়ে, বলল, 'স্যার, এর চাইতে ভালমানুষ আমি আপনাকে জোগাড় করে দিতে পারি',— কিন্তু তার কথার অর্থ বুঝবার আগেই দেখলাম, গোটা বাজারটা হুড়মুড় করে উঠে যাচ্ছে। দোকান-পসরা ছেড়ে মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঝুড়িভর্তি সব্জি মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে, কাপড়ের বস্তাগুলো মাড়িয়ে যাচ্ছে; দেখতে না-দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকজন জঙ্গলে ঢুকে নিরাপদ আশ্রয় নিল। পরে আমি জানতে পেরেছি, ওই কনেস্টবলটিও ভেবে নিয়েছিল, আমার ক্যামেরাটা ছিল এক ধরনের মানুষের আকার নিরূপণের যন্ত্র; ওই যন্ত্র দিয়ে আমি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য নিয়োগ-প্রার্থীদের দেহকাঠামোর আকার মাপছি। আরেকবার রায়পুর জেলায় আমি যখন ফোটো তুলছিলাম উপস্থিত লোকজন তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল; তাদের একজন আমাকে বলল, 'আপনি আমাদের সব শক্তি শুষে নিয়ে ওই ছোট বাক্সটায় ঢুকিয়ে নিয়েছেন।' অন্য এক জায়গায় দেখেছি, আদিবাসী মানুষ মনে করত, ক্যামেরা হল এক্স-রে'র মতো একটা যন্ত্র; ওই যন্ত্রের সাহায্যে আমি তাদের কাপড়-চোপড়সহ দেহের অভ্যন্তর— একেবারে যকৃৎ পর্যন্ত সবকিছু দেখতে পাই। অনেকেরই জানা আছে, যকৃৎ হল জাদুবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ডাইনবিদ্যার প্রয়োগে কাউকে হত্যার আগে লোকটির যকৃৎটাকে প্রথমে অক্রমণ করতে হয়। আপনি যদি কোনো মৃত মানুষের এক টুকরো যকৃৎ ধারণ করতে

পারেন, অথবা তার একটা ছবিও সঙ্গে রাখতে পারেন তাহলে অতিপ্রাকৃত শক্তির একটা ভর আপনি পেয়ে যাবেন।

অথচ বাস্তারে যখন আমি মারিয়া ও মুরিয়াদের ওপর একটা তথ্যচিত্র তুলছিলাম তারা কিন্তু তখন আমাদের ফোটো তুলতে মোটামুটি সাহায্যই করেছিল। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ক্যামেরার সামনে বাচ্চাদের ভিড় জমাবার আগ্রহ দেখে। কখনো আবার অদৃষ্ট খারাপও যেত। একবার আমি মুরিয়াদের বিয়ের ফোটো তুলতে গিয়েছিলাম; পাত্রীর বাবা আমার বহুদিনের বন্ধু। প্রথমদিনটা নির্বিঘ্নে কেটে গেল; আমরা উপহার দেয়া-নেয়াও করলাম; বিয়ের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখারও সুযোগ পেলাম; এমন সজ্জন বন্ধুর সান্নিধ্যে বড় একটা বেশি দিন কাটাই নি। বেশ চমৎকার কিছু ছবিও তুলতে পেরেছিলাম। তারপর, দ্বিতীয় দিন সকালে হঠাৎ বরটি মূর্ছা গেল। হাতে বেটপ ক্যামেরা নিয়ে আমি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি জানতাম অতঃপর কী ঘটতে পারে। এক-একে উপস্থিতজনদের দৃষ্টি অনিবার্যভাবে আমার হস্তস্থিত ক্যামেরাটির দিকে নিবদ্ধ হল। বুঝতে অসুবিধা হল না তারা কী ভাবছে : ওই আজব ছোট বাক্সটাই দেবতাদের রোষ বরটির ওপর জাগিয়ে তুলেছে। পাত্রটির মা ছিলেন বেশ তেজী মহিলা, মাথায় তার কোকড়ানো একরাশ পরচুল (বলা হত তিনি মহাদেবের মূর্তিধারিণী)। কয়েক মিনিট বাদেই তিনি আমার মুখের ওপরই ঘোষণা করলেন যে এই ক্যামেরার জন্যেই তার ছেলের বিপত্তি ঘটেছে। কিছু আর করার নেই। আনন্দের সমস্ত পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ক্যামেরা সরিয়ে রাখার পরও সকলের দৃষ্টিতে ছিল অস্বস্তি আর মলিনভাব। মনে হচ্ছিল, আমার কাঁধের ওপর বুঝি একটা কালো বাঁদর বসে আছে।

একবার আমি দক্ষিণ বাস্তারের অনিন্দ্য পর্বতমালায় বাইসন-হর্ন মারিয়াদের অঞ্চলে সফর করছিলাম। সেখানে এক নদীতে মাছ ধরছিল একদল ছেলেমেয়ে। তাদের ছবি তুলতে আমাকে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। প্রতিবারের মতো লোকজন, এক্ষেত্রেও জানাল, মাছ কী তাই তারা জানে না! মাছ সেখানে ছিল, এই পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়ে তারা জানাল, একটা মাছও তারা কোনোদিন ধরে নি (সম্ভবত তারা ভেবে থাকবে, আমি বুঝি তাদের মাছ ধরার অধিকারটাও হরণ করার সরেজমিনে এসেছি; বাস্তবত ভারতবর্ষে এরকম অনেক অধিকার-হরণ হয়েছেও)। অতঃপর তারা বলল যে মাছধরার জাল-ফাঁদ কোনো কিছুই তাদের নেই— ইচ্ছে করলে আমরা গ্রামে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি। শেষমেশ আমরা যখন জাল-ফাঁদসহ ছেলেদের নদীর ধারে আবিষ্কার করি তখন সেখানে এসে হাজির হল ভয়ংকর অশুভ দৃষ্টিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ; সে চিৎকার করে কিছু একটা বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে, দশ গোনার মতো সময় না দিয়েই পুরো জায়গাটা জনশূন্য হয়ে গেল। লোকজন সবাই

জঙ্গলে গিয়ে গা ঢাকা দিল, মাটিতে পড়ে রইল তাদের জাল-ফাঁদ। বোঝা গেল বৃদ্ধটি ছিল গ্রামের পূজারী; সে জানিয়ে দিয়েছিল যে দেবতা তাকে জানিয়ে দিয়েছে, ক্যামেরার সামনে যে নিজেকে দাঁড় করাবে সেই সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে।

এই ভ্রান্তবিশ্বাস দূর করার জন্যে স্বয়ং পূজারী বৃদ্ধকেই আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড় করালাম। প্রথমে সে তার বিশাল তেজী দেহের পিঠটা ক্যামেরার সামনে রাখল; কিন্তু অনেক বলে কয়ে শেষ অবধি তাকে ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড় করাই। শেষে তিনি ঘোষণাও করেন, ছবি তোলার কারণে কেউ মারা গেলে তিনিই হতে চান সেই আত্মত্যাগী ব্যক্তি। তারপর আমি গ্রামবাসীদের দেখালাম মহারাজার ফোটো, আমার স্ত্রী ও আমার ফোটো; বললাম, যদিও আমাদের 'আত্মা' এক টুকরো কাগজের ওপর ছাপ ফেলেছে তবু তো আমরা সবাই বেঁচেবর্তে সুখেই আছি। এই ঘটনার ফলে একটা ধারণা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল; ফলে তার কদিন বাদেই চমৎকার এক মোরগ-লড়াইয়ের ফোটো তোলার সুযোগ পেয়ে যাই। আমার ধারণা, গ্রামবাসীরা হয়তো মনে মনে ভেবেছিল আমার সাংঘাতিক অস্ত্রটা যদি এভাবে মোরগদুটোকে খতম করতে পারে তাহলে সর্বদা মাংস পাবার একটা উপায় হয়ে যাবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমি অসহায়, তাদের ইচ্ছাপূরণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও যে সুখের পরিবেশটা আগে ছিল সেটা আর ফিরে এল না; কিন্তু সেরকম পরিবেশই তো একটা ভাল ফোটো তোলার ক্ষেত্রে একান্ত জরুরি।

অনেক সময়ে আবার স্থানীয় অধস্তন কর্মচারী বা সাহায্যকারী বন্ধুরাও নানা ঝামেলার সৃষ্টি করত। বহু চেষ্টাচরিত্তি করে একবার সারানগরে একদল লোক জড়ো করেছিলাম সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাদের ফোটোতে তুলে রাখতে। সবকিছু যখন প্রস্তুত তখনই এক অত্যুৎসাহী চাপরাশি চিৎকার করে তাদের দিকে ধেয়ে গেল : 'কি আস্পর্ধা তোমাদের! সাহেবের সামনে হাবার মতো দাঁত কেলিয়ে বসে আছো?'

একই অভিজ্ঞতা আমার নেফাতেও হয়েছে। বরিস ও ওয়ানচোম রা ছিল খুবই ফোটোজেনিক; অথচ তাদের বেশির ভাগ গ্রাম সফরের সময়ে আমাকে সর্বদাই ক্যামেরা সরিয়ে রাখতে হত। ফ্রন্টিয়ার বরাবর বৌদ্ধ গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের কোনো অসুবিধাই আমার হয় নি।

তেরো

বই লেখা একটা ব্যাপার ; কিন্তু লেখাটা টাইপ করা, ছাপার বন্দোবস্ত করা অন্য ব্যাপার। শিলংয়ে আসার আগে অবধি, এবং তার আগের অল্প কদিনের কথা বাদ দিলে কোনোদিনই আমার জন্যে কোনো স্টেনোগ্রাফার বা টাইপিস্ট ছিলনা; আমি নিজেই আমার যাবতীয় ঢাউস বইগুলো টাইপ করেছি। আমার অভ্যেস ছিল প্রথমে

একটা খসড়া লেখা টাইপ করা, তারপর শূন্যস্থান পূরণ করে পুনর্বার লেখাটি টাইপ করা; এবং চূড়ান্তে প্রেস-কপিটা টাইপ করা। এ ছিল বিপুল পরিশ্রম ও ধৈর্যের কাজ, কিন্তু সেটারও দরকার ছিল। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মুখে বলে বলে অন্যকে দিয়ে লেখাবার থেকে নিজে লিখলে লেখাটা অনেক ভাল হয়।

তারপর আছে প্রুফ-রিডিংয়ের কাজ। আমার প্রকাশক ছিলেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের রয় হকিন্স। যুদ্ধের বছরগুলোয় কাগজ ছিল দুষ্প্রাপ্য; তখনো কিন্তু এই ভদ্রলোক একের পর এক বই প্রকাশ করে গেছেন; মুনাফা ছিল না, এ এক বিরল সৌজন্য প্রদর্শন। রয় হকিন্স আমাকে বলে দিয়েছিলেন, মুদ্রকের কাছে টাইপ-কপি পাঠাবার আগে কিভাবে প্রুফ দেখতে হবে। অক্সফোর্ড প্রেস আমার মানসপটে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল, আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান বিষয়টা ছিল : মুদ্রণের ক্ষেত্রে আমাকে কতটা যত্নবান হতে হবে। সচরাচর যা ঘটত তা হল এইরকম : আমি অক্সফোর্ডে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলাম, কদিনের মধ্যে সেখান থেকে একটা চিঠি আসত; সেই চিঠিতে থাকত লম্বা এক জিজ্ঞাসার তালিকা। বানানের ক্ষেত্রে কখনোই আমি খুব পারদর্শী নই; প্রেসের চোখে সাধারণভাবেই ধরা পড়ত যে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় আমি বিভিন্ন বানান লিখেছি। কখনো বা ব্যাকরণগত ভুলও থাকত, কখনো যতিচিহ্নের ত্রুটি। তরুণদের মধ্যে সাধারণত যেমন থাকে আমার মধ্যেও তেমনি প্রকাশনজগতে আসার আগে অবধি ধারণা ছিল, যাই থাক মুদ্রকই সব 'ঠিকঠাক করে দেবেন'। এবার আমি শিখলাম, বিশেষত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, পাণ্ডুলিপিতে যা আছে মুদ্রক হুবহু তাই বসাবেন, তাই করবেন। অধিকাংশ কম্পোজিটরই বাস্তবত ইংরেজি ভাষাটা জানতেন না— কপি অনুযায়ী কম্পোজ করতেই তারা সহজভাবে প্রশিক্ষিত।

ফলে প্রুফ আসত আর যেত; তিন-চারবার আমি প্রুফটা পড়তাম, শুদ্ধ করতাম; প্রেসের অফিসও প্রুফ দেখত; সবার শেষে হকিন্স নিজে প্রুফটা দেখতেন। আমার ধারণা তাঁর প্রকাশিত প্রতিটি বইয়ের ক্ষেত্রেই শেষ ভুলটি অবধি সংশোধন না করা পর্যন্ত তিনি ছাড়তেন না।

মাঝে মাঝে বিচিত্র সব সমস্যা দেখা দিত বিশেষত আমার লেখায় যখন থাকত অন্তরঙ্গ মুহূর্ত বা যৌনতা সম্পর্কিত বিষয়। যৌন বিষয়ে বিকৃতমনা এক কম্পোজিটর যখনই আমার পাণ্ডুলিপিতে 'সেক্স' শব্দটা পেতেন তখনই তিনি সেটি উল্টো করে বসাতেন। লক্ষ করেছি প্রায় সব কম্পোজিটরই (পিউবিক হেয়ারসকে) 'পাবলিক হেয়ারস' কম্পোজ করতেন। পাবলিক হেয়ারস আবার নৃতাত্ত্বিকগণের লেখার অন্যতম কৌতূহলপূর্ণ বিষয়; কিন্তু আমি তো সেটা লিখিই নি। মুরিয়াদের ওপর লেখা আমার বইয়ের কাজটা যখন অর্ধেকটা হয়ে গেছে তখন এক সাংঘাতিক

সমস্যার উদ্ভব হল। বইটি ছাপছিল ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস; তারা হঠাৎ আবিষ্কার করল; কী ছাপছে তারা! তারা আমাকে পত্রে জানাল, এরকম অশ্লীল বিষয় তাদের পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়। কিন্তু হকিন্স তাঁর অবস্থানে একেবারে অনড়; তিনি প্রেসকে জানিয়ে দিলেন যে কাজ নেবার আগে টাইপ-করা প্রেস-কপি তাদের পড়ে দেখা উচিত ছিল। সৌভাগ্যবশত তখন প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন একজন উদারমনা ব্যাপটিস্ট; তিনি নিজেই বুঝলেন, গোটা ব্যাপারটা হাস্যকর। আমি হিসেব করে দেখেছি, বইটি শেষ হবার মধ্যে আমি ও অক্সফোর্ড প্রেস মিলে কম করে আটবার প্রুফ দেখেছি। তার ফলটাও হয়েছিল স্বস্তিকর। সাত লক্ষ শব্দবিশিষ্ট গ্রন্থটিতে মাত্র তিনটে প্রমাদ থেকে গেছে। এই সাফল্যের ক্ষেত্রে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের অবদানও কম নয়।

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিবীটা গোল

'বিরামহীন ভ্রমণ মানেই নিরন্তর দেখাসাক্ষাৎ। একদা পৃথিবীর কোনো সুদূর প্রান্তে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় পিয়ের তেইলহার্ডের। এমন সানন্দ অভ্যর্থনা জানালেন তিনি, যে বন্ধু কিঞ্চিৎ বিস্মিত। পর্যটক বললেন, 'আমি এত খুশি কেন'?— 'কেননা পৃথিবীটা গোল।'

-- ক্লোদ আরাগঁ।

এক

শিলংয়ে আসার আগে বাইশ বছর আরণ্যজীবন কাটাবার ফলে নিজেকে বহির্জগৎ থেকে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন করার অভ্যাস জন্মেছিল বলে বিশ্বাস। কনফারেন্স ও কমিটি আমি এড়িয়ে চলতাম। যদিচ এই বিষয়ক অন্যান্য স্কলারদের সঙ্গে যথেষ্ট পত্রব্যবহার করতাম। তবে বছরে একবার বর্ষকালে বম্বে যেতাম নিয়মিতই। তা হ'ল আমাদের আদিবাসী কাজের জন্যে টাকা তুলতে। বেড়াতে ভালবাসি বলে দু'একবার বিদেশেও গেছি। বম্বের মানুষজন খুব দয়ালু ও দরাজহাতের মানুষ। অনেক বন্ধু ছিলেন সেখানে। এঁদের মধ্যে মুখ্য হলেন জেহাঙ্গীর প্যাটেল।

জে. পি. প্যাটেল মানুষ হিসেবে যেন এক পিকউইক। যখন পরিচয় হয়, তিনি এক ব্যবসায়ী, তুলোর কারবারে উন্নতি শুরু করেছেন। তারপর এলেন গান্ধীর সংস্পর্শে। তাঁর এক অনশনের পর জুহুতে তাঁকে আতিথ্য জানালেন। পরে পাটানগড়ে আমাদের কাজে সহায়তা করেই ক্ষান্ত হলেন না। থানে জেলায় অতীব শোষিত ও নির্যাতিত ওয়ার্লি আদিবাসীদের জন্য এক চমৎকার প্রতিষ্ঠান শুরু করলেন। কয়েকটি অরণ্য সমবায় গড়লেন। ডিসপেনসারি ও স্কুল খুললেন কয়েকটি। এরপর তাঁর সেরা কাজটি করলেন স্পানিশ মহিলা সোফিকে বিয়ে করে। একদিন এঁকে সগর্বে নিয়ে এলেন বম্বেতে। বিগত পনেরো বছরে পাটানগড়ের কাজে চাঁদা তোলায়; আমার বই প্রকাশে; বিশাল বন্ধুগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায়, সকল সম্ভাব্য উপায়ে ইনি আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ উপদেশ সর্বদা আমার উপকারে লেগেছে।

বম্বেতে সবচেয়ে আগে বন্ধু পাই বোধহয় ম্যাকলিনদের। এঁদের গোয়ালিয়া ট্যাংক রোডে একটি বাড়ি ছিল। খ্রিষ্ট সেবা সঙ্ঘে কাজ করার পর্বে ওখানে থাকতাম। জন

ম্যাকলিন উইলসন কলেজে গণিতের এক অধ্যাপক ছিলেন। স্বামী ও স্ত্রী, বাড়ির দরজা খোলা রাখতেন ভারতীয়দের জন্য। জাতীয় আন্দোলনে এই দম্পতির জোর সহানুভূতি ছিল। প্রয়াতা মার্গারেট মোর ছিলেন আরেক মিশনারি বন্ধু। ইনি অতীব ধর্মপ্রাণা। কিন্তু কৌতুকবোধ ছিল যথেষ্ট। বহুবছর পরে একবার করনজিয়াতে আমাদের কাছে আসেন। ওঁর ভালো লেগেছিল।

ম্যাকলিনদের বাড়িতে মাঝে মাঝে 'ইন্টার-রিলিজিয়াস ফেলোশিপ'—এর বৈঠক হত। ওখানেই পরিচয় হয় সি. জে শাহ্-র সঙ্গে। ইনি জৈনধর্মের উপর এক চমৎকার বই লেখেন, তবে পরে ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন। গুজরাটে যখন তদন্ত করতে যাই, ইনি সঙ্গে ছিলেন। তিরিশ বছরের বেশি হয়ে গেল আমাদের বন্ধুত্বের।

করনজিয়াতে গিয়ে ডেভিডদের সঙ্গে পরিচয়। জ্যেষ্ঠ হ'ল মায়ার; উইলফ্রিড লিখেছিল সাড়াজাগানো বই 'মনসুন', এবং করনজিয়াতে ছিল কিছুদিন; সুন্দরী ও মিষ্টালাপচারিণী ফ্লোরেন্স। এবং ওদের মা মিসেস ডেভিড। যে সব প্রাচীন ইহুদি পরিবারকে অন্তরঙ্গ জানতাম, তাদের মতোই এঁরাও দরাজহস্ত ও আতিথ্যপরায়ণ। সেই প্রথম অধ্যায়ে আমাদের মদত ও উৎসাহ দিয়েছেন।

অনেক বন্ধুত্বের স্মৃতিতে জড়ানো বম্বে। নানা রকম মানুষের সঙ্গে ছিল সম্পর্ক। রাজনীতিকদের মধ্যে ছিলেন বড়ো মাপের আইনজীবী ও বক্তা এম. আর জুয়াকর; ভুলাভাই দেশাইকে তো খুবই পছন্দ করতাম। ছিলেন কে. এফ. নারিম্যান; পুরুষোত্তমদাস ত্রিকামদাস; বি. জি. খের ও অন্যান্যরা। সাংবাদিকদের মধ্যে ডি. এফ. কারকার সঙ্গে অক্সফোর্ড থেকেই মিত্রতাবন্ধন; 'টাইম্স অফ ইন্ডিয়া'-র শামলাল; বহু বছর 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া' সম্পাদনা করেন, শ্যন ম্যাণ্ডি অতীব আমুদে এক আইরিশ; আর সবার ওপরে ফ্র্যাংক ও বেরিল মোরে। ফ্র্যাংকের ছেলে ডম মোরেসকে ছোটবেলা থেকে জানি। যেমন বড় হতে থাকল, ওর প্রথম পর্বের কবিতার কপি আমাকে দিত।

বম্বে গেলে, বান্দ্রায় হিল্লা ভকিলের কাছে তীর্থদর্শনে যেতে ভুলিনি কখনো। বসন্ত ভেলিংকার ছিলেন কে. পি. প্যাটেলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মধ্যে এক। আমাকেও এঁর বন্ধু করে নেন। রগুড়ে কথাবার্তায় ইনি রীতিমত পারদর্শী। ফলে ওঁকে জানাটা ছিল বড়ই আনন্দের।

বম্বে হাউস, এবং টাটা এনটারপ্রাইজেসের সঙ্গে যুক্ত অনেক মানুষই ছিলেন। কয়েকজনের কথা আমি বলেছি। সুপ্রিয় পিল্লু ভেসুগরের সঙ্গে ছিল বিশেষ দোস্তি। জামসেদপুরের ইতিহাসের ওপর কাজ করার কালে জামসেদ ভাবা ও তাঁর স্ত্রী বেটির সঙ্গে খুব দোস্তি হয়। অন্যান্য সম্মানিত বন্ধুরা হলেন পারমাণবিক শক্তি বিশেষজ্ঞ হোমি। যিনি জামসেদের ভাই। আর কে. এ. ডি. নওরোজী। হোমি মোদী এবং প্রয়াত আরদেসির দালাল। আমাদের বাৎসরিক সম্মেলনে এঁরা সবাই হাজির থাকতেন।

যেমন থাকতেন পুরনো দোস্ত এম. সি. চাগলা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন জে. এ. ডি. নওরোজী; সুনা বাটলিওয়ালা ও জন মাথাই। মৃত্যু এঁদের নিয়ে গেছে।

বম্বেতে গেলে বহু বছর ধরে আমার প্রকাশক রয় হকিন্‌সের সঙ্গেও থেকেছি। ভারি দিলখোলা, বিবেচক মানুষ। চমৎকার সঙ্গীও বটেন। খুবই মনোযোগী শ্রোতা, এই গুণের জন্য আমার কাছে তাঁর বিশেষ কদর ছিল। লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে প্রায়ই দেখি আমি কৌশলীভাবে কথা বলতেই পারি না। সঠিক প্রশ্ন করে করে হকিন্‌স কাউকে সুন্দর তাতিয়ে তোলেন। শুধু তাই নয়, উত্তরগুলোও মন দিয়েই শোনেন। হয়তো আমার অনেক বইয়ের প্রুফ দেখেন বলেই, উনি আদিবাসী প্রসঙ্গে সত্যিই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। আমাকে বড়ই স্নেহ করেন। ফলে প্রকাশক হিসেবে উনি (আমার বইয়ের) বিরূপ সমালোচনা পড়েন। সমালোচনা যেখানে সবচেয়ে তীব্র, সেগুলো লাল পেনসিলে দাগ দিয়ে আমাকে পাঠান। একদা বলেছিলেন, 'আমার বন্ধুদের প্রচুর ত্রুটি থাকুক, এটাই চাই আমি। তাহ'লে মনে হয় না ওরা বড়ই গুরুভার হয়ে উঠছে।'

এর অনেক আগেকার বন্ধু ইভলীন উড, খুবই পুরনো দোস্ত্। আমার মন থেকে ভণ্ডামি, বাগাড়ম্বর প্রবণতা এ সব ধুয়ে মুছে সাফ করতেন উনি। যেন জঞ্জালমুক্ত করে দিতেন। ১৯৪২-তে এঁর প্রথম স্ত্রী মেইভ্ আমার একটা ছবি আঁকেন। তা এ বইয়ে তুলে দিলাম।

দুই

পরে কলকাতার জীবনও জানলাম। ১৯৪৬ অবধি নৃতত্ত্ববিজ্ঞান ছিল জুওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্‌ডিয়ার এক উপ-অংশ, অন্য প্রাণীদের পদতলে সাষ্টাঙ্গ শায়িত মানুষ। ছিলেন সার্ভের সঙ্গে যুক্ত (এ বিভাগে) স্পেশাল অফিসার ডঃ বি. এস. গুহ, অ্যানথ্রোপলজিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। ওই বছরই ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন অ্যান্‌থ্রোপলজিকাল সার্ভে (পরে এর নাম হয় অ্যানথ্রোপলজি ডিপার্টমেন্ট) এবং গুহ হন প্রথম ডাইরেক্টর। কাজটা শুরু করার জন্য ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে যোগ দিতে ইনি আমাকে ডাকেন। কথা হয়, পাটানগড়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে; শামরাও ওখানকার কাজ চালাবে। সেই মতো আমি যাই বেনারসে। (অ্যান্‌থ্রোপলজিকাল) সার্ভের আপিস তখন ওখানেই।

বেনারসে একবছরের বেশি সময়কাল থাকি। ঘন ঘন পার্বত্য আদিবাসী অঞ্চলে বেরোতে না পারলে ওখানে টিকতে পারতাম কিনা সন্দেহ। 'অ্যাকাডেমিক' পরিবেশের জঘন্যতম চেহারা সেখানে। ঝগড়াঝাঁটি, ঈর্ষা ছিল, কাজ হত সামান্যই। আমরা যেখানে থাকতাম, সেই বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ভয়ংকর একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। সার্ভে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল। সে এক বিশাল মুক্তি।

৬৪ নং পার্ক স্ট্রীটে একটি বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় আমরা একটি মনোরম ফ্ল্যাট পাই। চৌরঙ্গির ইন্‌ডিয়ান মিউজিয়ামে সার্ভে আপিস, দিব্যি কাছাকাছি। আমার জীবনে এই প্রথম একমাত্র সময়, যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আপিসে গেছি। বছরখানেক থাকি কলকাতায়। তার অনেকটা সময় গেছে ওড়িশার বণ্ডো ও সাওরা এলাকা, দক্ষিণ ভারত ও আসাম পর্যটনে। কন্ট্রাক্ট ফুরালে মিঃ গুহ চেয়েছিলেন, আমি থেকে যাই। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের পরিবেশ ভালো লাগত না। গ্রামে ফেরার জন্যে মন তৃষিত। দু'তিন বছর বাদে ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করবার জন্য সরকারি নির্দেশ আসে। তখনো মনে হয়, এ আমার কাজ নয়। তারপর থেকে যা যা ঘটে, তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়, যে আমার চিন্তা সঠিক ছিল।

তবে কলকাতা আমাকে কিছু আজীবনের বন্ধু দিয়েছে। ভিক্টর স্যাসুনের মতো আরেকটি বন্ধু পাইনি। স্নেহশীল, মুক্তমনা, কৌতুকবোধদীপ্ত, সে এক আশ্চর্য গুণের মানুষ। সঙ্গী হিসেবে সর্বোত্তম। আমার জীবনে ও এক স্বাধীন বিস্তার এনে বড়ো করে দেয়। ওর জন্যই আমি ইউরোপের কিছুটা দেখি। দু'বার যাই আফ্রিকা। ওর কারণেই জীবনে একবার সুখাদ্য খেতে পাই, যতদিন তা জোগাড় করা সম্ভব ছিল।

ওর ভাই জো ছিল আরেক ভাল বন্ধু। মিড্‌লটন স্ট্রীটে স্যাসুনদের সুন্দর বাড়িটি ছিল আমাদেরই আরেকটি বাড়ি।

মিনি ও লিগুসে এমারসনও ছিলেন। যত দিন গেছে ততই ওঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্য আমার কাছে ক্রমেই দামি হয়ে উঠেছে। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর, লিগুসে 'দি স্টেট্‌সম্যান' কাগজে যোগ দেয়, (এ কাগজের ডেসমণ্ড ডয়েগ ও নিরঞ্জন মজুমদারও বিশিষ্ট বন্ধু) এবং পরে মিনি হন বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল। অনেক বার ওঁরা উদার অতিথিবাৎসল্য দেখিয়েছেন আমাকে। ওঁদের কাছে সদাই মেলে নবতম বইগুলি, টাটকা খবরটবর, বেজায় মজার গল্প। ওঁদের বাড়ি যাওয়া এক মূল্যবান অভিজ্ঞতাই বটে। মিনির বোন শীলা চিত্রশিল্পী, তাঁর স্বামী ডব্লু. এইচ. অডেনের ভাই জন অডেন, এঁরাও বন্ধু। বম্বেতে ছিলেন আরেক বোন, মনোহারিণী ইন্দিরা।

আমরা যখন কলকাতায়, ভিক্টর, 'ট্রপিক্‌স্' নামে এক পিকচার-এজেন্সি চালাচ্ছিলেন। ভিক্‌টর লিখতেন সুনীল, জানা ছবি তুলতেন। এঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ফোটোগ্রাফার বলতে আমি এতটুকু ইতস্তত করি না। সে সময়ে সুনীল অবিবাহিত। কিন্তু খুশনসীব তিনি, সুন্দরী ও গুণবতী শোভাকে বিয়ে করলেন। অরো ছিলেন যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র ও অন্যান্য শিল্পীরা। বিষ্ণু দের মতো কবি, সর্বোপরি ছিলেন সুধীন দত্ত। তাঁর স্ত্রী রাজেশ্বরী ও সুধীনের ভাই সুবুল, এক চমৎকার ছেলে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সে সুধীনের মৃত্যু (মাত্র উনষাট বছরে) ভারতকে রিক্ত করেছে এক বড় কবিকে কেড়ে নিয়ে। আমার এক মহার্ঘ বন্ধুকে নিয়ে গেছে।

কলকাতা বসবাসের কালে এশিয়াটিক সোসাইটির (তখন তার নাম রয়্যাল

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল) কাউন্সিলের সদস্য হই। পরে ফেলোও হলাম। এদেশে এটি খুব বড় সম্মানের মধ্যে একটি। ফলে অনেক ভারতীয় বিদ্বজ্জনের সংস্পর্শে আসি। এঁদের মধ্যে খুব দামী আমার কাছে সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী। ভারতের বিদ্বজ্জনসমাজে এক অনন্য চরিত্র। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস অফ ইন্ডিয়ার ফেলো নির্বাচিত হই। দু'বার এঁদের কাউনসিলের সদস্য হই।

শিলংয়ে আসার পর, প্রায়ই কলকাতা গেছি। কিন্তু তা প্রায় সর্বদাই অন্য কোথাও যাবার পথে। ফলে সে যাওয়া ক্ষণিকের জন্য। এতই লোকজন, দেখাসাক্ষাতে ঠাসা, যে নতুন বন্ধুত্ব করার সময় মিলত না বললেই হয়। সামান্য যে ক'জন বন্ধু পাই, তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল বব ও মার্গোট গিলকি এবং তাদের চমৎকার ছেলেমেয়ে, ডেভিড, জন ও শারদা। বব ছিলেন ইউ. এস. আই. এস.-এ। ভারি বিদ্বান ছেলে। ফরাসি ভাষায় তুলনামূলক সাহিত্যের উপর একটি বড় নিবন্ধ লেখে। চোখদুটিতে মায়ামমতা মাখানো। মার্গোট লাজুক, অতীব বিনয়ী এক কবি, তার ওপরে চেয়ে থাকার মতো সুন্দরী। ওদের বাতানুকূল ফ্ল্যাটে আমি আর লীলা থাকতাম। ওরাও আমাদের কাছে থাকত, ছেলেদের মন জিতে নিয়েছিল। এখন ওরা চলে গেছে। সরকারি পদাসীন লোকেরা যেমন যায়।

তিন

১৯৪৯-এর এপ্রিলের শেষে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানথ্রোপলজিকে বিদায় জানালাম। এক সপ্তাহ বাদে ভিক্টরের সঙ্গে রওনা হলাম ইউরোপ ও আফ্রিকায়। প্যান-আমেরিকান বিমানে গেলাম ব্রাসেল্স্। তারপর পনেরোদিন ঘুরলাম ইউরোপ, প্যারিস ভেনিস, রোমে। অবশেষ পৌঁছলা ইংলন্ডে। সেখানে মা ও এলডাইথের সঙ্গে দু'মাস থাকলাম। এরপর, আগস্টের গোড়ায় গেলাম আমরা ফরাসি পশ্চিম আফ্রিকায়।

এ সফরের জন্যে প্রচুর তোড়জোড় করতে হয়েছিল। জিওফ্রে গোরার দিল পরামর্শ; ড্যারিল ফর্ড থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। ইনটারন্যাশনাল আফ্রিকান ইন্স্টিটিউটে ফোটো দেখতাম, রয়্যাল অ্যানথ্রোপোলজিকাল ইনস্টিটিউটে বই পড়তাম। ভিক্টর গেল প্যারিসে প্রফেসর মোনোর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বললেন, তাঁর 'অ্যাসতিতুৎ ফ্রসেজ দ্য আফ্রিক নোয়ার' (IFAN) আমাদের সব সাহায্য করবে। মারশেল গ্রিওলের কাছ থেকে একটি হার্দ্য চিঠি পাওয়া গেল। তিনি ফরাসি গভর্নরকে বিদ্বান এল্যুয়িনকে সদয় মনোযোগ দেবার অনুরোধ জানালেন। ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিস থেকে পেলাম একটি কাটছাঁট নিরুত্তাপ চিঠি। তাতে 'স্থানীয় অফিসিয়াল'দের বলা হল, আমরা যদি 'ব্রিটিশ আফ্রিকায় ঢুকি, তাহ'লে আমাদের যথাসাধ্য সহায়তা যেন করা হয়।'

কিছুদিন চিন্তায় কাটল, যেতে কি পারব? অবশেষে মিনিস্ত্র দ্য' লা ফ্রঁস দ্য

উএ্মের-এর এক চিঠি মিলল। জানা গেল আমাদের অনুরোধ-এর ভালো সাড়া মিলেছে।

পয়লা আগস্ট লন্ডন থেকে প্যারিস রওনা হলাম। সেখানে নিয়মকানুনের ঝামেলা বহুৎ চলল। চারদিন বাদে উঠলাম স্কাইমাস্টারে। এ বিমানটি আমার তেমন প্রিয় নয়। ডাকার গিয়ে মাঝরাতে এক হোটেলে জায়গা পেলাম। IFAN-এর মানুষজন খুব সাহায করল। মন্ত্রী, কমিশনার ও পুলিস, সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলাম। ব্রিটিশ কনসাল যদিও মনে করতেন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের সকল আগ্রহ শুধু 'স্তনবৃন্তে ও মন্দিরে', তিনি যথেষ্ট ভদ্রতাই করেন।

ডাকার থেকে গেলাম ওৎ ভোল্তায়, তারপর জঙ্গলের গহীনে বোবো দিয়োলাসেতে, আর আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরু হ'ল।

পৌঁছতে কিছু দেরি হয়, সূর্য পশ্চিমে হেলছে। সামান্য ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ডাকার থেকে স্বামীরা ফিরছেন। তাঁদের স্বাগত জানাতে উৎসাহউচ্ছল ফরাসি মহিলারা শর্টস ও টুপি পরে এসেছেন— আত্তআগাডাওগাউতে এক প্রতিনিধি দল যাচ্ছেন, তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন আফ্রিকান চীফরা। বিমানবন্দরে এঁদেরই ভিড়।

একটা কিছু হোক, এমন আশায় আমরা একটি বিমানের ডানায় নিচে দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। অবশেষে দেখি আমাদের মালপত্তর চাপানো হচ্ছে এক জরাজীর্ণ বাসে, তার উইণ্ডস্ক্রীণে লেখা 'ঈশ্বরই আমার শরণ।'

ভিক্টর বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা ঢুকে পড়লেই ভালো।'

আমরা ঢুকে পড়লাম।

কিছুক্ষণ বাদে এল এক ছোকরা পুলিস। আমাদের পেশা কী তা জানতে চাইল। 'মানবজাতিবিজ্ঞানী' (এথনোলজিস্ট) শব্দটা ওর তেমন পছন্দ হ'চ্ছে বলে বোধ হল না। ওব পেনসিল ছিল না। তাই আমার পেনসিলটা দিলাম। ওটা নিয়ে ও চলেও গেল।

আরো অপেক্ষা করেত হ'ল। অবশেষে এক সুদর্শন যুবক, হরিণশিকারির মতো হরিণের শিং লাগানো টুপি পরে এসে আমাদের হাত ঝাঁকাল, ড্রাইভারের সীটে বসল। শহরপানে চলল ঝোড়োগতিতে।

বহু জায়গায় দাঁড়াতে হ'ল। ড্রাইভারের নিজস্ব কাজ ছিল। তারপর আচমকা গাড়ি দাঁড়ায় এক হোটেলে। আমরা টেলিগ্রামে জায়গা রাখার কথা বলেছিলাম। রাস্তার পাশে আমাদের মালপত্তর দুমদাম নামিয়ে একগাল হেসে, সকলের হাত ঝাঁকিয়ে ড্রাইভার রাতের আঁধারে উধাও হ'ল।

হোটেলটি আলোয় ঝলমলে। দেখতেও ভালো। সামনে এর মস্ত পামকোর্ট। বৃষ্টি থেমে গেছে, ওয়েটাররা টেবিল এনে রাখছে। মনটা উল্সে উঠল। কিন্তু আপেল সদৃশ গাল যাঁর, যাঁকে দেখলে মনে হয় মেডকের কোনো কৃষিখামার থেকে

এসেছেন,সেই হোটেল মালিক বললেন, জায়গা রাখা হোক, এ মর্মে কোনো টেলিগ্রাম তিনি পান নি। আমার সন্দেহ, (সে তার) উনি পেয়ে থাকলেও কোনো ইতরবিশেষ হ'ত না। আমাদের যে সব সহযাত্রী এর আগে নিজের নিজের গাড়িতে এসেছেন, দেখতেই পেলাম, তাঁরা জায়গা পেয়ে গেছেন। মনে হয়, হোটেলের সঙ্গে এয়ার ফ্রান্সের কোনো চুক্তি ছিল। আজকের মতো যেদিনই ওই বিমান রাত করে এসে পৌঁছবে, সেদিন ওই বিমানযাত্রীদের আগে জায়গা দিতে হবে।

মালিক বললেন, একটা জায়গাও নেই। না, অন্য হোটেলও নেই। তবে আজ হল 'ফীস্ট অফ দি অ্যাসাম্প্শান'- এর (স্বর্গ কর্তৃক যিশুজননী মেরিকে গ্রহণের) রাত। রাতভোর নাচ চলবে। ইংরেজ জাতিবিজ্ঞানী ও তাঁর বন্ধু ডিনারে সাদরে আমন্ত্রিত। হাত ছাড়িয়ে বোঝালেন, ভেবে দেখ, কি খাবারদাবার! কি পানীয়! কি পরিবেশ!

পামকোর্টের একপাশে আমাদের মালপত্তরের এক ছোটখাট পাহাড়। বসার মতো জায়গা না পয়ে ভিক্টরের বিছানার উপর বসে আছি, বিষণ্ণ মনে দেখছি আনন্দ উৎসব। ওদিকে ভিক্টর তার পুঁথি-পড়ে শেখা ফরাসিতে প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে।

তখন একটি ফরাসি শিশু তার খাড়াচুলওয়ালা, ইয়া লম্বা কালো পুতুলটি বুকে জাপটে কাছে এসে আপত্তিজনক চোখে আমাকে দেখতে থাকল। যেন পুতুলটা ভালো, আমি তুলনায় খারাপ। অমি ভাবছি, জবাব দেবো। এমন সময়ে সৌভাগ্যক্রমে বাধল খাবার টেবিলে টেবিলে তুলকালাম ঝগড়া। মহিলারা চেঁচাচ্ছেন, বোতল উলটে পড়ছে। ভিক্টর প্রাণ বাঁচাতে চেয়ারে উঠে পড়ল।

শেষমেশ যেমন হোক, ঘর একটা পেলাম। সৌভাগ্যক্রমে ফরাসি কলোনিগুলির প্রশাসকদের একজন এ পুণ্যদিনের সম্মানে মদ্যপান করছিলেন, তিনি গৃহমন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনেরালের নামের উল্লেখ শুনতে পান। ভিক্টর, হাই কমিশনারের চিঠিতে কাজ না হওয়াতে, মরিয়া হয়ে তার অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করছিল। মঁশিয় দ্যুবোলে একটা সুরাহা করে ফেললেন। নামটা একটু বিদ্ঘুটে, খানিক একগুঁয়েও বটে, তবে হাসিখুশি, কাজের লোক। পুরো হোটেল নতুন করে খোঁজা হল, আমরা একটা ঘর পেলাম।

ডিনার মন্দ ছিল না। মদ্য-বিহীন ডিনার মাত্রই একশো ফ্রাঁ। তারও চল্লিশ রকম তালিকা। আমরা মাছের সুপ ইত্যাদি দিয়ে ভালই খেলাম। আমি শামুকও নিলাম, তবে খেলাম না বললেই হয়। ওগুলো টিনের শামুক।

বোবো-দিয়োলাসো এবং আমাদের প্রথম পরিচয় এ রকমই। পরদিন ভোরে উঠে বেরোবার তোড়জোড় করতে গেলাম। আমাদের দরজার বাইরেই দুই হোটেল ভৃত্য একটা বানরের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। নিশ্চয় রাতেই ওটা মরেছে কোনো অজানিত অসুখে। আমি যাচ্ছি, ওরা হাসল। ভাগ্যে হাত ঝাঁকায় নি। হালকা গরম কফি ও

রোল্‌স দিয়ে প্রাতরাশ সেরে আমি ও ভিক্টর একটা লম্বা লাল রাস্তা ধরে চললাম দোকানের দিকে। চারপাশে কত, ফুল বড়ই সুন্দর।

অনেক আলোচনার পর আমাদের প্রোগ্রাম বানানো হল। গাড়ি ভাড়া করলাম। অভিযানে বেরোলাম।

বোবো-দিয়োলাসো থেকে প্রায় দু'শো কিলোমিটার দূরে গায়োআ আমাদের প্রথম গন্তব্য। এটি এক জেলার কেন্দ্রে। গাইডবুক বলছে, জায়গাটিতে দুর্ঘটনার ভয়। অধিবাসীদের দেখাটা অবশ্য আকর্ষণীয়। মোটামুটি ভোরে বেরোলাম দুটো গাড়ি নিয়ে। একটি বড় স্টেশন-ওয়াগন, একটি জীপ। অরণ্য পথে যাওয়াটা তেমন আকর্ষণীয় নয়।

রাস্তা চলছে, চলছে, চলছে। বেঁটে গাছ এবং কাঁটাঝোপের মরুভূমি দিয়ে। লোকজন খুব কম, বন্যপ্রাণীও দেখলাম না। মাঝে মাঝে খুব কর্মচাঞ্চল্য। মানুষজন বাজারে এসেছে। মেয়েরা চলেছে সার বেঁধে। চমৎকার লম্বা তারা। মাথায় ঝুড়ির বোঝার ফলে আরো লম্বা দেখায়।

হঠাৎ হঠাৎ উজ্জ্বল লাল পাখি তার সৌন্দর্য বিকীরণ করে উড়ে যায় ঝাঁক দেখিয়ে।

মাঝে মাঝে পথে পড়ে গ্রাম। গাড়ি থামে, আমরা নেমে একটু দেখি। ওদের মাটির বাড়িগুলো ক্ষেতের মাঝখানে। এমনভাবে গড়া, যেন দুর্গ। খুব তারিফ করার মতো। সার সার মৃৎপ্রাচীর। তার মাঝে মাঝে ফোকর। সবুজ সাগরের মধ্যে মধ্যে যেন উঁচু উঁচু শিলা।

এ ভাবেই এক সপ্তাহ কাটাই। দেখলাম চমৎকার বোবোদের; একটি ডিয়ান্ গ্রাম; ফুলানিদের পশুচারণ। কাউল্ নামে এক জায়গায় দেখলাম অসামান্য লোবি মেয়েদের, যাদের বলা চলে 'অধিত্যকার মেয়েরা'। প্রথম দর্শনে মনে হয় ওদের চেয়ে কুদর্শন মেয়ে দেখি নি। অবাক কাণ্ড, খুব ঝটপট আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেল।

বোবো-দিয়োলাসোতে ফিরলাম। ট্রেনে চেপে চললাম আইভরি কোস্টের আবিদজানে। ব্লু ট্রেন এবং ফ্রান্সের গ্র্যান্ড এক্‌সপ্রেস আমাদের মনে ছিল। রেলওয়ে কোম্পানির বিশাল নামটি অভিভূতও করেছিল। আশা করছিলাম, বিলাসভ্রমণ না হোক, আরামে যাওয়া যাবে। বস্তুত, 'দি কোম্পানি ইন্‌টারন্যাশনাল অফ রেলওয়ে গ্রাণ্ড এক্‌সপ্রেস ইউরোপীয়ান' আমাদের জন্য রেখেছিল এক কম্পার্টমেন্টে চারটে করে কাঠের বেঞ্চি, খড়ের গদি এবং সরু সরু খড়ের বালিশ। জানলা ঢাকা মোটা ব্যাণ্ডেজের কাপড়ে যাতে এঞ্জিন থেকে কাঠের আগুনের ফুলকিগুলো ভিতরে না ঢোকে। যাত্রীরা যাতে বাতাসের ঝাপটা কেন, কোনো বাতাস না পায়, সেটাও (ওই পর্দার জন্য) ঘটছিল। পুরো বগিটাতে একটি শৌচাগার। যেমন ছোট, তেমন নোংরা। একমাত্র কলটি খুললাম, এক ফোঁটা জলও পড়ল না।

আফ্রিকার ট্রেন বেগে-ধাওয়ার জন্য নয়, সে এক ধীরগতি বাজার। প্রতি স্টেশনে লম্বা বিরতি। চাষীরা ছাগলের পাল, ডিমের ঝুড়ি, রাঙাআলুর স্তূপ, লাউয়ের খোল বোঝাই ধেনো মদ নিয়ে ভিড় করে আসে। অধিক উদ্যোগী রেলকর্মীরা, তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের অনেকে এসব মাল প্রচুর কেনে। যাতে (আইভরি) কোস্টে গিয়ে মোটা মুনাফায় বেচতে পারে। নিজেদের কম্পার্টমেন্ট গাদা বোঝাই হয়ে গেলে, প্রথমশ্রেণীর করিডরে সেগুলো রাখা হচ্ছে। সবাই, সর্বত্র সকলের হাত ঝাঁকাচ্ছে। প্রতি স্টেশনে রেলকর্মীরা কিছুটা মদ খাচ্ছে। ফলে রাতে ট্রেন চলছে অদ্ভুত ভাবে। কখনো এত ধীরে যাচ্ছে, যে মনে হয় এবার থামবে। হঠাৎ, যেন চট্‌কা ভেঙে দারুণ বেগে চলল। চুল্লী থেকে মেঘের মতো বেরোতে থাকল আগুনের ফুলকি। তখন উত্তেজনায় চেঁচাতে চেঁচাতে ব্রেকম্যানরা দৌড়ল। প্রতি কোচের পিছনে যে চাকা, সেগুলো ঘোরাতে থাকল, যতক্ষণ না ট্রেনের গতি কমে।

তবে এ অভিযানে সবার উপরে হ'ল ফ্রেঞ্চ টোগোতে যাওয়াটা। ১৯৩৩-এ এসেছিলেন জিওফ্রে গোরের। তাঁর কারণেই আমাদের আকর্ষণ বাড়ে। তিনি বলেছিলেন, তিনি যাদের দেখেছন, তাদের মধ্যে কাব্‌রাইরা হ'ল 'সভ্য' না হওয়া একমাত্র আফ্রিকান গোষ্ঠী, যারা পাগল নয়। আবিদজান থেকে লোমে গেলাম বিমানে। সমুদ্রোপকূলে এটি ছোট্ট সুন্দর এক রাজধানী। তারপর গেলাম উত্তর দিকে। টোগো হ'ল লম্বা একটি সরু আঙুল, যা আফ্রিকার পাঁজরে খোঁচা মারছে। আমরা যাব (ওই আঙুলের) নখের গোড়ার কাছে। যাব পাহাড়িয়া দেশে। ওখানেই কাবরাইদের গ্রাম। যাত্রাপথে দেখলাম কোন্‌কোম্‌বাদের। সারা-তে থাকার জন্যে দলপতির আরামদায়ক বাড়িটি পাই। সুদর্শন, বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষদের সঙ্গে চমৎকার কাটে সময়। কখনো ভুলব না সারা রাতব্যাপী নাচের কথা।

আইভরি কোস্ট থেকে দূরে চড়াই পথে আমাদের যাত্রা যেমন ভালো তেমন উত্তেজনাপূর্ণ। সে যেন এক ভৌগোলিক নগ্ন নৃত্য। উত্তর পানে যতই যাই, মানুষজন ততই স্বল্প-বাস। মনোরম অরণ্য অঞ্চল ধরে চলেছি। হাসিমুখে নরনারী হাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছে। শুনলাম, ওরা খালি হাত ওপরে তোলে। দেখিয়ে দেয় হাতে হাতিয়ার নেই।

অবশেষে পৌঁছলাম লামা কারা। সেখানকার অফিসার পিয়ের অবানেল খুব ভাল ব্যবহার করলেন। চমৎকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেটা খুব কাজে লাগল। ভারতে থাকলে যা করতাম, তাই করতে চেয়েছিলাম, এবং করলাম। হেঁটেই গেলাম কাবরাই পর্বতমালা পেরিয়ে। প্রথমে যে দু'তিনটি গ্রাম দেখি, তা বড়ই ম্যাড়মেড়ে, খানিক 'সভ্য' ও বটে। জিওফ্রেকে গাল দিয়েছি, ও আমাদের ভুল বুঝিয়েছে বলে। তবে একেবারে ভিতরে ঢুকে মনে হল, তেমনটি কখনো দেখিনি, দারুণ।

কাবরাইরা উত্তম চাষী। নিজেরা যেমন সুদর্শন,— তেমনি চমৎকার বাড়ি বানায়,

সাফসুরৎও রাখে। সে সময়ে ও অঞ্চলে অসুখবিসুখ যথেষ্ট হ'ত। যেমন গলায় ঘেগ বা গালগণ্ড, অন্ত্রাশয়ে হার্নিয়া, স্লীপিং সিকনেস। তবু অনেকেই চমৎকার দেহসৌন্দর্যের নিদর্শন। দলপতিরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট লোকজনের পোশাকে খুব বাড়াবাড়ি। কিন্তু অন্যরা, বিশেষ করে পরম সুশ্রী তরুণ-তরুণীরা সে সময়ে সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহে থাকত। ক্যাথলিক মেয়েদের উন্নত স্তনের মাঝে দোলায়মান ক্রুশের পেশেন্ট-যুক্ত হার ছাড়া দেহে কিছু থাকত না। এক উদ্যোগী ফরাসি ব্যবসায়ী টুপি এনেছিলেন, তা অনেকেই কেনে। এ টুপি পরা মানুষদের দেখার মতো, দেহে তো আর কিছু নেই। একদিন এক বৃদ্ধকে দেখলাম, লম্বা দাড়ি, মাথায় টুপি। টুপিটি খুলে কোনো ফরাসি অভিজাতের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে সে বলল, 'বঁজুর ম্যঁশিয়।'

গোরের অনেক আগেই বলেছিলেন, কাবরাইদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারটা খুব কম, এবং তারা মৃত পূর্বপুরুষদের ভয়ে সন্ত্রস্ত নয়। ওদের এই মুক্ত-মানস আমার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটে। ওদের তথাকথিত লজ্জাশরম ও শালীনতার বাড়াবাড়িও নেই। যা আছে তা এক অসামান্য নিষ্পাপতা। প্রতি গ্রামে আমাকে ও ভিক্টরকে আলাদ আলাদা মাটির ঘরে থাকতে দেওয়া হত। নগ্নদেহ লাবণ্যময়ী তরুণীরা দিনে ও রাতে যখন তখন আসত। আমাদের পাশে বসত। শরীর বিষয়ে চেতনার কোনো চিহ্ন দেখিনি। গোরের বলেছেন, 'মেয়েদের যৌনস্বাধীনতা অবাধ।' এবং পুরুষ 'আসক্ত সমকামিত্বে।'' আমি বা ভিক্টর এ সবের চিহ্নও দেখি নি। নিজেদের শুচিতা রক্ষায় এত ব্যস্ত থাকতাম যে এসব দেখাশোনার ক্ষমতা তেমন ছিল না। মনে হয়, গোরের অন্য কোনো এলাকার কথা বলে থাকবেন। আমাদের মতো অত গভীর গহনে যান নি উনি।

দুটি গ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ফাউদা এবং এনেইদা। এককেটিতে আমরা বেশ অনেকদিন থেকেছি। বারবার ম্যালেরিয়া হয় আমার। গলাতেও কষ্ট ছিল প্রায় আগাগোড়াই। তাতেও এ চমৎকার যাত্রার উত্তেজনা দমে নি, আনন্দ কমে নি।

জীবনের কিছু শ্রেষ্ঠ ফোটো ভিক্টর তোলে। পরে *জিওগ্রাফিকাল ম্যাগাজিন*-এ তার কিছু ছাপা হয়।

অবশেষে এই আনন্দউজ্জ্বল, ক্লীন্নতামুক্ত, ভাবনাতিচন্তার বোঝাহীন মানুষদের দেশ ছাড়লাম বিষণ্ণ মনে। গেলাম কোস্টে, সেখান থেকে নৌকা পথে দাহোমি, তারপর গাড়িতে লাগোস্।

লোমে থেকে বিদায়, অতীব চমকপ্রদ।

জেটিতে ছিল সার সার অত্যদ্ভুত কাঠের চেয়ার। ইংল্যান্ডে মেলায় বিশাল নাগরদোলায় উঠলে যেমন চেয়ারে বসতে হয়, ঠিক তেমন। এক অফিসার হাত নেড়ে বললেন, আমরা যেন মালপত্র সহ তার একটিতে বসি।

হঠাৎ সাইরেন তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্তনাদ করে। জংধরা যন্ত্রপাতি ঘড়্‌ঘড়িয়ে একটা

ক্রেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। অন্ধকার থেকে এক বিশাল আংটা আমাদের মাথার উপরে নেমে ঝুলে থাকল। উত্তেজনায় চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের কুলিরা ওটা ধরল। ওটার সঙ্গে লাগাল এক লোহার ডাণ্ডা, সেটা আমাদের চেয়ারে লাগানোই ছিল। আবার সাইরেনে চিৎকার। আমাদের টেনে তোলা হল উপরে, চল্লিশ ফিট নিচে আটলান্টিক মহাসাগর।

এবং সব আলো নিভে গেল।

মনে হল নিচে কোনো বোট আছে, কেননা আঁধারের গহ্বর থেকে পুরুষ কণ্ঠে অজানা ভাষা শোনা যাচ্ছিল। আমরা কিচ্ছুটি দেখতে পাচ্ছি না। উপরে দুলছি।

পাঁচ-ছয় মিনিট বাদে আলো জ্বলল। সাইরেনে চেঁচাল, আমরা সমুদ্রের দিকে গেলাম, একটা ছোট বোটের ডেকে ধাক্কা খেলাম। বোটটা ঢেউয়ে এমন আছাড় খাচ্ছিল, যে আবার আলো নিভে গেল।— এবার আধঘন্টা আলো বন্ধ।

ঢেউগুলো যেন রাক্ষুসে। অতিকায়। আমাদের ছোট বোটটি এই আগ-গলুইয়ে সিধা ওঠে, আবার পাছ-গলুইয়ে। অত উদ্বেগ না থাকলে আমি খুব বমি করতাম।

ভিক্টর সহসা আমার বাহু আঁকড়ে বলল, 'হায় ঈশ্বর! ওটা কী?'

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল, শুকনো নারকেল শাঁস বোঝাই ঝুড়িতে গাদা করা একটা বোট। আমাদের নৌকার উপর যেন চড়াও হবে। আমি চোখ বুঝলাম। সংঘাত অনিবার্য। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। আমাদের বোটের মাঝিরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড় দিয়ে ধাক্কা মেরে হানাদারকে সরাল। সে নৌকোটি যেমন অতর্কিতে এসেছিল, তেমনি নিমেষে আঁধারে মিলিয়ে গেল।

অবশেষে আলো যখন এল, আরেকটি ম্যামি চেয়ার (ওই ভয়ঙ্কর কাষ্ঠাসনগুলির নামই ওই) আমাদের বোটে নামল। এতে নামলেন জাহাজের এক অফিসার, এবং প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত দুটি ফরাসি মেয়ে। ওরা জেটিতে কয়েক ঘন্টা বসেছিল। একটা স্টীমলঞ্চ এগিয়ে এল, দাড়ি নেমে এল, আমাদের দ্রুত বেগে টেনে নিয়ে চলল আটলান্টিকের দিকে।

আমাদের বোট আছাড়পিছাড় খাচ্ছে। শীকরকণা ভিজাচ্ছে অমাদের, ফরাসি অফিসার কথা বলছেন, মেয়েরা চেঁচাচ্ছে। ভিক্টর আর আমি ভয়ে মুখ সবুজ, আশঙ্কায় অসুস্থ, চেয়ার আঁকড়ে বসে আছি।

অবশেষে জাহাজের বিশাল চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল আমাদের এক জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে আমাদের অনেক উপরে এক উজ্জ্বল আলোকিত ডেকে ক্রেন দেখতে পেলাম। কিন্তু মুক্তির সময় আসে নি। এখানে সমুদ্র খুব বিক্ষুব্ধ, প্রায় বিশটা বোট ধাক্কা মারছে জাহাজের গায়ে। একটা বিশাল, বিশাল ঢেউ ওগুলোকে সাঁ করে উপর পানে তুলে দিল। মনে হ'ল ওগুলো আমাদের ওপর আছড়ে পড়বেই। কি

ভীতিকর দৃশ্য। এই সাদামাটা কাঠের নৌকোয় ভিড়, মাঝিরা হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাচ্ছে আমাদের মাথার ওপর,— আমরা দুটি তরঙ্গের মধ্যে জলের ঘূর্ণিপাকে।

অবশেষে বাঁচলাম, একটা হুক নেমে এল। আমাদের মাল্লারা অন্য চেয়ারটাকে তুলে দিল। আমাদের দাবি অগ্রগণ্য ছিল, আধঘন্টা আগে থেকে নৌকোয় বসে আছি। আবার নামল হুক। আমরা উঠে গেলাম আলো উজ্জ্বল এক নট-দোলন-কাঁপন ডেকে।

খুবই আরামদায়ক। ভালো কেবিন, ফরাসি খাদ্য পানীয়। কিন্তু ম্যামি চেয়ারদের সহজে ভোলা যাবে না।

ব্রিটিশ নাইজোরিয়ার অবস্থা অনেক ভালো। রাস্তা অনেক সিধা, হাসপাতাল আরো বড়ো। স্কুল অনেক পরিষ্কার, কিন্তু তুলনায় শীতল। করমর্দন-টর্দন নেই, এরা ফরাসি নয়।

ক'দিন লাগোসে থেকে বিমানপথে প্যারিস। তারপর সিধা কলকাতা। তারপর ঘরে ফেরা পাটানগড়ে।

চার

ফরাসি পশ্চিম আফ্রিকায় এক মহা অসুবিধা ছিল। আমি কোথাও এক পেয়ালা চা পাইনি।

ওই বিশাল এলাকার দোকান ও হোটেলগুলির, ও বস্তুটা কী সে বিষয়ে ধারণা খুব ঘোলাটে। দীর্ঘকালের অভ্যাস হয়ে গেছে ওই চাঙ্গা করে তোলা পানীয়ে। জুটতে শুধু নোংরা পেয়ালায় খারাপ কফি। অবশেষে কয়েক সপ্তাহ নৈরাশ্যের পর টোগোল্যান্ডের লোমের বিশাল বাজারে একটা পতপতে চায়ের প্যাকেট পেলাম। তার একপাশে জাদু-ওযুধ-এর মালমশলার দোকান, অন্যদিকে অনেক চেম্বারপটের দোকান। তখন বুঝলাম ডক্টর জনসনের কথার যাথার্থ্য, 'এই মনোমোহন চা পাতার মিশ্রণ; যার কেটলি জুড়োবার অবসর পায় না; যে চা খায় আরামে সন্ধ্যায়, মাঝরাতে চা তাকে দেয় সান্ত্বনা। প্রভাতকে স্বাগত জানায় সে চা দিয়ে।'

চা, এমনকি কফিও হল প্রধান। তবে খাদ্যও আছে।

আমি সত্যিই আরাম্সে খাই সাদাসিধা ভারতীয় নিরামিষ খাবার। সু-রন্ধিত ডাল ও ভাতের জুড়ি নেই। পাটানগড়ে আমার খাদ্যসূচী ছিল সাদাসিধা :

পরধানের রাঁধা ভাত
পাটানগড়ের নিজস্ব পদ্ধতিতে জাফরাণ-পক্ক কচি মুরগি
থেঁতো করে, বা শিলে বেটে জংলা সব্জি।

একই সঙ্গে আমি অনেক পদের সুস্বাদু রান্নাও ভালবাসি। যা বলতে গেলে পাই না। অনসূয়া বেশ তিরিশ বছর আগে যেমনটি খাইয়েছিলেন। তেমন গুজরাটি নিরামিষ রান্না আমার সবচেয়ে পছন্দ। আর ইন্দিরা লুথরার রান্না বিষয়ে বলব,

'শিল্প এর চেয়ে সহজ লাবণ্যমণ্ডিত হয় না।
প্রকৃতি এ-থেকে এতটুকু হরণ করতে পারে না।'

অন্যরকম খাবারদাবার ব্যাপারে আমার জ্ঞান ভিক্টর স্যাসুনের সঙ্গে জড়ানো। প্যারিসে, নৎর্দামের সামনে 'ত্যুর দ্য আরগঁ'-তে একটিবার খাবার বড় সাধ ছিল। এ. ই. হাউসম্যানের মতে " কাফে দ্য পারী" অনেক ভালো। ওদের কমলালেবুর রসে রান্না করা হাঁসের মাংস; বরবু উসমান (হাউসম্যানের সম্মানে) চীজ্ দিয়ে রাঁধা মাছ, সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট নতুন আলু। মে মাসের এক চমৎকার সকালে ভিক্টর আমাকে নিয়ে যায় ওখানে। হোটেল মালিক 'বারবু উসমান" শব্দটি শোনেন নি। স্মোক্‌ড সামন মাছ দিয়ে শুরু করলাম। তারপর 'কানার অ স্যাং' (নং ১৯৯৫৩৯) খেলাম। শেষে কিছু আর্টিচোক (সবুক ডাঁটা জাতীয় সবজি) এবং অভিজাত মদ্যপান।

ভিক্টরের সঙ্গে ভ্রমণ পর্যায়ে ইউরোপ ও ফরাসি আফ্রিকায় খেয়েছি। ছোট ছোট দোকানে পেতাম চমৎকার ব্রান্ডি। জঙ্গলের গহীনেও, অনেক সাদাসিধা চমৎকার ফরাসি খাবার। আমরা অসম্ভব লোভ দেখাতাম না। তবে ওই একবার যা খেয়েছি, তা ভুলিনি। আমাদের অন্যতম স্মরণীয় ভোজন মেলে ব্রাসেল্‌সে, অপ্রত্যাশিত ভাবেই রু দ্য লা ভিয়োলেৎ-এ ল্যু দা ফ্রঁসে। খুব বুঝদার ও কর্মদক্ষ এক ওয়েটারের জন্য ব্যাপারটি উপভোগ্য হয়। এসকারিও দ্য বুরগোয়াঁ খেলাম, অতঃপর ঠাণ্ডা গলদা চিংড়ি, কক্ ও ভ্যাঁ দ্য আভিনি, শেষে, ক্রেপ ফ্লঁবি বা আগুন পক্ক প্যানকেক।

লুগানোতে খাই এক চমৎকার লাঞ্চ। ডিনার নয়, লাঞ্চই আমার পছন্দ। নুড্‌ল ও ডিম, মাখনে রাঁধা, সস্ বোলোনেজ্, ফ্রেস দে বোয়া রোমানফ্। আরেকদিন খাই ঠাণ্ডা আর্টিচোক, সঙ্গে সস্ গ্রিবিশ। চমৎকার!

ভেনিস ও রোমে তেমন আহামরি খাইনি। শ্রেষ্ঠ ইটালিয়ান খাবার খেয়েছি শিলংয়ে। আমাদের অত্যন্ত বিশেষ বন্ধু জিতেন ঘোষের বউ সুন্দরী ইনেজ্, রাভিজলি রাঁধত। না খেলে তার স্বাদুতা বোঝা যাবে না।

স্বচ্ছন্দে গা আলগা দিলাম প্যারিসে। ঔপন্যাসিক উইলফ্রিড ডেভিড ও শামরাওয়ের সঙ্গে পনেরো বছর আগে যাই রাইন পেডক্-এ। এবার ভিক্টর ও আমি সেখানে ভালো কিন্তু অত্যধিক হিসেবছাড়া লাঞ্চ খেলাম। হোটেল ম্যানেজারের পরামর্শ শুনলাম না মূর্খের মতো। সে বলেছিল বিখ্যাত 'কক্ অ ভ্যাঁ অ শাতো দ্য কতোঁ অঁদ্র' খেতে। না শুনে আমরা খেলাম, শাম্‌পাইন সতেঁ আ লা বোর্দোলেজ্; ক্রুইৎ; সতি ফ্র্যাঁ এর্ব; রোইর্নঁ দ্য ভ্যো ফ্লঁবে।

মমার্তে পাই চমৎকার হোটেল ওবের্জ দ্যু সাংলিয়ের ব্লো। সেখানকার তন্দুরী ভেড়ার চপ যেন শূন্যভুবনে নিয়ে যায়। আর গলদা চিংড়ির সুপ খেতে ওখানে বারবার যেতাম।

লা এস্‌কারিও রেস্তোরাঁ ছিল পছন্দসই। তার 'মেনু'ত্র সোয়াইনে' ব্যাপারে প্রথম পুরস্কার পাবে শামুকগুলি। যাদের নামে এ খাদ্যের নাম।

যাহোক, একেবারে সাদামাটা রান্নাতে আমার বেশ চলে যায়। দুনিয়াতে অন্তিম ভোজ খেতে হলে আমি শুরু করব 'সস্ ভিন্যাইগ্রে'-এর সঙ্গে এস্‌কারিও দিয়ে। খাবো বারোটা অয়েস্টার, 'সস্ অল্যান্দেজ্'-এর সঙ্গে অ্যাস্‌পারাগাস। শেষ করব 'ক্রেপ্ সুজেৎ' দিয়ে। কোন মদিরা পান করব, ভেবে লাভ নেই। হয়তো ততদিনে ভারতে মদিরা থাকবেই না।

সর্বশেষে সিডনি স্মিথ-এর সঙ্গে আমি একমত। সে বলত 'স্বর্গ বলতে তার স্বর্গ হোল ভেরী বাজাতে বাজাতে 'পাতে দ্য ফোয়া গ্রা' খাওয়া। যাকগে, পাটানগড়ে বিশ বছর আগেকার কথা বলে জাল গোটাই। সেখানে আমাদের অতীব দেহাতি রাঁধুনি সকলকে চমকে দিয়ে বলল, রাতে খাবার জন্য 'মশলাদার পশ্চাদ্দেশ (বাটক্‌স)'' রান্না হয়েছে। সামান্য যে কয়টি ইংরিজি রান্না জানত, সে বিষয়ে ওর বেজায় গর্ব ছিল। 'বাটক্‌স' বলতে ও বোধহয় 'বাটাক'। অর্থাৎ 'হাঁস' বোঝাতে চেয়েছিল। আরেকদিন গ্রামে জোর আলোচনা। আমি কি রকম সাহেব। সদ্য সদ্য কমিশনার ঘুরে গেছেন। তাঁর বিষয়ে সংশয় নেই, তিনি 'পাক্কা সাহেব।' এক সাধারণ ভারতীয় অফিসার এসেছিলেন। তিনি 'ডালভাত' সাহেব। কিন্তু আমি? রাঁধুনিটি ধাঁধার উত্তর দিল, 'উনি মশলাদার সাহেব।'

পাঁচ

পরের বছর আমি আর ভিক্টর আবার যাই আফ্রিকা। উদ্দেশ্য, বেলজিয়ান কঙ্গো এবং ফ্রেঞ্চ ইকুয়েটোরিয়াল আফ্রিকা গমন। বোট চেপে মোম্বাসা গেলাম, উপভোগ করতে পারি নি। বিমানভ্রমণে মনে জাগে মৃত্যুভয়, সমুদ্রপথে ভ্রমণে এমতো ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগে। নাইরোবি অবধি গিয়ে আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশের তোড়জোড় সবে শুরু করেছি, আমার গলব্লাডারের যন্ত্রণা শুরু হ'ল। যে বিশেষজ্ঞকে দেখালাম, তিনি বললেন, ডাক্তারি চিকিৎসাব্যবস্থার উপায় নেই এমন আরণ্য দুর্গমে যাওয়া বিপজ্জনক হবে। ফল দাঁড়াল, ভ্রমণসূচি ঢেলে সাজাতে হ'ল। ভিক্টর অবশ্য শেষাবধি গিয়েছিল। কঙ্গোর খানিকটা দেখেছিল। সে জন্য ওকে সর্বদা ঈর্ষা করেছি। কিছু কাল কাটালাম নাইরোবির আশপাশে। (নাইরোবিতে) ছিলেন শৈশবের বন্ধু ডাক্তার এল. এস. বি. লিকি। আমরা দুজনেই ধার্মিক মিশনারি মা-বাপের ধর্মত্যাগী সন্তান। ইনি আমাদের কিকুয়ু এবং মাসাইদের কিছুটা দেখান। মাউ-মাউ আন্দোলন তখনো শুরু হয় নি। তবে ব্রিটিশ অধিবাসীরা নিজেদের ধ্বংসের ভিত খুঁড়ছিলেন। চারপাশে টান-টান উত্তেজনা যে বাড়ছে, সে আঁচ আমরা পেয়েছিলাম।

কিলিমাঞ্জারোর পাদদেশে আরুশা ও মোশিতে থাকি, যখন ঝটপট টাঙ্গানায়িকা

ঘুরে আসি। ভোর নামক জায়গায় দেখি কিছু আরণ্য প্রাণী। তেয়িস্তা পাহাড়ে উঠে সাক্ষাৎ পাই ওখানকার মানুষজনের। মৃজিমা ঝরনায় এক ক্রুদ্ধ মাদী হিপোপটেমাস আমাদের তাড়া করেছিল।

এরপর বিমান পথে যাই এনতেবে। পরে কাম্পালা। উগাণ্ডা আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। বর্ণপার্থক্য ওখানে কম। আমাদের ভাগ্য ভালো, — চমৎকার একটা গাড়ি ভাড়া করা গেল। আফ্রিকান ড্রাইভারটিও খুবই দক্ষ। গুলুর উত্তর অবধি গাড়িতে যাই, নাইলে নৌকা ভ্রমণ করি। ঘুরতে ঘুরতে আচোলি ও লাগবারাদের কিছু দেখি। বেলজিয়ান কঙ্গোতে ঘন্টা দুই ঘুরি। তার আগে পাসপোর্ট ও পারমিট নিয়ে অবিশ্বাস্য রকম ঝামেলা হয়। এ তো সর্বব্যাপী লালফিতার অভেদ্য চক্কোরের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য। ওখানে লাঞ্চও খাই।

(আফ্রিকান নৃত্য বিষয়ে) তাঁর ধ্রুপদী বইয়ে জিওফ্রে গোরের বলেছেন, 'আফ্রিকান নাচ। ওরা আনন্দের কারণে নাচে। শোকের কারণেও; ভালোবাসা জানাতে নাচে, ঘৃণা জানাতেও; সর্বনাশ এড়াতে নাচে; ধর্মের জন্য নাচে, এবং সময় কাটাতে নাচে।'

তবে ১৯৫০ সালেই আফ্রিকান নাচ হয়ে উঠেছিল ছাড়া-ছাড়া, যখন-তখন, হঠাৎ-হঠাৎ স্বভাবের। পুব ও পশ্চিমে কিছু এলাকা তখনো ছিল, যেখানে গোরের কথার সমর্থন মেলে। অনেক এলাকায় নৃত্য তখনি অতীতে চলে গেছে। হয়তো ধর্ম বদল, অথবা সাধারণভাবে আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থির পরিস্থিতির ফলে নৃত্যের আবেগ হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। আফ্রিকাতে নাচ দেখা সর্বদা সহজও নয়। ঠিক সময়টিতে যেতে হবে, মানুষজনকে নাচের মেজাজে থাকতে হবে, এবং তাড়াহুড়ো করলে চলবে না।

উগাণ্ডায় মনোরম শস্যউর্বর জায়গা দিয়ে উত্তর দিকে চলেছি গাড়িতে। অবশেষে প্রায় সুদান-সীমান্ত অবধি বিস্তারিত আচোলি জেলায় পৌঁছলাম। আচোলিরা নাইলোটিক (বা নীলনদের) আদিবাসী। একদা ওদের চমৎকার শিরোভূষণ এবং চিতাবাঘের চামড়ার পোশাকের জন্য এরা বিখ্যাত ছিল। আজ অবশ্য অনেকেই সভ্যজগতের পোশাক পরছে।

কাম্পালা ফিরছি। ছোট্ট শহর আতিয়াকে পৌঁছলাম এক তপ্ত মধ্যাহ্নে। কয়েকটি ভারতীয় দোকান আছে। আমরা অবাক, আমরা পুলকিত, একটি গুজরাটি পরিবার আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে উদার আতিথ্যে আমন্ত্রণ জানাল। পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় বণিকরা যে কত অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে, কি বুদ্ধি আর সাহসিকতায় ওরা বাণিজ্য করে তা বিস্ময়কর বটে। ইস্ট আফ্রিকায় ব্যাঙ্ক নোট ইংরিজি ও গুজরাটিতে ছাপা হয়, এতেই এদের গুরুত্ব বোঝা যাবে। পুরি, আমের চাটনি ও অন্যান্য সুখাদ্যে লাঞ্চ সারা হল। বাইরে ড্রামের বজ্রগর্জন বলে দিল, আচোলিরা নাচ দেখাতে এসেছে।

তিরিশ বছর ধরে আমি আদিবাসী নাচ দেখছি ও ছবি তুলছি। আমি যা দেখেছি,

তার মধ্যে এই নৃত্য সবচেয়ে সুন্দর ও উদ্দীপক নাচগুলির অন্যতম। নাগা যুদ্ধ নৃত্য, বা বাইসন-হর্ন মারিয়া বিবাহ নৃত্য দেখার কালে যেমন আনন্দে ভেসে যাই, এখন তাই হ'ল। কল্পনা করুন, এক বিশাল জনতা, অনিন্দ্যসুন্দর কালো, চকচকে শরীর তাদের, — আবর্তিত হচ্ছে, অঙ্গভঙ্গি করছে সুষম ছন্দে,— ফেটে পড়ছে আপন আনন্দোচ্ছ্বাসে,— গোড়ালি ঠুকছে, পা ঠুকছে, লাফিয়ে উঠছে বিশাল উদ্দীপনায় ও প্রাণোৎসাহে। আফ্রিকান নাচ যারা দেখে, ওই জীবনোদ্দীপনা প্রথম চোখে ধাঁধা লাগায় তাদের।

এদের কাছে নাচটা নয় কোনো প্রয়োজনের বাইরের কিছু; কোনো বিলাসিতা,— ইচ্ছেমতো যাতে সাড়া দেওয়া যায়। যেখানে নাচ টিকে আছে, সেখানে তা জীবনের এক আবশ্যিক শক্তি। নিশ্বাস নেওয়া, বা আহারের মতোই স্বাভাবিক, সবসময়েই নাচা হয় আবেগদীপ্ত আনন্দে। আচোলিরা হাসছিল না। ওরা খুব এক লক্ষ্য, উত্তেজনায় টান-টান। নাচাটা খুব দায়িত্বের জিনিস, ওরা ছিল মন্ত্রমোহিত।

রণ অশ্বের মতো লাফাতে লাফাতে, নেচে নেচে ওরা মাঠে ঢুকল পরপর মিছিলে। একটা লম্বা খুঁটি ঘিরে নাচছিল বটে, কিন্তু কোনো বিশেষ নিয়ম মানছিল না। শত শত নাচিয়েদের জন্য জায়গাটা ভিড়ে ভরে গেল। প্যারিসের জনপ্রিয় ক্যাবারেতে যেমন হয়। দুঃখের বিষয়, কমজনই পরেছিল প্রাচীন পোশাক। কারো কারো মাথায় ছিল পালকের শিরোভূষণ। অধিকাংশ পুরুষের পশ্চাদ্দেশে লেবেল আঁটা। তাতে হয় ওদের সই আছে, নয়তো এইচ-ই, এ-ডি-সি, এমনকি ইউ-এস-এ লেখা। আতিয়াকে আমরা যেমনটি দেখেছিলাম, তেমন নাচ দেখলে, আফ্রিকার গভীর, প্রাকৃতিক শক্তি,— আনন্দ উপভোগ ও প্রদর্শনের ক্ষমতা,— ছন্দের প্রতি ভালবাসা, — সবটা হৃদয়ঙ্গম হয়। কারেন ব্লিক্সেন বলেছিলেন, 'কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগুলিকে জানার ফলে আমার দুনিয়াটা অসামান্যভাবে বিশাল হয়ে যায়।' সংস্কার যাকে অন্ধ করে নি, তেমন সকলেই ওঁর মতে মত দেবেন।

আফ্রিকার গ্রামীণ মানুষদের আসল চেহারাটি দেখা যায় দু'জায়গায় — নাচের সময়ে এবং হাটবাজারে। আফ্রিকার বড় বড় হাট আজও দৃশ্য হিসেবে চমকপ্রদ। সেখানে মিলিত হচ্ছে, মিশে যাচ্ছে, সভ্যতার সকল স্তরবিন্যাস, আর্থনীতিক প্রগতির সকল পর্যায়।

বেলজিয়ান কঙ্গোর পূর্ব-সীমান্তে উগাণ্ডার পশ্চিম—নীল নদ জেলা। দুরান্তে, দুনিয়ার এক সৌন্দর্যভরা অঞ্চলে, বড় বড় আরণ্য প্রানীর সে কি বৈচিত্র্য, আর মানুষগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ, যেন জাদু করে ফেলে। এখানে থাকে লুগবারা আদিবাসীরা, বেশ যথেষ্ট সংখ্যক এরা, তুলনায় সমৃদ্ধিশালীও বটে। সংখ্যায় প্রায় দুই লাখ। বলা হয়, আফ্রিকায় শ্রেষ্ঠ কৃষকদের মধ্যে এরা পড়ে। অর্থাৎ, বাজারে এসে এরা পয়সা খরচ করতে পারে।

ত্রিশ বছর আগে অধিকাংশ লুগবারা নগ্ন থাকত। আজ পুরুষরা পোশাক পরে, বেশির ভাগই তা ইউরোপীয় পোশাক। মেয়েদের আবরণ পাতা, কেউ কেউ স্কার্ট ও ব্লাউজ পরছে। এর মানে এই, এরা কিনতে চায় নানা জিনিস।

এক সকালে আমি তিনটি বড় বড় বাজারে যাই। কুসুমিত কত গাছ! চমৎকার লাল ফুলের ঝাড় শোভিত উগান্ডা টিউলিপ; হলদে ক্যাসিয়া; সুন্দরী অ্যাকাসিয়ার শীষ ঘিরে ফোটা তুলতুলে ফুল,— আর তার নিচে কালো শরীরের তরঙ্গিত সমুদ্র। উজ্জ্বল রঙের ছোপ তাতে বৈচিত্র্য এনেছে। ঝলমলে রেশমের পাগড়ি, উজ্জ্বল রঙা মাথার রুমাল, চুলে ফুল, নানা রকম পুঁতির মালা। আমার কাছে কালো বড় সুদর রং। যখন তা রোদে ঝলমল করে, নাচে, কালো রঙকে আলো করে প্রকৃতিজ বা শিল্পজ উজ্জ্বল লাল— নীল— সবুজ, আমি মুগ্ধ।

প্রতি বাজারই উঁচু বেড়ায় ঘেরা। ঢুকতে হয় সামান্য দক্ষিণা দিয়ে। ভিতরে তো নড়াচড়া করা কঠিন। চারদিকে মাটিতে বসেছে বিক্রেতারা বেসাত নিয়ে। দল বেঁধে বসে তারা কথা কইছে। বিক্রেতাদের মতো পণ্যও নানান রকম। মাদুর, বাস্কেট, বাসনকোসন, যাঁতা, কাঁচা ও রান্না করা খাবার, ফল, গহনা, তামাক, আখ-বিয়ার। এই সুখী মানুষেরা যে কোন বস্তু থেকে বিয়ার বানাতে পারে— মধু থেকে, কলা থেকে। বিয়ারটা বাদ দিলে এ বাজার ভারতের মফঃস্বলের বাজারেরই মতো। বিনিময় প্রথাতে কারবার চলছিল। পয়সা দিয়েও কেনাবেচা হচ্ছিল,— তবে ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট আফ্রিকার মতো কড়ির ব্যবহার দেখি নি।

লুগবারা বাজারগুলির বিষয়ে স্মরণীয়তম অভিজ্ঞতা ওদের বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাব। সর্বত্র গালভরা হাসির অভিনন্দন, — এই একবার দেখি ফোটো তোলাবার জন্যে মানুষর হুড়োহুড়ি। অনেক ফোটো তোলার ভানও করতে হ'ল। যা ফিল্‌মে ওঠে নি।

বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও শুভেচ্ছার বিশাল সঞ্চয় আছে আফ্রিকার হৃদয়ে। কিন্তু ঘৃণাও আছে। ভবিষ্যতে বিশ্বশান্তির ব্যাপারে এর মস্ত ভূমিকা থাকবে। শুভেচ্ছা জিতবে, না ঘৃণা!

ছয়

সুজান কারপেলেস আর জি. পি. মললশেকরের আমন্ত্রণে সিলোন (আজকের শ্রীলঙ্কা) যাই। তিন সপ্তাহে ছিলাম, তা খুবই উদ্দীপক। আর লাভও হয় অনেক। যথেষ্ট জনসভায় যেতে হয়। এর আগে সংবাদপত্রজগতের এত মনোযোগ পাইনি। আমার ফোটোর প্রদর্শনী, তা হাজারের বেশি লোক দেখে গেল। কলম্বোর ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট ভালো। ইউনিভার্সিটি, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ইয়ং মেন্‌স বুদ্ধিস্ট্ অ্যাসোসিয়েশান, ইত্যাদিতে বক্তৃতা দিলাম। তিনবার অভিযানেও বেরোলাম। প্রথমবার গেলাম সুজান, আর সিলোনের ডিরেক্টর অফ অ্যানথ্রোপলজি যিনি সেই

অতি বিদগ্ধ এস. পরাভভানার সঙ্গে। দর্শনীয় সর্বত্র গেলাম, সিগিরিয়া; দামবুল্লা, অনুরাধাপুর। তবে যত প্রাচীন নগরী দেখি, মিহিন্তালে আমাকে সব চেয়ে নাড়া দেয়। আগে উত্তর সিলোন দেখেছি। কিন্তু এবার প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের অভিঘাত আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়।

আরেকবার গেলাম ডঃ আর. এল. স্পিটেলের সঙ্গে। ইনি কলম্বোর এক প্রাচীন বাসিন্দা, এবং যাদের দীর্ঘদিন দেখতে চাইছি, সেই ভেড্ডা আদিবাসীদের বিষয়ে সর্বাধিক জানেন, হয়তো জীবিত আর কেউই ওঁর মতো জানে না। উনি আমাকে নিয়ে যান অরণ্যে। শেষ দুটি প্রাচীন, আদিম ভেড্ডা সেটেলমেন্টে। আফ্রিকা বা ভারতে যা দেখেছি তার চেয়ে এ অভিজ্ঞতার স্বাদ একেবারে অন্যরকম। সিলোন গভরনমেন্টকে তাঁদের কাজকর্ম নিয়ে বলব, এমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সাংবাদিকরা বেজায় চাপাচাপি করল। আমি বেশ কড়া ভাষায় বললাম, ভেড্ডাদের প্রতি কোনো মনোযোগ দেওয়া হয় না। ওরা সম্পূর্ণ অবহেলিত। আমার মন্তব্যে কাজ হয়। চলে আসার পর ডিক স্পিটেল লেখে, 'বিশ্বাস করো, কাগজে তোমার মন্তব্যগুলি আমাদের মন্ত্রীদের ভাবিয়েছে। একাধিকজন আমার কাছে স্বীকার করে গেলেন, হুলটা ভালোমতো জ্বালা ধরিয়েছে। ওঁদের অনুরোধে আমি একটা ভেড্ডা ওয়েলফেয়ার স্কীম বানালাম। ভেড্ডা ওয়েলফেয়ার অফিসার মিলেছে, ভেড্ডা কল্যাণে পরামর্শদাতা কমিটি হয়েছে। এক্ষণিক প্রয়োজনের বিষয়ে বলা হয়েছে, পোল্লেবেড্ডে মানুষদের রেশনের খাদ্য ও বন্দুক দিতে হবে। সেটা কার্যকরও হয়েছে। ওদের বিষাদক্লিষ্ট, উপবাসশীর্ণ চেহারার ওপর এর পরিণাম কেমন হবে ভাবো। তুমি তো দেখেছিলে!'

মনে হয় স্পিটেলকেই সিলোন গভরনমেন্ট শেষমেশ ভেড্ডাদের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করে।

তৃতীয় অভিযান, অক্সফোর্ডের পুরনো দোস্ত, বার্নার্ড অ্যালুইয়ার-এর সঙ্গে। মাতালে-তে পাহাড়ের ওপর অতীব মনোরম পরিবেশে ওর বাড়ি ছিল, সেখানে নিয়ে যায় আমাকে। ওদের পারিবারিক মন্দির দেখি, পাহাড়ে কাটা এক মন্দির, নানা দেওয়াল চিত্রে সজ্জিত।

সাত

যত বিদেশে গেছি, থাইল্যান্ড অভিজ্ঞতা সবার উপরে। আর্থার ব্রেইন-হার্টনেল, অক্স্ফোর্ডে আমার চেয়ে নিচে পড়ত, ইউনিভার্সিটি কলেজে। সে ছিল কবি। নিজেকে ঘিরে এমন এক পরিবেশ রচনা করেছিল, যার ধারেকাছে কম জনই যেতে পারত। বড় প্রিয় সজ্জন, স্বভাবে বাড়াবাড়িও ছিল। এই সেদিন যখন ৫৬ বছর বয়সে মারা গেল, আমি বড় দুঃখ পাই। বিয়ার খেতে ওর ঘরে প্রায়ই যেতাম। অনেকদিন

বাদে বলেছে, ওখানেই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গ্রাহাম গ্রীন, ইভলীন ওয়াহ্, এবং ডব্লু. এইচ, অডেনের। ব্যাপারটা এরকম,-- যখন ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়, (যদি তা হয়েই থাকে), ওঁরা তখন বুদ্ধিদীপ্ত কয়েকজন তরুণ যুবক। আজ ওঁরা যা, সেদিন তা হন নি। তবে হ্যারল্ড্ অ্যাকটন তখনই এক উজ্জ্বল এবং 'ওরিজিনাল

পরে আর্থার চলে যায় থাইল্যান্ড, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়। আমার কথা কোন কারণে ওর মনে পড়ে, আমাকে ব্যাংককে ওর সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করে। শামরাও এবং আমি ওখানে ও উত্তর-থাইল্যাণ্ডে চমৎকার কাটাই এক মাস।

থাইল্যান্ড নিয়ে অনেক লেখা হয়েছি, একটি ভালো গাইডবুক পাঠকদের বলে দেবে আমরা যা দেখেছি, তার প্রায় সবটাই। মন্দির দেখতে দেখতে আমাদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কি! বেশ কিছু চমৎকার ছবি তুলি। বিশিষ্ট একটি, ওয়াট আরুণের ঘোরানো চূড়াটির উপরে আকাশে তিনটি এরোপ্লেন উড়ছে। এমন ছবি হাজার বছরে একবার তোলার সুযোগ মেলে।

যখন অভিজ্ঞতাটি মনের মধ্যে তাজা, দুর্ভাগ্য, তখন আমি এই যাত্রা নিয়ে তেমন কিছু লিখি নি। খবরের কাগজে কয়েকটা লিখি। থাই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যতজনের সঙ্গে সম্ভব, দেখা করি। ওঁদের এশিয়াটিক সোসাইটি দেখি। তবে গিয়েছিলাম তো ছুটি কাটাতে, আর থাইল্যান্ড এমনই এক জায়গা, যে সেখানে ছুটি উপভোগ করা যায়। আদর্শবাদকে উদ্দীপিত করে এমন কিছু এখানে নেই। আফ্রিকার বর্ণসংকট মনকে বিদ্ধ করে। সিলোনে ছিল অবহেলিত ভেড্ডারা। ভারতে অবশ্য জিরোবার সময়ই মেলে না। থাইল্যান্ড বিষয়ে মনে হ'ল, এমন মানুষদের মধ্যে এসেছি, যাদের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সুন্দর সঙ্গতি আছে। যেখানে অন্যায়ও ঘটে, এরা এমনই আনন্দময়, যে তা ভুলেও যায়।

কিছুদিন থাকলাম আর্থার ব্রেইন-হার্টনেলের কাছে। অতঃপর গেলাম নরফোক হোটেলে। জেরাল্ড্ স্প্যারো নামে এক বিশিষ্ট ইংরেজ আইনজীবী, ইনি কেমব্রিজ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, থাই গভরনমেন্টের আইন-উপদেষ্টা,— এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। শামরাও এবং আমি এঁর কাছে অনেক উপকার পাই।

একটা বেজায় ভালো কাজ করেন,— উত্তরে চিয়েংমাইতে নিয়ে যান, ঘোরাফেরার জন্যে একটি গাড়ি দেন। চিয়াংমাই, ব্যাংককের একেবারে উলটোটা। ব্যাংকক জনাকীর্ণ, তুলনায় এ জায়গাটি খুব খোলামেলা। যাদের মধ্যে লাও এবং বর্মী রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে,— সে সব মানুষের রং বেশি ফর্সা। দক্ষিণের অধিবাসীদের চেয়ে এদের আচরণ ও ব্যবহার অনেক মনোরম। মন্দির স্থাপত্যও পৃথক রকম। অনেক নিরাভরণ, অনেক কম জাঁকজমক, তবু তার একটি নিজস্ব মর্যাদা ও সৌন্দর্য আছে। আবহাওয়া তুলনায় ভালো, ব্যাংককের চেয়ে তাপমাত্রা কম,— রাজধানীতে

গোলাপ তেমন হয় না। এখানে গোলাপ আকারে ও বর্ণবৈচিত্র্যে অনেক সুন্দর।

জেরাল্ড, উত্তরপানে পঞ্চাশ মাইল দূরে এক ছোট্ট মাঠে নিয়ে যায়। এটি এক বিশাল পাহাড়ের গোপনে। পাহাড়ের পাথরগুলো আকাশপানে খোঁচা খোঁচা আঙুল তুলে আছে। এ হ'ল চিয়াংমাই, আমার দেখা যা কিছু তার মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও রোমান্টিক জায়গাগুলির অন্যতম। বিশাল এক গুহায় নির্বাক মূর্তির ভিড়। পাহাড়ের উপর ছোট ছোট প্যাগোডা। অনেকগুলো ঝুঁকে দেখেছে এক মাছ বোঝাই সরোবর। শান্ত স্বভাব শ্রমণরা এদের খেতে দেন। চাষীরা পাকা ধান কেটে ঘরে তুলছে, তেমন ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে গাড়িতে চলতে খুব ভালো লেগেছিল। শ্যাম দেশে জলা প্রচুর। বলদ-গাড়ির বদলে এরা নৌকোতেই খাদ্য শস্য বহন করে। অধিকাংশ বাড়িই টিপির উপর। তাতে স্যাঁতা ধরে না। নীল পোশাক ও বড় বড় খড়ের টুপিতে লোকজনকে দেখতে বড় ভালো লাগে।

ভারতের কাছে শ্যামদেশের ধর্ম মত খুবই ঋণী। রামায়ণ কাহিনী বিশাল প্রেরণা দিয়েছে স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, কাঠের কাজে ও দেওয়ালচিত্রে। থিয়েটারকেও প্রভাবিত করেছে। রাজ-পর্যায়ে ব্যবহৃত শব্দাবলী, পোশাক ও উৎসবেও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব। তবে ভারতের তুলনায় শ্যামদেশে ধর্ম ব্যপারে বাড়াবাড়ি কম। এখানে তা অত গভীরে শিকড় চালায় নি, ধর্মোন্মদনা কম। জনজীবনে ধর্মের কোনো বিশেষ প্রভাব নেই।

আমেরিকান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী জে. এফ. এম্‌ব্রী একদা জাপান ও ভিয়েতনামের সংস্কৃতির সঙ্গে থাইল্যান্ডের সংস্কৃতির তুলনা করেন। বলেন, জাপানও ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক কাঠামো খুব অন্যরকম। মানবিক সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক সামাজিক প্যাটার্নের সঙ্গে মানুষের আচারব্যবহার সুসমঞ্জস। শ্যামদেশে এটি ঢিলেঢালা। থাইবাসীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এম্‌ব্রী উল্লেখ করেছেন, ওদের দৈনন্দিন জীবনে, 'নিয়মতান্ত্রিকতা, শৃঙ্খলাবোধ, ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ, এসব বিষয়ের কোনো চিহ্ন নেই।' প্রশাসনিক নিয়মনিষ্ঠা বিষয়ে বলতে গেলে সমীহ নেই। নেই ইনডাসট্রিয়াল সময়বোধ। জাপানিদের কাছে কাজ একটি সদ্‌গুণ চীনাদের কাছে তা নিয়ম, থাইরা মনে করে কাজ ব্যাপারটা আদপে ভালো নয়। থাই ধর্মেও এই খোশমেজাজি মনোভঙ্গি দেখা যায়। শ্যামদেশের বৌদ্ধধর্মের শেষ কথা হ'ল আনন্দ, সুখ। চিয়েংমাইতে এক থাই বন্ধু প্রথম কথাই শুধোল, "তুমি সুখী তো?" ভারত থেকে যে এসেছে, সে তো সেখানে সুখের কথা তত ভাবে না। সুখ সেখানে সাফল্য মাপবার মাপকাঠি নয়। প্রশ্নটা ধাক্কা দিয়েছিল, ভালো লেগেছিল। সে শুধোয় নি, "ভাল আছ তো?" কিংবা "তুমি ভালো তো?" কিংবা "টাকা কামাচ্ছ? প্রোমোশান হচ্ছে?" শুধোল, "তুমি সুখী তো?" একটি থাই শব্দ 'সুনুক', যার মানে হ'ল সন্তোষজনক কিছু, মনজাগানো কিছু, আনন্দদায়ক কিছু, সহিষ্ণু কিছু। এটাই মুখ্য। আশাদীপ্ত মনে

বেড়ানো সুনুক, কোনো খেলাধূলো বা নাচ দেখা, বা কারো সঙ্গ উপভোগ করা হ'ল সুনুক। বৌদ্ধধর্ম সুনুক। অন্যান্য ধর্ম কিছু একঘেয়ে। যারা হাসতে পারে, তাদের শ্রদ্ধা করে শ্যামদেশীয়রা। যদি চাও শ্যামদেশীয় কেউ তোমার পছন্দ করুক, তুমি সুখের অনুভূতি জাগাবে তার মনে।

সুখী দেশ শ্যামে যত জায়গা দেখলাম, চিয়েংমাই সবচেয়ে সুনুক।

আমি বলেছি (১ম অধ্যায়ে) বেলা রাইটের কথা। বেচারি খুন হয়ে যায়। ওঁকে দেখি নি। তবে আমার জীবনে মস্ত প্রভাব আছে ওঁর। সুন্দরী রাদার সঙ্গে ওঁর মিল আছে। সে এক শ্যামদেশীয় মেয়ে। ওর সঙ্গে চিয়াংমাইতে বড় সুন্দর দিন কাটে। আমেরিকায় শিক্ষিতা, ইংরিজি বলত 'ধীরে, সহজে।' 'যে সব অতীব স্মার্ট তরুণীরা আমেরিকা বা প্যারিসে অভিজাত ফিনিশিং স্কুলে যায়,' অনেকটা তাদের মতো উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। আমরা একসঙ্গে ছোট্ট শুওরের মাংস খেয়েছি, পান করেছি ব্ল্যাক লেবেল। একদিন ও আমেরিকান ও শ্যামদেশীয় নাচকে ব্যঙ্গ করে চমৎকার নাচল। বললাম, 'পুরুষরা এত খুশি হতে পারে, তা জানতাম না।' কিন্তু শেষে তো বিদায় নিতেই হ'ল। 'গভীর অনিচ্ছায় আমরা আমাদের সুন্দরী ও গুণবতী রাদাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। বিমান যখন আকাশে, দেখলাম ও ছোট্ট লেসের রুমাল নাড়ছে। তারপর নজরের বাইরে চলে গেলাম।' কি চমৎকার সে অভিজ্ঞতা। ছোট্ট লেসের রুমালটি এখনো আমার মনকে বিধুর করে। "ল্যান্ড অফ দি মুনফ্লাওয়ার" বইয়ে জেরাল্ড স্প্যারো এ সব কথার সবই বলেছেন।

ঝামেলাটা এই, বাস্তবে কোনো রাদা ছিল না। আমাকে আরো চিত্তাকর্ষক বানাবার জন্যে জেরাল্ড সবটাই বানিয়ে লেখে। আমি জানি ও চিন্তাই করে নি। যে গল্পটা ভারত সরকারের ওপর মহলে পৌঁছতে পারে, (পৌঁছেছিলও), এবং মনে হতে পারে আমি লোকটা ভালো নই। জেরাল্ড আমাকে সত্যিই পছন্দ করত। আমিও তাই। সত্যি বলতে কি, ওর বইয়ে যা লিখেছে, তাতে আমি গর্বিত।

> 'ভোরিয়ার বরাবর যা, তেমনি অগোছালো ও আনন্দময়। সহৃদয় ভালুক-মার্কা এক মানুষ। লম্বা চুল, সন্ধানী চোখ ও নরম গলা... যে মাপকাঠিতেই মাপা যাক, অতীব চমৎকার মানুষ। অবশ্য সেনাদলে নেবার কঠোর বিচারের মাপকাঠিতে নয়...ও এক সেইন্ট্...ইতিহাসের ফ্যাকাশে সেইন্ট নয়, যাদের ঘিরে থাকে শুচিতা এবং পবিত্র জলের গন্ধ। ও আধুনিক সেইন্ট। ভুলচুক করে থাকে, খুবই মানবিক, তবু ওর মনে অপার সহানুভূতি, দরদ।'

এত ভালো কথা যে বলে, তার ওপর রাগ করা যায় না। কিন্তু রাদাকে নিয়ে কী করি, আমরা ইতিহাস বইয়ে যে সব চরিত্রের কথা পড়ি, — শত শত পাঠকের মনে রাদা তেমনই গেঁথে বসেছে। ও এখন আমার জীবনে এক অধ্যায়। প্রিয় রাদা, কি ভালোই না হ'ত। যদি....

আমাদের এ যাত্রার একটি পরিণাম এই,— থাইল্যান্ড বিষয়ে ভিক্টরকে এমন উৎসাহে চিঠি লিখি, যে ও চিরতরে ভারত ছেড়ে ব্যাংককে থাকতে গেল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইংরেজির অধ্যাপক হয়।

আট

১৯২৮ থেকে আমি চারবার ইউরোপ গেছি। প্রতিবার দু'মাস মতো থেকেছি। চৌত্রিশ বছরে আটমাস খুব বেশি নয়। ফলে অক্সফোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কে জং ধরেছে, পুরনো বন্ধুরা অবহেলিত হয়েছে, সবচেয়ে মন্দ যা, আমার জননীকে বড় অবহেলা করেছি। তবে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চিঠি লিখেছি তাঁকে। ৮৯ বছর বয়সে ক'বছর আগে উনি মারা যান।

কিছু বন্ধুর সঙ্গে কখনো যোগাযোগ হারায় নি। ঘনিষ্ঠতম ছিল প্রয়াত লরেন্স হাউসম্যান। গান্ধীর সঙ্গে যখন প্রথম কাজ করি, ও খুব সাহায্য করেছিল। পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে ও আমাকে ও শামরাওকে ইংল্যান্ডে ডাকে, যাওয়ার জন্য অর্থব্যবস্থাও করে। অনেক বছর ধরে ওর সঙ্গে খুব প্রাণবন্ত চিঠিপত্র চলত।

লরেন্স এক কট্টর শান্তিবাদী, গান্ধীর এক ভক্ত। জীবনের শেষভাগে ও সোসাইটি অফ ফ্রেণ্ডস-এ যোগ দেয়। আমাকে লেখে, এ কাজের মধ্যেই ও একমাত্র ধর্মীয় সান্ত্বনা পেয়েছে। ওর ধর্ম বিশ্বাসের সবটাই বিধৃত আছে ব্লেকের কবিতা 'দি ডিভাইন ইমেজ'-এ। বলেছিল, 'আমি খুব অ্যান্টিথিওলজিকাল হয়ে গেছি।'

মৃত্যুর অব্যবাহিত আগে, ও আমাকে যে শেষ চিঠি লেখে, তাতে লিখেছিল;

> পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে আমি প্রায় চূড়ান্ত হতাশ। অন্যায়ের প্রতিকার হিসেবে এ যুদ্ধকে গ্রহণ করলাম, ফল হ'ল হাইড্রোজেন বোমা। আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ করলে এর ফল দাঁড়াবে বন্ধু ও শত্রু, উভয়েরই আত্মহনন ও বিলুপ্তি...রাজনীতিক জগতে নেহরু ছাড়া কারো ওপর বিশ্বাস নেই তেমন। আমার মতে উনি, জীবিতদের মধ্যে মহত্তম। আশা করি, তুমি ওঁকে ভালবাসো।

এতগুলো বছর ধরে আমার বোন এলডাইথ মায়ের সঙ্গে থেকেছে। ফলে জীবনের অনেকটাই শূন্য থেকে গেছে। যদিও তা ও কখনো মানে নি, বলে নি। ওর মতো স্বার্থশূন্য মানুষ আমি আরেকটা দেখি নি। পুরো জীবনটাই পরের সেবায় দিয়ে দিল। সৌভাগ্যবশত, মায়ের জীবদ্দশাতেই ওরা হয় লন্ডনে, নয় কাছাকাছি থাকত। চার্চ মিশনারি সোসাইটির এক সেক্রেটারির কাজ, যা ভালো লাগার মতো, তা ও পেয়ে যায়। এ কাজ ও বহু বছর ধরে করছে। যুদ্ধের ঠিক আগে, ১৯৩৯-এ এলডাইথ আমাদের কাছে পাটানগড়ে এসেছিল। পরে, সরকারি ট্যুরে ভারতের সর্বত্র মিশন কেন্দ্র ও হাসপাতাল দেখতে আসে। সে সময়ে শিলংয়ে আমাদের সঙ্গে বড় আনন্দে দু'মাস কাটায়।

গান্ধীর কথা : 'প্রকৃত ভালবাসা মহাসাগরের মতো সীমাহীন। তা অন্তরে ঢেউ তোলে, ফুলে ফেঁপে ওঠে, ছড়িয়ে পড়ে। সকল সীমা ও সীমান্ত পেরিয়ে তা গোটা দুনিয়াকে ঢেকে ফেলে।' এলডাইথ এ কথার মূর্ত রূপ।

বাসিল স্কুলশিক্ষক হয়। কিছুকাল পড়ায় বিখ্যাত চীয়াম স্কুলে। সেখানে ওর অন্যতম ছাত্র ছিল একটি ছেলে, যিনি পরে ডিউক অফ এডিনবার্গ হন। তারপর ও আরো দু'তিনটে স্কুলে পড়িয়েছে। হেলেন নামে এক অনন্যাসুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে। ওদের এখন তিনটি সন্তান। শুনেছি, তারা চমৎকার। আমি দেখেছি একজনকেই, মেয়েটি তখন নেহাৎ কচি শিশু। বেসিলের সঙ্গে খুব দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, আমরা চিঠিও কমই লিখি। তবে মনে মনে ও খুব কাছে থাকে। ও আমার মনের মতো মানুষ। দেখা হলে দুজনেরই চমৎকার কাটে।

অষ্টম অধ্যায়

নেফা যাত্রা

মানুষ আর পাহাড়ের মিলন হলে বড় বড় কাজ হয়;
পথে ঠেলাঠেলি করে তেমনটি করা যায় না।

—উইলিয়াম ব্লেক

এক

বাস্তার ও ওড়িশায় রিসার্চের বছরগুলি আনন্দ দিয়েছে, ফলদায়ীও বটে, তবু বহুদিন ধরে আসামের কথা ভাবছিলাম। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে ওখানে গবেষণা করার সম্ভাবনা বিষয়ে ডক্টর জে. এইচ. হাটন আমাকে এক বিশদ চিঠি লেখেন। স্বাধীনতার ঠিক আগে ১৯৪৭-এর জুন মাসে বিল আরচার আমাকে আমন্ত্রণ জানায় মোকোকচুং-এ। ও বিহার থেকে বদলি হয়েছিল নাগা পর্বতে। বলে, নাকাচারি নামে কোনো স্টেশনে পৌঁছতে, ও কাউকে পাঠাবে স্টেশনে। অবশ্যই বিল হ'ল কবি। মোকোকচুং কোথায়, তা বলা দরকার মনেই করে নি।

ফলে আমি আর শামরাও গাড়িতে আর ট্রেনে রওনা হলাম। বিমানপথ তখনো হয়নি। চললাম আসাম, দীর্ঘ পথ। গরম যেন দাবাদহ। কয়েকদিন লাগাতার চলে পৌঁছলাম নাকাচারি। দুটি হাসিখুশি নাগা অভ্যর্থনা জানালেন। ভেবেছি, রেলস্টেশন থেকে বিলের বাংলো এক মাইলের মধ্যে হবে। বললাম, আমাদের মিঃ আর্থারের বাংলোয় নিয়ে চলুন।

ওঁরা বললেন। 'সত্যি বলতে কি, মোকোকচুং সাতচল্লিশ মাইল দূরে।

যা ভেবেছিলাম, সে তুলনায় এ তো অনেক দূর। তবে আমি তেমন ঘাবড়াই নি। ভাবলাম, তেমন সময় লাগবে না।

বললাম, 'গাড়িটা কোথায়?'

একজন বললেন, 'সত্যি বলতে কি, গাড়ি কোনো কাজে লাগবে না। রাস্তাই নেই। আমাদের হাঁটতে হবে। চারদিন লাগবে।'

অতএব হাঁটলাম। দুরন্ত গরমে সে বেজায় কষ্টকর অভিযান। তবে পথে ভালো ডাকবাংলো ছিল। এক জায়গায় বিলও স্বাগত জানাতে এসে গেল।

ক'দিন কাটালাম মোকোকচুং-এ; কাছাকাছি কিছু গ্রাম দেখলাম। গেলাম কোহিমা, পরিচয় হ'ল বিখ্যাত স্যার চার্লস পসির সঙ্গে। চমৎকার এবং কর্মদক্ষ নাগা অফিসার

মিঃ কোভিচুসা আংগামি কয়েকটি নাগা গ্রাম দেখালেন। আদিবাসী শিল্পের ওপর নতুন বই শেখার জন্য আমি মালমশলা জোগাড় করছিলাম। অনেক ছবি তুলি প্রাচীন গ্রাম প্রবেশের দরজাগুলির। অসামান্য কাঠখোদাই কাজ সেগুলোতে। অধিকাংশই এতদিনে ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকবে। ফিজোর সঙ্গেও দেখা হয়। তিনি সে সময়ে তাঁর বহিরাগতদের বিষয়ে ঘৃণা ও বিরাগের নীতি বিকশিত করছেন। এ নীতি তাঁর দেশবাসীর জীবনে অনেক যন্ত্রণা আনে, তারা বেইজ্জৎও হয়।

শামরাও পাটানগড়ে ফিরে গেল। আমি জোরহাটে বিলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দুজনেই গেলাম কোনিয়াকদের দেশে, গেলাম ওয়াকচিং অবধি। সেখানে ক্রিস্টোফ ফন ফ্যুয়ের-হাইমেনডর্ফ একদা এক বছর কাটান। বিল অবশ্য তার সরকারি কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। ওয়াকাচিং-এ ক'দিন ছিলাম। তুয়েনসাং থেকে অনেক কোনিয়াক ও ফোম দলপতিরা ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আমরা দুজনেই কাঠখোদাই, টুপি ও অন্যান্য হস্তশিল্প জোগাড় করি।

চড়াই ভেঙে ওঠার সময়ে একেবারে আচমকা পৌঁছে যাই কোংগন গ্রামে। বর্মার কাছাকাছি এক সুদুর গ্রাম থেকে একটি কান কেটে আনা হয়েছে, তার উৎসব চলছে। নরমুণ্ড-শিকার বন্ধ করতে ব্রিটিশ সরকার তখন প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এই গ্রামটি মানুষের বদলে বানর-শিকারের সৎ প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। তারপরেই, দুর্ভাগ্যক্রমে এক ভয়ংকর কলেরায় মড়ক হয়। তখনি সিদ্ধান্ত হয়, এটির বদলে ওটিতে কাজ চলবে না।

সে সময়ে যে প্রথা চলছিল,— যদি আস্ত মুণ্ড না পাও, আরেকটি সমৃদ্ধ গ্রাম থেকে মাথার কোনো অংশ, যেমন একটি কান, কিনতে পার। কোংগনবাসীরা তাই করেছে। আমরা যখন পৌঁছুই, তখন ব্যাপারটি নিয়ে উৎসব চলছে, যেন ওরা নরমুণ্ড-শিকার অভিযানে বিজেতা হয়ে ফিরেছে। এরপর অনেক নাগা নৃত্য দেখেছি, এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। এ তো আসল ব্যাপার — অফিসার আসবে বলে সাজানো-বানানো কিছু নয়। এদের ধারণাও ছিল না যে আমরা আসব। সময়মতো খবর পেলে এ নাচ করতই না। বিলকে তো সরকারি অফিসার হিসেবে মোটা জরিমানা করতেই হল, সে গভীর অনিচ্ছায়। গ্রামবাসীরা এটা মেনেই নিল। বলল, এটা যোগ্যই হয়েছে। ওরা এখন সুশস্য এবং সুন্দরতরো শিশু পাবে।

মোকোকচুং থেকে আমি একা বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে আমার সহকারী সুন্দরলাল। আর এক চমৎকার মানুষ, এক নাগা দোভাষী। গেলাম কোনিয়াক অঞ্চলে। প্রাচীন জীবনধারার শেষ চিহ্ন দেখলাম। আমরা যখন যাই, মিশনারিরা তখনো গ্রামের গহীনে ঢোকে নি। জীবনধারা বইছিল শত শত বছরের পুরনো খাতে। কাবরাই অভিযান বাদ দিলে, আমার সবচেয়ে অ্যাডভেঞ্চারগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

দুই

১৯৫২-তে যাই দ্বিতীয়বার আসামে। গভর্নর জয়রামদাস দৌলতরাম ডেকেছিলেন। এবার পাটানগড় থেকে আমি ও শামরাও আগাগোড়া যাই গাড়িতে। আজ যেমন রাস্তা তখন তেমন ভালো ছিল না। এক দেশী নৌকোয় গঙ্গা পেরোতে চব্বিশ ঘন্টা লেগে যায়। শিলংয়ে গভর্নরের সঙ্গে অনেক কথা হয়। এন. কে. (নরী) রুস্তমকীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন আদিবাসী এলাকার উপদেষ্টা। সে এলাকার মধ্যে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি (নেফা) নামক বিশাল কুমারী অঞ্চলও আছে। আজ দু'জনেই সকৌতুকে স্মরণ করি। নরী প্রথমেই বললেন, 'দুঃখিত। নেফা যেতে পারছ না।' কেননা তখনো আমি সরকারি মতে ভারতের নাগরিক নই, (যদিও এতে আমার কোনো ত্রুটি ছিল না)। সাধারণত বিদেশীদের ও অঞ্চলে যেতে দেওয়া হ'ত না।

মণিপুর পর্বতমালা সম্পর্কে খুব উৎসাহী বিবরণ পড়েছি। আমার আসল ইচ্ছে, সেখানে যাওয়া। গাড়িতে শিলং থেকে ডিমাপুর, কোহিমা দিয়ে ইম্ফলে পৌঁছে দেখি সেখানে একটি মাত্র ছোট ডাকবাংলো। তাতে এমন ভিড়, যেন এক বাজার। হোটেলও নেই। গেলাম ডেপুটি কমিশনার-এর কাছে। হাসিখুশি মানুষটির নাম এম. এন. ফুকন। ওঁর বাগানে একটি গেস্ট হাউস, তাতে থাকতে দিলেন। সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। মনোরম উপত্যকায় ঘুরলাম। শামরাও ঘরে ফিরল। আমি সুন্দরলালের সঙ্গে কাবুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একশো মাইল পায়ে পথ হেঁটে রাওনা হলাম।

পূর্ব-মণিপুরের কাবুইরা ভারতের সবচেয়ে চিত্তচমৎকারী আদিবাসীদের মধ্যে একটি। লাবণ্যময়, অতিথিবৎসর, পরিশ্রমী; ওরা মেলবন্ধন ঘটিয়েছে অতি সূক্ষ্ম মর্মানুভূতি, এবং রং ও ডিজাইন বিষয়ে উঁচুমানের রুচির। ওরা কাঠখোদাই করে না, বা আঁকে না। ওদের মেয়েরা বোনে সুন্দর বস্ত্র, 'তরুণরা সাজসজ্জা করে চমৎকার। সুন্দর শিরোভূষণ হাড় ও হাতির দাঁতে তৈরি বাজুবন্ধ ও কণ্ঠি, কান ও গলার তেমন গহনা, যেমনটি দেখা যায় না।

হাওচাং নামে একটি গ্রামে আছি, দেখি যে বাড়িতে আছি তার মাচানে ছোট ছোট কাঠের বাক্স। গৃহস্বামী একটা পাড়লেন, বেতের বাঁধন খুললেন। ঢাকনা খুলে দেখালেন, পাতা ও শিমুলতুলোর ওপর পাতা আছে লং-টেইল্‌ড ব্রডবিল পাখির উজ্জ্বল নীল পালকে তৈরি এক চমৎকার গহনা। অন্য বাক্সগুলিতে নানান গড়ন ও মাপের অনুরূপ সব অলঙ্কার। পরদিন গ্রামের একটি শিশুর কর্ণবেধ অনুষ্ঠান ছিল। সে উপলক্ষে যে নাচ হয়, ছেলেরা কানে ওই অলঙ্কার পরল। শিরোভূষা শিং ও পালকের। একটি ছেলে কাঁচপোকার খোলসের ঝকমকে পেনডেন্ট পরেছিল। মেয়েরা বাতাসে হাত নাচিয়ে প্রজাপতির মতো নাচছিল। তরুণ যোদ্ধারা নাচাচ্ছিল বর্শা। শুনলাম, নাচটির কোনো মর্মার্থ নেই, এ শুধু 'সৌন্দর্য ও সুখ'-এর জন্য।

আজকের প্রয়োজন-ভিত্তিক কাজকর্মের আধুনিক জগতে যারা সর্বোচ্চ সম্মান দেয় সৌন্দর্য ও সুখকে, তারা সৌভাগ্যবান বটে।

১৯৫৬ সালের মে মাসে তাওআং যাত্রাপথে লেখক ও তাঁর স্ত্রী লীলা আপ্যায়িত

সুউচ্চ খামলাং উপত্যকায় মিশমি মেয়েদের সঙ্গে লীলা (নভেম্বর, ১৯৫৭)

নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ারের আদিবাসী মানুষ

উপরে বাঁদিকে উত্তর সুবর্ণসিরির এক তাগান
" ডানদিকে কোনিয়াক দলপতির ছেলে
নিচে বাঁদিকে দিগারু মিশমি মেয়ে
" ডানদিকে তাপাটাকি, এক মিনিয় আবর

কাবুই অভিযান এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। বেচারা সুন্দরলালের পরে হ'ল গেঁটে বাত। হাঁটতে গেলেই যন্ত্রণা। ইম্‌ফলে ফিরে ওকে হাসপাতালে দিলাম, থাকল তিন সপ্তাহ। ফুকন থাংখুল অঞ্চলে যাচ্ছিল। আমি ওর সঙ্গে উখরুল অবধি যাই। পরে একাই যেতে হল। কেননা আমি যাদের দেখেছি, তাদের মধ্যে ফুকন সবার চেয়ে জোরকদমে হাঁটে। ওর বদলে আমি পেলাম এক তরুণ থাংখুল ক্রীশ্চানকে। সিরোহি পাহাড়ের চারপাশের খোলামেলা সুন্দর অঞ্চলে গেলাম, পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। ও ছিল দোভাষী ও পথদিশারী। আমেরিকান বুশকোট ও জকিদের টুপি পরত বটে। তবে ভালো সঙ্গী, চমৎকার গাইড। পাপ থেকে পরিত্রাণ বিষয়ে একটু বেশি বকত বটে, মাঝে মাঝে মনে হত আমার অতীত তারুণ্যের প্রেতের সঙ্গে হাঁটছি।

তিন

পাটানগড়ে ফিরলাম। আবার গেলাম সাঁওতাল এলাকায়। কিন্তু ১৯৫৩ সাল জুড়েই মনে হত, আমি যেন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছি। মনে হত, মধ্য ভারত খুব বিশদভাবে দেখেছি। আসাম বিষয়ে আমি অত্যুগ্র উৎসাহিত হই, আবার তেমনই আশাভঙ্গ ঘটে। দ্রব্যমূল্য, মজুরি, সবই বাড়ছিল। কোনো ব্যক্তি একক চেষ্টায় রিসার্চ চালাবে, তা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

সহসা, ডিসেম্বরের গোড়ায় পাটানগড়ে নিজের বাড়িতে বসে আছি, স্বর্গের বার্তার মতো নয়া দিল্লী থেকে এক রহস্যময় টেলিগ্রাম এল। সই করেছেন কোনো 'ফরেইন'। আমাকে অবিলম্বে গিয়ে নেফা বিষয়ক কোনো সিলেকশান বোর্ডে অংশ নিতে বলা হয়েছে তাতে। না জানি রাজধানী বিষয়ে কিছু আর নেফা বিষয়ে যা জানি, তা হ'ল ওটা সেই জায়গা, যেখানে আমাকে যেতে দেওয়া হয় নি। টেলিগ্রাম পৌঁছতে এক সপ্তাহ লেগেছে। হাতে নেই সময়। কোনো চিঠিও আসেনি যাতে সব লেখা আছে। লীলা আর শামরাওয়ের সঙ্গে বিচলিত চিত্তে কথাবার্তা কয়ে মনে হল, যাওয়াই ভালো। যত তাড়াতাড়ি পারি, আমি আর লীলা দিল্লী রওনা হলাম।

কন্‌স্টিটিউশান হাউসে জায়গা পেলাম। মনোরম, কম-খরচার এ আবাসে স্নান ও শৌচাগার সকলের জন্য। ঘর থেকে বাথরুমে যাও। ও পাশের ঘরের দিকের দরজা বন্ধ করো। সাময়িক রেহাই মিলল। কিন্তু বেরোবার কালে অন্যের দরজার খিল খুলেছ কি সব ভেস্তে গেল। দরজা খোলার ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যবশত লীলা ভুলেই যেত। ফলে আমাদের প্রতিবেশী, এক তরুণ তিড়বিড়ে সাংবাদিক, বেজায় বিরক্ত হত।

ক'দিন বাদে প্রধানমন্ত্রী ব্রেকফাস্টে ডাকলেন। আমাদের প্রতিবেশী শোধ নেবার সুযোগ পেল। ব্রেকফাস্ট ৮-৩০টায়। আমরা উঠেছি ৫টায়। দেখি, আমাদের দিকের দরজা বন্ধ। ধাক্কাধাক্কি করলাম, কাকুতিমিনতিতে কোনো কাজ হ'ল না। দুজনে তখন

চুল ছিঁড়ছি প্রায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট তো কেউ নিতিনিত্য খায় না। লীলা স্বাভাবিক ভাবেই চায়, ওকে খুব সুন্দর দেখাক। আমি অন্তত দাড়িটা কামাতে চাই। অন্য বাথরুমের খোঁজে মিছেই দৌড়লাম, সব দরজাই বন্ধ। সোয়া সাতটার পর আমি বিনম্র হয়ে মাপ চাইলাম। তারপর তরুণ প্রতিবেশীটি দোর খুলল, আমাদের হাত মুখ ধুতে দিল।

এ তেমন কিছু নয়। পৌঁছবার পরদিন খুব সকালে আমার রহস্যময় বন্ধু 'ফরেইন' এত্তেলা পাঠালেন। দেখা গেল বৈদেশিক মন্ত্রালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারি তিনি, নাম টি. এন. কাউল।

টিক্কি কাউল মানুষটা এমন, যে প্রথম সাক্ষাতেই ভালো লাগে। পাঁচ মিনিট না যেতে মনে হল, আমি ওকে আজন্ম জানি। ও বলল, ঠিক হয়েছে, অফিসার পদে এক নতুন সংযোজন হবে। পরে এর নাম হয়, ইন্‌ডিয়ান ফ্রন্টিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস। তাদের নির্বাচনে আমি সহায়তা করব। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব, আদিবাসী সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য আমার নেফা প্রশাসনে যোগ দেওয়া দরকার।

ব্যাপারটা এতই নতুন, যে কি বলব, তা ভেবে পাইনি। আমার অবস্থা সেই লোকটির মতো, যাকে প্রথমে একটা স্যাণ্ডুইচও খেতে দেওয়া হয় নি, তারপর আচমকা সাত পদের ব্যঞ্জন বেড়ে দেওয়া হ'ল। এর ফলে পাটানগড় থেকে শেকড় উপড়াতে হবে। ওদিকে আদিবাসী কল্যাণের ও রিসার্চের একটা নতুন বিশাল দিগন্ত খুলে যাবে। শামরাওকে দিল্লীতে আসার জন্য টেলিগ্রাম করলাম। লীলা, আমি, আর ও দীর্ঘ আলোচনা করলাম। শেষ অবধি নেফা প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। শামরাওয়ের মতে এ একটা বিরাট আঘাত। এর ফলে ওকে একলা পাটানগড়ে কাজ চালাতে হবে। তবে শামরাও তো চিরকালই স্বার্থচিন্তাশূন্য মানুষ। ওর মনে হল, আমার পক্ষে এ কাজটা করা ভালোই হবে।

নেফা যাত্রার অর্থ, আমার অনেক নিজস্ব আদর্শের একেবারে বিপরীত এক ব্যাপার। যদিও এও মনে হয়, এটা যুক্তিসঙ্গত বটে, সম্ভবত এটা হতই। এর মানে, একশো মাইলেরও বেশি অভ্যন্তরে এক গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে বসবাস। হতে পারে ছোট শহর,— আদিবাসী এলাকার কেন্দ্রের এক শহর, তবু শহর তো! এর মানে, বাঁধা রোজগার, আরাম ও সুযোগসুবিধে, যা কখনো পাই নি। দারিদ্র্য ও শোষণের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার অনেকটাই খোওয়া যাওয়া, স্বাধীনতা হারানো; যা মনে হয়, ঝটপট তা বলা যাবে না; কার্যসূচী মেনে কাজ করতে হবে; বিধিনিয়ম থাকবে। মর্জিমাফিক আচরণ কমবেই। কেননা শিলংয়ে আসার পর থেকে আমার জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে ও যেমনটি সবাই করে, তেমন।

এতে সমস্যাটা স্পষ্ট হল। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? উন্নত আদর্শবাদ নিয়ে ছোট সীমাক্ষেত্রে কাজ করা? না, বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজে লাগা? মনে সন্দেহ নেই, যে নেফা

আগমনের ফলে আদিবাসী জীবনে আমার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়েছে। আমার নিজস্ব দিগন্তেও সীমা ভেঙে এসেছে বিস্তার। বহু ব্যক্তির উপর আমার ব্যক্তিপ্রভাব ফলপ্রসূ হয়েছে। নিজের রিসার্চের সুযোগ কমে গেছে, কিন্তু অন্যদের রিসার্চে উৎসাহদান, পথনির্দেশ, এগুলো করা সম্ভব হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মশৃঙ্খলা নিঃসন্দেহে আমার উপকার করেছে। সবটা দেখলে মনে হয়, কাজটা সঠিকই হয়েছে।

চার

তাই দিল্লীতে বসলাম সিলেকশান বোর্ডে। ভবিষ্যতে যা হবে আই এফ এ এস (ইনডিয়ান ফ্রন্টিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশান সার্ভিস) তার সূচনাপর্বের সদস্যদের নির্বাচনে সহায়তা করবার কাজে। গত আট বছরে আমি এমন অনেক সিলেকশান বোর্ডে থেকেছি। শুনতে যেমন লাগুক, কাজটা সে তুলনায় অনেক চিত্তাকর্ষক এবং কৌতুককরও বটে। যদিও, খোলাখুলি বলছি, পনেরো মিনিটের সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি মানুষের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করবে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কতটা সম্ভব, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ইংল্যান্ডের এক অফিসার ওদেশে এমন অনেক বোর্ডে বসেছেন, তিনি বলেছিলেন ওঁরা হিসেব কষে দেখেছেন, ওঁদের নির্বাচিতজনদের শতকরা ত্রিশজন কাজে বিফল হতেন।

একটি বোর্ড মিটিংয়ে এক প্রার্থী এল। দেখতে একেবারে গোরিলা, তেমনই বিশাল চেয়াড়ে চোয়াল, লম্বা লম্বা হাত চেয়ারের দুধারে মেঝে অবধি ঝুলছে। গুণগত যোগ্যতা কী, তা জিজ্ঞাসা করতে ও বলল, ও এক চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা এবং ভার-উত্তোলক। পড়াশোনা কতদূর তা শুধোতে ও বলল, সীমান্তে তার কোনো দরকার আছে ব'লে ও মনে করে না।

সীমান্তের জন্য প্রার্থী বাছাই করার সময়ে আদিবাসীদের বিষয়ে মনোভাব কী, তা জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষকরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, প্রার্থী কি কোনো আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি?

একজন জবাব দিয়েছিল, 'অবশ্যই, যদি কোনো সুযোগ্যা পাত্রী আসে!'

আমি নেফা যেতে এমন উৎসুক, শীতের সময়ে ভ্রমণে এত ইচ্ছুক, যে টিক্কি কাউলকে বললাম, সিলেকশান বোর্ড থেকে আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হোক। যত দ্রুত পারি, পাটানগড়ে ফিরলাম, গোছগাছ সারলাম। মনে হচ্ছিল, মনে হওয়াটা যথার্থও বটে,— যে এত বছর ধরে যাদের জানি, যাদের এত ভালবাসি, তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াটা বড় কষ্টের, যেন আচমকা। পাটানগড় ছেড়ে আসতে হৃদয় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এ কাজ তো করতেই হ'ত। এলাম কলকাতা। ভিক্টর্ স্যাসুন সঙ্গ ী হ'ল। আসামের খাসি পর্বতে শিলং হ'ল নেফা প্রশাসনের সদর শহর। খুবই সুন্দর, তবে এখন জনসংখ্যা প্রচুর। ভিক্টর বলেছিল শিলংয়ে বসত করার ব্যাপারে ও সাহায্য

করবে। ১৯৫৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর আমরা বিমানপথে গৌহাটি গেলাম। নিউ ইয়ার ইভের ডিনারের সময়েই পৌঁছলাম শিলং-এ, পাইনউড হোটেলে। পরদিন গেলাম গভর্নর ও রুস্তমজীর সঙ্গে দেখা করতে। ইনি তখনো উপদেষ্টা ছিলেন। শুরু হ'ল আমার নতুন জীবন। আমাকে প্রথমে বলা হয় অ্যানথ্রোপলজিকাল কনসাল্টেন্ট। পরে সেটা হল আদিবাসী বিষয়ক উপদেষ্টা। এ নামটা যোগ্যতর হয়েছিল। আমি বাঁধাধরা সরকারি কর্মী ছিলাম না, একটা সাম্মানিক পেতাম, প্রথমে তিন বছরের চুক্তি হয়। পরে আরো তিন বছরের জন্য। তারপর পাঁচ বছরের জন্য। এ কাজে পেনশান নেই। তবে যদি বা কোনো দিন নেফা ছাড়তে হয়, অবসর গ্রহণের কথা নিজের প্রসঙ্গে ভাবতেই পারি না।

নরী রুস্তমজী এক অনন্য চরিত্র মানুষ। এক জীবনে যত সবচেয়ে বন্ধুভাবাপন্ন, দয়ালু মানুষ দেখা যায়, তাদের একজন। বিশাল কল্পনাশক্তি, অনুকম্পায়িতা, মাথাটি সাফ। জীবনীশক্তি রীতিমত নাড়া দেয়। প্রথম দিন আমাকে নিয়ে অনেক মাইল হাঁটলেন। অধিকাংশটা চড়াই পথে। আমি এমন দমছুট হয়ে যাই, যে একটা কথাও বলতে পারছিলাম না। আমার ধারণা, উনি তাই চেয়েছিলেন। তখন অতি বিশদভাবে আমাকে সব বোঝাতে বোঝাতে চললেন। কথার মাঝে কথা কওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। আদিবাসী মানুষের প্রতি ওঁর যে স্নেহ, তা যেমন খাঁটি, তেমনই বাস্তবজ্ঞানপূর্ণ। মানুষ হিসেবে ওদের বোঝার নৈপুণ্য দারুণ। সঙ্গীত বিষয়ে ওঁর ভালবাসা ও জ্ঞান, এই সঙ্গীতপ্রেমী মানুষজনের কাছে ওঁকে প্রিয় করেছে। ব্যক্তি-মানুষ নাগাদের জন্য ওঁর চেয়ে বেশি কেউ করেছে। অথবা ওঁর চেয়ে বেশি বুঝেছে বলে আমি জানি না। ওঁর মা 'মামি রুস্তমজী' বহুবছর ওঁর সংসার সামলাচ্ছেন। ইনি ভারী সংবেদনশীল, সদয় ও উদার মানুষ। এই সেদিন, যেন এই বইয়ে ওঁর নামটা ঢোকাবার জন্যই নরী বিয়ে করলেন মোহিনী রূপসী আভি দালালকে।

নেফাতে প্রথম ক'বছরে আমার জীবনে বিরাট ভূমিকা আছে গভর্নর জয়রামদাস দৌলতরামের। সবসময় একমত হতাম না। তবে আমাদের আলোচনার ফলে জীবন কিছু মুখরোচক হত। আদিবাসী সমস্যায় দুজনেই ছিলাম আগ্রহী, যেন একসূত্রে বাঁধা। গভর্নরের বিশেষ আগ্রহ ছিল আদিবাসী ধর্মে। সৃষ্টিকর্তা বা সর্বময় ঈশ্বর বিষয়ে মানুষ কী ভাবে. সে বিষয়ে প্রশ্নে তাঁর ক্লান্তি দেখি নি।

যেমন, একদিন সুবর্ণসিরির উত্তরাঞ্চলের আরণ্য এলাকা থেকে এক তাগিন দলপতিকে শিলংয়ে আনা হ'ল। এস এক হিংস্র-দর্শন মানুষ, সঙ্গে অনেক হাতিয়ার, মুখে এক লম্বা পাইপ। গভর্নর বললেন দোভাষী নিয়ে আমাকে আসতে,— ও কী বলে, তা শুনতে। তাগিন দলপতি মার্চ করে রাজভবনে ঢুকল, মুখে পাইপ। আমি তো মুগ্ধ। গভর্নরকে দেখলেই চুরোট নামিয়ে রাখি। সবাই বসলাম। শ্রী দৌলতরাম প্রশ্ন শুরু করলেন। আধঘন্টা জেরার পর দলপতি উসখুস করতে থাকল। পাইপ

নিঃসৃত ধোঁয়া আরো কালো হচ্ছে। হাতটা এগোচ্ছে ওর লম্বা ক্ষুরধার তরবারির দিকে, আমরা শঙ্কিত। অবশেষে গভর্নর জানতে চাইলেন, সর্বময় ঈশ্বর বিষয়ে ওর ধারণা কী! ও জবাব দিল, 'ও সব আমি জানি টানি না। আমি চাই এক ঢোঁক বিয়ার।'

গভর্নর সর্বদা সবুজ কালিতে লিখতেন। রাত দুটোর আগে শুতে যেতেন না। সবচেয়ে জুনিয়র অফিসারদের প্রতি রিপোর্ট ও ট্যুর ডায়েরি খুঁটিয়ে পড়তেন। সব বিষয়ে নোট দিতেন। নেফা বিষয়ে একটা বড় বই লেখার ইচ্ছে ছিল। এ কাজ তিনি পারতেন। কেননা তাঁর ছিল প্রভূত জ্ঞান, অপার ভালবাসা। হয়তো কোনদিন লিখবেন। আমি আশা রাখি!

পাঁচ

প্রথমে শিলংয়ে যেন খেই হারিয়ে ফেলি। গভর্নরের সঙ্গে প্রভূত আলোচনা করা, নরীর কথা শোনা, এর বাইরে তো কিছু করার নেই। কেউ জানে না, আমাকে নিয়ে করবেটা কি! কোনো বই নেই যা পড়ব। তবে পুরনো ট্যুর ডায়েরি আমাকে দেওয়া হয়। আমার প্রথম 'কেস' হ'ল, তাওআং-এর মহান বৌদ্ধ মঠের গ্রন্থাগারটি। বলেছিলাম, পুঁথি সকলের ক্যাটালগ করা হোক। তিন বছর বাদে কাজটা হয়।

আমার স্টেনোগ্রাফার হতে কেউ রাজি নয়, একটা চাপরাশিও পাই নি। ভিক্টর সঙ্গে না থাকলে কিছুই পেতাম কি না সন্দেহ। দুটো মূল সমস্যা ছিল। একটি বাড়ি, একটা গাড়ি। অনেক দিন ধরে বাড়ি খুঁজে খুঁজে নিরাশ হলাম। অবশেষে শহরের বহিরাঞ্চলে নংথিম্‌মাই-তে একটি বড়সড় বাড়ি মিলল। বাড়িটি পাহাড়ের ওপরে, পাইন গাছের আড়ালে। উলটোদিকে কবরখানা। ফলে চুপচাপ। পৌঁছবার রাস্তাটা বেয়াড়া। সে আমার ভালোই লাগল। এখানে মনে হল, যেন জঙ্গলেই আছি।

খুব ইতস্তত করি, ভিক্টরও তাড়া লাগায়। ও বোঝাল, এই চমৎকার বাড়িতে প্রচুর জায়গা, আমার সংগ্রহের মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, এমন কি একটা অফিসও হয়ে যাবে। ঠিক করলাম, ভাড়া নেব। ভিক্টর বাড়িমালিকের সঙ্গে কথা কইতে কলকাতা গেল। ইনি এ. সি. গাঙ্গুলী, নামী ব্যারিস্টার। ওঁর এবং ওঁর পরিবারের সঙ্গে বহুদিন ধরেই আমাদের সুসম্পর্ক। এই সেদিন ওঁর মৃত্যু হয়, আমরা সত্যিই আঘাত পাই।

ভিক্টর আমাদের গাড়িও জোগাড় করে দিল, একটি পুরনো রোভার। একবার সত্যি সত্যি গাড়িটা গৌহাটি গেল। লীলা আর ছেলেদের যখন আনতে যাই। একটু ঘুছিয়ে বসার পর ওরা শিলং এল।

জানুয়ারির শেষাশেষি পরিবার, একটা বাড়ি, একটা গাড়ি, এমনকি একটা টেলিফোনও পেলাম। ফোন তো জীবনেও ছিল না। ফোনের নম্বরটা তেমন সুবিধের নয়, ৪২০,— ভারতীয় দণ্ডবিধিতে প্রতারণার সঙ্গে লড়বার ধারা। ওদিকে শিলংয়ে এক্‌সচেঞ্জে চারটে সংখ্যা তখনো আসে নি। ফলে অধিকাংশ লোকের ফোন নম্বর-এর

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। আমরা এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি, নম্বরটা ৩০২ (নরহত্যা) নয়, অথবা ৩৯৭ (ব্যভিচার)। এক ধর্মপ্রাণ ব্যাপটিস্ট বললেন, গাড়িব নম্বর ৬৬৬ নয়, তাতে আমরা বেঁচে গেছি।

এ সময়ে আমি ভারতীয় নাগরিক হই। বহুকাল চেষ্টা করেছি হবার। সবরমতিতে প্রথম জীবনে আমি মনে মনে তাই ছিলাম। আসাম সরকার অর্ডারটি ইস্যু করেন। বন্ধুরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন তোলে, আমি অসমীয়া কি না। আসলে, কেউ ভারতীয় নাগরিক হওয়ার অর্থ, গোটা ভারতেই সে তাই। আশা রাখি, কোনোদিন হয়তো বিশ্বনাগরিক হতে পারব। তবুও এর ফলে আসামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। কোমলস্বভাব, শিল্পপ্রাণ অসমীয়া মানুষদের আমি খুব পছন্দ করি। সংবিধানমতে নেফা আসামের অঙ্গ। দুটি অঞ্চলের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকুক, পরস্পরকে ভালো করে চিনুক। এটা যে খুব গুরুত্বের, তা আমি শিলংয়ে প্রথম দিন থেকেই বুঝতাম। সেই প্রাচীন পর্বে, যখন আদিবাসীরা শান্তিপ্রিয় সমতলের উপর আক্রমণ চালাত, সামরিক বাহিনী প্রত্যাঘাত করত। সে-সব, অন্তত নেফার জীবন থেকে চলে গেছে। এটা সুখের বিষয়। পার্বত্য সীমান্তঞ্চলের ভাগ্য, ওদের নিকটতম প্রতিবেশী আসামের সঙ্গে গ্রথিত।

ছয়

জানুয়ারির শেষে কর্মীদের জুটিয়ে অফিস শুরু করলাম। এক রাঁধুনিও জুটল। ভিক্টর বলত, 'ও খাদ্যরসিকদের স্বপ্নের মানুষ।' আমার খাসি স্টেনোটি ছিল এটা-সেটা জোগাড়ে ওস্তাদ। আমাকে একটি আরামপ্রদ চেয়ার এবং একটি অফিস ঘড়ি এনে দেয়। জীবনে প্রথম ফাইল নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্‌থ্রোপলজিতে থাকার সময় আমি শুধু রিসার্চের কাজই করেছি। জীবনে কোনো ফাইল আসে নি আমার কাছে। অফিসের পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়া; অডিটে আপত্তির ব্যবস্থা করা; দলিলপত্রে যান্ত্রিক নিয়মে সই করা;— না সহজে হয় নি।

আমার মতো যে মানুষ জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ে দীর্ঘকাল বাস করেছে, তার কাছে নেফা এক মোহনীয় অভিজ্ঞতা। যোগাযোগ ছিল সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, প্রশাসনিক জগৎ ও আসাম রাইফেল্‌স্‌-এর সঙ্গে। উত্তর-পূর্ব ভারত সীমান্ত সুরক্ষার কাজ করে এই বিশেষ দলটি।

জানুয়ারির মাঝামাঝি এলেন নতুন উপদেষ্টা, কে. এল. মেহতা। বহুদিন ওঁকে 'কেন্‌' বলেছি। ভেবেছি স্বাক্ষরের 'কে' মানে 'কেনেস।' উনি বললেন, কান্‌হাইয়া লালের বদলে "কান্‌" বলতে পারো। আমি বললাম, একটি অক্ষর একটা নামকে বিশ্বের এক গোলার্ধ থেকে আরেকটিতে নিয়ে যেতে পারে। রুস্তমজী বদলি হলেন সিকিমে। দেওয়ান হিসেবে পাঁচ বছর বিপুল সাফল্যে কাজ করলেন। ১৯৫৯-এ শিলংয়ে দ্বিতীয়বার উপদেষ্টা হয়ে এলেন। ১৯৬৩-র মাঝামাঝি গেলেন বার্মা।

আদিবাসী অঞ্চলের এক মহান প্রশাসক হিসেবে কান্ মেহ্‌তা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সময়ে যে 'এক সূত্রীয় প্রশাসন'-এর কল্পনা উন্নয়নীকৃত হয়, নেফায় আগত সকলজনকে তা চমৎকৃত করেছে। আদিবাসী সমাজ বিষয়ে ওঁর কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু ওঁর দ্রুতধা, জীবন্ত মন শীঘ্রই ওদের সমস্যাগুলো ধরে ফেলল। এবং ওঁর মননের ঔদার্য এমনই, যে অন্য কেউ সুপারিশ করেছে বলেই কোনো নীতির বিরোধিতা উনি করতেন না। ফলে আমরা ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে কাজ করতাম। আমার *এ ফিলসফি ফর নেফা* ওঁর কাছে খুবই ঋণী। কান্-এর স্ত্রী গিসেলা চমৎকার মানুষ। শিলংয়ে সে সাড়ে পাঁচ বছর থাকেন। কোনদিন শুনিনি কারো বিষয়ে অপ্রিয় কিছু বলছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন দিকগুলি একসূত্রে বেঁধে রাখার কাজে উনি ছিলেন যথার্থ মানুষ।

বহুবছর যাঁকে জানি, তেমন এক চমৎকার মানুষ হলেন প্রাণ লুথরা। রুস্তমজীর পর ১৯৬৩-তে উপদেষ্টা পদে ইনি আসেন। ফিল্ড অফিসার হিসেবে অত্যুৎকৃষ্ট এই মানুষটি পরে ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হয়ে শিলংয়ে এলেন। দিল্লীতে কিছু কাল কাটালেন। নতুন সৃষ্ট নাগা হিল্স— তুয়েনসাং অঞ্চলের প্রথম কমিশনার হিসেবে নাগা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন। অতীব কর্মদক্ষ, প্রত্যেককে দারুণ খাটাতেন। কিন্তু অধীনস্থ অফিসারদের প্রসঙ্গে বেজায় ভালো ছিলেন। সিডনি স্মিথের বর্ণনা: কোনো ব্যক্তি যেন 'ট্রাউজার পরিহিত স্টীম এঞ্জিন',— আমার মনে পড়ত এঁর প্রসঙ্গে। অবশ্য এটাই চাই আমরা, কেননা কাজটা ইনি করে ছাড়েন। একই সঙ্গে মানুষটি বেজায় মানবিক, কৌতুকবোধ তীক্ষ্ণ। একদা গৌহাটি থেকে শিলং যাত্রাকালে ওঁর লামা অভিজ্ঞতার কথা বলে গাড়ি বোঝাই লোককে হাসিতে মাতিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার শক্ত বাঁধনটা এক গভীরতর স্তরে। কয়েক বছর আগে উনি দালাই ও পাঞ্চেন লামাকে ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখিয়ে বেড়ান। মনে করি, ওঁর মনে এ কাজের এক গভীর ছাপ পড়ে। সে সময়ে আমিও বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। দু'জনের মন চলছিল একই পথ ধরে। যখনি আমি অসুস্থ হয়েছি, বা মনে এসেছে নৈরাশ্য,— উনি সান্ত্বনা এবং সমর্থন জুগিয়েছেন। ওঁর স্ত্রী ইন্দিরাও চমৎকার। এঁর জ্ঞান ও রুচিবোধ, এঁকে কোহিমার কুটীর শিল্প পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে চমৎকার কাজ করার প্রেরণা দেয়। দিল্লীতে একটি উচ্চমানের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ইনি। এটির উদ্বোধন করার সম্মান মেলে আমার। আরো আনন্দ, সভানেত্রী ছিলেন আমার বন্ধু কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।

পাঁচবছর ধরে আরেকজনকে পাই বন্ধু ও পরামর্শদাতা হিসেবে। ইনি ব্রিগেডিয়ার ডি. এম. সেন। ইনি সেনাবিভাগের প্রাক্তন জজ-অ্যাডভোকেট। আমি ওঁকে যতদিন জানি, ততদিনই দেখেছি, নেফা প্রশাসকের আইন বিষয়ক নীতি ইনি গভীর বিচক্ষণতায় পরিচালনা করেছেন। যাকে বলি আমাদের 'কেবাং নীতি— যার ফলে

প্রায় সব বিবাদ-বিসম্বাদ,— এমন কি ফৌজদারি ব্যাপারও নেফার ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী কাউনসিলের হাতে দেওয়া হয়,— এর সবটাই ওঁর সৃষ্টি। যখন লিখছি, তখন মাত্র ছয়জন নেফা আদিবাসী জেলে আছে। এ থেকেই ওই নীতির সফলতা বিচার করা যাবে। কোমলপ্রাণ ও স্নেহশীল শ্রী সেন, আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের কাজকর্মে একটি সহিষ্ণু ও অনুকম্পায়ী দর্শন এনেছেন।

আসাম ও নেফার বন্ধু ও সহকর্মীদের বিষয়ে আমি সব কথা বলতে পারব না। তা সম্ভব নয়। কোনো সংকটে, কোনো অভিযানে, কোনো আলোচনাচক্রে এত এত মানুষ আছেন যাঁদের কাছে আমার ঋণ অনেক, আগেও যা, পরেও তাই। তবে আসাম রাইফেল্‌সের প্রধান ব্যক্তি মেজর জেনারেল অজিত গুরাইয়া, তাঁর স্ত্রী প্রেম, নকুলের বিশিষ্ট বন্ধু বালক বিজয়, এঁদের তো বাদ দিতে পারি না। আরো একজন : নেফার এম. পি. দিইয়িং এরিং। এখন উনি পার্লামেন্টোরি সেক্রেটারি; আদিবাসী মানুষেরা। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়বে বলে যেভাবে এগিয়ে আসেছ,— ইনি তার প্রতীকোপম।

সূচনা পর্বে তেমন কিছু কাজ ছিল না। নতুন বাড়িতে আসার পর খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সদ্য যোগদানকারী পলিটিকাল অফিসারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হল। দুই-তিন সপ্তাহ ধরে রোজ আমরা গিয়ে জুটতাম রাজভবনে। লেকচার শুনতাম, আলোচনা করতাম। 'ট্রাইবাল অ্যাপ্রোচ'—এর ওপর আমাকে চারটি লেকচার দিতে হয়। ভালোই হয়েছিল। আমি দিব্যি আত্মসন্তুষ্ট, যখন দেখি অন্তত একজন অফিসার আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন; মন দিয়ে নোট লিখছে। লেকচারের শেষে এ কথা ওকে বললাম। ও বলল, "সত্যি বলতে কি, আমি ছাতামাথা লিমেরিক লিখছিলাম।"

এরপর, পর্বতাঞ্চল ও সমতলের এক উৎসব হয়। কি জানি কেন, এটা আর করা হয় নি। আসামে যে নবাগত, তার কাছে এটি অতীব উত্তেজক। অধিকাংশ পার্বত্য জেলার আদিবাসীরা এল। নেফার সর্বত্র থেকে দলের পর দল এল, নাচবে, আনন্দ করবে। রাজভবনের লনে গভর্নর জয়রামদাস দৌলতরাম এক বিশাল মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করলেন। যে ভাবে সবাই সবাইয়ের সঙ্গে মিলছিল, দেখে খুব ভালো লাগল। নেফার দুই আদিবাসী মহিলার মাঝে স্বয়ং গভর্নর বসে গেলেন মাটিতে। অন্যত্র যেমন দেখেছি, এখানে তেমন পরিবেশই নয়। সেখানে পার্টিতে অফিসাররা বসেন চেয়ারে, আদিবাসীরা বসে মাটিতে। দুই শ্রেণীর অতিথিদের পৃথক পৃথক খাদ্য ও সিগারেট দেওয়া হয়।

জানুয়ারির শেষে কান্ ও আমি, শিলং থেকে দুটো দিন চুরি করে বেরোলাম প্রথম নেফা দর্শনে। সে এক ঝোড়ো ট্যুর। রবিবার ভোর চারটেয় শিলং ছাড়ি। সোমবার দুপুররাতে ফিরি। বেশ কিছু জায়গায় যাই বিমানে। বিমান ভ্রমণের ফলে দেখি সীমান্ত পর্বতমালার মহিমা। এবং আমাদের কাজটি যে কত বড়, তাও বুঝি।

বেরোবার আগে নরী আমাকে ভীষণ ঠাট্টা করে। নেফাতে বিমান ভ্রমণের চূড়ান্ত বিপদ বিষয়ে বলে,— যে সব জায়গায় যেতে চাই, সে সব জায়গার বিপদ নিয়ে আরোই বলে। বলে, এক জায়গায় বিমান নামবার জমিনটি ঢালু, নদীতে গিয়ে মিশেছে। যখনি কোনো বিমান নামে, —আসাম রাইফেলের জওয়ানরা দু'পাশে দাঁড়ায়। উড়োজাহাজের ডানা দুটো চেপে ধরে থামায়। নইলে ওটা তো নদীতে পড়ে যাবে। অন্যত্র উড়োজাহাজ পাহাড়ে ধাক্কা খায়, ফুটবল-পোস্টে ধাক্কা মারে। যাক গে এ সব বুড়ো ডাকোটা প্লেনে দরজা নেই। দরজা হটানো হয়েছে, যাতে ওপর থেকে ঝাঁপ মারা সহজ হয়। সঙ্গের সাথিরা কেমন হবে, তাই বা কে জানে! এটা ঘটনা, যে আমি গরু, ছাগল, ভেড়ার সঙ্গে ভ্রমণ করেছি। এবারকার সফরে সঙ্গে একটি বড়সড় শুওর ছিল।

নেফাতে বিমানভ্রমণ সর্বদাই উত্তেজক। কেননা কিছু বিগড়ে গেলে পাহাড়ে বাঁচার ভরসা খুবই কম। একটি স্মরণীয়তম বিমান সফর হল। যাচ্ছিলাম এক হালকা অস্টার উড়োজাহাজে। মাত্র একটি আসন একটি যাত্রীর। পাহাড়ের তলদেশ থেকে উঠছি। এই ক্ষুদে উড়োজাহাজে বসে থাকা যেন প্লাস্টিকের বুদবুদের মধ্যে বসে থাকা; টের পাওয়া যে সেটা সত্যিই উড়ছে। সেদিন দৃশ্য ছিল অতি চমৎকার। চারদিকে কালো মেঘ। মাঝে মাঝে ঝলসাচ্ছে রোদ। ঝলকে উঠছে বন্য ও উদ্ধত পাহাড়। আমাদের যেন নখে চিরছে।

দীর্ঘকাল উড়োজাহাজে ভ্রমণ ছিল না-পসন্দ্। যদিও গত কয় বছরে খুব উড়েছি নেফায়, তার পাহাড়ে নেমেছি বেপট সব জায়গায়। এখন অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। আজব কথা, এক ভাইকাউন্ট বিমানে প্রথম ভ্রমণ, সব চেয়ে বেশি ভয় দেখিয়েছিল। যা সবচেয়ে অপছন্দ করি, তা হ'ল, পাইলটের একটা কমলারঙা নোটিশের সুইচ টেপার অভ্যেস। নোটিশ বলে, মাঝ-আকাশে সীট বেল্ট বাঁধো। অর্থাৎ বিমান ঝড়ে টাল খাবে বা আরো ভয়ানক কিছু ঘটবে।

আমি বসেছিলাম মাঝামাঝি জায়গায়। আকস্মিক মৃত্যু বিষয়ে ধ্যানের এক বই পড়ছিলাম। অর্থাৎ চোখে ছিল (কাছের) চশমা, দূরের কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঘন্টা খানেক কেটেছে। কমলারঙা আলোটি জ্বলল। তড়বড়িয়ে কম্পিত আঙুলে সীট-বেল্ট বাঁধলাম। হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম। অন্তিম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছি। এক চোখ খুলে দেখি বাতি নেই। ভাবলাম, পাইলট চমৎকার মানুষ। 'বিপজ্জনক জায়গাটা পেরিয়ে গেছে, অথবা ওটার পাশ কাটিয়ে গেছে।' আবার বেল্ট খুললাম। কিন্তু দশ মিনিট বাদে আবার আলো জ্বলল। আবার কম্পিত হাতে বেল্ট বেঁধে হেলান দিলাম। স্ত্রী ও সন্তানদের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। আবার আলো নিভল। তবে আমরা নিরাপদ। বই পড়া শিকেয় থাক, (দূরে দেখার) চশমাটা পরলাম। ক'মিনিট বাদে আলো জ্বলল, নোটিশটি পড়লাম; লেখা ছিল : [শৌচালয়ের] ভিতরে লোক আছে।

সাত

এখন সময়টাকে ভাগ করে ফেলেছি। ট্যুর, রিসার্চ ও নীতির বিবর্তন। সাহিত্য-কর্মের একটা নতুন ধারা আবিষ্কার করলাম। ফাইলে নোট দেওয়া। কাজটা ভালো, তবে পেশাদার লেখকের অসুবিধে অন্যত্র। নেফাতে প্রায়শই এই নোট লেখাটা হয় 'গোপনীয়', নয় 'টপ সিক্রেট।' পাঠক একজন বা দু'জন। মিলটন যে আদর্শের কথা বলেছেন, "যোগ্য শ্রোতা মিলছে, তবে অতি কম।" আমি সেখানে পৌঁছে গেছি। অবশ্য মাঝে মাঝেই মনে হয়, কোনো শ্রোতাই কি আছে?

এই বছরগুলোতে আমার কাজের সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ হ'ল ট্যুর করা। স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে সে কথা লিখছি। এই সেদিন অবধি বছরে ছয় বা সাত মাস পাহাড়ে থাকতাম।

আমার রিসার্চের চরিত্র বদলে গেল। তেমনটিই হবার ছিল। আগে আমার থাকত অগাধ সময়, অন্য কোনো কাজের চাপ ছিল না, মানুষের মধ্যে বসবাস করতে পারলাম দীর্ঘ সময়। নেফাতে আমাকে পার্বত্য অঞ্চলের এক বিশাল সীমাক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হত; প্রায় তেত্রিশ হাজার বর্গমাইল; তিরিশ বা চল্লিশটি আদিবাসী গোষ্ঠীর দেখভাল করতে হত। তাই তিন থেকে ছয় বা সাত সপ্তাহের জন্য সুদূর অভ্যন্তর এলাকায় চলে যেতাম। সমাজবিজ্ঞানের তথ্য যতটা সম্ভব জোগাড় করতাম। গোষ্ঠীগুলির অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট লিখতাম। এবং প্রশাসনকে নানা প্রস্তাব সুপারিশ করতাম। লোকগাথা ও শিল্পে আমার আগ্রহ থেকেই গেছে। কিন্তু ফলিত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানই থেকেছে আগ্রহের মুখ্য বিষয়।

প্রথম বইটি লিখি গভর্নর শ্রী দৌলতরামের কথায়। ইনি চেয়েছিলেন গান্ধী বিষয়ে এক ছোট্ট বই, যা আদিবাসীদের মনে ধরবে। ওঁর বিষয়ে লেখা অধিকাংশ বইয়েই দেখি, ওঁর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে এমন সব জায়গায় জোর দেওয়া হয়,— আদিবাসী পাঠকের কাছে তা অজানা তো বটেই,— ওরা তাতে প্রবেশ করতে পারে না, ঘাবড়েও যায়। যেমন, গান্ধীর শপথ, গরুর দুধ খাবেন না। আদিবাসীরা বুঝত না, এর পরেও আমরা কেন প্রাণপণে ওদের বলছি দুধকে নিষিদ্ধ মনে কোর না। সন্তানদের দুধ খাওয়াও। গান্ধী মনে করতেন মদ ও তামাক খারাপ। এরা তো সে কথা মানতেই নারাজ। তাই, গান্ধী জীবনের যে সব দিক এদের মনে ধরবে, তার ওপর জোর দিয়ে আমি একটা ছোট্ট বই লিখি। এখন এ বই হিন্দী, আদি, আও নাগা, মোন্‌পা, আপাতানি, দাফ্‌লা ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ভ্রমণকালে শোককথা সংগ্রহ করতাম। অনেকগুলোই চমকপ্রদভাবে মৌলিক। আমার সংগৃহীত প্রায় সবগুলোই অন্যান্য লোককথা থেকে স্বতন্ত্র ধাঁচের। যথেষ্ট সংগ্রহ হলে একটি বই প্রকাশ করি, *মিথ্‌স অফ দি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্‌ডিয়া।* এতে ওসব লোককথার প্রায় চারশোটি আছে।

নেফা বিষয়ে প্রাচীন বইপত্তর থেকে সংকলনের কাজ করছিলাম। সাধারণে যা জানে, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি বই আছে। অধিকাংশই চাপা পড়েছে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নিচে, খুঁজে পাওয়াই দায়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত আমার *ইনডিয়া'জ নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি* বইটি প্রায় পাঁচশো পাতার। ১৮০০-১৯০০ বৎসরে যে সব প্রাচীন আবিষ্কারক, মিশনারি ও প্রশাসকরা লেখেন, তাঁদের লেখার অনেক কিছু এতে সংকলিত হয়। উদ্ধৃতির অনেকগুলো গভীর আগ্রহোদ্দীপক, কতকগুলো মজার। বইটির সাফল্য ছিল প্রত্যাশাতীত। পুনর্মুদ্রণও হয়েছে।

তারপর অনুরূপ আরেকটি সংকলন করেছি আমি। *দি নাগাস্ ইন্ দি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি*। শীঘ্রই এটি প্রকাশিত হবে।

আমার *ট্রাইবাল আর্ট অফ মিড্ল ইন্ডিয়া* বইটির অনুবর্তী আরেকটি বই লেখার কথা কয়েক বছর ধরেই ভাবছি। বেশ অনেক ছবি জোগাড় করি, তা আজও রয়েছে। নেফাতে কিন্তু পেলাম দুর্লভ বস্তুর আলিবাবার ঐশ্বর্য! অন্যত্র যা পেয়েছি, এ তার চেয়ে অনেক বেশি। তুয়েনসাং-এ প্রথমবার গিয়ে সাচ্চা নরমুণ্ড-শিকারের সংরক্ষিত নিদর্শন জোগাড় করি। এর পর থেকে যতবার গেছি, আমার সংগ্রহশালার জন্য এনেছি অনেক কিছু। অনেক ফোটো তুলি, অনেকগুলো ভালোই হয়। যখন যথেষ্ট সংগ্রহ হল, তা দিয়ে একটি বই হয়ে গেল, *দি আর্ট অফ দি নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া*। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বলল, বইটা নিজেদেরই ছাপা উচিত। আমার খুব ভালো লাগল। সরস্বতী প্রেস (কলকাতা) এটা ছাপে। খুব কর্মদক্ষ লোকজন, ওঁদের সঙ্গে কাজ করা খুব আনন্দের ব্যাপার। উৎকৃষ্ট এক শিল্পী পাই, আর. বাগচী। লে-আউট তৈরি, ইত্যাদি খুব মনভরানো কাজ হয়ে ওঠে। অর্থদপ্তরও আমার প্রতি সদয় ছিল। আমার বন্ধু নির্মল সেনগুপ্ত তখন অর্থদপ্তর দেখে। ও নিজেও শিল্পী, বসন্তের একটি সুন্দর স্কেচ করেছিল। আমরা দিব্যি জাঁকালো এক বই বের করলাম। যথেষ্ট দামী হওয়া সত্ত্বেও বইটি বেশ বহুল প্রচার পায়।

আমার সব বইয়ের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত বই, *এ ফিলসফি ফর নেফা*। এখন ওটার তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ চলছে। পরে শ'খানেক পাতার একটা ছোট বই লিখি। এ বইয়ের লেখক ও প্রকাশক আমি। এ কোনো সমাজবিজ্ঞান চর্চা নয়। দুনিয়ার এই কৌতূহলজাগানো এলাকার ইতিহাস ও রাজনীতি। প্রকাশনা হিসেবে বইটি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পায়।

একটি ছোট রিসার্চ বিভাগের কাজ বিষয়ে নির্দেশ দিতে আমাকে বলা হ'ল। এরও বিভিন্ন বিভাগ ছিল,— সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা। এ বিভাগটি এ সব বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করেছে। এ কাজে বিপুল সাহায্য করেছে বিভাগটির বিশেষ চরিত্র। আমরা অভ্যন্তর এলাকায় রিসার্চ অফিসারদের নিযুক্ত রেখেছি। ফলে এরা ওদের মধ্যে বসবাস করে, ওদের সাহচর্যেই আনন্দ করে

এবং বলতে গেলে সমস্ত সময়ে ওদের পর্যবেক্ষণ করে। আমাদের অফিসারদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বি. দাস শাস্ত্রী। ইনি ভাষাতাত্ত্বিক, এক উজ্জ্বল স্কলার, এঁর আগ্রহক্ষেত্র যেমন বিস্তারায়িত, তেমনই অ-সাধারণ। এঁর বন্ধুত্ব আমার কাছে খুবই দামী।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার কাজের পরিধিও বেড়ে চলল। আসাম রাজ্যে এক ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপনে আমাকে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। আমাকে মণিপুর ও ত্রিপুরার অনারারি অ্যাডভাইজার ফর ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স নিযুক্ত করা হয়। সেখানে যাই মাঝে মধ্যে, যতবার যেতে চাই, তা তো পারি না। নাগা এলাকায় আমাকে কোনো সরকারি পদে নিয়োগ করা হয় নি। তবে নাগাল্যান্ড স্থাপিত হওয়ার আগে ও পরে ওখানে আমি বারবার গেছি।

ফলে বন্ধু সংখ্যাও বেড়েছে। ইম্‌ফলে ছিলেন জে. এস. রায়না এবং তাঁর অসামান্যা স্ত্রী বিমলা। শিলংয়ে তো অনেক বন্ধু মেলে। খাসিদের বিচক্ষণ নেতা শ্রী ও শ্রীমতী ডানকান। মিসেস খোংগ্‌মেন, স্ট্যানলি নিকোল্‌স-রয় এবং এল. কে. ডোলির মতো অন্যান্য আদিবাসী নেতা। বহুৎ পড়াশোনা করা ও কৌতুকবোধে দীপ্ত আহমেদ কিদোয়াই, আর. বি. ভাগাইওয়ালা এবং পি. এইচ. ত্রিবেদী। ছিলেন আর. টি. রীম্‌বাই। এঁর সঙ্গে আমি আসাম রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কাজ করি। এস. বর্‌কাটোকি, যাঁর আদিবাসী অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞান প্রগাঢ়, এবং এঁর শ্লেষতীক্ষ্ণ কলম খুবই উৎসাহ দেয়। এবং— আরো অনেকে।

আট

১৯৫৯ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত জি. বি. পন্থ আমাকে একটি কমিটির চেয়ারম্যান হতে বলেন। এই কমিটি, সমগ্র দেশে নির্বাচিত আদিবাসী এলাকায় উন্নয়নের প্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নির্দেশে সাধারণ কম্যুনিটি ব্লক উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতে একটি প্রকল্প সংযোজিত হয়। এটির উদ্যোগ ও ব্যয়ভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। তখন এগুলির নাম হয় স্পেশাল মাল্‌টিপার্পাস ট্রাইবাল ব্লক। এর প্রধান বিষয়, প্রতি ব্লককে বারো লক্ষের বদলে সাতাশ লক্ষ করে টাকা দেওয়া। এ কাজের বহু সমালোচনা হয়। বলা হয়, টাকা ঠিকভাবে খরচ হচ্ছে না। মাঝে মাঝে একেবারেই খরচ হচ্ছে না। তদন্ত করে, বাস্তবে কী হচ্ছে তা রিপোর্ট করার জন্য আমার কমিটি গঠিত হয়।

আমার সহকর্মীদের সকলেরই আদিবাসী এলাকা বিষয়ে ব্যাপাক অভিজ্ঞতা ছিল। এ ক্ষেত্রে কর্মরত তরুণতরদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন ও. কে. মুর্থি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে আদিবাসী প্রসঙ্গে ইনি অনেক বছর ধরে ছিলেন। সে সময়ে ইনি সেক্রেটারি।

রিপোর্ট তৈরি করতে আমাদের একবছর লেগে যায়। এটি প্রস্তুত করার জন্য

সুযোগ মেলে পুরনো চেনাজানা কিছু এলাকায় আবার যাবার। নতুন নতুন জায়গার খোঁজ মেলে। এই প্রথম যেতে পারলাম অন্ধ্রপ্রদেশ, চান্দা, বম্বের মোকাড়া-তালসারি। আসামের স্বয়ংশাসিত পার্বত্য জেলা সকল, পরে রাজস্থান, সর্বত্র আদিবাসী জেলায় জেলায়।

তদন্ত হয়ে গেলে মনে হ'ল রিপোর্টটি দিল্লীতে বসে লেখাই সম্ভবপর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, প্রধান মন্ত্রালয়ে আমাকে একটি চমৎকার ঘর দেন, আমি দু'মাস কাজ করি সেখানে। তখন বাচ্চাদের স্কুল ছুটির সময়কাল। আমি লীলা ও বাচ্চাদের আনালাম। সবাই থাকলাম রাথিদের বাড়ি। ওদের ঘাড়ে বোঝা চাপানো হয়েছিল, আমাদের কিন্তু আনন্দে সময় কাটে।

ক্ষেমলাল রাঠি নেফা প্রশাসনে অর্থ-উপদেষ্টা। উনি চলে এলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। উনি জাঠ। আদিবাসীদের জন্য ওঁর মর্মানুভূতি খুবই ভিতরের ব্যাপার। ওদের সম্পূর্ণ বোঝবার ব্যাপারটা যেন ওঁর নিজের দায়িত্ব হিসেবে নেন। সততায় উনি যমনালাল বাজাজের মতো লোকদের সদৃশ। ওঁর দয়ালুতা বিশ্বজনীন। প্রত্যেকে ওঁর কাছে যেতে পারত। খুবই ধর্মানুরাগী, পন্থাও সঠিক। উৎকৃষ্ট প্রশাসকও বটেন। আমার জীবনে ওঁর ভূমিকা অনন্য। আমাদের দুই পরিবার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এবং ওঁর স্ত্রী লীলার বিশেষ বন্ধু।

দিল্লীতে কাজ করার সময়ে, রিপোর্টে এক জায়গায় জোর দেবার জন্য 'কিং লীয়র' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। শেক্সপীয়ারের বইটির এক কপি আনার জন্য আমার সহকারীকে সেক্রেটারিয়াট গ্রন্থাগারে পাঠাই, কেননা আমার বন্ধুদের কাছে ও বই ছিল না। চাইলে পরে গ্রন্থাগারিক ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'অফিস টাইমে শেক্সপীয়ার পড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক করছেটা কি? আমি কখনোই এক কপিও দেব না।' আমার সহকারী বলল, 'এ তো ডঃ এল্যুইনের জন্যে।'— 'ও, ডঃ এল্যুইন? জানি উনি এমন সব বই পড়েন। ঠিক আছে, ওঁকে দেওয়াই ভালো।'

আরো সমস্যা, কি করে বক্তব্য বোঝাই।

কম্যুনিটি ডেভলপমেন্টের লোকরা কর্মপ্রাণ, বুদ্ধিমানও। ঝামেলা একটাই, প্রায়ই বুঝি না ওঁরা কী নিঁয়ে কথা বলে চলেছেন। আরো মুশকিল, ওঁরা বোঝেন না আমি কী বলছি। যেমন, যখন বলতাম, 'কেমন করে কাজটা করেন?'

ওঁরা বলতেন। 'আপনি কি শৃঙ্খলাবিজ্ঞান মতে কাজ করেন?'

একটি নোটে লিখেছিলাম, 'যখন আদিবাসী মেয়েরা শহরে যায়, মাঝেমধ্যে ওরা গণিকা হয়ে যায়।' বিশাল ঝামেলা হয়। ওপরমহলে আমাকে প্রায় অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়, কেননা সরকারি রিপোর্টে আমি "গণিকা" শব্দ ব্যবহার করেছি। বাক্যটি পুনর্লিখিত হল; কেমনভাবে লেখা উচিত আমাকে তা শেখানোর জন্য। "তপশীলভুক্ত আদিবাসী রমণীগণ যখন নগর-সমাজের সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবেশ থেকে সেখানকার প্রথা গ্রহণ করে, তাদের মানসিকতায় বিপর্যয় ঘটে এবং তারা সমাজ-

বিরোধী প্রথাসকল গ্রহণ করে।' এমনটি লেখাই আবশ্যিক। এটা জনগণ বুঝবে।

যাই হোক, অবশেষে আমার ইংরিজিকে যথাযোগ্য ভাবে পালিশ করার পর সকল সদস্যই রিপোর্টটিতে সই করতে সম্মত হলেন। ৫৫০ পাতার রিপোর্ট। অধিকাংশই আমার লেখা, বা আমার দ্বারা পুনর্লিখিত। ১৯৬০-র মার্চের শেষে আমি ওটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি. বি. পন্থকে পেশ করলাম।

উন্নয়নের সকল বিভিন্ন দিক নিয়েই আমরা রিপোর্টটি লিখি। কর্মীসমস্যা, ওদের প্রশিক্ষণের ব্যাপার; জমি, জঙ্গল ও কৃষি,— বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল বিতর্কিত জুম চাষ নিয়ে। পশুপালন, সংবাহন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যপরিষেবা, শিক্ষা, মেয়েদের কর্মসূচী, শিল্প ও হস্তশিল্প, আবাসন, সমবায় ও গবেষণা। ভারতের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত স্পেশাল ব্লকগুলির কুড়িটির উপর আমরা বিশদ এবং যথাযথ রিপোর্ট দিই।

আমার মনে হয়েছিল, আমাদের রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রারম্ভের ভূমিকাটি, যার শিরোনাম ছিল 'দি ফাণ্ডামেন্টাল্স অন অ্যান অ্যাপ্রোচ টু দি ট্রাইব্স্।' কেননা যে কথা বহু বার বলেছি, তাই বলি এখানে । কাজে কী করছে তা তেমন বড় কথা নয়। কত টাকা খরচ করছ, তা অরো গৌণ। আদিবাসীদের পক্ষে প্রকৃত সত্যটা হ'ল, কিভাবে তুমি তা করছ। এই বিশেষ উন্নয়নী পরিকল্পনাগুলোর বিষয়ে একটি সমালোচনা হল, তাতে কোনো 'ট্রাইবাল টাচ' ছিল না। আদিবাসী অঞ্চলের জন্য ছকেবাঁধা পরিকল্পনাই নেওয়া হয়। আদিবাসীদের প্রয়োজন কী, তার সঙ্গে বাজেটটি সঙ্গতিপূর্ণ করার কোনো রীতিমতো প্রচেষ্টা করা হয় নি। আদিবাসী জীবন সম্পর্কীয় নীতি বিষয়েও ওই এক কথাই প্রযোজ্য। 'ট্রাইবাল টাচ' ব্যাপারটিকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হয়। কেননা সহানুভূতিহীন অফিসাররা এর এই ব্যাখ্যা করলেন, আমরা চাইছি ওরা চুলে পালক গুঁজে নগ্নদেহে ঘুরে বেড়াক। তা তো সত্যি নয়। আমরা এর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করলাম।

'ট্রাইবাল টাচ' বা "আদিবাসীদের প্রতি পক্ষপাত' এর মানে হ'ল,— যদি পারি, তাহ'লে আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ওদের চোখ দিয়ে ব্যাপারটা দেখতে হবে। আমাদের জানতে হবে, ওদের কাছে সবচেয়ে দামী কী। আমাদের দেখতে হবে, ওরা যেন সুবিচার ও যথাপ্রাপ্য তা পায়। যে সব শোষকরা আজও ওদের গ্রামে হানা দেয়, তাদের হাত থেকে ওদের বাঁচাতে হবে। দেখতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে ওরা এমন অবস্থানে পৌঁছায়, যাতে নিজ নিজ অঞ্চলের প্রশাসন এবং উন্নয়ন ওরা নিজেরা করতে পারে।

আদিবাসীদের প্রতি পক্ষপাত, এর অর্থ এই, — ওরা যে ভাবে যা করে, তাকে আমরা স্বীকৃতি ও সম্মান দেব। এ জন্য নয়,— যে সেটি প্রাচীন এবং সুন্দর। এই জন্য,— যে ওটা ওদের নিজস্ব অর্জন। ওদেরও নিজ সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর সেই অধিকার আছে, যা ভারতের যে কোনো লোকের আছে। এর মানে এই,— আমরা অবশ্যই ওদের ভাষায় কথা বলব। সে শুধু শব্দোচ্চারিত ভাষা নয়। সে গভীরতর,

হৃদয়ের ভাষা। এর মানে এই,— ওদের অতীত বিষয়ে আদিবাসীদের মধ্যে আমরা লজ্জার বোধ জাগাব না, কিংবা ঐতিহ্য থেকে হঠাৎ উপড়ে নিয়ে আসব না। সাহায্য করব, ওরা যেন নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপরেই গড়ে তুলবে নিজেদের,— এবং বেড়ে উঠবে বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে। এর মানে এই নয়, যে নীতিটা শুধু সংরক্ষণের। এর মানে নিরন্তর উন্নয়ন এবং পরিবর্তন আনয়ন। এ পরিবর্তন সময়ে আনবে অবিশ্বাস্য সমৃদ্ধি, যেহেতু ভারতের মূলস্রোতের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয় হবে।

শেষে বলেছিলাম। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, সঠিকভাবে পরিগৃহীত ও প্রয়োগসম্ভব উন্নয়নী পরিকল্পনা বিশাল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। এটাই আমাদের প্রস্তাব। নতুন আদিবাসী ব্লকগুলির জন্য চেয়েছিলাম 'সামান্য' ত্রিশ কোটি টাকা। বলেছিলাম। দুর্গম এবং ব্যাপ্তিতে বিশাল অঞ্চলের প্রেক্ষিতে এ অতি সামান্য টাকা। বলেছিলাম :

> আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে. এর অর্থ,— বাড়াবাড়ি রকম দ্রুতগতিতে উন্নয়ন ঘটবে, কার্যসূচী খুবই জটিল হবে এবং অযোগ্য লোকেরা চাকরি পাবে। তেমন হবার দরকার কি? মানছি, আমাদের 'ধীরগতিতে দ্রুত কাজ করতে হবে', সন্তর্পণে এগোতে হবে, নতুন দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য নিজেদের যে সময়টুকু লাগবে, তা ওদের দিতে হবে। আমরা যে চেষ্টাই করিনা কেন, বহির্জগৎ ওদের দুনিয়ায় প্রবেশ করবেই এবং সে জন্য ওদের তৈরি থাকতেই হবে। ক্ষুধা, রোগ, শোষণ, অজ্ঞতা, বিচ্ছিন্নতা, এগুলো অভিশাপ। এগুলো থেকে মুক্ত করার কাজে আর দেরি করা চলে না। দ্রুতগতিতে, দক্ষতার সঙ্গে এসব থেকে ওদের মুক্ত করতে হবে।
>
> 'প্রতিটি মানব তার ভাইয়ের দায়িত্ববহন করবে,'—(ওদের বিষয়ে) আমাদের দীর্ঘ অবহেলা, আমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, -এর প্রায়শ্চিত্ত আমাদের সকলকে করতেই হবে। (জগতে) একটি মানবজাতি, এবং আদিবাসীরা সে জাতির অতীব অমূল্য এক অঙ্গ।

রিপোর্টটি সদর্থে গৃহীত হয়। অনেক সম্মেলন ও সভায় আলোচিত হয়। প্রশাসনিক প্রসঙ্গে কিছু প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করেন নি। তবে বলতে গেলে প্রায় সবটাই মেনে নেন। আদিবাসী উন্নয়ন প্রসঙ্গে আমাদের মূল প্রস্তাবগুলি এখন সাধারণ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে বলে মনে করি।

নয়

নেফা থেকে আমাকে যথেষ্ট সরে থাকতে হয় এই কমিটির কাজের জন্য। ও কাজ

ফুরোলে আসল কাজে ফিরে আসব, এমন আশায় ছিলাম। কিন্তু ১৯৬০-এর এপ্রিলে, ভারতীয় সংবিধান মতে এক শিডিউল্‌ড এরিয়াজ অ্যান্‌ড শিডিউল্‌ড ট্রাইব্‌স কমিশন তৈরি হয়। শ্রী ইউ. এন. ধেবর চেয়ারম্যান। আমি অন্যতম সদস্য। আরো নয়জন ছিলেন, অধিকাংশই পার্লামেন্ট সদস্য। আমার নিজ কমিটির চেয়ে এর অধিকারক্ষেত্র অনেক বড়।

ধেবর কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, এক মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। ইনি জেদী, ভালো লাগার মতো মানুষ। খাটবার ক্ষমতা অসীম, সামাজিক-আর্থনীতিক ন্যায়বিচারের উপর বিপুল বিশ্বাস। ওঁর সঙ্গে ভালো বনিবনা হয়েছিল। বড়মাপের নীতি, যা দেখতে হত, আমরা প্রায়শ একমতই হতাম। ধেবর এ কমিশনকে একেবারে বাস্তবে যা সম্ভব, তেমন কাজে নিযুক্ত রেখেছিলেন। মূল আগ্রহ ছিল, যে আদিবাসীরা এতকাল অবহেলিত, এমন নির্মমতায় শোষিত, তারা যেন ন্যায়বিচার পায়। এই কমিশনেব রিপোর্টের মুখ্য অবদান হ'ল, রাজনীতিক, আর্থনীতিক, ও প্রশাসনিক ব্যাপারে আদিবাসীরা যেন ন্যায়বিচার পায়, তার উপর জোর দেওয়া। আমরা আবিষ্কার করি,— সংবিধানের পঞ্চম শিডিউল ভারতের আদিবাসী অঞ্চলে যে বিশেষ এলাকা সংগঠিত করেছিল— যেখানে সরকারের বিশেষ দৃষ্টিদানের কথা ছিল,— সেটি সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিপুল পরিমাণে আদিবাসী জমির (অবৈধ) হস্তান্তর চলেছে। কোটি কোটি আদিবাসী মহাজনদের কবলে। বড় বড় শিল্প প্রকল্পের ফলে আদিবাসী-জমির বিশাল বিশাল এলাকা থেকে ওরা উৎখাত হয়েছে। যদিও ন্যায্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা দেওয়া হয় নি। উন্নয়ন প্রসঙ্গে এই কমিশনের বিশেষ নতুন কিছু বলার ছিল না। এক অর্থে তা আমাদের আগেকার কমিটি ও অনুরূপ অন্যান্য কমিটি যা বলেছে, তারই পুনরাবৃত্তি।

এই রিপোর্ট লিখতে সহায়তা করার জন্য আমার যখন দিল্লীতে থাকার কথা, দুর্ভাগ্যবশত তখনি পড়লাম অসুখে। ১৯৬১ জুন থেকে আমার বাইরে বেরোনো বন্ধ হ'ল। ধেবর নিজে কষ্ট করে দিল্লী থেকে দু'বার এলেন। আমরা যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছি, তার অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা করতে এলেন। ব্যবস্থা করলেন, কমিশনের বাকি সদস্যরা দিল্লীতে বসবেন। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়ে যে খসড়া আনবেন, তা বিমানডাকে আমার কাছে পাঠাবেন। আমার কর্মী সংখ্যা বাড়ল। পেলাম দুটি অতিরিক্ত স্টেনোগ্রাফার এবং আরেকটি টাইপিস্ট। দুই মাস কাল আমরা নিরন্তর উত্তেজনায় কাটালাম। এ সময়টা আমি শয্যাশায়ী, সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার কথা। পার্সেল পৌঁছত, আমি লেগে যেতাম কাজে। সংশোধন করতাম, পড়ে পড়ে ইংরিজি সংস্কার করতাম। অতিরিক্ত, অথবা পরিবর্তিত প্যাসেজ বলে যেতাম। সবাই আবার তা টাইপ করতে থাকত। তারপর একেবারে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল ব্যাগে তা চলে যেত দিল্লী। এভাবেই আমি পুরো রিপোর্টটি নিয়ে কাজ করি। দুঃখের বিষয়। সই করার অনুষ্ঠান দিবসে আমি যেতে পারি নি। একজন দিল্লী

থেকে তেরোটি বড় বড় ছাপা ভল্যুম আনলেন, শিলংয়ে আমার ঘরে বসেই তা সই করলাম।

দশ

এ বছরেই আমি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্মারক বক্তৃতা দেবার আহ্বান পাই। অল ইন্ডিয়া রেডিও দিল্লীতে এ বার্ষিক অনুষ্ঠান করে। এর আগে বলেছেন, সি. রাজাগোপালাচারী; ডঃ কে. বি. এস. হ্যালনে; ডঃ এম. এস. কৃষ্ণান এবং ডঃ জাকির হুসেন। আমি খুব খুশি হই দুটো কারণে। বিষয় নির্বাচন করি "ভালোবাসার দর্শন।" ফলে আমাকে অনেক কিছু নতুন করে পড়তে হ'ল। এ কাজ আমি করি সেইসময়ে যখন ডাক্তারের নির্দেশে গৃহবন্দি আছি। ফলে আমার উপকার হল অনেক। আবার পড়তে হল অহিংসা বিষয়ে গান্ধীর ধারণা,— তার সকল সৌন্দর্য ও গভীরতা। প্লেটো এবং অগাস্টাইন বিষয়ে আমার প্রাচীন উদ্দীপনা নতুন করে জেগে উঠল। অবশ্য আমার প্রাচীন ধারণা দৃঢ়ীভূত হ'ল, যে অ্যারিস্টোটল ছিলেন এক নিরেট মানুষ। 'অ্যালিগরি অফ লাভ' এই প্রথম পড়ে সি. এস. লুইস বিষয়ে আমার ধারণা বলতে লজ্জা নেই কিছু নরম হ'ল। ফাদার এম. সি. ডার্সি ও বাংলা বৈষ্ণবধর্মের কিছুটা আমার নতুন আবিষ্কার।

আরেকটা কারণ, সর্দার প্যাটেল বিষয়ে আমার স্মৃতি সর্বদাই স্নেহকোমল। আমার জীবনে ওঁর প্রভাবও বিস্তর। উনিই প্রথমে জোর করেন যে আমার আদিবাসী-ভারতে যাওয়া উচিত।

এমনিতে বক্তৃতাদান আমার না-পসন্দ। আগে আমি ঘাবড়ে যাই, পরে নিজের বিষয়ে বিরক্ত হই। কখনো কিছু লিখে নিয়ে যাই না। যখন সরাসরি বলা হয়, তখনই শ্রোতাদের সঙ্গে একটা সংযোগ গড়ে ওঠে। যে বক্তৃতা লিখতে হবে, যা পড়তে হবে, শ্রোতাদের জন্য একেকটি এক ঘন্টা ধরে,— আবার তা রেকর্ড করাও হবে,— সে বিষয়ে আমার আশঙ্কা ছিল।

কার্যকালে ব্যাপারটা চমৎকার উৎরে গেল। বিশ মিনিট বাদে আমার বেশ স্বচ্ছন্দ লাগল, দেখলাম মাইক্রোফোনে কথা বলা যথেষ্ট সান্ত্বনাদায়ক। আমাকে অবশ্য পড়ার চশমা ব্যবহার করতে হয়। ফলে শ্রোতারা এক ঝাপসা দৃষ্টিবহির্ভূত উপস্থিতি। ওরা কিভাবে গ্রহণ করছে, তা নিয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। অল ইন্ডিয়া রেডিও অডিটোরিয়াম ভিড়ে বোঝাই। আমার বিশ্বাস, অনেকেই আশা করেছিল, আমি যেমন সব ভালোবাসার কথা বইয়ে লিখেছি, তেমন কথাই বলব। দুই ট্রাকবোঝাই সমাজবিজ্ঞানী মহিলারা এসেছিলেন প্রথম দিনের বক্তৃতা শুনতে। আমার কথাবার্তা খুব উচ্চমানের হওয়ার ফলে নিরাশ হন, আর আসেন নি। যৌনতার ব্যাপারটি আমি ছুঁয়ে যাই মাত্র। বক্তৃতা রেকর্ড করা হচ্ছে। পরপর ছয়টি বুধবার আধঘন্টা ধরে তা

ধারাবাহিক প্রচার হচ্ছে,— স্বভাবতই আমি খুব খুলেমেলে বলতে পারি নি। তবুও দিল্লীর এক খবরের কাগজ বড় বড় হেডলাইনে ছাপল, "এল্যুইন বলেন, কামজ প্রেমই শ্রেষ্ঠ।" হয়তো তাই, তবে আমি অমন খোলামেলা ভাষায় তা বলিনি।

দিল্লী এবার আমার ভালো লাগে। এই বক্তৃতার ফলে অনেক নতুন মানুষ, এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর সদর দপ্তর আকাশবাণীর চমৎকার লোকজনের সংস্পর্শে আসি। বহুকাল আগে ভারতে ব্রডকাস্টিং-এর প্রথম কন্ট্রোলার লায়োনেল ফিলডেনকে ভালোই চিনতাম। দিল্লীতে ওর বাড়ি থাকতাম। সম্রাট পঞ্চম জর্জের শেষ খ্রীসমাস ইভ ব্রডকাস্টিং-এর শেষে ও আমাকে আড়াই মিনিট ভারতের প্রতিনিধি হয়ে বলতে বলেছিল। সেদিন বিবিসি অনুরূপ এক অনুষ্ঠানে এক ক্ষুদ্র ভাষণ দিতে বলে। প্রধান বক্তা ছিলেন রানী এলিজাবেথ।

এখন আলাপ হল ডিরেক্টর জেনেরাল বি. পি. ভাটের সঙ্গে। চমৎকার লোক, ইংরিজি কবিতা বিষয়ে সূক্ষ্ম ও মর্মায়ী বোধ আছে; গৌহাটির স্টেশন ডিরেক্টর গোপাল দাশের সঙ্গে; আদিবাসী সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান যাঁর, সেই তরুণতর জে. ডি ভাবেজার সঙ্গে, এমন কতজন আরো। এঁরা সবাই আমার সময়টা আনন্দে ভরে দেন। পি. সি. বা টাইনি চ্যাটার্জির সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে পেরে বড় খুশি হই। আসামে প্রথম যাত্রাকাল থেকেই তো ওঁকে চিনি। নন্দনতত্বের দর্শন সম্পর্কে খুবই জানেন। তবু কথাবার্তা আচরণে লঘুমেজাজী। এবং সিগারে আমার মতই আসক্ত।

এগারো

দিল্লীতে খুব একটা যাই না। তবে গেলে ভালো লাগে। আমার মতো মফস্বলি মানুষের রাজধানী গমন তো অ্যাডভেঞ্চার। কিছু বাঘ সিংহ সদৃশ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা যায়। মজার মজার ঘটনা ঘটে। তবে আমি পছন্দ করি অ-সাধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ তেমন মানুষ যাঁদের বলার মতো বক্তব্য আছে। এমতো সাক্ষাৎকারের কিছু উদাহরণ দিই।

দিল্লী যখনি যাই, প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান, আমি যাই। ওঁর সঙ্গে অনেক কথা বলেছি। একবার আমার দেখা করার বা বলার তেমন কিছু ছিল না। ওঁকে বিরক্ত করতেও চাই নি। সযত্নে আমি ওঁর পথ এড়িয়ে চলছি। একদিন সকালে বিদেশমন্ত্রকের কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছি, হঠাৎ দরকার হ'ল, ভি আই পি দের শৌচালয়ে ঢুকলাম। বেরোতেই প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি। উনি বললেন "আরে, এখানে কি করছ?"— বলতে চাইনি কিছু। কিন্তু উনি বললেন, "আগামীকাল দেখা কোরো।"

সবে *ইন্ডিয়াজ নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ইন দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি* বেরিয়েছে। বন্ধুরা

বলল, এক কপি যেন মিঃ নেহরুর জন্য নিয়ে যাই। দিল্লীর বইয়ের দোকানে দোকানে হানা দিয়ে অবশেষে পেলাম বই, কিনলাম একটি। পরদিন বইটি নিয়ে ওঁকে উপহার দিলাম। বইটি নিলেন, ক'পাতা উলটোলেন, আমার দিকে চাইলেন ও বললেন, "আচ্ছা *লোলিতা* বিষয়ে তোমার কি মনে হয়?"

আমার মনে হ'ল, সাহিত্যক্ষেত্রে যা প্রতিযোগিতা, তাতে না লেখাই ভালো।

ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ডের *বোর্নিও পীপ্‌ল* যখন বেরোয়, লিখেছিলাম, আমার কি ভালো লেগেছে বইটা! বলতে কি, "স্টেট্‌সম্যান"-এ এক উচ্ছ্বসিত সমালোচনাও লিখেছিলাম। ম্যাকডোনাল্ড তখন ভারতে ইউনাইটেড কিংডমের রাষ্ট্রদূত। উনি চিঠি লিখে, এরপর যখন দিল্লী আসব, তখন ওঁর সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ জানান। সে ভাবেই পরের বার ওঁর অফিসে ফোন করি। উনি লাঞ্চে আসতে বললেন।

সময় হলে আমি ট্যাক্সি নিয়ে হাই কমিশনারের বাড়ি গেলাম, ভিতরে ঢুকলাম। ম্যাকডোনাল্ডকে দেখি নি কেমন দেখতে তাও জানি না। খুবই সুভদ্র, অভিজাতদর্শন এক ব্যক্তি আমাকে স্বাগত জানালেন। ওঁর হাত চেপে ধরে বললাম, বোর্নিওর ওপর লেখা ওঁর বই কি ভালো লেগেছে! তেমন সাড়া পেলাম না এবং জানা গেল, ইনি ম্যাকডোনাল্ডের সচিব। যাই হোক, ইনি নিয়ে গেলেন আমাকে বসার ঘরে। বেশ ভালো এক ইংরেজ মহিলা বসে জিন পান করছিলেন। আমাকেও তা দেওয়া হ'ল। তখন এক দীর্ঘকায়, অভিজাত পোশাকে সজ্জিত ইংরেজ ঢুকলেন, এ বড়িতে ওঁর স্বচ্ছন্দ গতায়াত, বোঝা গেল। আমি লাফিয়ে উঠে ওঁর হাত ধরে বললাম। ওঁর বোর্নিওর ওপর লেখা বইটি কি ভালো লেগেছে।— 'জীবনে যাই নি' বলে ইনি জিনের বোতলের দিকে এগোলেন।

এতক্ষণে আমার ধারণা হ'ল। ভুল বাড়িতে এসেছি। এই ইংরেজরা সর্বদাই অতীব ভদ্রতা করছে, ভাবছে এ লোকটা কে, অথচ মুখে কিছু বলছে না। তবে অবশেষে ম্যাকডোনাল্ড ঢুকলেন। বেঁটেখাটো মানুষ, চেহারায় কোনো আভিজাত্য নেই। চমৎকার খোশমেজাজী,— দেরি হবার জন্যে মাপ চাইলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা ইবান তাঁতশিল্প, এবং আমাদের জানা নৃমুণ্ডশিকারীদের বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনায় মেতে গেলাম।

১৯৫৮ সালে যখন ওঁরা ভারতদর্শনে আসেন, নতুন দিল্লীতে দালাইলামা ও পাঞ্চেনলামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রিত হই। ছিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মহান দুই লামা, ওঁদের অনুগামী প্রায় সত্তর জন ভিক্ষু, এবং অনেক মন্ত্রী ও বড় বড় অফিসার। নিমন্ত্রণ দেরিতে আসে, আমার পোশাক-আশাক তেমন নয়। যেমন, যে একজোড়া মোজা পাওয়া গেল, তা বেশ জীর্ণ। একটার গোড়ালিটা ছেঁড়া। মনে হল জুতো ওটা ঢেকে রাখবে। বাকিটাও ঢেকে চেপে রাখবে। আমি জানতাম, রাষ্ট্রপতি ভবনে হয় টেবিলে বসে খায় মানুষ, নয় দাঁড়িয়ে বুফে-ব্যবস্থায় খায়। ভাবলাম, বেঁচে যাব।

ক্ষেমলাল রাঠি আর আমি পৌঁছে গেলাম। সুশোভিত ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছি। টমেটোর রস একটু একটু খাচ্ছি।

দু'একজন ভালো লাগার মতো মানুষ পেলাম। দিব্যি চলছিল সব। আমাদের বলা হল মধ্যাহ্নভোজনের জন্য বিশাল ডাইনিং হলে যেতে। তারপর ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা; ইতিহাসে এই প্রথম মেঝেতে বসে পুরনো ভারতীয় কেতায় খেতে হবে। বন্দোবস্ত চমৎকার। লম্বা সারে আসন পাতা। ফুল সাজানো সর্বত্র। কি সুন্দর! একেবারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! কিন্তু ভারতীয় প্রথামতো খেতে হলে জুতো তো খুলতে হবে। দরজার যতটা কাছে সম্ভব, বসলাম। সন্তর্পণে জুতো খুললাম। তারপর এক পায়ের আঙুল দিয়ে অপর পায়ের মোজার ছিদ্রটি যতটা পারি ঢেকে বসলাম।

সুখের বিষয়, খাবার এত ভালো ছিল, যে সকলের মনোযোগ সেদিকেই থাকল। মনে হয়, আমি লজ্জা ঢেকেই বেরিয়েছিলাম।

বারো

ভারত প্রজাতন্ত্র হ'ল যখন, তখন সকল বেসরকারি খেতাব বর্জিত হয়। যারা পেয়েছিল, তাদের গভীর অনুশোচনা, যারা কোনদিন তা পাবে ভেবেছিল তারা হতাশ। তবে শীঘ্রই বোঝা গেল, গণতন্ত্রেও জনজীবনে কিছু সম্মান দরকার। ফলে, ইংল্যাণ্ডে যাকে বলবে চারটি 'অর্ডার', তেমন চারটি পর্যায়ে সম্মান ব্যবস্থা করা হল। ভারতরত্ন; পদ্মবিভূষণ; পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, দার্শনিক, সঙ্গীতকার, বিদ্বজ্জন, শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়াবিৎ, শিল্পী, সমাজসেবক, এবং সযত্নে দেখে গোনাগাঁথা কিছু অফিসার ও প্রশাসককে এ সম্মান দেন রাষ্ট্রপতি।

১৯৬১-এর ২৬ জানুয়ারি। প্রজাতন্ত্র দিবসে আমি ট্রাইবাল কমিশনের সঙ্গে আছি। কার একটা ট্রানজিস্টার ছিল, সংবাদ শুনছি। সহসা শুনি, আমাকে 'পদ্মভূষণ' দেওয়া হবে। খুবই খুশি হই।

তিন মাস বাদে নিউ দিল্লীতে ২৭শে এপ্রিল অনুষ্ঠানটি হয়। সাদা খাদির ট্রাউজার এবং বোতাম লাগানো একটি কালো বেঁটে কোট পরে আমি পৌঁছই। মোটামুটি স্মার্ট দেখাচ্ছিল।

এ অনুষ্ঠানে সম্মান প্রাপকরা দুই সারিতে বসেন। আমি, প্রয়াত ডক্টর বি. সি. রায়ের (ইনি 'ভারতরত্ন' পান) ঠিক পিছনে বসেছি। আমার পাশে এক প্রবীণ ও সম্মানিত কংগ্রেসী ব্যক্তি। ইনি ধুতি এবং এক হালকারঙা শার্ট পরে এসেছেন। এঁর প্রথম মন্তব্য :

—"এ রকম পোশাক পরেছেন কেন।"

কি যেন একটা বললাম। উনি বলতে লাগলেন :

—"পদ্মভূষণ পাবার মতো কাজ যখন করছিলাম, তখনো এ পোশাক পরতাম।

এখনো এটা পরেই নেবো। ওদের পছন্দ না হয়, আমাকে বের করে দিক।"

তারপর, আমাকে,— "আপনি কি ইংরেজ?"

"হ্যাঁ তাই বটে'—আমি বললাম।

—"তাহলে জানবেন। পদ্মভূষণ কি ইংল্যান্ডে আমাকে লর্ড বানাতো?"

"না। তা বোধহয় নয়।"

"হয়তো আমি হতাম 'স্যার', আমার স্ত্রী হতেন 'লেডী'।

"ওইরকমই।"

"কিন্তু এটা তো ভারত, এখানে তা হবে না।"

"না, তা হবে না।"

আমাদের চেয়ারে সেই কেসগুলো, সম্মানচিহ্ন পাওয়ার পর ওতে রাখা হবে। ভারতরত্ন স্বভাবতই অনেক বড়ো, কেসে পালিশ ঝকঝকে। আমাদের গুলোর চেয়ে অনেক ভালো। আমার সঙ্গী তা দেখলেন।

"ডক্টর রায় আমার চেয়ে বড় সম্মান পাচ্ছেন কেন?"

বললাম, কেন পাচ্ছেন।

ইনি প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকতার আশ্রয় নিলেন, 'যাক গে, কি বা এসে যায়।' গলা তুলে ডক্টর রায়ের চওড়া পিঠের দিকে সতর্কতায় চেয়ে বললেন, "ক'বছর বাদে এসব সম্মানের কোন্ মূল্যটা থাকবে?"— আবার চাইলেন ডাক্তার রায়ের দিকে, "যাইহোক কোটি কোটি মানুষের চেয়ে আমাদের অধিকাংশজনের এর উপর অধিক দাবী নেই।"— এবার উদ্দীপিত হয়ে বললেন "ফুল মেনি এ জেম অফ পিওরেস্ট রে সীরীন, ওয়েস্টস ইট্‌স সুঈটনেস অন দি ডেসার্ট এয়ার। আমরা ভাগ্যবান। কারো নেকনজরে পড়েছি।"

তারপর আরো গাম্ভীর্যে, আমার মতে বেশ মাধুর্যে সিঞ্চিত গলায় বললেন, "কোনদিন খুঁজি নি। আশাও করি নি এসব সম্মান। ঈশ্বরের কাছে যখন প্রার্থনা করি, একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, আমাকে নিয়ে যা করবার করো। যাতে আমি তোমার চরণের কাছাকাছি থাকতে পারি।"

এরপর আমি এতই অভিনন্দন পাই, যে আমার যেন আশা করবার অভ্যাস জন্মে গেল। একদিন সিনেমা গেছি, টিকিটবিক্রেতা আমার দোস্তও বটে,— আমি টিকেট কেনার পর ও হাত বাড়াল। আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, "অজস্র ধন্যবাদ।" পরে দেখা গেল। টিকেটের জন্যে ও আরো বারো নয়াপয়সা চাইছিল।

এর কিছুদিন বাদে আমি *টাইম্‌স লিটারারি সাপ্লিমেন্ট*-এ নতুন *কম্প্যানিয়ান্‌স অফ লিটারেচার* পড়ছি। তাতে বলছে, এরিক সেটি বলেছেন, "লীজিয়ন অফ অনার প্রত্যাখ্যান করাই যথেষ্ট নয়। ওটা পাওয়ার জন্য বিবেচিত হওয়া কখনো উচিত ছিল না।" গল্‌সওয়ার্দি 'কম্প্যানিয়ন্ অফ অনার' পেয়েছিলেন বলে, হাউসম্যান ওটি

প্রত্যাখ্যান করেন। আমার তেমন কাজ করার কথা মনে হয়নি। কখনো ভাবিনি আমার পদ্মভূষণ পাওয়ার যোগ্যতা আছে। একান্ত অ্যাকডেমিক সম্মান ব্যতীত কিছু আশা করি নি, বা চাইনি। ওসব কথা ভাবিই নি। তবু খুব খুশি হই। মনে হয়েছিল, আদিবাসীদের জন্য নেফায় যে নীতি গৃহীত হয়, এটা তারই স্বীকৃতি।

তেরো

এই নীতির কঠিনতম পরীক্ষা হয় যখন ১৯৬২ সালের অক্টোবরে নেফা পর্বতাঞ্চলে নেমে এল বহুদিন গুমরে থাকা এক ঝড়। চীনারা প্রবল শক্তি নিয়ে সীমান্তে হানা দিল। কামেং সিয়াং ও লোহিতে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বিধ্বস্ত করল। সর্বাগ্রে পতন হ'ল তাওআংয়ের। সে এক তীর্থ। আমি আর লীলা ছয় বছর আগে ঘুরে এসেছি: তারপর, একটি ধোঁকা লাগানো বিরতি। এবার আক্রমণকারীরা সে লা-র পাশ কাটিয়ে বম্‌ডিলা দখল করল। এবং দক্ষিণে তেজপুর এল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর লোহিতে ওয়ালং-এর পতন হ'ল। চীনারা তার নিচের উপত্যকাকে সন্ত্রাসিত করল। একই সঙ্গে ওরা উত্তর সিয়াং-এ ঢুকে পড়ল। সুন্দর মেচুকা উপত্যকায় হানা দিল। যে সব ছোট ছোট গ্রামে একদা থেকেছি, তার কয়েকটা দখল করল। সুদূর উত্তরে সুবর্নসিরি বাদ দিলে এসব জায়গা আমি এত ভালো জানি, যে এর প্রচণ্ডতা আমি বুঝলাম। তাওআং পতনের পর আমার রক্তচাপ ২৫° উঠে যায়; যখন সব শান্ত তখন নেমে আসে। বম্‌ডি লা পতনের পর ৩০° উঠে যায়। ভয় বা উদ্বেগে এমনটা হয় নি। ভীষণ দুঃখে এটা হয়েছিল। কেননা সর্বদাই আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছি, যুদ্ধের ফলাফলের উপর। মনে হত, আমার সত্তাকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া হচ্ছে। নেফার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কেউই সে সংকটকালের দিনগুলি ভুলতে পারবে না।

শিলংয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। অনেকে তাঁদের পরিবারবর্গকে সরিয়ে দেন। বন্ধুরা জোরাজোরি করে, লীলা যেন ছেলেদের নিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি বলি, আমরা আদিবাসীদের। আমরা আসামের। বোঝাই যাচ্ছে সকল অধিবাসীকে সরানো যাবে না; তাই যেখানে আছি, সেখানেই থাকব। পরবর্তী ঘটনা প্রতিপন্ন করল, আমি সঠিক ছিলাম। যুদ্ধবিরতি এল, চীনারাও পিছু হটল।

এখন, আক্রান্ত জায়গাগুলিতে প্রশাসন পুনঃপ্রবর্তনের কাজ, মানুষের মনে আস্থা ফেরানোর কাজ। সুখের বিষয়, এই কঠিন কাজের জন্য একদল চমৎকার সীমান্ত সার্ভিস অফিসার ছিলেন। প্রাণ লুথরা; বব খাতিং; ইউ, চাকমা; কৃষ্ণ জোহরি; বার্নার্ড দুগাল এবং অন্যেরা প্রশংসনীয় কাজ করেন। আদিবাসী নেতারা সাহায্য করেন প্রতি পদে। উল্লেখযোগ্য যে কম সময়কালের মধ্যে, অমন ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্ত ফিরে এল স্বাভাবিক জীবন ছন্দে।

নবম অধ্যায়

নেফা পর্বতাঞ্চলে ভ্রমণ

"ওর দেশ দূর হতে দূরে, অরণ্য ও নদী, জঙ্গল,
জলাভূমি ও নদী, আরাক্কাবোআ'র পাহাড়—
যোজন যোজন দূরে....

ওআল্টার ডি লা মেয়ার

এক

যদিও নিছক বিদ্যোৎসাহিতার নিরিখে বাস্তারের মুরিয়া বা যুবকেন্দ্র ঘোটুল এবং সাওরাদের ধর্ম বিষয়ে আমার সমীক্ষার সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই হয় না,— নেফায় ভ্রমণ, আমার আগেকার সব অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে অন্যরকম। কুট্রিয়া কোণ্ড এবং আবুঝমার পাহাড় বাদ দিলে শারীরিক শ্রম, ভারতের অন্যত্র অনেক কম। এখন নেফাতে আমাকে বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিতে হত সর্বদাই পায়ে হেঁটে। অমন উঁচু পাহাড় বলতে গেলে আগে দেখি নি। গোড়ার দিকে পথও ছিল খুব খারাপ। অবশ্য ওড়িশায় আমি প্রায়ই এমন সব গ্রামে গেছি, যেখানে কেউ যায় নি, এমন কি ছোটখাট সরকারি কর্মীও নয়। নেফাতে আমি সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ও দুর্গম এলাকাই বেছে নিতাম। অনেক সময়ে রোমাঞ্চিত হয়েছি, যেন আবিষ্কারার্থে ভ্রমণে এসেছি। একটি স্থানীয় কাগজ, রিসার্চের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছিল, "নেফা, এই দুনিয়ার এল্যুইনদের কাছে অনাঘ্রাত কুমারীদের মতো এক বিশাল ক্ষেত্র।" মধ্যভারতে মানুষরা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। তবে নেফার দূরদুর্গমে পরিব্রাজকদের যে উচ্ছ্বসিত আতিথ্যে সংবর্ধনা করা হয় তার সঙ্গে ওর তুলনা চলে না। অসুবিধা অনেক ছিল। কিন্তু ভূপ্রকৃতির বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য, এবং মানুষজনের চমৎকারিত্ব মনকে উচ্ছ্বাসে ভরে দেয়।

এ সব ট্যুরে আমি একাই এক ইউনিট। সঙ্গে আমার মতো খাবার। আর তাঁবু খাটাবার সাজসরঞ্জাম। সব সময়ে তাঁবু থাকত না। প্রায় সর্বদাই পুরুষদের যুবাবাসে, বা কারো বাড়িতে ঘুমোতাম। সব সময়ে দুটো তেরপল নিয়ে যেতাম। গ্রামের মাঝখানে দু'দিক খোলা ছাউনি খাটিয়ে দিনের বেলা বসতাম। যেন থিয়েটারে কোনো দামী আসনে বসেছি। ওখান থেকে গ্রামজীবনের বিচিত্র, খোলামেলা চেহারা দেখতাম। সর্বদা নিয়ে যেতাম গ্রামোফোন। মানুষকে আকৃষ্ট করতে ওটি খুব কাজে লাগে। কয়েক কৌটো লজেন্স, শিশুদের সঙ্গে দোস্তালি পাতিয়ে ফেলত। আমার যন্ত্রচালিত খেলনা, কিছু বা বাস্তারের দিনের, সকল লজ্জা ও সংশয় ভেঙে দিত।

সবচেয়ে বড় কথা, হয় হাঁটতে হত, নয় টাট্টু ঘোড়া চাপতাম। জীপে ঘুরলে মানুষজনের বহিরঙ্গটাই দেখা যায়। ধীরে হেঁটে গ্রাম হতে গ্রামে গেলে ওদের জানার সুযোগ মেলে। অনেক ট্যুরে হপ্তার পর হপ্তা আমি একটিও সরকারি কর্মী দেখিনি। একদম একা চলছি, কোনো সময়ে কোনো পথপ্রদর্শক নিইনি। বলতে কি, এত বছরে আমার কোনো পথপ্রদর্শক দরকারও হয়নি।

যদিও পর্যটন ভালবাসি, চড়াই ভাঙতে খানিক হাঁপাই, উঃ আঃ করি। সঙ্গী আদিবাসীরা তাতে মজা পায়।

একদিন মণিপুরে এক পাহাড়ে উঠছি, এক সহৃদয়, ইংরিজি জানা নাগা তরুণ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল। "আপনার মতো মোটা বুড়োর পক্ষে এ খুব কষ্টকর স্যার।" তিব্বত সীমান্তের কাছে গেলিং-এ মেম্বারা বলল, আমি এরোপ্লেনের মতো গোঁ গোঁ করে হাঁটছিলাম। আমাদের বুঝতে হবে, আদিবাসীদের মধ্যে 'মোটা' বা 'বুড়ো' গুণবাচক শব্দ। মোটা মানে যৌনক্ষমতাপূর্ণ, শক্তসামর্থ। বয়স সর্বদাই শ্রদ্ধেয়— চল্লিশ পেরোলেই সে বুড়ো।

একবার শেরডুকপেন্-এ সুন্দর বনাচ্ছাদিত উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছি,— হঠাৎ, অকারণে আমার টাট্টুটা লাফিয়ে উঠল, আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি চুরোট খাচ্ছিলাম। সবাই চমৎকৃত। চুরোটটা ধরাও আছে। জ্বলছেও। ধপাস করে পড়লাম। হাড়গোড় ভাঙেনি। তবে পেছনে বেশ খানিকটা ছড়ে গেল। আমাকে নিকটতম ফাঁড়িতে নিয়ে গেল। যখন জিগ্যেস করলাম, টাট্টুটা ভয় পেল কেন, — শেরডুকপেনরা সহাস্যে বলল, যে গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাতে একটা ভূত থাকে। গাছের তলা দিয়ে মানুষ গেলে ও ফেলে দেয়।

— "তোমরা তো আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতে পারতে?"

— "না। আমরা দেখতে চাইছিলাম। অন্যদের মতো তোমাকেও ভয় দেখাবার সাহস ওর হয় কি না।"

পরে কথা হয়, জায়গাটার নাম হবে 'এল্যুইনের পতন।' তবে এ সদয় প্রস্তাবে আমি বাধা দিই। ভয় হয়; কথার অপব্যাখ্যা করা হতেই পারে।

আরেকবার বিমানপথে আমিও লীলা পাসিঘাটে যাই। উড়োজাহাজ নামছে, আমি খুব খুশি। এক বিশাল জনতা অপেক্ষমাণ। ভাবলাম, এই তো চাই। নামলাম। আবোর ও স্থানীয় অফিসারদের আনন্দোচ্ছল জনতার সামনে এলাম। আমাদের দেখে ওদের উৎসাহ নিভে গেল।

ওরা বলল, "ভেবেছিলাম, তোমরা এক পাল ইয়র্কশায়ার শুওর।"

আমার পর্যটনগুলির মধ্যে যা গুরুত্বপূর্ণ, তেমন কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব। ওখানেই পেয়েছি, যা আমার কাছে দামী,— স্নেহবৎসল, বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ; পাহাড়ের সৌন্দর্য; উত্তেজনা ও বৈচিত্র্য; এবং কাজের কাজ কিছু করছি, এমন উপলব্ধি।

দুই

তাওআংয়ে তীর্থযাত্রা

তাওআং, ভুটান ও তিব্বতের মধ্যিখানে এক কোণে এক চমৎকার উপত্যকায় এক বিশাল বৌদ্ধ মঠ। দালাই লামা এ জায়গায় আসেন প্রথম বিশিষ্ট স্থান হিসেবে, সে ভাবেই তাওআং গোটা বিশ্বে সংবাদ হয়। উনি আসেন, যখন চার বছর আগে ভারতে উনি রাজনীতিক আশ্রয় চান। চীনারা এ জায়গা অধিকার করলে সে দুঃখ হেডলাইন হয়। আবার, লামারা ও ভারতীয় প্রশাসকরা এটি পুনর্দখল করলে আনন্দোল্লাসের ব্যাপারটিও খবর হয়।

তাওআং অনেক দূরে। আমি যখন যাই, হেঁটে বা টাট্টু চেপে যেতে হত। এখন একটি চমৎকার পার্বত্য পথের জন্য জায়গাটি সুগম হয়েছে। ১৯৫৬ সালের মে মাসে আমি ও লীলা যখন যাই, আমরা ঠিক সেই পথে যাই, যে পথ ধরে দালাই লামা সদলবলে সমতলে নেমেছিলেন। আমাদের অভিজ্ঞতা লিখব। উনিও ওসব জায়গাই দেখেছেন। ও সব লোকজনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়েছে, তা উৎরাইয়ের পথে। আমরা ঠিক তাই করি, চড়াইয়ের পথে।

তিনি যখন তেজপুর পৌঁছন, দালাই লামাকে অভ্যর্থনা জানাতে দু'শোর বেশি সাংবাদিক এসেছিল। তেজপুর থেকে পাহাড়ের পাদদেশে চারদুয়ার হয়ে গাড়িতে নতুন রাস্তায় পৌঁছই বম্‌ডি লা। চারদুয়ার থেকে বম্‌ডি লা দালাই লামা জীপেই যান। আমরা মাত্র আটাশ মাইল গাড়িতে গেলাম। রাস্তার মুখ অবধি ৪,০০০ ফুট উঠলাম। এরপর সরু পাকদণ্ডী বেয়ে পায়ে হেঁটে, বা টাট্টু চেপে। ছোট ছোট পাহাড়ি টাট্টু চেপে যেতে যারা অনভ্যস্ত, তাদের পক্ষে এ যাত্রা সহজ নয়। টাট্টুগুলো চলে অতলান্ত খাদের কিনার ঘেঁষে। যেমন খাদ অনেক,— এটা বেশ ভয়ধরানোও। ডিম্‌ডাম্ মাছি আমাদের কামড়ে শেষ করছিল। এই বিচ্ছিরি পতঙ্গের কামড়ে বিষ আছে, চুলকানি ও ঘা হয়। আমাদের পায়ের মাংসপেশীতে বেজায় যন্ত্রণা। কিন্তু পথ চলেছে এমন মনোহারিণী দৃশ্য দিয়ে,— উপত্যকা, ঝরনা, পাহাড়, — পবিত্র দেবস্থান আশীর্বাদ জানাচ্ছে,— কষ্টের কথা ভুলে গেলাম। যান্ত্রিক বাহনের ধুলো ও ঝাঁকানি নেই। বরফের পাহাড় ও পুণ্যস্থানের এর মধ্য দিয়ে তীর্থে চলেছি।

বাস্তবত, নেফাক্ষেত্রে এটি স্মরণীয়তম অ্যাডভেঞ্চারগুলির একটি।

প্রথম বলি প্রকৃতির সৌন্দর্য। দূরের পাহাড় তুষারপাতে সাদা; কাছের পাহাড়ে পাইন, ওক ও ফার গাছ। পাইনের গন্ধ; জলপ্রপাত ও ঝরনা; তীরভূমি বুনো স্ট্র-বেরি গাছে ঢাকা; রোডোডেনড্রনের ঝাঁকানো মেলা; আরো কত নানা রঙের ফুল। সে লা-র ওপর দিয়ে চলা ভোলা যাবে না। ছমছমে, রহস্যময়, বিচ্ছিন্ন, এ মহান গিরিবর্ত্ম খাঁটি রোমাঞ্চ জাগায়। দূরত্ব ও উচ্চতার কথা ভুলে যাই বিস্ময়ে। উৎরাই

পথে নামছ, ফুলের মেলা। নেফাতে যদি স্বর্গ থাকে তা হামীন অস্তু, হামীন অস্তু, হামীন অস্তু, এখানেই।

দু'দিন বাদে পৌঁছলাম বম্‌ডি লা। তীর্থযাত্রার উপযোগী পোশাক কিনেছিলাম। আমার বাদামী শার্ট, লম্বা গোড়ালি ছোঁওয়া গাঢ় রঙের লম্বা কোট, লাল কোমরবন্ধ। এক চমৎকার পশমি টুপি। লীলা কিনেছিল লালশার্ট, কালো কোট, জরিদার অ্যাপ্রন, নকশা করা বুট। একটি চমৎকার উজ্জ্বল রঙা ছোট টুপি। মাথার একপাশে পরত, চমৎকার দেখাত ওকে।

বম্‌ডি লা থেকে সঙ্গী হলেন প্রিয় বন্ধু, আর. এস. নাগ, ওখানকার পলিটিকাল অফিসারও বটেন। আর শচীন রায়, এক চমৎকার তরুণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী। একটি নদী উপত্যকা দিয়ে আঠারো মাইল দূরে দিরাং-এ গেলাম। যত সুন্দর জায়গা দেখেছি, তার মধ্যে একটি। মোন্‌পাদের বাড়িগুলি শক্তপোক্ত পাথুরে দোতলা বাড়ি। কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ের উপর ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়গুলির ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বহে গেছে কাকচক্ষু-নির্মল এক ছোট নদী। অনেক বৌদ্ধ মন্দির আছে। আরো অনেক বাড়ি। প্রার্থনাচক্র ও শস্যপেষাই জাঁতাকল চলে জলের সাহায্যে। বড় বড় প্রার্থনাচক্রগুলি, বাতাসে আন্দোলিত নিশানগুলির মতো নিরবচ্ছিন্ন, অথচ অশ্রুত ধ্বনিতে বলে চলে পবিত্র শব্দ নিয়ে: "ওম্‌ মণিপদ্মে হুম্‌।"

গ্রামের মাঝে এক দর্শনধারী পুরনো কেল্লা, বা ডিকোং। তার উপরে এক মন্দির। সেখানেই তাঁবু খাটালাম। সুন্দর বাড়িটি। দোতলায় অনেক ছোট ছোট বুদ্ধ মূর্তি। একটি ছোট গ্রন্থাগার। সেখানে লীলা ও আমি থাকলাম। নিচে আরেকটি ঘরে কিছুটা বড় বড় বুদ্ধমূর্তি, সেখানে থাকলেন আমাদের সঙ্গীরা। একটি স্বাভাবিক ধর্মীয় পরিবেশ, একটি মন্দির, যেখানে ক্যাম্প্‌খাট পেতে তুমি ঘুমাতে পারো, আর মূর্তিগুলির স্নেহকোমল, মমতামাখা চোখ চেয়ে আছে, এ সত্যই মনকে নির্মল আনন্দ ও জীবন দেয়। বৌদ্ধধর্ম, জীবনবিচ্যুত ধর্ম নয় : ধর্ম জীবনের অঙ্গ।

দিরাং-এ তাওআং-এর মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা হয়। স্বীয় মঠে যাবার পথে ওখানে ছিলেন। সারা জীবনে যদি সামান্য ক'জন প্রকৃত সন্তের দেখা মেলে, ইনি তাঁদের একজন। ওঁর দিকে চেয়ে 'পবিত্রতার সৌন্দর্য' এই কথা কটি আমার মনে এল। কোমল, সুভদ্র, সরল, অন্তরের আনন্দে দীপ্তজ্যোতি এ মানুষটির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মনোমোহনকারী। যতবার ওঁকে দেখেছি, নিজেক শুদ্ধতর লেগেছে।

দিরাং থেকে এক মাইল মতো বাইরে গিয়ে, যেভাবে স্থানীয় মানুষরা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানায়, — তার প্রথম অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রধান লামা ও তাঁর ভেড়ীবাদকেরা, ঢোলবাদকেরা ও স্থানীয় অফিসারদের এক বিশাল দল ছিল। কোনো কোনো ভেরী সাত থেকে আট ফুট লম্বা। ভারী সুন্দর সব শিশুও ছিল। পথের দু'ধারে প্রতি গ্রামে একই অভ্যর্থনা পাই। স্থানীয় সম্মানিত লোকজন ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে অভ্যর্থনা

জানাতেন। প্রত্যেকে একটি মালা পরাচ্ছেন, একটি সাদা শাল দিচ্ছেন। আমরা একটি সাদা শাল দিচ্ছি। তারপর ওরা মিছিল করে নিয়ে গেল আমাদের। একটি ছোট তাঁবুতে। ফুলে সাজানো, কয়েকটি নাতিউচ্চাসন উজ্জ্বল রঙের গালচে শোভিত, তাঁবুটি আমাদের প্রতীক্ষায় ছিল। নিচু নিচু টেবিল, তাতে রুপো, চীনামাটি, বা কাঠের পেয়ালা। কোথাওবা আখরোট বা স্ট্রবেরির পাত্র। তারপর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত জনপদবাসীর স্ত্রী পেয়ালাগুলিতে ঢাললেন মাখন-চা। চা-লবণ ও মাখনের সে এক অদ্ভুত পানীয়। তারপর পদমর্যদা অনুযায়ী আমি, আমার স্ত্রী, দুজনের মুখে তুলে ধরলেন চা। তারপর অন্যদেরও দিলেন। আমি পাত্রটিতে ঠোঁট ছোঁয়ালাম মাত্র, কেননা মাখন প্রায়ই থাকত পচা, আমি গন্ধটা সইতে পারতাম না। বাকি সবাই দিব্যি উপভোগ করলেন। কেউ কেউ পর পর আট পেয়ালা চা খেলেন। চা-এর পর আমাদের প্রায়ই হত ভাতের মদ। ভদ্‌কার মতো, খুবই কড়া পানীয়।

একেক সময়ে বেজায় অপ্রস্তুত হতে হতো। বিশেষত খুব সকালে এটি যখন সামনে হাজির। তারপর দিনভোর গ্রাম হতে গ্রামে এই সৌজন্য। ক্রমে জানলাম, আমরা যদি পানপাত্রে একটি আঙুল ডোবাই এবং প্রভু বুদ্ধের সম্মানার্থে তিনবার মদটি ছিটিয়ে দিই, তাহলে পান না করলেও চলে। মাঝ মাঝে অবশ্য যে মহিলা মদ পরিবেশন করছেন, তিনি তোমার কান পাকড়ে, মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে ওই তরল আগুন তোমার গলায় ঢেলে দেবেন। এ জন্য কখনো তিনি তোমার কোলেও বসতে পারেন। শুনেছিলাম গ্রামের সুন্দরীতমা মেয়েটি এ কাজ করে। আমার ক্ষেত্রে সর্বদাই জুটেছেন বৃদ্ধা মহিলারা, বোধহয় লীলা সঙ্গে ছিল, সেইজন্য।

মোন্‌পারা বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ, ভদ্র ও বন্ধুভাবাপন্ন। অতিথির প্রতিটি কথার জবাবে ওরা টুপি খুলে দু'হাতে ধরে এবং শরীরটি সামনে ঝোঁকায়। এখনো কোথাও কোথাও ওরা জিভ বের করে স্বাগত জানায়। এ যাত্রাকালে কখনো শুনিনি শিশুর কান্না, একটি চড়া কথাও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

দিরাং থেকে যতই এগোই, ভূপ্রকৃতি হয় আরো সুন্দর। পাহাড় আরো উঁচু, তুষারশৃঙ্গ দেখা গেল। যে গ্রামেই যাই, অধিবাসীরা সুগন্ধি পাতা ও ডালপালার আগুন জ্বেলে স্বাগত জানায়। যেখানে দালাই লামা তাঁর যাত্রাপথে থেমেছিলেন, সেই সেন্‌ঝেড়্ঝং-এ, গগনচুম্বী সে-লা পর্বতমালার নিচে এক প্রশস্ত মালভূমিতে আমাদের চমৎকার সংবর্ধনা জানানো হয়। দিনটি চমৎকার. প্রাকৃতিক দৃশ্যের রং ও সৌন্দর্য, ছবির মতো সুন্দর আনন্দময় মানুষজন, ভেরী বাদন। আভিজাত্যপূর্ণ অনুষ্ঠানটি ভোলবার নয়।

এবার ১৪,০০০ ফিট উঁচু সে-লা পাস পেরোতে হবে। সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, পথটা খাড়াই। আমরা শ্বাস নিতে পারব না, এবং বৃষ্টি হবেই। চড়াই ও উৎরাই, দুই পথেই বৃষ্টি হয়। ফলে দূরের দৃশ্য দেখতে পাই নি। তবে মনে রাখার

মতো আরোহণ বটে। চুড়োয় উঠে পিকনিক লাঞ্চ সারলাম। সেখানে এক জোড়া পার্বত্য হ্রদ, যার নাম 'দেবতার দুই চোখ।'

পাহাড় পেরিয়ে আধাপথ নেমে পৌঁছলাম এক পার্বত্যনদীর কূলে আমাদের ছাউনিতে। দেখি মোন্‌পারা ছাউনিটি বানিয়েছে এক পুষ্প কুঞ্জের মতো, অতি সুন্দর।

কিন্তু ফুল তো ঠাণ্ডা আটকায় না। যত তাঁবু দেখেছি, এটি তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট। অনর্গল বৃষ্টি পড়ছে। ১২০০০ ফিট উচ্চতায় সবচেয়ে শীতে কাঁপ ধরানো রাত কাটালাম। বহুদিন এমনটা হয় নি। সূর্যাস্তকালে আমি আর লীলা জংলা স্ট্রবেরি তুলি পরম আনন্দে।

তারপর গেলাম বিশ মাইল দূরে তাওআং-এ। পনেরো মাইল দূর থেকেই, সমুদ্রস্তর থেকে ১০০০০ ফিট উঁচুতে, পাহাড়ের ঢালে জাহাজসদৃশ বিশাল বৌদ্ধমঠটির প্রথম দর্শন মিলল। যতই এগোই, পথে ছোট ছোট গ্রামে অন্তত বারোটি সংবর্ধনা মিলল। তাওআং-এর কাছে যখন, বর্ণাঢ্য পোশাক এবং জমকালো হলুদরঙা কাপড়ের টুপি পরা মঠাচার্য, এবং প্রবীণ কিছু ভিক্ষু তিন মাইল এগিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য। পরদিন ২৪শে মে বুদ্ধপূর্ণিমা, বুদ্ধ জন্মের ২,৫০০তম জন্মবার্ষিকী। আমরা মঠটি দেখলাম। এর চেয়ে শুভ দিন আর কি হতে পারত?

মঠের প্রবেশ পথে মঠাচার্য এবং অন্যান্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। শাল বিনিময় ও ভেরী বাদন হ'ল। ধীরগতিতে হেঁটে গেলাম অনেক সৌধের স্বপ্ন-জটিল পথ দিয়ে। পৌঁছলাম বিশাল প্রাঙ্গণ ও প্রধান মন্দিরে। সেখানে অতিকায় এক বুদ্ধমূর্তি, অজস্র ছোট ছোট মূর্তি। মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্ম এবং সোচ্চার তান্ত্রিক উপাদান। এর সমাহারে এটি প্রজ্বলিত ভক্তির এক কেন্দ্র। দৈত্যদের মূর্তিগুলি কল্পনা-উদ্ভট, মহান সন্তদের মূর্তিগুলি অভিজাত, যে সব পুণ্যাত্মাদের পুনর্জন্ম হয়েছে, সেই রিনপোচেদের মূর্তিগুলিও তাই। পটচিত্র, ধ্বজা, মন্দিরে টাঙানো সজ্জা, ঘন্টা ও আলো, মানবদেহের উরুর হাড়ে বানানো ভেরী, বর্ণাঢ্য গালিচা, এ সব মিলেমিশে মন্দিরটিকে এক সমৃদ্ধ, গম্ভীর, চমৎকারিত্বে সজ্জিত করেছে। ঐতিহ্য বা প্রথা অবশ্য চায়, এ মন্দির সর্বদা কৃত্রিম আলোতে উদ্ভাসিত থাকুক।

বুদ্ধপূর্ণিমার দিন ছিল। অধিকাংশ সন্ন্যাসীরা সার বেঁধে বসে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন। আমরা প্রধান মূর্তিগুলিকে শাল নিবেদন করলাম। আজ মন্দিরে হাজার দীপ জ্বলছে। রংমেশানো মাখনে মেঝেতে চমৎকার ছবির আলপনা। দেওয়াল হতে দেওয়ালের মেঝেতে বসানো মাখনে তৈরি এক হাজার বুদ্ধ মূর্তি।

পরে গেলাম এক অপূর্ব গ্রন্থাগারে। এর দুর্লভতম সঞ্চয় হল, আটটি বিশাল খণ্ডে গেটোম্‌পা। এর তিনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। অন্যান্য প্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের পুঁথির অনুলিপিও ছিল। সাতাশোর উপর বই। কিছু ছাপা, কিছু হাতে লেখা। শুনলে মনে হবে তেমন কিছু নয়। কিন্তু মঠের বই প্রকৃত অর্থেই বই। আজকের উদাসীন আধুনিক

দুনিয়ার ছয়টি সাধারণ বই মিলিয়ে একেকটি বইয়ের মাপ। জ্ঞানের প্রতি লামাদের খুব শ্রদ্ধা, যদিও ওদের অনেকেই নিজেরা লেখাপড়া জানেন না। প্রতি মন্দিরে আছে নিজস্ব পবিত্র গ্রন্থ। উৎসবের দিন বইগুলি নিয়ে শোভাযাত্রা করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। গ্রন্থ, পড়া না হলেও পূজিত হয়। গ্রন্থাগারে আমাদের খাওয়ানো হল কিছু অচেনা স্বাদের, তত্রাচ সুস্বাদু খাদ্য, এবং সেই মাখন-চা। বারান্দা থেকে আমরা দেখলাম এ উৎসবের সম্মানে কিছু নৃত্য। সবচেয়ে মন ছুঁয়েছিল মৃত্যুর রাজা ও রানীর থুতোডাম নৃত্য। এ নাচ দর্শকদের মনে করিয়ে দেয়, মৃত্যু প্রতীক্ষায় থাকে প্রতিটি মানুষের জন্য। তাই মানুষের উচিত নয় পার্থিব জীবনের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হওয়া।

এই মঠ, আমার মনে অক্সফোর্ড তো বটেই— আমি উদারচেতা বলে কেমব্রিজেরও স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। তেমনি সাধারণ পরিবেশ, যার আড়ালে আছে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও নিয়মশৃঙ্খলা। তেমনই সংকীর্ণ ছোটছোট পথ। যে সব উঁচু উঁচু বাড়িতে সন্ন্যাসীরা ছোট ছোট কুঠরিতে থাকেন, সেগুলির ভিতর দিয়ে পথগুলো চলে গেছে। আছে এক মিলনীগৃহ। এখানে নেতৃস্থানীয় লামারা মঠের নীতি ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করতে বসেন। বিশাল এক রন্ধনশালা; বিশেষ দ্রষ্টব্য, লামারা যাতে মাখন-চা বানান, সেইসব বড় টী-পট। প্রাঙ্গণগুলি পাথরে বাঁধানো। অনেক ঘোড়াও ছিল। গ্রন্থাগারের নিচে ভূগর্ভে একটি বিশাল ঘর। অনুষ্ঠানে নাচার যে মুখোশ এবং জমকালো পোশাক, সে-সবের বড় বড় বাক্স সেখানে। একটি ছাপাখানাও আছে। ছাপার কাজ খুব শ্রমসাধ্য ব্যাপার, বইয়ের আকার আয়তক্ষেত্রের মতো। প্রতিটি পাতা স্বতন্ত্র কাঠের ব্লকে খোদাই করতে হয়।

আমি বলেছি, এবারের পর্যটন তীর্থযাত্রা। বাঁধাধরা সরকারি পর্যটনের চেয়ে আমার কাছে এটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মে আমি চিরদিন আগ্রহী। তার অনেক শিক্ষা আমাকে প্রাণিত করেছে। এই কয় সপ্তাহ আমার জীবনে আনে এক স্পষ্ট পরিবর্তন। আধ্যাত্মিক অনুভবের দিকে যেন এক পা এগিয়ে গেলাম।

তিন

তাগিনদের মধ্যে গণ্ডগোল

আমি শিলং-এ আসার সামান্য আগেই সুদূর-উত্তরের তাগিনরা আসাম রাইফেলসের এক ছোট বাহিনী ও ওদের কুলীদের আক্রমণ করে আচিংমোরিতে, ওদের অনেককে মেরেও ফেলে। এই বিক্ষুব্ধ আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। তবে তা ঝটপট শেষ হয়ে যায় এবং ওরাও শান্ত হ'ল। ১৯৫৫-এর মার্চে আমি তাগিনদের অঞ্চলে যাওয়া মনস্থ করি। ওদের অঞ্চল তখন দুর্গম ও বন্য ছিল।

যাত্রাটা শুরুই হয় অপয়াভাবে। জোড়হাট থেকে বিমানে যেতে হলে পাহাড়ের

দুরদর্গম এক সুদূর অঞ্চলে। যাত্রার দিন সকালটাই যেন রাক্ষুসে, বড় বড় মেঘে কালো। আমরা যাব সেই প্রাচীন ডাকোটায়। আমাদের লোকজনের ভাষায় 'সৌভাগ্যক্রমে' সেটি চালাবেন স্বয়ং উইং-কমাণ্ডার। এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে দেখি ওঁর মেজাজ তখনি খুব খারাপ। বিমানটিতে খুব বেশি মাল তোলা হয়েছে। ব্যাটারিতে কোনো গড়বড় আছে। এঞ্জিনের শব্দটা ভুতুড়ে। যেন গীয়ারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্লেনের চাকাগুলো ঘুরছে না। উনি বিড়বিড়িয়ে বললেন 'বুড়ির মতো ঘড়ঘড় করছে।' আমার মনোবল তেমন ছিল না, আরো দমে গেল। ভিতরে ঢুকে দেখি, ভিতরে অর্ধেক জায়গা চালের বস্তা ও টিনের বাক্সে ঠাসবোঝাই। প্লেন যদি উপরপানে ওঠে, ওগুলো যেন আমাদের উপর এসে পড়বে। যাই হোক, কোমরের বেল্ট বাঁধলাম। উইং-কমাণ্ডার চালাতে থাকলেন। এয়ারস্ট্রিপে চলছে ডাকোটা, আমরা মাটিতেই আছি। কেউ চাকাগুলো পিছনে টেনে রাখল। আমরা চলছি দুর্বলগতিতে। পাইলট কোনমতে আকাশে উঠলেন। বিমান খুব নিচে। তিনবার চক্কর মারলেন এয়ারপোর্টের উপর। আমি ভাবলাম, অত্যন্ত গুরুভার বোঝার জন্য এমনটা হচ্ছে। কিন্তু উনি ভাবলেন, ডানদিকের টায়ারটা ফেঁসে গেছে। রেডিও অপারেটর দৌড়ে এল, আমাদের বেলট খিঁচছে আর বলছে, 'আরো এঁটে বাঁধো, আরো!' আমার হেডমাস্টার আমাকে পেটাবার সময়ে অমনি করেই নিচু হতেন।

নিরাপদেই অবতরণ করলাম। কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। তারপর ককপিটের দরজা খুলল এবং এমন তোড়ে বেরিয়ে এল অশ্রাব্য খিস্তির প্রবাহ যে আমি তো ভাবলাম প্লেনের তেলে না আগুন লাগে। সশ্রদ্ধ অভিনিবিশে শুনে যাচ্ছি। পাইলট দরদরিয়ে ঘামতে ঘামতে বেরিয়ে এলেন ও বললেন। 'তোমরা, বেজন্মারা, মরতে বসেছিলে।' পরে বিমানকর্মীদের একজন বলল, এমন পরিস্থিতিতে তারা পালাতে পারে, যাত্রীরা সর্বদাই মারা পড়ে।

পাইলট এখন কড়া হলেন। আরেকটা বিমানে যাবার ওপর জোর দিলেন। এবার আমরা ভালো বিমানে দ্রুত গেলাম, গন্তব্যে পৌঁছে নিরাপদে ল্যান্ডিং করলাম।

সেখান থেকে প্রথমে যাই নির্জন, প্রায় কারো না দেখা সিপি উপত্যকায়। উত্তরের সে পথ এত খারাপ ছিল, যে মাঝে মাঝে আমরা গুড়ি মেরে চার হাতে-পায়ে হাঁটতাম। নেফার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানে কোনো যুবাবাস ছিল না। বাড়িগুলি এত ছোট ও মানুষ বোঝাই, যে মাঝেমধ্যে যখন সেখানে থেকেছি,—দেখেছি আমি ওদের বিব্রত করছি। আমার তাঁবু নেই, আছে দুটো তেরপল। (তা দিয়ে) মাঝে মাঝে বানাই ছোট কুঁড়ে ঘর। মাঝে মাঝে একটু সমতল জায়গার জন্য, পাহাড়ের গা কেটে নিতে হয়। একটা তেরপল মাটিতে আরেকটা দিয়ে ছাউনি, অবিরল বর্ষণে ব্যাঙের মতো জবুথবু বসে থাকি। মার্চ মাসেও ছেদহীন নিষ্ঠুর বর্ষণ।

সিপি নদীর ধারে একটি ছোট ছাউনিতে পৌঁছে আন্দাজ করা যায়, আমরা কি

পরিস্থিতিতে পড়তে চলেছি। আটঘন্টার বেশি সময় ধরে আমরা বারো মাইল হেঁটেছি। একটি সংকীর্ণ পিছল গিরিপথে আমরা চড়াই-উৎরাই করতে করতে এসেছি। গিরিপথের খানিকটা একদিকে হেলানো। ফলে সুবনসিরি নদীর ডান পাড়ের মাটিতে ঠিকমতো পা ফেলা যায় না। পথ যেন শেষ হবার নয়। পিছলে নামছি, হাঁচোড়পাঁচোড় করে উঠছি। চড়াই ভাঙতে দু'বার আমি পড়ে যাই কোমর অবধি। শত শত জোঁক মাটি থেকে শরীর ওঠাচ্ছে, রক্তচোষা চিবুক হাঁ করে। হাতের চেটোর মতো বড় বড় মাকড়সা উপর থেকে ঝুলছে। ডিমড্যাম পতঙ্গরা জেট ফাইটারের মতো সগর্জনে মাথা ঘিরে উড়ছে। প্রথম দিন গা থেকে আটচল্লিশটা জোঁক ছাড়াই। মোজার ভিতর থেকে, বুটজুতো থেকে, হাত থেকে এমন কি চুল থেকেও।

সিপি নদী বহে গেছে এক সংকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে। দুপাশে খাড়া বনাবৃত পাহাড়। চূড়ার নিচে কন্দরে তাগিনদের গ্রাম। যেগুলিতে যাই, সেখানে জল আছে। ছোট ছোট গ্রাম। ছয় থেকে আটটির বেশি বাড়ি নেই। তবে প্রতি বাড়িতে অন্তত চারটে উনোন। যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ থাকে। আগুন থেকে বাঁচাতে শস্যের গোলাগুলো উনোন থেকে দূরে।

প্রথমে আশঙ্কা ছিল, আমি হয়তো আচিংমোরি ট্র্যাজিডি নিয়ে আরো তদন্ত করতে এসেছি। উপত্যকা সীমান্তে এক সুদূর গ্রামে দলপতিরা বেশ কিছুদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি। যদিও সাধারণ মানুষের এক মস্ত দল আমাকে ঘিরে ধরে। তবে অচিরে চমৎকার হাত-তাঁতে বোনা আলখাল্লা পরে, দেহরক্ষীদের ছোট্ট একটি দল নিয়ে হাজির হলেন দলপতি। চারদিকে থমথমে নীরবতা। মানুষজন সরে গেল, আমরা মুখোমুখি। বিদ্যুতে তরঙ্গিত সে মুহূর্ত। এই প্রথম দলপতি দেখছেন একজনকে, যে 'নিউ স্টেট্‌সম্যান' রাখে। তিনি নিজেকেই বললেন, সভ্যতা তো এখানে আছে। যা দেখলেন, তা তাঁর তেমন পছন্দ হয় নি। মনে হল উনি আমাকে নিঃশেষে পান করছেন,— সাদামাটা চেহারা, চশমা, জীর্ণ কোট জীর্ণ ও ঢোলা ট্রাউজার, কাদামাখা জুতো! যেন উনি ভাবছেন, এই কি সব না কি? এ সবই দিতে এসেছে ওরা? সিধা দাঁড়িয়ে আছেন। নিশ্চল, চোখে আগুন। আঙুল বুলোচ্ছেন স্বীয় তরবারিতে। হাসার চেষ্টা করলাম, কোনো সাড়া নেই। নিয়মবাঁধা উপহার দিলাম,— হাত নেড়ে সরিয়ে দিলেন। একাধারে আভিজাত্য ও তাচ্ছিল্য মিশিয়ে উপহার দিলেন একটা ডিম। সাদা ও ঠাণ্ডা ডিমটি আমার হাতের আঁজলায়। আবার হাসলাম, তবে আমারও মনে হল হাসিটা দেঁতো হাসি হয়ে যাচ্ছে। না কোনো সাড়া নেই। নিরাপত্তার উপায় হিসেবে আমাকে একটু থিয়েটার করতেই হবে। আমার মতে তা আসাম রাইফেলের গোটা একটা প্লেটুনের সমানে সমান। আমার বাঁধানো দাঁতের পাটি খুললাম। এখন জনতা কলকল করে উঠল আগ্রহে ও উত্তেজনায়। আবার পরলাম দাঁতগুলো। আবার সমুদ্র গর্জন। এই লজ্জাকর নাটক অনেকবার করার পর সাড়া পেলাম। দলপতির ঠোঁট

কুঁচকে গেল, উনি দিলখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। নিজের পাকধরা চুল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন। 'আরে! আমিও বুড়ো!' শীঘ্রই খুব অন্তরঙ্গভাবে আমার পাশে বসলেন।

এখনো সবটা সহজ হয়ে ওঠেনি। উনি জানেন, তাগিনরা অন্যায় করেছে। কথা কইবেন না ব'লে মনস্থ করেছেন উনি। যত প্রশ্ন করি, উত্তর মেলে একটাই। 'আমি কিছু জানি না। আমি করি নি।'

কথাবার্তা পৌঁছল ঈশ্বরতত্ত্বে। আশা ছিল। এ বিষয়ে কিছু জানা যাবে। ওঁর কথাবার্তা কিছুটা অপ্রস্তুতে ফেলল।

প্রশ্ন করলাম, 'বলুন, কে সৃষ্টিকর্তা?"

লাফিয়ে উঠে ওপরে দু'হাত তুলে বললেন, "শপথ করছি। সে আমি নই।"

"কে সৃষ্টি করলেন পৃথিবী?"

"কোনো ধারণাই নেই। তবে আমি করি নি। সে সব আমার জন্মের আগে হয়েছে।"

"চাঁদ ও সূর্য?"

"আমি নই, আমি নই। অল্প বয়সে একটা গ্রাম ধ্বংস করেছিলাম। সে তো অনেক আগে। আর কিছু করি নি।"

তবে মনে হ'ল। আমি চলে আসার সময়ে উনি সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন। অঞ্চলটির পূর্ণতর উন্নয়ন খুব জোরগলায় দাবি করেন।

এসব মানুষের জীবনে অতীব বিশ্রী ব্যাপার হ'ল, এক জাতের চর্মরোগ। এটা শুরুতে দাদের মতো। তারপর সমস্ত দেহের চামড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। উপরে থাকে অতিক্ষুদ্র মাছের আঁশের মতো পুরনো খোসা। চামড়াটা এ কারণে সাদা বা রুপালি দেখায় এবং খোসা ঝরতে থাকে। আমি দেখেছি, খোসা ঝরাবার জন্য মানুষ ছুরি দিয়ে গা চাঁছছে। সর্বদা গা চুলকায় ও চিড়বিড় করে বলে মানুষগুলো স্থির থাকতে পারে না। এখন এই কদর্য রোগটি নির্ণয় হয়েছে 'টিনিয়া ইম্ব্রিকাটা' নামে, এবং নেফা-র ডাক্তাররা এটি সারাবার জন্য বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন।

তাগিন, ও উত্তরের গালোংদের দেশে যাবার পর আমি দাপোরিজো-তে ফিরি। তারপর সহজগম্য রাস্তা ছেড়ে ভয়ংকর কঠিন যাত্রা পথ নিই। সে পথ দেশটা চিরে চিরে গেছে। নেমে আসি ঝিরো-তে। বিশাল কম্‌লা নদী পেরোই, পেইন্ উপত্যকার পথ ধরি।

সুদূর উত্তরে যাত্রা ছিল খুব কঠিন। তবে মানুষজন ভালোলাগার মতো, সহযোগিতাও খুব করে। ওদের দীর্ঘদিন ধরে বলা হচ্ছে হিল মিরি, সরাক, বা পানিবোটিয়া। ওদের ওই চিড়বিড়ে চর্মরোগ ছিল না, যা তাগিনদের জ্বালাচ্ছিল। অনেকেই খুব সুদর্শন। কিছু মহিলা তখনো ওদের পরম্পরামতে বেতে বোনা

বক্ষবন্ধনী পরে। সবাই পরত চমৎকার কোম্‌রবন্ধ্‌, সযত্নে বেতে বোনা। দাফলাদের মতোই কেশসজ্জা ছিল ওদের। সামনে গিঁট দেওয়া। চমৎকার ছোট ছোট বেতের টুপি পরত, মাঝে মধ্যে সে টুপিতে শজারুর কাঁটার সজ্জা থাকত।

অনেক গ্রামের চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হ'ল, ওদের সমাধিগুলি। অনেকগুলিতে ছিল সার সার বানরের খড়পুতুল। মুখ হাঁ করা, থাবা প্রসারিত। পিঠের ঝুড়িতে তামাক ও সামান্য খাদ্য। এগুলোর কার্যকারিতা হ'ল, প্রেত যখন মৃত্যুলোকে যায়, তাকে এ সব দিয়ে সহায়তা করা।

আমার দোভাষীরা বউদের নিয়ে চলছিল। দাম্পত্যজীবনের বিরামহীন ঝগড়াবিবাদ আমাদের আনন্দ জোগাত। পুরুষরা সবাই বহুপত্নীক। একজনের তিন বউ তাঁবুতে থাকত। ওর চার বউ। ওর মতে, তিনজন ঘরের কাজ করবে, একজন শয্যাসঙ্গিনী হবে। ওর আকাঙ্ক্ষা আটটি বউয়ের। বলল, আসলে ও চায় বারোটি বউ। কিন্তু সরকার কিসব নব্যভাবধারা এনেছে। ওকে কম বউ নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে।

দুনিয়ার এই অংশটা আমার মনকে এক চরম শূন্যতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন রাখে। তার সঙ্গে ছিল বিরামহীন বৃষ্টি এবং আমাদের সঙ্গে চলমান ঘন কুয়াশা। কম্‌লা নদীকে এমনিতে সুন্দর দেখাবার কথা। কিন্তু পাহাড় থেকে নেমে নড়বড়ে বেতের সাঁকোয় সে নদী পেরোবার সময়ে ভয় লেগেছিল। যাত্রার শেষপর্বে এক বিশাল অরণ্য দিয়ে যেতে হয়। গাছের ডাল বেয়ে বৃষ্টি ঝরেই চলছিল।

যত পর্যটন করেছি, এটি বোধহয় সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। তবু উপভোগ করেছি, তা বলতে পারি না। তবে গিয়েছিলাম বলে সর্বদাই আনন্দিত লেগেছে।

চার

সিয়াং ভ্রমণ

সিয়াং-এর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনাই চলে না। এই পরম মনোরম ডিভিশনে চারবার গেছি লম্বা সফরে। সিয়াং তুলনারহিত। প্রথমবার, ১৯৫৫-এর জানুয়ারিতে আলোং থেকে উৎরাই পথে যাই পান্‌গিন-এ। আবার চড়াই ভেঙে সিয়াং নদীর বাঁ কূল দিয়ে যাই শিমোং-এ, বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাই কারকো। আবার দক্ষিণ কূল ধরে আলোং-এ ফিরি। সীমান্তের নাগাবিহীন অংশে এটাই আমার প্রথম লম্বা সফর। শারীরিক শ্রম খুব হয়েছিল। তবু তা উত্তেজক ও উচ্ছ্বসিত আনন্দদায়ক। গ্রামে আমরা যথারীতি থাকি যুবাবাসে। এটি এক লম্বা, বাতাস খেলানো বাড়ি, ছাতটি নিচু। এক পাশে একতলায় ছিল শুওরের খোঁয়াড়। উপরে তক্তা পাতা। আমাদের শৌচাগার। ধনী লোকদের সুবিধেটা হ'ল, ওরা শুওর তেমন জায়গায় রাখে, যেখানে ওরা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পাবে। যুবাবাসে আমাদের চারপাশে সদাই ভিড়। ছেলেরা মাচায় ওঠে

ও চেয়ে দেখে। কোথাও কোথাও মেঝের ফাঁকফোকর দিয়ে মানুষ উঁকি মারে। প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা নাচতে আসে। প্রায়ই নাচ চলে মাঝরাতের ওপার অবধি।

ভিক্টর সঙ্গে আছে। আছে আমার বড় ছেলে কুমার এবং অতীব মূল্যবান মানুষ সুন্দরলাল। ভজন রাঁধত, হরিচরণ ছিল চাপরাসী। চমৎকার গেরস্ত লোকজন সব। দোভাষীর জন্য পেয়েছিলাম, লাল কোট পরিহিত দুই রাজনীতিক দোভাষী, তাপাংটাকি এবং ওরিন মোদী। চমৎকার মানুষ এরা। এ সফরের সাফল্যে ওদের অবদান কম নয়।

কুমারের বয়স চোদ্দ হবে, সে তখন এক তরুণ তুর্কী। ওর আবোর দাও এবং বর্শা আছে। তাপাং ও ওরিন সহ বহু গ্রামবাসীর সঙ্গে গভীর দোস্তালি। ও প্রাথমিক চিকিৎসার ভার নেয়। ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধে, সহজ ওষুধগুলো বিতরণ করে। অপ্রশংস মানুষের ভিড় প্রায়ই হয়। ও গ্রামোফোন বাজায়। সব সময়ে মেজাজ টগবগে। বিমান থেকে নিচে লাফিয়ে পড়া ব্যাপারটা দেখতে ভালো লাগে ওর। প্যারাস্যুটগুলো দুলতে দুলতে, ভাসতে ভাসতে নামছে, দেখে খুব উত্তেজিত। আবোর নদী সাঁকোগুলো ভার সামলে পেরেনো বেজায় মজার। প্রতিবার অন্তত বারোবার পড়ে যেত। তবে হালকা ওজনের শরীর, কোনো ক্ষতি হত না। ভিক্টর কয়েকবার বিশ্রীভাবে পড়েছে। তবে সাঁকো পেরোবার মার্চে আমি অক্ষতই থেকেছি। এক রাতে অবশ্য পাহাড়ের মধ্যে এক গভীর খাতে পড়লাম। গোড়ালি মচকালাম। সৌভাগ্যবশত হাঁটতে হবে মোটে আরো চল্লিশ মাইল।

ছ'বছর আগে, এর পরে যাই অতীব বিচ্ছিন্ন বোরি অঞ্চলে।

খানিকটা পথ গেলাম বিমানে। চব্বিশটা ছাগল সহযাত্রী। ছোট দল নিয়ে বোরি গ্রামগুলির ভিতরে যাত্রা শুরু করলাম। দুনিয়ায় এ অংশটি খুবই আকর্ষণীয় এবং ছবির মতো সুন্দর। স্থানটির বিষয়ে এ অবধি কিছুই লেখা হয় নি। বোরিরা এই অর্থে আবোর, যে ওরা একই ভাষা বলে। তবে পোশাক আশাক ও চেহারায় তফাৎ আছে। উৎসাহী তাঁত বয়নকারী। চমৎকার স্কার্ট। কোট ও ক্লোক বানায়। উপকরণটা উল। উত্তর থেকে আনা হয়। পুরুষ ও মেয়েরা কপালের ওপর চুলটা বব্ করে। পিছনের চুল লম্বা রাখে। দেখতে ভারি চমৎকার। যত চমৎকার সুন্দর শিশু দেখেছি, তার মধ্যে এদের শিশুরা বিশেষ ছোট্ট মেয়েরা অন্যতম।

এ সফরে আমার মতে সব চেয়ে বিপজ্জনক ছিল ঝোলানো পুল বা 'ঝুলা'গুলি। ফাঁপা বাঁশ নদীর এপার থেকে ওপারে লাগানো। সরকারের দেওয়া তারের দড়িতে মাঝে মাজে জড়ানো, তবে সব জায়গায় নয়। একটা সরু বেত বা তারে পা রেখে চলতে হবে। দু'পাশে বেতের দড়ি ধরে ধরে। পা রাখার বাঁশটি বেত বা বাঁশের টুকরো গুঁজে ফাঁকফোকর ভেজানো। তবু অনেক জায়গাই খোলা। গোটা জিনিসটা রীতিমতো পলকা দেখতে। যখন জোর বাতাস বয়, পুলটা সাপের মতো হিলহিলিয়ে

ওঠে। দুনিয়ার এ অঞ্চলে ক্রীড়াবিৎ হওয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী হওয়ার মতোই জরুরি।

উপত্যকার উপরে উঠে গেছে পারি পর্বতমালার মহানদর্শন তুষারে ঢাকা চূড়া। বহু জায়গায়, সুইজারল্যান্ডের মতো সুন্দর দৃশ্য দেখি। দুর্ভাগ্য ক'দিনেই আবহাওয়া বিগড়ে গেল। অঞ্চলটির সৌন্দর্য হারিয়ে গেল সর্বব্যাপীর মেঘ ও কুয়াশায়। বৃষ্টিও শুরু হ'ল।

বোরি অঞ্চলে অন্য জায়গার মতোই যুবাবাসে থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। এখানে তার নাম ব্যাংগো। ব্যাংগো একটা লম্বা, ঠাণ্ডা বাড়ি। মেঝেটা যে কোনো সময়ে পড়ে যাবে বলে মনে হয়। পুরো দৈর্ঘ্যটাতে সারসার উনোন। গ্রামের লোকরা এটাকে সভাগৃহ, যুবাবাস ও ক্লাব হিসেবে ব্যবহার করে। সারাদিন আগুন ঘিরে ভিড় করে বসে থাকে এবং বেজায় চেঁচিয়ে কথা বলে। বোরিরা উত্তেজিত হলে উচ্চখাদে একই ভাবে কথা বলে চলে। সাধারণত তিন-চারজন একসঙ্গে কথা বলে। যখন বলে, সে শব্দঝটিকা ভয়াবহ। কথায় বলে, 'বোরিদের জিভ চার গজ লম্বা।' আবিবাহিত যুবক ও পুরুষরা আগুন ঘিরে ঘুমায়। আমি সাধারণত এক কোণে বিছানা পাততাম।

এভাবে ব্যাংগোতে বসবাসকারী প্রথম অতিথি আমরাই। আমাদের আগে মাত্র দু'জন অফিসার আসেন। তাঁদের সঙ্গে রক্ষীরা ছিল। ইন্দিছিন্দিহীন ঢাকাঢুকি দেওয়া তাঁবুতে তাঁরা থাকেন। লক্ষণীয়, বোরিরা আমাদের যেন দেখতে পেত না। আমরা ওদের মধ্যেই আছি। ওরা চারদিকে বসে চেঁচাচ্ছে, গর্জাচ্ছে। ঝুড়ি বুনছে। মদ খাচ্ছে, ঝগড়া করছে। আমাদের বিষয়ে ওদের আগ্রহই নেই। এতে খানিকটা বুঝলাম, ওরা কিভাবে থাকে।

আরেকটা বিষয়ও নজর করার মতো। ওই রকম ভিড়ভাট্টায় (মাঝে মাঝে একশোর বেশি মানুষও জমত) আমরা সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখতাম। সবই থাকত নিরাপদ। থাকত চা-পাতা, চিনি, সিগারেট— যে সব জিনিস পেলে ওরা খুশি হয়। তবু কিছুই তালাবন্ধ করে রাখতে হয়নি। কেননা চুরি করার কথা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

আমার দুর্ভাগ্য, সারাজীবন আমি ধর্মযাজকদের বিরক্তির কারণ হয়েছি। বোরি অঞ্চলেও তাই হ'ল। এ আশঙ্কা ছিল না যে আমরা ট্যাক্স চাপাতে, বা ওদের জমি কেড়ে নিতে এসেছি। ভারতের অন্যান্য দূরান্ত অঞ্চলে তেমনটা দেখেছি। এখানে আমাদের বিষয়ে সন্দেহ এবং আশঙ্কার কারণ রাজনীতিক নয়, ঈশ্বরতত্ত্বগত। প্রতি গ্রামে প্রবেশ কালে স্বাগত জানাত সার সার সূঁচলো মাথা বাঁশের শূল। এবং ফটকগুলি নানারকম প্রতীকচিহ্নে সাজানো। কখনো বা তা মরা কুকুরের মাথা। আমরা যে সব দুষ্ট আত্মা নিঃসন্দেহে আনছি, তাদের ভয় দেখিয়ে খেদাবার জন্য। আমি এবং আমার সঙ্গীরা বিষাক্ত আধ্যাত্মিকতা বহন করছি। অন্য দুনিয়ার বিষ-ছোঁয়াচ আনছি। আমার সংগ্রহশালার জন্য কিছু কিনতে চাইলে পুরোহিতরা ঘোষণা করল, কেউ যদি তার

ব্যক্তিগত কিছু আমাদেরকে বোরি দেশের বাইরে নিয়ে যেতে দেয়, সে ব্যক্তি মরে যাবে। ছবি তুলতে দিতে ঘোর আপত্তি। যার ছবি তোলা হবে, তার আত্মাটা ক্যামেরা নিয়ে নেবে। একবার এক বুড়ো আমার সঙ্গে বেশ খানিকটা সময় কথা কইছে,— ওর ছোট্ট মেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে এল। বুড়ো যদি আমার সঙ্গে আরো কথা বলে, উইয়ু-ভূত বুড়োকে খেয়ে নেবে। এক খণ্ড কাঠ, একটা ভারি লোহা ছুঁড়ে ও বুড়োকে মারল। কোনো কোনো গ্রামে হুঁশিয়ারি দেওয়া হ'ল, কোনো বাড়ির ভিতরে দেবতাদের ও প্রেতাত্মাদের নাম নেওয়া চলবে না। আমরা বাইরে এসব প্রশ্ন করেছি।

ওসব আশঙ্কা এখন উবে গেছে বললে হয়। এ সব মানুষ, মানবজাতির ইতিহাসের শৈশবে বন্দি ছিল। বহুজন একটি দেশলাই জ্বালায় নি; ঘড়ি দেখেনি কেউ। জানে না ওটা কী। আমাদের সব কিছু সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল। একটা চেয়ার, বা টেবিল বানাবার কালে খুব মন দিয়ে দেখত। রান্নার বন্দোবস্ত দেখে মোহিত। আগ্রহ ছিল না এরোপ্লেনে। ওটা 'সরকারের গরুর গাড়ি।' মাথার ওপর দিয়ে এতবার বিমান আসত-যেত, যে ওরা চোখ তুলেও দেখত না। অঞ্চলে দাসপ্রথা ছিল। প্রশাসন অবশ্য ক্রমে দাসদের মুক্ত করছিল, এখন প্রায় সকলকে মুক্ত করেছে। দাসরা প্রায়শই সদ্ব্যবহার পেত। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওদের কাহিনীও লিখে নিই। আমার সঙ্গে একটি ভালো তাগিন বৃদ্ধাকে নিয়ে আসি। শৈশবে ওকে বন্দি করে দাস বানানো হয়। তারপর বারবার ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির লোকদের কাছে ওকে বিক্রি করা হয়েছে। ত্রাণ বিষয়ে ওর একটি স্বপ্ন ছিল। মাটিতে এক গর্তে ও ঢুকে গেল, অনেক ক্লান্ত পথ হাঁটল অন্ধকারে, 'তারপর পৌঁছল আলোর দেশে, সূর্য-চাঁদ দেবতার সামনে।' আমি ওকে আলোং-এ আনি, ও মুক্তি পায়। ওর কাহিনী আমি *এ ফিলসফি ফর নেফা*-তে বলেছি।

১৯৫৮-এর শুরুতে কুমার ও আমার পুরনো ছোট্ট দল নিয়ে সাত সপ্তাহের চমৎকার ভ্রমণে যাই সিয়াং-এর সবচেয়ে উত্তর দিকে তুতিং-এ। প্রথমে সিয়াং নদীর দক্ষিণ কূল ধরে উৎরাইয়ে নামলাম। আশিংস্-এর গ্রামগুলি দেখলাম। মনোরমা বম্ডো অবধি গেলাম। এক বাঁশের ভেলায় নদী পেরোলাম। পুবদিকের শিমোং অঞ্চল দিয়ে আবার গেলাম উত্তর দিকে। শেষে লাবণ্যময়ী ইয়াং-সাং-চু উপত্যকা, যা পুণ্য এক উর্বরা ভূমি। চড়াই পথে সেখানে মানখোটা অবধি গেলাম। তুতিং-এ ফিরে দশদিন আটকে গেলাম আবহাওয়ার দুর্যোগে। খানিকটা সময় কাজে লাগালাম ভারত ও তিব্বতের সীমান্ত রচনাকারী গেলিং ও কেপাংলা দেখে।

এগুলো নেফার অতীব আকর্ষণকারী ও উত্তেজক অংশগুলির একটি। মেঘবৃষ্টিতে আড়াল না করলে দৃশ্য অপরূপ। মানুষজন সুভদ্র, আতিথ্যপরায়ণ এবং ফোটো তোলার যোগ্য চেহারা। আদিবাসী সংগঠনগুলি এখনো টগবগে। এ দেশ নাচ ও গানের। কঠিন ও প্রাণশক্তিপূর্ণ শ্রমের সুতাকাটা ও বোনার চমৎকারিত্বের, আর হাস্যমুখ সুন্দর শিশুদের।

সিয়াং পেরোলাম বাঁশের ভেলায়। শুনতে যেমন, অ্যাডভেঞ্চার তার দ্বিগুণ। ওদের অঞ্চলকে যে সব নদী বিশিষ্ট করেছে, আবোররা সে সব নদীকে ভয় পায়। বিশ্বাস, — এসব নদীতে আছে বিপজ্জনক সব প্রেতাত্মা, নিপ্পোংরা। এরা মানুষকে জলের নিচে টেনে নেয়। অতীতে কয়েকটি সলিল সমাধি ঘটেছে। ফলে ওরা মাছ ধরা, বা নৌকা বা ভেলায় নদী পেরোনো থেকে নিরস্ত হয়েছে। বম্‌ডো-তে ভেলা বানাবার কাজে আমাদের সাহায্য করুক আশিংরা— এটা খুব সহজে হয় নি। অবশেষে একজন বা দু'জন এগিয়ে এল। যদিও নদী পেরোনোর বিপজ্জনক ব্যাপারটা দেখার জন্যে নদীকূলে ভিড় জমে গিয়েছিল। এক মেম্‌বা, তুতিং-এ একটি চমৎকার ভেলা বানায়। এ অতীব আদিম জাতের একটা দাঁড়ও বাইত। ভেলাতে এগারোজন বসতে পারে; গলুইয়ে এক আরামপ্রদ বসার জায়গা, এবং এক প্রার্থনা-ধ্বজা। নদীর কূলে আবোররা আমাদের উত্তরণ নিরাপদ করার জন্য বলি দিতে থাকল। মেম্‌ ও খাম্‌বারা একটি প্রার্থনা-ধ্বজা শোভিত চারাগাছ খাড়া করাল।

সে বছরই অক্টোবরে গেলাম ছয় সপ্তাহের লম্বা সফরে। গেলাম উত্তর-পশ্চিম সিয়াং-এ। প্রথমে মেচুকা, তারপর উৎরাই পথে রামো, পৈলিবো এবং বোরি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ফিরলাম আলোং-এ।

উপত্যকাটি অলোকসামান্যা রূপসী। আগে ক'ঘন্টা কাটিয়েছি মেচুকাতে। তবে আউটপোস্ট অবধি গেলে নিসর্গশোভা সম্পর্কে ধারণা জন্মে না। বোঝা যায় না পাইনে ঢাকা পাহাড় ঘেরা এ রমণীয় উপত্যকার কি বিপুল সম্ভাবনা। পাহাড়ের পর বরফঢাকা পর্বতমালা।

রামো-পৈলিবো অঞ্চল দুনিয়ার এক অনন্য, আশ্চর্য জায়গা। পাহাড়গুলি ভয়াল, প্রধানত পথ অতি দুরারোহ। মেচুকা ও টাটোর মাঝে নিয়িং শি নদীর দু'পাড়ে পাহাড় এত খাড়া, এমন উঁচু, যে পথযাত্রীর মনে হয়, সে এক গভীর খাত দিয়ে চলেছে, চলতে চলতে আতঙ্ক হয়, যেন সব বন্ধ হয়ে আসছে। এ সেই জায়গা, যেখানে আগে চলত নরবলি; মানুষ ধরে দাস বানিয়ে বিক্রি করা হ'ত; বন্দিদের রাখা হত খোঁয়াড়ে; এবং সন্দেহ ও বিদ্বেষ ছিল সর্বব্যাপী। আজ এ জায়গা দুনিয়ার এক বন্ধুভাবাপন্ন অঞ্চল। এক গ্রামে একটি ভালোমানুষ পৈলিবা আমাকে খানিকটা বানরের মাংস দেয়। আফশোস, আমার রাঁধুনি যেন অপমানিত হয়ে ওটা নিল না। দিল আমার এক দোভাষীকে। সে মাংস খেয়েই ও ভীষণ অসুস্থ হ'ল। বিষাক্ত তীরে বানরটি মারা হয়। এবং কুচিলা বিষকে পরাভূত করার জন্য যতটা সময় নিয়ে রাঁধা দরকার, তা করা হয় নি।

আবোর দেশে আমার ভালোবাসার জন ওই সিয়াং নদী। এ অসামান্য নদীর উৎস তিব্বতের গভীরে তাং .পা-তে। উত্তরতম সীমান্তে এ ভারতে ঢোকে। নিচের দিকে বহে চলে পাসিঘাটের সমতল অবধি। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পরাক্রমী ব্রহ্মপুত্রের

বুকে। সিয়াং নদীর ধারাপথের উপর দিয়ে আমি অনেক বার উড়ে গেছি। কয়েকবার কোমসিং থেকে তুতিং বা তারপরেও ওই নদীর দৈর্ঘ অনুসরণে হেঁটেছি। সুদূর উত্তরে ইয়াং সাং চু। এবং সিয়োম্, সিয়াং-এর এ দুটি সুন্দরী শাখা নদীর পথেও হেঁটেছি।

যত কবি যত কলম এতকাল হাতে তুলে নিয়েছেন, তাঁরা এ কাজে হাত লাগালেও এ নদীর মোহিনী সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারতেন কি? আমার সন্দেহ আছে। অপরূপ এ নদী, এমন লাবণ্য ললিত এমন রহস্যাবৃত, কত না বৈচিত্র্য এর সৌন্দর্যে,— কোথাও বইছে ঝুঁকে পড়া শান্ত অরণ্যের মধ্য দিয়ে, কোথাও বা সুউচ্চ খাতের মধ্য দিয়ে দুর্বার বেগে বইছে। এর রং সর্বদা বদলে বদলে যায়। দূরের তুষারঢাকা পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে নরম কুয়াশা ঢাকা এ নদী, যত সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে, তার অন্যতম। সিয়াং মেজাজী নদীও বটে। মাঝে মাঝে আমাকে এত ক্লান্ত করেছে, যে মনে হয়েছে এ নদীতে গেলে ফেরা যায় না। আমার জীবনাবসানে সিয়াং-এর পাশে দেহ শায়িত থাকলে আমি খুশি হব।

পাঁচ

লোহিত-এর অদ্ভুত আকর্ষণ

লোহিতের মানুষজন বরাবর আমায় টানত। জানি না কেন ওদের সঙ্গে আরো সময় কাটাই নি। যদিও মিশমি অঞ্চলে দুটো লম্বা সফরে গেছি, অবশ্য পায়ে হেঁটে চড়াই পথে লোহিত উপত্যকা থেকে ওয়ালং যাই নি, গেছি বিমান পথে। খাম্‌প্‌তিদের ওখানে অনেকবার গেছি। ১৯৫৯ সালে যেবার বসন্ত্ আমার সঙ্গে ছিল, ওদের গ্রামে যে যাই, সেটা সবচেয়ে আনন্দদায়ী সফর ছিল। ওখানেই দেখি গ্রামজীবনে বৌদ্ধ ধর্মের সহজতম শ্রেষ্ঠ চেহারা। ছোট ছোট মন্দিরে উপহার দিতে অনেকগুলো ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি নিয়ে যাই। সর্বত্রই আন্তরিক উৎসাহে স্বাগতাভিনন্দন পেয়েছি। নিংগ্রো-র সন্ন্যাসীরা আমাকে 'প্রদায়ক' আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করেন। এই প্রশাসনিক বিভাগে আমি প্রথম যাই রশিদ ইউসুফ আলির সঙ্গে। যত বিশিষ্ট লোক দেখেছি, তাঁদের মধ্যে ইনিও একজন। তবে কোনো স্বীকৃতি পান নি। চূড়ান্ত বর্ষাকালে গেছি, ধ্বংসপ্রাপ্ত এক তাম্র মন্দিরের খোঁজে। হাতির পিঠে, জল ভেঙে, দিকদিশাহীন অরণ্য দিয়ে। রশিদের চরিত্রের সঙ্গে এই ক্ষ্যাপাটে, নিষ্ফলা, অথচ উপভোগ্য অ্যাডভেঞ্চার খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। আমাকে ওই একই গোত্রে ফেলতে পারলে ভাল লাগত। তবে সে বিষয়ে নিঃসংশয় নই। ধারণা, আমি একলা থাকলে বৃষ্টি থামা অবধি অপেক্ষা করতাম।

আমার প্রথম মিশমি সফর, তেজু থেকে রোইং, অঞ্চলের এপার-ওপার ক'রে। বিশাল অ্যাডভেঞ্চার কিছু নয়, তবে সে সময়ে ১৯৫৫ নভেম্বরে, তিন সপ্তাহে নির্ভেজাল মিশমি জীবন দেখা যেত। অঞ্চলটি এবড়োখেবড়ো, তবে শত শত মাইল হাঁটতে হয় নি, প্রায় অগম্য পাহাড়ে চড়তে হয় নি।

এক নতুন আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছে প্রথম যাওয়া। এতে বিশেষ রোমাঞ্চ আছে। মনে আশঙ্কা একটু ছিল। আগে যাঁরা গেছেন, সকলেই বলেছেন, মিশমিরা কি 'দুর্বোধ্য'; কি বিশ্রি এবং কুদর্শন। আমি কিন্তু এই বলব, প্রথম দর্শনেই ওদের ভালবেসে ফেলি। প্রথমে গ্রামে যাই, সেটা তরাওন বা দিগারু মিশমিদের গ্রাম। পুরুষরা মাথার ওপর চুলে খোঁপা বাঁধত। মেয়েরা এক চমৎকার অনেক উঁচু কেশ সজ্জা করত, যা যেখানেই হোক। সকলে মুগ্ধ হয়ে দেখবে।

এ সফর কালে আগাগোড়া থেকেছি মিশমি বাড়িতে। কয়েকটা বাড়ি যথেষ্ট বড়। আত্মীয় স্বজনদের পরিবারসহ থাকে সেখানে। খুঁটি বসিয়ে জমি থেকে উঁচুতে লম্বা, নিচু বাড়ি। দু'ধারে বারান্দা, প্রবেশ পথ একটি। একদিকে একটি করিডোর। তার গায়ে ছোট ছোট অনেক ঘর। প্রতি ঘরে এককেটি পরিবার থাকে। যে পরিবারে মালিকের অনেক বউ, সেখানে একেক ঘরে একেক বউ নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। আগন্তুকরা ঢোকে পুবের দরজা দিয়ে। সহবৎ অনুযায়ী, সে আগে গিয়ে বসবে আগুনের কাছে। ক'মিনিট নিশ্চুপ থাকবে। তারপর তোমাকে দেওয়া হবে প্রথম ঘরটি। ওটিই অতিথি-গৃহ। এ ঘরে নিজস্ব শৌচালয়ও আছে। শুওরের খোঁয়াড়ের ওপরে। ঘরগুলো পরিষ্কার, বেশ গোছানো। নেফায় আসার পর এই প্রথম ডাঁশ মাছির কামড় খাইনি। যদিও যথেষ্ট ভিমরুল বা বোলতা ছিল। আমার মতো ঢ্যাঙা মানুষের অসুবিধা হ'ল, ছাত এত নিচু, যে বাড়ির ভিতরে নুয়ে নুয়ে চলতে হয়। আমার ঘরে সর্বদা লোকের ভিড়, ছেলে থেকে বুড়ো, ছোট মেয়ে থেকে বুড়ি। দুষ্প্রাপ্য কোনো মাছকে অ্যাকোআরিয়ামে রাখলে সে যত নিজের মতো একলা থাকতে পায়, আমার অবস্থা তারই মতো। মিশমিদের মধ্যে নিজের মতো একান্তে থাকার বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই রাতে আমাদের ঘিরে স্বামী-স্ত্রী সব জোড়ায় জোড়ায় শুয়ে থাকত, নিঃসংকোচে।

কিছু মিশমি এতই অলস, যে ওরা নিজের বাড়ির চারপাশের জমিও সাফ করে না। ফলে দরজা অবধি চলে আসে ঝোপ জঙ্গল। বাড়ির সামনে প্রায়ই দেখা যায় বড় সড় সমাধি গৃহ। উপরে ধ্বজাদণ্ড এবং উড়ন্ত ধ্বজা। ভিতরে দেওয়ালে পশুর মাথার খুলি সাজানো। শিকারে নিহত হোক বা আনুষ্ঠানিক ভোজে উৎসর্গিত হোক, প্রতিটি পশুর মাথার খুলি রাখা হয়। মিশমিরা প্রচলিত প্রথায় কখনো মুণ্ড-শিকার করে নি। ওরা চুল ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শিকারে যেত। কোনো শত্রুকে মারলে, তার ডানহাতের বুড়ো আঙুল 'যা খাওয়ার সময়ে কাজে লাগে,' সেটি কেটে নিত, আর এক গোছা চুল। বিজয়োল্লাসে এ সব নিয়ে ফিরত। বিশেষ উৎসবঅনুষ্ঠানের পর, দরজার মাথায় চুল ঝোলাত, সামনে বুড়ো আঙুলটি পুঁতে দিত।

প্রথম দশ দিন, এই তারাওন মিশমিদের মধ্যে কাটে। এরা নয়নশোভন ও সুদর্শন। ওদের বয়নশিল্প ভালো। আমি অনেক সুন্দর নমুনা কিনি। তামাক ভালবাসে। পুরুষ

ও নারী, সবার মুখেই লম্বা লম্বা পিতল বা রুপার পাইপ। নেফাতে ওরাই বলতে গেলে একমাত্র গোষ্ঠী, যারা উলকি পরে না, পানসুপারি খায় না, প্রায় সকলের দাঁতই ঝকঝকে সাদা।

পরের দশ দিন কাটে ইদু মিশমিদের মধ্যে। তারাওন এবং এদের বসতির মধ্যে পায়া নদী। এরা শক্তপোক্ত, যোদ্ধাসদৃশ গোষ্ঠী। প্রথম গ্রামটিতে কিছু বিব্রত হই। মনে হ'ল লোকজন তেমন বন্ধুবৎসল নয়। আমাদের দোভাষী মদে বেহুঁশ, জঙ্গলে পড়ে আছে। স্থানীয় দলপতি কাছে এল না। পরে অবশ্য অবস্থা পালটে যায়। তারাওনদের মতোই ইদুদের পছন্দ করতে শুরু করি। ওরা অনেকটা বাইগাদের মতো, খুব বন্য, ঝাঁকড়া চুলো, জঙ্গলেরই সন্তান। বিষমাখানো তীর আর আড় ধনুক গুলতি দিয়ে চেপে ছোঁড়ে, যেন গুলি মারছে। ওদের বয়নশৈলীও চমৎকার। অনেকদিন হাঁটতে হয়, এমন দূরত্ব থেকে সীমান্তে যাবার পথে ওরা একদল আমাদের তাঁবুতে এল। উৎকৃষ্ট গুণমানের কাপড়, নকশাও চমৎকার, তাই বেচতে চলেছে। অনেকে রংচঙে উলের জামা পরেছিল, তাতে অনেক ক্রুশ আঁটা। বিগত শতকে ফাদার ক্রিক এ দেখেই বিশ্বাস করেছিলেন, যে ওরা দীর্ঘকাল আগে ক্রীশ্চান হয়েছিল, আবার স্বধর্মে ফিরে এসেছে।

এ হ'ল বুনো হাতির রাজত্ব। ওরা মাঝে মাঝে মানুষ মারে, প্রায়ই শস্যহানি ঘটায়। তেজু হাসপাতালে একটি লোককে দেখি, দু'বছর আগে একটা হাতি ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। লোকটা তখনো আরোগ্য হয় নি। বুনো হাতি কাউকে মারলে, সে ব্যক্তি যায় সূর্যের দেশে। পাতালপুরীতে মৃতদের রাজত্বে যায় না। সূর্যের দেশে সবরকম আরামের ব্যবস্থা। তাই অমন মৃত্যু অপছন্দের নয়।

এক বছর লীলা আমার সঙ্গে এক লম্বা, কষ্টসাধ্য সফরে গেল খামলাং উপত্যকায়। তেজুতে বিদায় জানালেন পলিটিক্যাল অফিসার উমা শর্মা, খুব ভালো, অতীব সুজন, নম্র এবং সৌজন্যপূর্ণ। প্রথমটা গেলাম কয়েকটা খাম্‌প্‌তা গ্রাম দিয়ে। তারপর নিঃসঙ্গ উপত্যকা যা পাহাড় পানে উঠে গেছে।

খামলাং উপত্যকা বিরলবসতি। আর পুবদিকে ওয়াক্রো থেকে তুষাররেখা অবধি প্রায় অজানা অঞ্চলটি সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মিজু বা কামান মিশমিদের বিচ্ছিন্ন বিরলবসতি ওখানে। সমগ্র উপত্যকায় পঞ্চাশটিরও কম বাড়ি, আন্দাজ করলাম। সমগ্র জনসংখ্যা পাঁচশোই হবে। দুটো বাদে সব গ্রামই দেখেছিলাম। অধিকাংশ বসতিতে একটি থেকে চারটি বাড়ি। নেফাতে যত রাস্তা দেখেছি, তেমনই দুর্গম পথ। অধিকাংশ গ্রামই পাহাড়ের উপরে, লম্বা ও খাড়া চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। অঞ্চলটিকে বহুধা বিভক্ত করে বইছে অনেক নদী। বৃষ্টি নামলে তা পেরোতে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়।

কামান মিশমিরা ভালো লাগার মতো মানুষ। এ অঞ্চলে ওরা নিজস্ব সুন্দর

পোশাক ও অলঙ্কার ধরে রেখেছে, বড় সুন্দর দেখায় ওদের। ওদের বয়নশৈলী নেফাতে শ্রেষ্ঠতম একটি। অত্যাশ্চর্য বৈচিত্র্য তাতে। একই নকশার দুটি জিনিস কমই দেখেছি। ওদের কিংবদন্তী বলে, এসব নকশা ওরা প্রজাপতি-মাছ ও সাপের কাছে পেয়েছে, তাই নকল করেছে। অন্যান্য নকশায় বাড়ি, মানুষ, এমন কি এরোপ্লেনও দেখা যায়।

প্রথমে থামি চৌখামে। তারপর হাতি চেপে চললাম খামলাং উপত্যকার প্রবেশদ্বারে ওয়াক্রোর নির্জন আউট পোস্টে। যাত্রার প্রথমপর্ব ছিল নীরেস। তবে পথে একটি-দুটি বৌদ্ধ মন্দির দেখি। ভাঙাচোরা মন্দির, অবাক করা সুন্দর গুহা-রেখ-চিত্র।

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে মনে হল, তুলনারহিত অরণ্য বিস্তার। কুয়াশা ও মেঘে ঢাকা। তপন কুমার বরুয়া ছিলেন। উনি আমার সঙ্গে আরো সফরে গেছেন। ছিল সোমিয়া, এক চমৎকার মিশমি দোভাষী। বলে দেওয়া হয়েছিল যেহেতু গ্রামগুলো খুব ছোট, আমরা যেন তাঁবু নিয়ে যাই। হাতিগুলো ফেরত পাঠিয়ে পায়দলে চলা শুরু করলাম।

প্রথম গ্রামটির অভিজ্ঞতা নৈরাশ্যজনক। কোনো নিষেধ জারি ছিল। তাই ভিতরে যাওয়া বা কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও ছিল নিষিদ্ধ। বাইরে জঙ্গলে তাঁবু খাটালাম। রাতে বুনো হাতির বৃংহণ আমাদের ঘুমোতে দেয় নি। পরের গ্রামটি পাহাড়ে, উঁচুতে। তুষারশুভ্র পাহাড় ও নীল আকাশের অপূর্ব দৃশ্য। পাহাড়ের এক পাশে তাঁবু, বাকি তিন দিকের দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে। এখানকার মানুষজন বন্ধুবৎসল, অতি সুন্দর বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত।

এখানে লীলা শুরু করল ওর জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ। সকলকে স্নান করাবে। একটি ছোট জলপ্রপাত ও কুণ্ড ছিল। অসম্ভব নোংরা একপাল ছেলেমেয়ে ও জোগাড় করল, শুরু হল সাবান ঘষা ও রগড়ানো। সত্বর একটু বড় ছেলে মেয়েরাও এল। পরে একটি ছেলে বলল, অভিজ্ঞতাটা জবর বটে, তবে ও এর পুনরাবৃত্তি চায় না।

আমরা উপত্যকার প্রত্যন্ত অবধি গেলাম। গেলাম ততদূর, যতদূর মানুষজন দেখা যায়। তারপর নদী পেরোলাম। পথে লীলা চলল মানুষজনকে স্নান করাতে করাতে এবং মাছ ধরতে ধরতে। চমৎকার ছোট ছোট মাছ ধরেছিল যেখানেই যাই। গলগণ্ড দেখেছি। আগে যা দেখেছি, তার চেয়ে এখানকার মিশমিরা অনেক গরিব।

গ্লাও গ্রামে পাহাড় ঘেরা এক চমৎকার হ্রদ দেখি। এখন আমার নিজেকে বেশ সাহসী বীর মনে হচ্ছিল। আমাদের আগে এখানে কেউ এসেছে, তার কোনো নিশানা নেই। কিন্তু গ্লাও গিয়ে জানা গেল, কিংডন-ওআর্ড, অনেক আগে এক সপ্তাহ ওখানে ছিলেন। বস্তুত কিছু অতীব আরণ্য জায়গায় যাওয়া সত্ত্বেও, নেফায় আমায় নিজেকে

কখনোই বীর মনে হয় নি। হয় কিংডন-ওআর্ড, নয়তো পিটার জেমসের কাছে হেরে গেছি। পিটার খুব জনপ্রিয় পলিটিকাল অফিসার ছিলেন একদা, এখন আছেন চা বাগানে।

উত্তর সিয়াং-এ যেখানেই গেছি, যত পাহাড়ে ভেঙেছি, সর্বত্র শুনেছি আবোরদের মুখে জেম্‌স মিগামের নাম। ইনি আমার আগে ওখানে যান। শুধু তাই নয়, উনি অনেক ভালো ছিলেন। ওরা স্পষ্ট গলায় বলত, "জেমস মিগান আমাদের একটা মিথুন দেন। জেম্‌স মিগান সারারাত নাচতেন। যত ভুতের মদ দিতাম খেয়ে নিতেন।" আমাকে বলতেই হ'ল, আমি জেম্‌স মিগান তো নই, ওঁর সঙ্গে সমানতালে চলতে পারব না।

গ্লাও-এর হ্রদে অনেক মাছ। মিশমিরা মাছ ধরতে রাজিই নয়। এগারো বছর আগে দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে ভেলা চেপে মাছ ধরতে যায়। ওরা আর ফিরে আসে নি। বলা হয় হ্রদের দেবী ওদের জলের নিচে টেনে নেন।

মানুষের প্রয়োজন কী, তা দেখা ছাড়াও আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁতবস্ত্র আহরণে, এবং বয়ন-নকশার অর্থ উদ্‌ঘাটনে। কাজটা সহজ নয়। কামান মিশমিরা মন খুলে তথ্য জানাতে চায় না। তবে সবাই বলল, যদি লেগে থাকি, আমি এ বিষয়ে পরম জ্ঞানী এক বুড়ো মিশমিকে পাব, সে সব জানে। শেষ অবধি যখন তাঁকে পেলাম, তখন তো আমি রোমাঞ্চিত। ছোট নোটখাতাটি বাগিয়ে ধরে সহকারীদের সঙ্গে ওকে সম্ভাষণ জানাতে ছুটলাম। কপাল মন্দ! লোকটি বোবা এবং কালা।

বলতে লজ্জা হচ্ছে, একবার মাত্র বিমান যোগে আমি লোহিত যাই। ক্ষেমলাল রাঠি সঙ্গে ছিলেন। সফরও খুব জমেছিল। জোরহাট থেকে যেতে হয় তেজু। অনেক চা-বাগান থাকে নিচে। কি সুন্দর সাজানো তার নকশা। মনে হয়, দাবাখেলার ছক যেন। যথেষ্ট ওপর থেকে তেজু পেরিয়ে হাইয়ুলিয়াং-এ লোহিত উপত্যকায় খাড়াই ধরে উঠলাম। আমরা চলছি, দৃশ্য সুন্দর থেকে সুন্দরতর হচ্ছে। বেশি বেশি তুষারঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। হাইয়ুলিয়াং থেকে চ্যাংউইন্‌টি-র পথ তেমন দুর্গম নয়। ভাবছিলাম, যদি আকাশ পথে না যেতাম,— পথ ধরে হাঁটতাম, লোকজনের সঙ্গে মিশতাম, কত ভালো হত। না হয় নিসর্গশোভা দেখা হত না। চ্যাংউইন্‌টি পেরিয়ে গেলাম। সামনে জনশূন্য উপত্যকা, যে উপত্যকা দিগন্তের তুষারে মিশে গেছে। তারপর ফিরলাম ওয়ালং এবং কিবিথুর দিকে। ওয়ালং-এ অবতরণ বিপজ্জনক। একবার মনে হল আমরা সিধা চলে যাচ্ছি পাহাড়ের গায়ে। বিমান থেকে জিনিসপত্র ফেলার জন্য এই এয়ারস্ট্রিপ ব্যবহার হয়েছে। চারদিকে গর্ত। যখন নামলাম, তখন ক্যাঙারুর মতো লাফাচ্ছি। আবার উড়ব কি করে, সে আশঙ্কা ছিল। তবে এঞ্জিন 'রেভ' করে সিধা উপরে উঠে গেলাম।

ছয়

তিরাপে গেলাম

নেফা ডিভিশনের সবচেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব তিরাপে আমি অনেকবার গেছি। দুটো সফর মনে থাকবে খুব। ফি বার চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম। গিয়েছিলাম তেমন এলাকায়, যেখানে সেসময়ে কমজনই গেছে ও দেখেছে। ১৯৫৪-এর নভেম্বরে ওয়ান্‌চো অঞ্চলে প্রথম যাই। সর্বত্রই উষ্ণ অভিনন্দন ও আতিথ্য মেলে। যদিও এ সব গ্রামের কয়েকটিতে দীর্ঘকাল কেউ আসে নি। আমার আগমন নিয়ে পোমাউ-এ এক গান গাওয়া হ'ল :

যে সাহেব থাকে শিলং-এ
ময়না পাখির মতো উড়ে এসেছে এই উঁচু পাহাড়ে
আমাদের গ্রামে বসেছে এক গাছের ডালে
আমাদের মন খুশিতে ভরপুর
বড় নদী থেকে ছোট নদীতে মাছ যেমন উজিয়ে আসে
সমতল থেকে সাহেব তেমনি এসেছে উঁচু পাহাড়ে।
আমাদের মন খুশিতে ভরপুর।।

সে-সময়ে যদিও কম লোকই গেছে ওয়ান্‌চো পাহাড়ে, নিকটবর্তী ওয়ান্‌চোরা নিজেরা শতখানেক বছর ধরে সমতলে যাচ্ছে। বর্তমানে নাগাল্যান্ডের অংশ। প্রতিবেশী অঞ্চল তুয়েন সাং-এর চেয়ে এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বেশি হয়েছে। যতটা হতে পারত, ততটা না হলেও পোশাক কিছুটা বদলে গেছে। অনেক পুরুষ পরে কালো কোট, অনেক মেয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, চমৎকার হাত-তাঁতে বোনা স্কার্ট ছেড়ে কিছুটা চওড়া, নোংরা মিলের কাপড় পরছে। কিন্তু অভ্যন্তর এলাকায় ওরা নিজেদের ঐতিহ্যমতো অতি সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কার পরে। অধিকাংশ তরুণ তরুণী নগ্নদেহ। শুধু মাথায় শিরোভূষণ এবং ফুল। বহির্জগতের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার ফলে এরা শরীর সচেতন হয়েছে। যখন একটি গ্রামে ঢুকলাম, মেয়েরা তো বটেই, কিছু পুরুষও মাথা থেকে পা অবধি বিছানার চাদরে মুড়ে তবে সামনে এল। লংফোং-এ মেয়েরা মাথা এবং মুখও ঢেকে রাখল। চোখদুটো শুধু দেখা যাচ্ছে। যেন আরব দেশে আছি। এ অভ্যাস শুধু অসুন্দর নয়, এই আত্মসচেতনতার নৈতিক প্রভাব ভালো হতে পারে না।

অনেক অদ্ভুত বেখাপ্পা ব্যাপার দেখেছি। চমৎকার পুঁতির মালার উপর একটা ট্রিল্‌বি টুপি। ওয়ান্‌চো পুরুষরা মাথার পিছনে কিছু একটা লাগায়। সেটার ওপর দিয়ে চুল জড়ায়। প্রথামতে এটা একটুকরো কাঠ। কাঠের ওপর মানুষের মাথা বা

অন্য কারুকার্য খোদাই করা। কোনো যোদ্ধা হলে কাঠটি মানুষের হাতের মতো হয়। নইলে তাতে নানান জ্যামিতিক নকশা, তাও না থাকলে উজ্জ্বল রঙে চিত্রায়িত। প্রথাটা রয়ে গেছে। কিন্তু এখন পুরনো টর্চ, টেবিলচামচ, পেনসিল, এসবও ব্যবহৃত হয়। কানের গহনা কার্তুজ, তার মুখে আয়না লাগানো। একটি ছেলে, কানের গয়না খুলে আয়না দেখে চুল আঁচড়াল, আবার ওটা কানে পরল, দেখতে কৌতুকবোধ হয়। দীর্ঘকাল আগে যে ওয়ান্‌চো যোদ্ধারা নরমুণ্ড শিকার করেছে, আজও গলার পরে পিতল বা কাঠের মুণ্ডমালা। দু'বার দেখেছি, একটি বড় পিতলের মাথার দু'দিকে গোলাপি প্লাস্টিকের মাথা। বাজারে কেনা পুতুলের মুণ্ডু ছিঁড়ে লাগানো। দেখতে অতীব ভয়ংকর।

লান্‌কাও-এ একটি বাড়িতে দেখেছি, রেলের টিকিটের মালা ঝুলছে। দূরের বাজারে যাওয়ার দুঃসাহসী কাজের স্মারক ওগুলো। সেনুয়া গ্রামের দলপতির গৃহসজ্জায় ছিল বানরের থাবার মালা, সারস পাখির ঠোঁটের মালা এবং পুরনো টর্চের বাতিল ব্যাটারি।

ওয়ান্‌চো-দের প্রচণ্ড চা- আসক্তি। ওরা শুনেছে, চা কেটলিতে বানানো হয়। তাই ওরা নিষ্ঠা ভরে বাঁশের চোঙা থেকে কেটলিতে জল ঢালে। চা-পাতা ঢালে আরেকটা বাঁশের চোঙায়। কেটলির গরম জল ঢালে বাঁশে। বাঁশটা গরম করা হয়। সিদ্ধ করা কালো চা, দুধ বা চিনি ছাড়া পান করা হয়।

আবার, ভাতের মদ বানায় বটে, কিন্তু পানের ব্যাপারে খুব সংযমী। একটিও মাতাল পুরুষ দেখিনি। এক মাস ছিলাম। প্রচুর মদ খেয়েছে, এমন একজনকেও দেখিনি। কিন্তু অনেকেই আপিম টানত। অনেক ছোট ছোট পপি ফুলের বাগিচা দেখেছি। অনেক জায়গায় প্রতি বাড়িতে ফেস্টুনের মতো গাঁজা ঝুলছে। শুকোনো হচ্ছে। বয়স্করা তরুণদের আপিম ছাড়াবার চেষ্টা করে, নিজেরা ও নেশা ছেড়ে কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে না। পরে প্রশাসন, আপিমের অভ্যাস কমাতে অনেক প্রচারকার্য চালিয়েছে।

তিরাপের ওয়ানচো পাহাড়ে প্রথম সফরের স্মৃতিতে আছে, পরিষ্কার খোলামেলা এলাকায় কঠিন খাড়াই পথে ওঠা,— সেখানে বড় বড় নেড়া পাহাড় বাতাসে ধুয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ওয়ান্‌চো গ্রাম পাহাড়চুড়োয় তিন হাজার ফিট উঁচুতে। প্রতিটি যাত্রাকালে আমাদের উৎরাই বেয়ে নিচের উপত্যকায় নামতে হত; পাঁচ থেকে দশ মাইল পাহাড়ের পাদভূমিতে হাঁটতে হ'ত; তারপর চড়াই ভেঙে ওঠো। আমরা খু-ব ক্লান্ত। কিন্তু তিন হাজার ফুট উঠলে তবে আরেকটা গ্রাম। তবে অঞ্চল নিসর্গ মাহিমাময় চোখ ঝলসানো। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে দেখা যাবে, ভ্রমণসূচীটা যেন ম্যাপের মতো প্রকল্পিত আছে। যে সব গ্রামে যাওয়া হবে, তার ধূসর ছাতগুলি আশপাশের পাহাড়ের ওপর চাক বেঁধে আছে।

কয়েকটা গ্রাম কিঞ্চিৎ বিবর্ণ। তবে দুটো গ্রামের কথা, প্রথমটি হ'ল সেনুয়া। আমার সৌভাগ্য, ওয়ানচোরা যখন মেয়েকে পতিগৃহে পাঠায়, সে অনুষ্ঠান দেখতে পেয়েছিলাম। একদল তরুণতরুণী ওকে নিতে এসেছে, বেজায় সেজেগুজে। কমলারঙা পুঁতির শিরোবন্ধনী, উজ্জ্বলরঙা কাপড়। চুলে দুলছে পালক ও ফুল। কনেটি ফুটফুটে সুন্দরী, ছোটখাট। চমৎকার শিরোভূষণ মাথায়, খুশিতে ঝলমল করছে। সবাই বলল, মেয়ে ভাগ্যিমানী। হবু স্বামীর সঙ্গে শয্যায় মিলন হয়েছে। তাই অচেনা কোনো বরের ঘরে যাচ্ছে না। দেখলাম মেয়েটি গয়না পরছে, বন্ধুরা ছোট ছোট মোড়কে উপহার দিচ্ছে। শেষে বেরোল এক লম্বা মিছিল। সামনে দুই বৃদ্ধা, তারপর কনে। আর লম্বা সার বেঁধে নিত্-কনেরা।

আরেকটি সুন্দর গ্রাম লোংকাও। এ গ্রামের অকলুষ নিষ্পাপতা আমাকে মুগ্ধ করে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের পরনে সুতো বলতে নেই। তারা সে বিষয়ে এতটুকু সংকুচিত নয়। মোরাংটি ছিল সুপরিসর, আরামদায়ক ও পরিষ্কার। রাতদিন ঘিরে থাকত শিশুরা, বালক বালিকারা, তরুণ-তরুণীরা। অনেকের চেহারা চোখকে কাড়ে। সারাদিন ওরা আমার তাঁবু ঘিরে, তাঁবুর ভিতরেও খেলা করত। মোটা লতা নিয়ে দড়ি টানাটানি খেলত। প্রচণ্ড উদ্যম, উত্তেজনায় জোর চিৎকার। ক'জন গান গেয়ে গেয়ে এক পায়ে নেচে বেড়াত। ছোট্ট শিশুরা ভারী সুন্দর। ওদের হাতে পিতলের ব্রেসলেট, বেতের বাজুবন্ধ আর কানে ঝুলছে কাঠবিড়ালীর লেজ। ওয়ান্চো দেশ জুড়ে বড় বড় দলপতিদের শিশুদের চরিত্র অসামান্য। যা আগেও দেখেছি অন্যত্র, এখানে তা চমক লাগায়। শিশুদের কান্না বলতে গেলে শুনি নি। ওরা খুবই শক্তপোক্ত, লড়াই করে, এ-ওর চুল ছেঁড়ে, ধুলোয় গড়ায়, দড়ি টানাটানি খেলায় ওদের হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, মাটিতে পড়ে মাথা ঠুকে যায়। কিন্তু কাঁদে না। মনে আছে, পিঠে বাচ্চা বাঁধা দুটো ছেলে লড়ছে। বাচ্চাগুলো ভয়ে চেঁচাচ্ছে।

এই মনোহরণ গ্রামে শেষদিন এক বিশাল নাচ হয়। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। বজ্র নির্ঘোষে দামামা বাজছে। পুরো সকালটা ছেলেরা নিজেদের বিশেষ সাজসজ্জায় ব্যস্ত থাকল। দুপুরে শুরু হ'ল নাচ। পুরনো দিনে ওরা মুণ্ড শিকার করত। ওরা পিছন ফিরে সেই অতীতের দিকে চায়, যখন ওরা সাচ্চা মরদ ছিল। সেই অতীতের দিনের স্বাদ এই নাচের মধ্য দিয়ে ফিরে পেতে চায়। নাচ ওদের নিয়ে যাবে সেই অতীতে। তিনদল সশস্ত্র ওয়ান্চো দারুণ সেজেগুজে চারপাশের জঙ্গল থেকে গুড়ি মেরে বেরোল। পাহারা দেবার লোক রাখল। এগোল, পেছোল, তারপর এগিয়ে বন্দুক ছুঁড়ল। একজন পেল একটি কাঠের নরমুণ্ড, সেটি ঝুড়িতে রাখল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিতে দিতে। এরপর এরা মস্ত বড় বৃত্তে দাঁড়িয়ে নাচ শুরু করল। দৌড়াচ্ছে, বন্দুক তুলে দেখাচ্ছে, বর্শা তুলছে উপরে। আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছেলেরা মাঝেমাঝে বন্দুক ছুঁড়ছে, যাতে আমি চমকে লাফিয়ে উঠি। এতে সবাই খুব মজা পাচ্ছিল। আমি হয়তো অন্যদের চেয়ে কম মজা পাচ্ছিলাম।

পরে, (সঙ্গে কুমার ছিল) আমি আরেকটা লম্বা সফরে বেরোই। পাটকোই পর্বতমালার ভয়ংকর ঢাল বেয়ে উপরে ওয়াক্কা অবধি যাই। তারপর লাজু অতিক্রম করে হাতুত্ নোট্‌কে অঞ্চল এবং টাংসা গ্রামে যাই। পরবর্তীকালে, প্রায় আয়ত্তাসাধ্য বিপদবাধা সত্ত্বেও ওখানে চমৎকার রাস্তা বানানো হয়েছে। আমার সফরের সময়ে গাড়িটাড়ি ছিল না। হাঁটতে বাধ্য হই, তাতে আমার উপকারই হয়।

প্রথমে যাই নোক্‌টে-দের দেশে। নোক্‌টেরা খানিকটা অন্-আদিবাসী হয়ে গেছে। বহু শতাব্দী ধরে সমতলের সঙ্গে ওদের সংযোগ। পোশাক-আসাক অতি বিচ্ছিরি। কিন্তু গ্রামগুলি অন্যান্য গ্রামের মতোই মনোহারী। গ্রাম পাহারার বাড়ি, বা মোরাং-এ মানুষের মাথার খুলি সাজানো। যেদিন মুণ্ড শিকার ছিল এদের প্রধান কাজ, এ সেইদিনের ভয়াল স্মারক। এছাড়া আছে পাথরের খাম্বা— অতীত দিনের যুদ্ধগুলির স্মরণচিহ্ন।

নোক্‌টে এলাকা পেরিয়ে খুব খাড়া ও কঠিন পাহাড় পেরোলাম আট মাইল হেঁটে। পৌঁছলাম লোংখাই। চলে এলাম এক অন্য জগতে। সুদূরবাসী ওয়ান্‌চো-দের সুন্দর বর্ণোচ্ছল জগতে। এখন ট্রিলভি হ্যাট, নোংরা গেঞ্জি আর নোংরা শর্ট্‌স, 'সভ্যতার'র শোচনীয় উচ্ছিষ্টের বদলে আমরা পেলাম দোলায়মান পালক, যে নগ্নতা আবরণের অধিক, বাদামী চামড়ায় সেই শোভন নগ্নতা, অলঙ্কার, হাত-তাঁতে বোনা কাপড়, চকচকে পিতলের কোমরবন্ধ এবং চতুর্দিকে সুন্দরতম নিসর্গের পট।

এ হ'ল মহান দলপতিদের দেশ। এদের আছে বিশাল বিশাল বাড়ি। অন্দর যার অন্ধকার, অনেক স্ত্রী। অনেক সহচরী এবং সেই মানুষেরা, যার দাস নয়। মাথাটা নেড়া রাখতে হয় শুধু।

তিরাপ্-এর কোথাও কোথাও আমি স্বাধীন ভারতের প্রচলিত সম্ভাষণ, 'জয় হিন্দ' শুনেছি। সরল আদিবাসী যাদের বিশিষ্ট লোক মনে করে, তাদের বেলা 'জয় হিন্দ' শব্দটি বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করে। শিলং বা দিল্লী থেকে কেউ এলেন, মানুষ শুধোবে, 'জয় হিন্দ্ এসেছেন কি?' অথবা বলবে, 'দয়া করে এটা জয় হিন্দ্‌কে বোলো।' আমার মনে হয়, 'সাহেব'-এর চেয়ে এ শব্দটি সন্তোষজনক।

যতই এগোই অঞ্চলটি আদিম থেকেও আদিমতর হতে থাকে। শেষে পৌঁছই ভারত ও বর্মাকে বিভাজনকারী পাট্‌কোই গিরিমালায়।

প্রায় তিনসপ্তাহ ধরে পাহাড়ের ঢাল ধরে হাঁটলাম। পাটকোই পাহাড় আট থেকে নয় হাজার ফুট উঁচু।

আকাশের পটে যেন এক ভীষণ, দৃঢ়সংকল্প প্রাকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময়ের প্রায় সর্বক্ষণই পাহাড় আবৃত ছিল মেঘ ও কুয়াশায়। লাগাবাঁধা সূর্যের দেখা নেই, বাতাসে আক্রোশের ছোবল, জীবন যেন দুঃসহ। আরামের অভাব তত মন দমিয়ে দেয় নি। এমন আবহাওয়ায় মানুষজন যে ময়লা চাদর জড়িয়ে হতাশ মুখে বসে থাকছে, তাতে মন বেশি দমে যায়।

কখনো ভুলব না সেই নিঃসঙ্গ, জনশূন্য, বিদ্বেষী পাহাড়ের কথা। কিছু দূরে দূরে পাহাড়ের দুরারোহ একেকটি শাখা নেমে এসেছে তিরাপ নদী অবধি। উপত্যকা সকল ওই মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে প্রাকার অবধি উঠে গেছে। কখনো রোদ পড়তে দেখিনি। তেমন এক উপত্যকার উপর ঝুঁকে আছে একটি গ্রাম। সেটি এক জঙ্গল আবৃত পর্বতশাখার উপরে, যেন 'ড্রাকুলা' বই থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবাই যে নামে ভয় পায় এ সেই রাংপাং-দের কিংবদন্তী গ্রাম। ওরা বিশ বছর আগেও নরবলি দিত ইতিশ্রুত। আমরা গেলাম ওখানে। দেখলাম ওরা শান্ত ও অমায়িক। তবে অতীত ইতিহাস আলোচনা করার সময়ে বেশ সতর্ক।

সফরের শেষ অধ্যায়ে যাই তাংসা পাহাড়ে। 'তাংসা' শব্দের অর্থ 'বর্মার সন্তানসন্ততি'। বর্মা থেকে অভিবাসী হয়ে চলে আসার ইতিহাস এদের আছে। চেহারাতেও ব্রহ্মদেশীয় ছাপ। চুল বাঁধে মাথার উপর, যে সারোং বা লুঙ্গি পরে, তার সঙ্গে স্কটল্যান্ডের পশমি উত্তরীয়ের মিল আছে। ওদের সাহচর্যের সময়কাল খুবই উপভোগ করেছি।

লম্বা সফর, বিচিত্র তার আকর্ষণ। অনেক কিছুতে পৃথক। সমতলের কাছের লোক্‌তেরা আধুনিক; তারপর ভালোবাসার মতো ওয়ান্‌চোরা বর্ণোজ্জ্বল, ঝলমলে, বাঁচার আনন্দে উচ্ছল; হাতুত মিত্রসঙ্ঘের লোকরা আপিমখোর, হৃতদরিদ্র; তাংসারা সুদর্শন, চিত্রোপম।

কয়েকটি সীমান্ত গ্রামে লোকজনের টাকার বিষয়ে আগ্রহ নেই। এখানে বিনিময় প্রথায় দরকারি জিনিস জোগাড় করতে হ'ত। একটা ডিমের বদলে এক বাক্স দেশলাই; একটা পুঁতির মালা। অথবা আটশো চল্লিশ গজ সুতোর ফেটির বদলে একটা মুরগি; চা-পাতার বদলে চাল। কুমার এ কাজে বিশেষ দক্ষ। এক সময়ে ও রীতিমতো দোকান চালাত। সেখানে আমাদের মিউজিয়ামে রাখার নমুনা জোগাড় করতাম। মানুষ তো টাকার বদলে ও সব দিত না।

১৬০ মাইল ব্যাপী লম্বা সফর। শেষের দিকে আমরা ক্লান্ত হয়েও পড়েছিলাম। শেষদুটো সফরে হেঁটেছি বৃষ্টিতে ভিজে। শেষে পৌঁছই চ্যাংল্যাং-এ। জায়গাটা রাস্তার ওপর। আমাদের একটা উন্নয়ন কেন্দ্রও আছে। চমৎকার হাল তার। যেমন স্যাঁৎসেঁতে, তেমনি ধুলো। সব সাফসুতরো করে শান্তিতে রাত কাটাবার উদ্যোগ করছি, শুনলাম গাড়ির হর্ন। এতগুলো সপ্তাহের পর, কি চমৎকার সে আওয়াজ। মনে আছে, বনেটে চুমো খেলাম। পুরুষোচিত কড়া চুমো। গাড়ি থেকে নামল লীলা আর ক্ষেমলাল রাথী। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ওরা এসেছে ল্যান্ড রোভারে। ঝটপট জিনিস গোছানো হ'ল। সূর্যাস্তের সময়ে আমরা বহুৎ ঘোরানো এক পথে নামলাম, যার মাঝে মাঝে বিপজ্জনক 'ইউ' বাঁক। পেসাম মারঘেরিটা, তারপর শিলং।

সাত

নেফার পর্বতাঞ্চলে সফর

উত্তর-পূর্ব ভারতে এসব, এবং অন্যান্য সফরে আমি মোটামুটি দু'হাজার মাইল ঘুরেছি। আন্দাজ আড়াইশো মাইল গেছি হাতি বা টাট্টুঘোড়া চেপে বাকিটা পায়ে হেঁটেছি। এ জন্য যে শারীরিক শ্রম দরকার, মাঝে মাঝে সেটা কড়া ডোজে হয়ে যেত। কেননা সে সময়ে আমার বয়স বাহান্ন থেকে সাতান্ন। যদিও আমি উচ্চারোহণ ভালবাসি, আমি ব্যায়ামবীর নই। কখনো ভেবেছি, যখন ত্রিশ বছর বয়স; তখন যদি নেফায় আসতাম,— এই বেশি বয়সের বছরগুলো কাটাতাম ওড়িশা বা বাস্তারের সহজসাধ্য পাহাড়ে! তবু, তা যদি করতাম, তাহ'লে মধ্যভারতের আদিবাসীদের বিষয়ে বইগুলি লেখাই হ'ত না। কেননা শীঘ্রই ওরা বদলে যায়।

নেফাতে নিরন্তর চলতে হ'ত। ওড়িশায় এক গ্রামে, একসঙ্গে দীর্ঘকাল থাকতে পেরেছি। এখানে তেমন থাকা কঠিন। জিনিসপত্র এবং কুলি, এসব জোগাড় করা কঠিন। সব খুঁটিয়ে দেখব, এমতো অনুসন্ধিৎসা তো আমার ছিলই। বরাবর 'অদৃশ্য মানুষ' হতে চেষ্টা করেছি। এ কাজও কঠিন ছিল। এখানে আমি সরকারি লোক তো বটেই, এক প্রবীণ সরকারি অফিসিয়াল। আমাকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়িও করা হ'ত। আমি ছিলাম এক আজব বস্তু, সবাই দেখতে চাইত আমাকে।

এমন লম্বা সফরের মানে, লীলা ও ছেলেদের পিছনে রেখে চলে যাওয়া। আমার প্রথম সফর তুয়েনসাং-এ সাত সপ্তাহের। এতে লীলার খুব কষ্ট হয়। আমরা সবে এসেছি শিলং-এ, তখন ওর তেমন বন্ধুও ছিল না। ফিরে এসে দেখি ও অসুস্থ এবং দুর্বল। ওর যে এমন হাল, এ খবরটুকুও আমাকে দেয় নি কেউ।

এক বিচক্ষণ ও প্রাচীন ফরেস্ট অফিসার আমাকে বহুদিন আগে যা বলেন, সেই দরকারি ব্যাপারটা শিখলাম এই সব সফর থেকে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার অধীনস্থ কর্মীদের কেউ যদি ট্যুরে থাকে, অথবা নির্জন জায়গায় কারো একার পোস্টিং হয়, আমি কখনো তাকে তিরস্কার করে কিছু লিখি না।' আর সকলের মতো আমিও মাঝে মাঝে অশান্তিকর চিঠি পেয়েছি যখন একলা ঘুরছি। খুব বিচলিত হয়েছি। অত বিচলিত হতাম না, যদি তেমন বন্ধুদের কাছে পেতাম, যারা ব্যাপারটা জানে। ওদের সঙ্গে আলোচনা করতাম। নিঃসঙ্গ একলা থাকার এ এক বিপদ। যদি কোনো প্রশাসক দেখেন, যে তাঁর অধীনস্থ এক কর্মীকে আড়ংধোলাই দেওয়া উচিত,— সে কাজ করার জন্য ততক্ষণ সবুর করা উচিত, যখন সে তাঁর কাছে সদর অফিসে এসেছে। বিচ্ছিন্ন একাকিত্বে সব কিছুই বড় মর্মবেধী হয়।

নেফার এ সব সফর খুব উপভোগ করেছি। অনেক শিখেছি তা থেকে। তাওআয়াং যাবার পথে পাহাড়ের সৌন্দর্য আমাকে যেন শুদ্ধ করেছিল, শক্তি দিয়েছিল। মানুষজনের নম্রতা ও শান্ত স্বভাব আমাকে পরিপ্লুত করেছিল। তবে মনে

হয়, যে কোনো অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীর তুলনায় তাগিন্‌রা আমাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। আদিবাসীদের ভালবাসা, ওদের জেনে মুগ্ধ হওয়া এতই স্বাভাবিক,—যে আমি ওদের 'রোমান্টিসাইজ' করেছি সর্বদা। কিন্তু তাগিন্‌দের মধ্যে শূন্যতা ও দারিদ্র ছাড়া যেন কিছু নেই। গান্ধী দরিদ্রনারায়ণের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। তিনি দরিদ্রের দেবতা। আবার সেই দেবতাই অবস্থান করেন প্রতি দরিদ্রের মাঝে। তাই দবিদ্রসেবা করলেই তাঁকেও পূজা করা হয়। দরিদ্রনারায়ণ সৌন্দর্য ও বিমুগ্ধতার দেবতা হিসাবে আবির্ভূত হন। কিন্তু তাগিনদের মধ্যে তিনি অনশনক্লিষ্ট বুদ্ধ, অথবা 'ইসাইয়ার যন্ত্রণাকাতর সেবক'-এর রূপ পরিগ্রহ করেছেন। যাঁর মধ্যে, তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করি, এমন কোন সৌন্দর্য নেই।

আমাদের মতো রোমান্টিকদের কত কি শেখার আছে! যারা ধনী এবং সফল তাদের জন্য সহানুভূতি, কেননা ওরা প্রায়শই অসুখী; যারা খুব বাঁধাধরা পথে চলে, খুবই মাটো মানুষ, তাদের ভালবাসা এবং তাদের যত্ন নেওয়া দরকার; যারা কুৎসিত ও ভোঁতাবুদ্ধি, তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমার পক্ষে এ ছিল এক কঠোর শিক্ষা। কেননা, আমার কবি মন আনন্দ পায় অচেনা অজানা ও বিস্ময় জাগানো অভিজ্ঞতায়। সৌন্দর্য আমাকে এমন টানে, যে একগাছা চুলে বেঁধে টানলেও আমি চলে যাব।

দশম অধ্যায়

একটি 'দর্শন'-এর পরিণত হয়ে ওঠা

'মন খুলে আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে
বড় আর কোন্ আশীর্বাদ পেতে পারে মানুষ?'

—এডমাণ্ড স্পেন্সার

এক

যখন আমি আর শামরাও মৈকাল পাহাড়ে প্রথম বসত করি, কারো কাজে লাগি এমন কিছুই আমাদের জানা ছিল না। শামরাও কিছু অষুধ বিষুধ জানত। আমি উদ্যান রচনা বিষয়ে সামান্য জানতাম। কিন্তু মুরগি পালন বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের উৎস ছিল পি. জি. ওডহাউসের বই 'লাভ্ অ্যামাং দি চিকেন্স।'

বাস্তবতা বিষয়ে কেজোকর্মা জ্ঞানের অভিজ্ঞতা আমাদের ওই রকমই। সে সময়ে কোনো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল না, ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়নের বড় বড় প্রকল্পও ছিল না। যে সামান্য সংখ্যক সমাজসেবী ছিলেন, যাঁরা আদিবাসী বিষয়ে বিশেষত, তাঁরা প্রধানত স্কুল এবং ডিস্পেন্সারি খোলার কথাই ভাবতেন।

আমাদের প্রথম ধারণাটি ছিল অতীন্দ্রিয়, বস্তুবাদী নয়। যদিও আদর্শটি বাস্তববাদী কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করব বলে আশা রাখতাম। আমরা ভাবতাম, আদিবাসীদের সঙ্গে বসবাস করলে,— যতদূর সাধ্য, ওদের জীবনে জীবন মেলালে,— খানিকটা ওদের দুঃখ বঞ্চনার ভাগ নিলে,— এক পাষাণ-হৃদয় পৃথিবী ওদের প্রতি যে দীর্ঘ অবহেলা ও দুর্ব্যবহার করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। 'মানবতার সামগ্রিক সঞ্চার'-এর অঙ্গ হয়ে ওঠার এ এক পন্থা। দরিদ্রতম গোণ্ডদের সঙ্গে, ওদের স্তরের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে চলা সম্ভব ছিল না। একটা হাতঘড়ি, একটা ঝরনাকলম ওদের অনেক দূরে সরিয়ে দিত। অপরপক্ষে, আমরা ক'দিন লোক দেখিয়ে নয়, দীর্ঘকাল ধরে ওদের মতো ঘরেই থেকেছি সাদাসিধা ভাবে। সমান উদ্বেগে ভুগেছি, ওদের মতোই আমাদের ওপরেও সরকারি কর্মচারীরা নিপীড়ন চালিয়েছে,— একেবারে গ্রামীণ নিয়মে ভুগেছি ম্যালেরিয়ায়। মনে হয়েছিল, ওদের সঙ্গে নিজেদের এক করে ফেলতে এ সব ছোট ছোট চেষ্টাও সদর্থক হবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যে হাজার হাজার আদিবাসীর হৃদয় স্পর্শ করা গিয়েছিল। ওরা বুঝেছিল আমরা বাস্তবজ্ঞানরহিত, তবু ওদের কথা ভাবি, ওদের স্নেহ করি।

১৯৬৩ সালে লীলা এল্যুইন

তিব্বতীয় ফ্রন্টিয়ারে কুমার

অশোক ও রানি

অন্তত মনস্তাত্ত্বিক স্তরে আমরা এক নতুন চেতনা, নতুন আশা জাগিয়েছিলাম। যখন যাই, তখন ওরা অতীব দমিত ও নিরাশ্বাস ছিল।

এতেই অবশ্য ক্ষান্ত দিই নি। স্কুল খুলি, একটি ডিসপেনসারি। সেখানে পরে শামরাও দারুণ খ্যাতি লাভ করে। পঞ্চাশ কেন, একশো মাইল পথ হেঁটে মানুষ ওকে দেখাতে আসত। ঝগড়াঝাঁটি বাধলে মিটমাট করিয়ে,— সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে ঝামেলা বাধলে ওদের সাহায্য করে,— ওদের আদালতে তুললে পরামর্শ দিয়ে,— আমরা বহু মানুষকে সাহায্য করেছিলাম। যেটুকু সাধ্য, সেটুকু করতাম। ধীরে ধীরে গ্রামজীবনে প্রকৃত কী প্রয়োজন, তা শিখতে থাকলাম।

একটি কাজ ছিল আমাদের কাছে খুব মূল্যবান। ছোট্ট হলেও একটি কুষ্ঠাশ্রম খুললাম। সে সময়ে কুষ্ঠ চিকিৎসায় জন্য পাওয়া যেত চালমুগরার তেল, তবে তাতে তেমন কাজ হ'ত না। তবে আমরা ভেবেছিলাম, একটা জায়গা তো তৈরি করা যাবে, যেখানে এই হতভাগ্যরা মোটামুটি স্বাচ্ছন্দে, নিরাপদ থাকতে পারবে। আর, এক জায়গায় ওদের রেখে দিলে আমরা হয়তো এ রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব। অজ্ঞতার অন্ধকার দিনের যে আতঙ্ক, এ সময়েও কুষ্টকে তেমনি আতঙ্কের চোখে দেখা হ'ত। এই আশ্রয় উদ্‌ঘাটন করাটা আমাদের কাছে উদ্বেগ ও ভালবাসার এক বিশেষ প্রতীক হয়ে উঠল। পঁচিশ বছর চালিয়েছি ওটা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সালফোন্ চিকিৎসাও শিখে নিই।

প্রথম বছরগুলিতে আমাদের 'নীতি' ছিল, অংশত লোকজনকে উৎসাহ জোগাব। সামান্য, প্রাত্যহিক ছোট ছোট সেবার কাজ করে। আবার, ওদের মধ্যে অধিকার চেতনা জাগাব। অনেক আগেই বুঝেছিলাম প্রকৃতঅর্থে অগ্রগতি, সে ওদেরই হাতে। ওদের হয়ে, পুলিস, জঙ্গলবিভাগের কর্মী, বেণে ও অন্যদের সঙ্গে আমরা অনেক লড়েছি। ফলে অন্-আদিবাসীদের কাছে আমরা খুব অপ্রিয় হয়ে উঠি। এরা আমাদের বিষয়ে অনেক রকম কুৎসা রটনা করতে এতটুকু ইতস্তত করত না, যা আরো বিপজ্জনক। ওরা গ্রামবাসীদের বলত, অস্পৃশ্য অচ্ছুৎদের আনীত জল আমরা ওষুধে মেশাই; আমরা ওদের ক্রীশ্চান করবার মতলব আঁটছি; ওদের ছেলেমেয়েদের শহরের স্কুলে পাঠিয়ে দেব! সৌভাগ্যক্রমে পুলিসের এক সাব ইন্‌স্পেক্টরের হ'ল গনোরিয়া। শামরাও যখন ওকে সারিয়ে তুলল, সরকারি লোকজন পথে আসতে শুরু করল।

আর্থনীতিক সমস্যা নিয়ে ছিল বিশেষ উদ্বেগ। কত কাল আগে ১৯৩৪ সালে, আদিবাসী সমস্যা বিষয়ে প্রথম লেখা লিখলাম বাইগাদের বিষয়ে 'মডার্ন রিভিয়ু'-তে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম 'এই সাহসী ও মনোমুগ্ধকারী মানুষদের নির্মম দারিদ্র্য, নিঃস্বতা ও অজ্ঞতার' প্রতি। লিখেছিলাম, "আপনারা ওদের জানলে মোহিত হবেন। আবার এটাও সত্যি যে রাতে, অনেক রাতেই ঘুম আসবে না। যে দুঃসহ কষ্ট দেখেছেন, তা আপনাকে তাড়া করবে। এ ভেবে ব্যাকুল হবেন, যে সমাজ অবহেলায়

পুরুষ হতে পুরুষানুক্রমে এমনটা ঘটতে দেয় কি তাকে কী দণ্ড দেওয়া যায়।”

দারিদ্র্য ও অসুখ ছিল মূল সমস্যা। কিন্তু বহুমুখী, সর্বব্যাপী শোষণ থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনও ছিল সঙ্গের সাথি। যা সুন্দর, যা মুক্ত, তা আমি বাঁচাতে চাইতাম। ভালোবাসা, বিশেষ করে সহজ সরল মানুষের ভালবাসা এবং সুখের জীবনে যারা একটা অনুশোচনাবোধ ঢুকিয়ে দিতে চায়, চিরকাল তাদের বিরোধী থেকেছি। ওদের জমিভূমি, অরণ্য, ও'বেলার আহার এ নিয়ে ওদের যে উৎকণ্ঠা, তা থেকে ওদের বাঁচাতে চাইতাম। আমাকে একেবারে ভুল বুঝত সবাই। তবে কবি ও শিল্পীদের সর্বদা পথের সাথি পেয়েছি। যেমন ডব্লয়ু. জি. আরচার। যুদ্ধের সময়ে লেখা তাঁর কবিতার বই, 'দি প্রেইন্‌স অফ দি পান'-এ একটি কবিতা আমার উদ্দেশে লেখেন। কবিতাটি এ জন্য তুলে দিচ্ছি, যে আমি যা করতে চাইছিলাম, এ কবিতা ঠিক সে কথাই বলেছে। আমি খুশি হয়েছিলাম, সেটা কারণ নয় এ উদ্ধৃতির।

> তোমার প্রজ্বলন্ত পাহাড়, নির্জন অরণ্য, এর মধ্যে
> গর্জাতে গর্জাতে এল গ্রীষ্ম। বন্ধ্যা ভূমি
> গেছে বিশ্রামে। আর মেঘের মতো এসে পড়ে সংবাদ
> তুমি তো কাজ করছ শান্তির প্রয়োজনে
> বাঁচাচ্ছ সুখী প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম দেওয়ানেওয়া
> বাঁচাচ্ছ কবিতা, যা বাঘের মতো প্রাণবন্ত
> বিষাক্ত সমভূমির ধ্বংসের হুমকির মুখে
> তোমার ভালবাসা, তোমার শিল্প দিয়ে ঠেকিয়ে রাখছ
> গুড়ি মেরে আগুয়ান, আদিবাসীদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু।

আমি যা করতে চাইছিলাম, তার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আদিবাসীদের সবাই জানুক, চিনুক, এ চেষ্টা। কতিপয় পথিকৃৎ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর কাজ বাদ দিলে, যা কমজনই পড়ত— সে সময়ে আদিবাসীদের দেখা হত বিরক্তিকর বন্যবর্বর হিসেবে,— যারা ঝামেলা পাকায়। নতুবা বর্ণোজ্জ্বলতাপ্রিয়, ছবি-ছবি মানুষ হিসেবে, যাদের কাজ হ'ল উশৃঙ্খল যৌনাচারে নিমগ্ন থাকা, নরবলি দান, এবং মুণ্ডু শিকার। ফলে, যদিও কিছু লোক তাদের ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাসের চশমায় দেখত,— প্রচলিত ধারণা ছিল, ওরা এক পৃথক জাতের মানুষ,— ওরা হয়তো আমাদের মনে সদয় করুণা জাগাতে পারে, কিন্তু মুগ্ধ শ্রদ্ধা জাগ্রত করতে পারে না। আমার মনে হ'ত, যদি আদিবাসীদের এগোতে হয়, তাহলে দেশের বাকি মানুষ ওদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। ওদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা করবে, এটা খু-ব দরকার।

দুই

আদিবাসীদের রক্ষা করা বিষয়ে আমার মতামত রীতিমত ঢেউ তোলে। বহু বছর

ধরে, এমন কি এখন অবধি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল, আমি চাই, 'ওরা যেমন আছে। তেমনি থাকুক,'— ওদের উন্নয়ন স্থগিত থাকুক। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের স্বার্থে ওদেরকে জাদুঘরের নিদর্শ হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা হোক। এ কথা তখন যেমন, এখনও তাই, ননসেন্স।

আমার ওপর কিছু আক্রমণ ঘটেছে সুপরিকল্পিত অপব্যাখ্যার পরিণামে।* সাধারণত, আমার সমালোচকরা আমার লেখায় সত্যিই কী লিখেছি, তা পড়েন না। সত্যি বলতে কি, আমার পলিসিতে অতীক অদ্ভুত কিছু নেই। আমি মনে করেছি, আদিবাসীরা ভীষণ কঠিন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার মন্ত্র আবিষ্কার করেছিল, যেটা জানা আমাদের জানা দরকার। এবং ওদের উন্নয়ন কাজটা খুব সযত্নে, সময় নিয়ে করা দরকার। আমি বিনিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম, ওদের তখনি 'সিভিলাইজ্‌ড' করা হবে, যখন সে কাজটি সঠিক ভাবে করা যাবে। এ তো স্পষ্ট এবং অমোঘ, যে ওদের 'সিভিলাইজ্‌ড' করা হবেই; চেয়েছিলাম ওরা খানিক সময় পাক, যাতে নিজ জীবন নিয়ে গর্ববোধ গড়ে ওঠে, আর্থনীতিকভাবে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে, যাতে,— যখন বহির্জগৎ ওদের মধ্যে ঢুকে পড়বে, ওরা যেন ভেসে না যায় উচ্ছ্বাসে। চেয়েছিলাম স্বীয় অতীতের সঙ্গে পরিষ্কার সমঝোতায় আসুক, এবং এগিয়ে যাক স্বাভাবিক বিবর্তনের নিয়মে।

প্রথম বছরগুলিতে, ওদের রক্ষা করবার প্রয়োজন যে জরুরি, সেটাই মনে অগ্রাধিকার পায়। ১৯৩৯-এ প্রকাশিত *দি বাইগা* বইয়ে, দেশের কোনো 'বন্য, মোটামুটি দুরধিগম্য' কোনো জায়গায়, এক ট্রাইব্‌স কমিশনারের সরাসরি শাসনে এদের রেখে ন্যাশনাল পার্ক জাতীয় কিছু প্রস্তাব করি। এর মানে এই নয়, যে ওদের জন্য কিছুই করা হবে না এই এলাকায়।

আদিবাসীরা যাতে 'যতদুর সম্ভব সুখে ও স্বাধীনতায়' বাস করতে পারে তা প্রশাসনকে দেখতে হবে। ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী সমাজ সংগঠনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে। গ্রামের মোড়লবা তাদের পুরনো কর্তৃত্ব ফিরে পাবে। ওই অঞ্চলে যে অন্-আদিবাসীরা আছে, তাদের লাইসেন্স নিতে হবে। কোনো ধর্মের কোনো যাজক আদিবাসী জীবন ভেঙে দিতে পারবে না। এলাকার মধ্যে বসবাসকারী মানুষজনের অগ্রগতির জন্য যা সম্ভব, সব করা হবে। শুধু দেখতে হবে আদিবাসী জীবনছন্দ যেন চোট না খায়,— আদিবাসী সংস্কৃতি ধ্বংস না হয়, আদিবাসীর স্বাধীনতা প্রত্যর্পিত হয়, অথবা রক্ষা করা হয়। আর্থনীতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আজ যাকে বুনিয়াদী শিক্ষা বলা হয়, তা অনুসরণে স্কুলগুলি করতে হবে। স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন বুঝে এ শিক্ষাকে সরল করতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে। মাছ ধরার ও শিকারের ঢালাও অনুমতি দিতে হবে। নিম্নপদের অফিসারদের একনায়কতন্ত্র শেষ করতে হবে।

কিছুকাল বাদে লিখি, অতীব বন্য, একেবারে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রেও আমাদের "তিনরকম মুক্তির জন্য লড়তে হবে। ভয় থেকে, অভাব থেকে, বাধাপ্রদান থেকে মুক্তি। আমাদের দেখা উচিত হবে, যে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে আদিম গোষ্ঠীর আদিবাসীরা সুবিচার পায়। দেখতে হবে যে ওরা প্রবঞ্চক ও শঠদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, মুক্তি পেয়েছে অত্যাচারী জমিমালিক ও মহাজনদের হাত থেকে, ঘুষখোর ও লুঠেরা সরকারি কর্মীদের হাত থেকে। তারা যেন চিকিৎসা ব্যবস্থা পায়,... সেই সব ধান্দাবাজদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, যারা কেড়ে নেবে ওদের গান, নাচ, উৎসব, হাসি...।" এ তো আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবার নীতি নয়। চেয়েছিলাম, সুপরিকল্পিত, সুনিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ, যা একেবারে অন্য ব্যাপার।

দি বাইগা-তে আমার প্রস্তাবগুলি ঠিকভাবে লেখা হয়নি। মন্দভাগ্য 'ন্যাশনাল পার্ক' শব্দটির বহু গূঢ় অর্থ বেরোবে সে আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু ১৯৩৯-এ কী বা করার ছিল? এতো বাইগা সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যাপার নয়। বাইগাদের সংস্কৃতি অতি যৎসামান্য। প্রশ্ন ছিল ওদের বাঁচিয়ে রাখার, অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করার খুব সহজ সরল পথে ওদের উন্নয়ন করা। বাস্তব ঘটনা এ রকম, ভারত সরকার এখন একজন ট্রাব্‌স কমিশনার নিযুক্ত করেছেন, বহু রাজ্যে স্থাপিত হয়েছে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, তা তপশীলী ও আদিবাসীর জন্যই হয়েছে। আমি অনেক কাল আগে যা বলি, কার্যকরী হলে এগুলো তা থেকে খুব একটা অন্যরকম নয়।

তিন

স্বাধীনতার আগের বছরগুলিতে কোনো নীতি বা দর্শনে পৌঁছানোর অবকাশ ছিল না। আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অবশ্য অনেক অবাস্তব অ্যাকাডেমিক আলোচনা হ'ত। এর কারণ, আদিবাসীদের জন্য যে পরিকল্পনা এবং সমগ্র দেশের জন্য যে পরিকল্পনা তা একতালে, সমগতিতে চলতে হবে। এ সময় সকলেই উপেক্ষার শিকার। ভারতের গ্রামগুলির অধিকাংশ তখন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। বাতিলযোগ্য, সামাজিক ধর্মীয় ও কৃষিকার্যের পদ্ধতি,— যা আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, জনগণ তাতেই বাঁধা পড়ে আছে। যৎসামান্য চিকিৎসা-সহায়তা পেত,— শিক্ষার সুবিধা নেই বললে হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ। আদিবাসীদের মতোই ওরা নির্যাতিত ও শোষিত। আদিবাসীরা আবার অন্যদের চেয়ে বেশি উপেক্ষিত। কেননা ব্রিটিশ সরকার ওদের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ঠেকাতে খুবই ব্যস্ত। ওদের পাহাড় পর্বতে কংগ্রেস কর্মীদের যেতে দেওয়া হত না। আমি যখন প্রথম আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে যাই, বহু বছর পুলিস আমাকে নজরে রাখে। হয়তো তা স্বাভাবিক। আমার অবশ্যই ছিল 'বিক্ষোভের কর্মসূচী।' বাইগাদের জন্য আমাকে স্কুল খুলতে দেওয়া হয়নি। অরণ্য-গ্রামে গেলে, নিষেধ জারি না করলেও খুব কড়া নজর রাখা হত। রাস্তা,

১৯৬২ সালের এক পার্টিতে নকুল, অশোক ও বসন্ত

সিয়াং নদী

হাসপাতাল, ডিসপেনসারি— বলতে গেলে ছিল না। কৃষি উন্নয়নে সামান্যই আগ্রহ ছিল। যারা আদিবাসীজীবনে শিকার করত, ওদের আরো গরিব বানাত, তাদের বিরুদ্ধে কোনো বাস্তব রক্ষাব্যবস্থা ছিল না।

এর অর্থ এই নয়, যে কিছুই করা যেত না। তবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কাজ করে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত। যে অন্যায়ের প্রতিবিধান হয়নি, তার যেগুলি আমি আবিষ্কার করতাম,— কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতাম। পরিস্থিতির সমাধান করার জন্য বিশদ খুঁটিনাটি লিখে প্রস্তাব জানাতাম। বিশেষ কিছু সমস্যা নিয়ে কাজ করতাম। যেমন, — জেলে বন্দি আদিবাসীদের অবস্থা— ঝুম চাষের অবস্থা,— ইত্যাদি। একই সঙ্গে আমি ও অন্যেরা, আদিবাসী বিষয়ে যেন মানুষ জানতে পারে। জনসমক্ষে ওদের তুলে ধরবার সে কাজ করে চলতাম।

কিন্তু এল স্বাধীনতা। সমগ্র দেশে এল এক বিশাল জাগরণ। আদিবাসীরা জায়গা পেল মানচিত্রে; তারা 'সংবাদ' হয়ে উঠল। উন্নয়নের জন্য বড় বড় প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরি হল। ব্রিটিশ আমলের সামান্য, অনিচ্ছা-প্রণীত কার্যসূচী যে স্বাধীন ভারতে একেবারে অচল, তা পরিষ্কার বোঝা গেল। যদিও তখনো কাজের গতি খুব মন্থর, দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার নির্বাসন থেকে আদিবাসীদের, বাকি দেশের সঙ্গে একীভূত করার দরকারের উপর, এই প্রথম জোর দেওয়া হয়। স্বাধীনতার আগে আমার বক্তব্য ছিল, কিছু কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী, যারা খুবই ছোট, বড়ই দূরে থাকে, তাদের এখনকার মতো সব কিছুর বাইরে রাখা ঠিক হবে। তখন পরিস্থিতি যেমন, সেজন্যই তা করতে হবে। পরে, *এ ফিলসফি ফর নেফা*-র দ্বিতীয় সংস্করণে খুব পরিষ্কার লিখেছি, যে নেফার মতো এক বিচ্ছিন্ন, সুদূর অঞ্চলের ক্ষেত্রেও, আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা,— তাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারা যেখানে আছে সেখানেই থামিয়ে রাখা আমাদের পলিসি নয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত জুড়ে আদিবাসীদের জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করা হয়েছে। এবং তা হয়ে চলবে। গোড়াতে যত টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়, তার চেয়ে অ-নেক বেশি টাকা বরাদ্দের সপক্ষে যাঁরা জোর দেন, আমি তাঁদেরই একজন। যখন তাদের বসতি অঞ্চলের অভ্যন্তর অবধি পথ বানানো হবে, বড়োসড়ো ভাবে উন্নয়নের বহু প্রকল্প নেওয়া হবে, তখন ওদের 'যেমন আছে, তেমনি থাকুক' বলা যায় না, কোনো ঘেরা এলাকায় পুতুলের মতো সাজিয়ে রেখে দেওয়া চলে না। আমি পরিবর্তন চাই। ১৯৩২ সালেও পরিবর্তনই চেয়েছিলাম। তবে যা আমি এবং আমার সমভাবনার মানুষরা চাই, তা হ'ল পরিবর্তন যেন মঙ্গল আনে, অধঃপতন ও অবক্ষয় যেন না আনে।

আজকাল আদিবাসী উন্নয়নের ব্যাপারে বিরামবিরতিহীন আলোচনা চলতে থাকে। যা বলা হয়, তার এক চতুর্থাংশও যদি কাজে করা যেত, অবস্থা পাল্টে যেত। প্রতি সম্মেলনে বা কমিটিতে, বা বক্তৃতায়, মানুষ মনে করে তাদের কর্তব্য হ'ল বিচ্ছিন্ন

করে রাখা, না অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া, না একীকরণ করা, —এই সব ব্যাপারে চিরকাল যে মতান্তর চলছে, তারই চর্বিতচর্বণ করা। ভুলে যায় যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ওসব আলোচনা বাতিল হয়ে গেছে। বাস্তব পরিস্থিতি এই, যে দু'এক বছরের মধ্যেই আদিবাসী-ভারত সমেত গোটা দেশটাই কম্যুনিটি ডেভলপমেন্ট ব্লকের আওতায় এসে যাবে। এ এক সিদ্ধান্ত। এটা হতে চলেছে। তাই, আদিবাসীদের আধুনিক সভ্যতা প্রবাহে আনা হবে কি না, অথবা তাদের অঞ্চলকে সর্বগম্য করা হবে কি না, তা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। আমরা চাই বা না চাই, আদিবাসীরা চা'ক বা না চা'ক, 'সভ্য' ওদের করা হবেই। ওদের বসতি অঞ্চলকে সর্বগম্য করে দেওয়া হবে। অনেক আলোচনার বিষয় অবশ্যই থাকল। তবে এখন থেকে সে-সব আলোচনা যেন হয় কর্মসূচীর খুঁটিনাটি নিয়ে। মূলনীতি নির্ধারিত হয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আমার যে কমিটি নিযুক্ত করেন, তার উদ্দেশ্য ছিল কী পদ্ধতিতে প্রকল্প সকল বাস্তবায়িত করা যায়। আমার নিজস্ব মত ছিল, আধুনিক ভারতের প্রেক্ষিতে অন্য জায়গার তুলনায় আদিবাসী অঞ্চলে উন্নয়নের কাজ অনেক বেশি জোরদার করতে হবে, যাতে তারা তাদের প্রতিবেশীদের পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারে; বিশেষ জোর দিতে হবে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং আর্থনীতিক কর্মসূচীর উপর; বিশাল টাকা খরচ করে পথ বানাতে হবে। যাতে দূর চলে আসে কাছে। আমি লিখেছিলাম :

> 'পাহাড় ও সমতলের ঐক্য, জাতীয় স্বার্থেও যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন পাহাড় ও অরণ্যের মানুষদের স্বার্থে। পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করতে পারি। আদিবাসীদের আমরা অনেক কিছু দিতে পারি, আবার ওদেরও অনেক কিছু আছে, যা আমাদেরকে দেবার মতো।'

চার

স্বাধীনতা আসে, কম্যুনিটি ডেভলপমেন্টের সূচনা নিয়ে কাজ শুরু হয়। আমার বার বার মনে হয়, আমার দায়িত্ব হবে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, কাজের পন্থা কেমন হবে, তার ওপর জোর দেওয়া। প্রকল্প রচনার কাজে আমি সাহয্যে অক্ষম। স্বাধীনতার প্রথম পাঁচবছর আমি লিখি ও বলি প্রধানত একই বিষয়ে। আদিবাসীদের প্রতি কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া সমীচীন হবে,— আমাদের এবং ওদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি কি পারস্পরিক বোঝাবুঝির দরকার হবে,— এইসব। সাবধান হতেও বলেছিলাম। ওদের জন্য অসংখ্য পরিকল্পনা করলে ওদের উপর চাপ পড়বে। আমাদের প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতমান ওদের দমিয়ে দেবে,— ওদের মনে জন্মাবে হীনমন্যতা। ওদের গ্রামে অসংখ্য বহিরাগত এনে ফেললে জমিজমা বিষয়ে ওদের উদ্বেগ হবে।

এটাও পরিষ্কার যে উন্নয়নের বৃহৎ প্রকল্প যখন রূপায়িত হতে চলেছে, একটা দ্বিমাত্রিক পলিসি দরকার। একটা হ'ল, এটা বিনিশ্চিত করতে হবে যে সংস্কৃতিক্ষেত্রে ওদের এত নপুংসক করা হবে না যাতে ওদের পরিচয় ও চরিত্র হারিয়ে যায়। মিস্টার নেহরু বলেছেন। ভারতবর্ষ এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমৃদ্ধির দেশ, এবং আদিবাসীদের উৎসাহ দিতে হবে, যাতে ওরা স্বীয় ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি ও ভাষাকে রক্ষা করে চলে। যদিও প্রথমদিকে ভাবতাম আদিবাসী সংস্কৃতি 'সংরক্ষণ' করতে হবে। পরে এ বিষয়ে চিন্তা ওখানেই থেমে নেই। সংস্কৃতি অবশ্যই এক চলমান প্রাণবন্ত বস্তু। সর্বদাই তা বদলে বদলে যায়। ওদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং প্রতিভার ধারা পথেই ওদের উন্নয়ন করতে হবে,— এ সেই প্রয়োজনীয় কথাটি যা নেহরুর ফর্মুলা সংক্ষেপে বলেছে।

একই সঙ্গে, ১৯৪৪-এ জোর দিয়ে লিখি, 'যদি আবার একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তৈরি হয়, যা বিশেষ প্রতিনিধিত্ব চাইবে, গুরুত্ব চাইবে, সরকারি কাজে পার্সেন্টেজ থাকবে ওদের, তাহলে সে খুব হতাশার ব্যাপার হবে।' পাঁচবছর বাদে '*স্টেট্সম্যান*'— এ লিখলাম :

> 'আদিবাসীদের বিষয়ে যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে, আরক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা যেন ভারতের ঐক্যের উপর কোনো ছায়া না ফেলে। ওদের শিক্ষিত করতে হবে, যাতে ওরা বোঝে এ প্রজাতন্ত্রে ওরা পূর্ণ নাগরিক, সত্যই অধিকার আছে ওদের, জরুরি কর্তব্যও আছে।'

আদিবাসী ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যাগুলো তুলনামূলকভাবে সহজই ছিল। ওদের প্রয়োজন ছিল সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়। কয়েকটা জায়গায় সমস্যা ছিল অপেক্ষাকৃত জটিল। যেমন, সাওরা পাহাড়ে, বা মুরিয়াদের ছিল অতি সুখী আদিবাসী জীবন, দৃঢ়বদ্ধ, প্রাণবন্ত। নেফাতে এসে দেখলাম, এখানে এবং সীমান্তের অন্যান্য জায়গায়, আদিবাসীরা তাদেব প্রাচীন সংস্কৃতি ধরে রেখেছে। শিল্প ক্ষেত্রে যেমন উন্নত, তেমনটি ভারতে অন্যত্র বিরল। আদিবাসী জীবন তখনো প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। তা তখনো খুব বড়ো কিছু। ওখানে কিছু পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নই ওঠে না। সমস্যা হ'ল, প্রাচীন জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধগুলি ধ্বংস না করে, পরিবর্তনের হাওয়া আনা।

বেশ কিছু বছর ধরে নরী রুস্তমজী এ সব সমস্যা নিয়ে ভেবে চলেছেন। তাঁর বিশ্বাসগুলি সীমান্ত এলাকায় কাজে রূপায়িত হচ্ছে। দুর্ভাগ্য, আমি ওঁর নোটগুলির কপি অনেক পরে পাই। সে কারণেই *এ ফিলসফি ফর নেফা* লেখার সময়ে ওঁর ওপর সুবিচার করিনি।

যেমন বহুদিন আগে, ১৯৪৮ সালেই দেখছি, উনি অতীব সঠিক পলিসির প্রবক্তা। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সভ্যতার অগ্রগতির কাজে ওঁর নীতি প্রযুক্ত হতে পারে। আদিবাসীদের 'উন্নত ও সভ্য' করা বিষয়ে দায়িত্বহীন আলোচনাকে উনি অভিযুক্ত

করেছেন। সরকারি কর্মী বা সমাজসেবীরা আদিবাসীদের কাছে যাবে, 'প্রভুর হুকুম তামিল' করতে নয়, যাবে তাদের "অগ্রজ হিসেবে; তারা নিজেরা অনেক কষ্ট সয়েছে, এবং সেই কষ্টের অভিজ্ঞতা যাতে অন্যদের না সইতে হয় সেই মনোভাব নিয়েই যাবে। তারা সর্বত্র যেন একই প্রশাসনিক যান্ত্রিকতা সর্বত্র চাপাতে চেষ্টা না করে। কখনোই, পাহাড় অঞ্চলে যে ঐতিহ্যপুষ্ট বিচারব্যবস্থা আছে, তাকে অন্যত্র যা চলে, সেই লাইনে এনে ফেলার চেষ্টা না করে। 'যে কায়েমী ব্যবস্থা তার দুর্নীতি এবং ঢিলেমির জন্য কুখ্যাত, সেটা তেমন অঞ্চলে চাপিয়ে দেবার কথা এরা যেন স্বপ্নেও না ভাবে, যেখানে ন্যায়বোধ মানুষের সহজাত, যেখানে আইন দ্রুত কাজ করে। ফলপ্রসূ হয়।"

এরপর ১৯৫৩ সালে রুস্তমজী যা লেখেন তাতে দেখছি, পরে আমি কী ভাবব এবং লিখব, তা যেন আগেই অনুমান করেছিলেন। লেখাটি সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি।

> 'বেঁচে থাকার আনন্দ এখনো অনেকটা টিকে আছে এ সব বিচ্ছিন্ন ও সুদূর পাহাড় অঞ্চলে। নাচ ও গান এখানে দৈনন্দিন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নির্ভয়ে, বাধাবন্ধন না মেনে এখানকার মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলে, ভাবে। পাহাড়ি লোকজনের সমাজনিয়মগুলির মধ্যে যে ভালোটা আছে, সেগুলো যেন কলঙ্কিত না হয়। অথবা তার জায়গায় এমন নিয়মাবলি আনা না হয়, যা হয়তো 'আধুনিক' এবং 'উন্নত', কিন্তু পার্বত্য আদিবাসীদের অর্থনীতি এবং চিন্তাধারার সঙ্গে অসামঞ্জস্য। পাহাড়ীয়াদের চরিত্রে আছে সুস্থ, সিধা এবং পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি। অস্বাভাবিক জীবনযাপনের ফলে শহরবাসীর মধ্যে যে অসুস্থ জটিলতা দেখা যায়, তা থেকে, সুখের বিষয়, এরা মুক্ত।
>
> সবচেয়ে মন্দ হবে যদি বাড়াবাড়ি রকম মিশনারি সুলভ উৎসাহে, পাহাড়ীয়াদের মধ্যে যে তাজা, সৃজনশীল আকাঙক্ষা বেঁচে রয়েছে আমাদের কর্মীরা তা নষ্ট করে দেয়। যদি সেবা করাই উদ্দেশ্য হয়, পাহাড়িয়াদের আমাদের দেখাতে হবে। তাদের ভাষা এবং গান, ওদের নিয়মবিধির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। তেমন শ্রদ্ধা দেখাতে পারলে, যে কাজ সামনে পড়ে আছে, তার ক্ষেত্রে আমরা ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারব।' এ জন্য প্রতিজনের প্রথম কাজ হ'ল স্থানীয় ভাষায় সঙ্গে পরিচিত হওয়া। 'বহিরাগত হয়ে নয়। ওদের একজন হ'য়ে আগ্রহী হও, ওই সব মানুষের রীতিনীতি ও আচরণ বুঝতে চেষ্টা করো। ওদের জীবনে জীবন মিলাও।'

পাঁচ

নেফাতে আদিবাসীদের পরিবর্তন ও উন্নয়ন বিষয়ক দর্শনে আমার প্রথম অবদান ছিল এক রিপোর্ট। এটি আমি গভর্নরকে দিই। তিনি এটি প্রধানমন্ত্রীকে দেন তুয়েনসাং-এ

সাত সপ্তাহ সফরের পর। দুর্ভাগ্যবশত রিপোর্টের উপর লেখা ছিল 'গোপনীয়।' পরে আমি যা বিশদ লিখেছি, তার সবটারই অঙ্কুর এ রিপোর্টে ধৃত ছিল। মিঃ নেহরু এক দীর্ঘ নোট লেখেন, এবং আমার প্রস্তাবগুলিকে মোটামুটি সমর্থন করেন।

এরপর নেফা সেক্রেটারিয়েটে সহকর্মীদের সঙ্গে দু'তিন বছর মহানন্দে কাজ করি। সবরকম সমস্যা ও নীতি বিষয়ে খুব বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। গভর্নরের সঙ্গে আদিবাসী ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা রাজভবনে একত্র হতাম। আরো ঘন ঘন মিলিত হতাম আমার বাড়িতে। আদিবাসী পোশাক নিয়ে আমাদের প্রথম সেমিনার হয়। পরে অনেক, অনেক বিষয় চলে আসে আলোচনাসূচিতে। আমাদের অনেক প্রস্তাবকে প্রশাসন বাস্তবায়ন করে। পরে আমাকে বলে একটি বই লিখতে, যা হ'ল '*এ ফিলসফি ফর নেফা*।' প্রথম সংস্করণটি ছোট, সাদামাটা। কিন্তু মিঃ নেহরু খুব উৎসাহ দিয়ে এর ভূমিকা লিখলেন। ফলে এটি নতুন করে লেখার যথেষ্ট উৎসাহ পেলাম, গোটাটাই ফিরে লিখলাম। যা ছিল তার দ্বিগুণ হ'ল এখন। প্রচুর ছবি ঢোকালাম, ১৯৫৭-এ পুনর্প্রকাশিত হ'ল। এ সংস্করণেও মিঃ নেহরু ভূমিকা লিখলেন। এই ভূমিকাতেই আদিবাসীদের জন্য ওঁর বিখ্যাত পঞ্চশীলের কথা প্রথম লেখেন। দু'বছর বাদে বইটির পুনর্মুদ্রণ হয়। এখন ওটি হিন্দী এবং অসমীয়াতেও অনূদিত হয়েছে।

আমার অক্সফোর্ডের দিনগুলিতে যেমন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এই আলোচ্য দর্শনের মূল ভিত্তিটি তার সঙ্গে যেন গ্রথিত। তখনো কারো ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া আমার অপছন্দ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এর পরিণতি হল ধর্মীয় ব্যাপারে, ধর্মান্তকরণে বা ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপে ঘোর আপত্তি। সমাজবৃত্তে এক সভ্যতার উপর আরেক রকম সভ্যতা চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমার আপত্তি। এই আদিবাসী পলিসিতে মানুষকে জোর করে কিছু করানো, করতে বাধ্য করা, তেমন কিছু নেই। ওদের উৎসাহ দিতে হবে উন্নয়নে, উন্নয়নই হ'ল মূল কথা। ওদের নিজ ঐতিহ্য অনুসরণ করেই উন্নয়ন আনতে হবে। ওদের অতীত ঐতিহ্যকে ওরা মেনে নিক, এবং সেখান থেকেই শুরু হোক স্বাভাবিক বিবর্তন। এতে অবশ্য সরকারি কর্মচারীদের ওপর যথেষ্ট বাধানিষেধ জারি হবে। সকল দেশেই সরকারি লোকজনের প্রবণতাই হ'ল, এঁরা তথাকথিত আদিম মানবদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এও ভাবেন, ওদের আরো ভালো শিক্ষা দেবার, ওদের ভালো করবার অধিকারটি ঈশ্বরপ্রদত্ত। কিন্তু মিঃ নেহরু বলেন :

> 'আদিবাসী অঞ্চলে মানুষকে অনুভব করানো যে তাদের নিজস্ব মতে জীবনযাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, এবং তাদের ইচ্ছা ও প্রতিভা অনুসারেই তারা উন্নয়নিত হোক,— এটা নিয়েই যত সমস্যা। ভারতকে তারা যেন রক্ষাকারী শক্তি নয়, মুক্তিপ্রদায়ী শক্তি হিসেবে গণ্য করে। এ ধারণা যদি জন্মায়, যে ভারত ওদের শাসন করছে, ওরা শাসিত মানুষ, অথবা যে সব

রীতিনীতি ও আচরণে ওরা অনভ্যস্ত, তা ওদের ওপর চাপানো হবে,— তাহ'লে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যাবে।'

এ ফিলসফি ফর নেফা-তে যা ছিল, এখানে তার সারসংক্ষেপ দেবার জায়গা নেই। বাস্তব প্রয়োজন, মনস্তত্ত্বগত নতুন ভাবধারাগ্রহণ, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিগত সমস্যা— এই সবকিছুর প্রেক্ষিতে আদিবাসী সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই আদর্শবাদী পলিসির মূল ব্যাপারটি হয়তো খুবই বস্তুবাদী, মিঃ নেহরু যেমন বলেছেন, 'জমি ও অরণ্যে আদিবাসীর অধিকারকে মানতেই হবে।' আরেকটি হ'ল, আমরা একদল আদিবসীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করব, যাতেও ওরাই প্রশাসন এবং উন্নয়নের কাজ করতে পারে। ওদের স্বভূমি জগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে মিত্র বলে গণ্য করতে হবে, প্রতিদ্বন্দ্বী বলে নয়। অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী তরুণদের ক্লাব, অথবা যুবাবাস আছে। শিক্ষাদায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে ওগুলি চমৎকার ভিত্তিভূমি হতে পারে। প্রমাণিত হয়েছে, আদিবাসী পর্ষৎগুলি, আদিবাসীদের আত্মসম্মান নির্মাণ ও রক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। নেফাতে এ সব পর্ষৎকে বিশাল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

আদিবাসীদের রুচির উৎকর্ষ রক্ষার জন্যও আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। ব্যবসায়ীদের নেফাতে বসতি করতে দেওয়া হয় নি। তার বদলে ওদেরই ব্যবসা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। কাজটি খুবই সফল হয়েছে। শিল্প,— চমৎকার তাঁতবস্ত্র,— সঙ্গীত ও নৃত্য, —এগুলোকে কলুষিত নয়, উৎসাহ দিতে হবে। কোনকিছুই নিশ্চল রাখা চলবে না। আর বাস্তবে এই সকল ক্ষেত্রেই ক্রমান্বয়ে শৈল্পিক উন্নয়ন ঘটে চলেছে। স্থপতিবিদ্যা বিষয়ে ভাবা হয়েছিল। সরকারি বাড়িগুলোও এমন শৈলীর হবে, যেন তা চারপাশের নিসর্গচিত্রের সঙ্গে মানানসই হয়, গ্রামীণ নিসর্গে ওগুলোকে বেখাপ্পা ঠেকে না,—দুর্ভাগ্যবশত এটা তেমন সফল হয় নি। সবচেয়ে বড় কথা এই,— সরকারি বা সামাজিক কর্মী, তিনি যেই হোন না কেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গোড়ায় থকাবে নিখাদ সাম্য এবং বন্ধুত্বের অনুভূতি।

এ বইয়ে বিধৃত ধারণাগুলি প্রথমত নেফার প্রেক্ষিতেই তৈরি হয়। তবে অনেকগুলোই অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলে প্রয়োগসাধ্য, তা করাও হয়েছে। সমস্যার চরিত্রে পার্থক্য অনেক। যেমন ঋণজর্জরতা, অথবা শিল্পায়নের অভিঘাত। কিন্তু মূল দৃষ্টিভঙ্গি সকলের জন্যই দরকার।

এ ফিলসফি ফর নেফা-তে আমার নিজস্ব পলিসি সবচেয়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে। তবে তা আরো দুটি বইয়েও মিলবে। প্রথমটি হ'ল "রিপোর্ট অফ দি কমিটি ফর মালটিপার্পাস ট্রাইবাল ব্লক্‌স।" আমি এর চেয়ারম্যান ছিলাম, লেখার দায়িত্বও আমারই বেশির ভাগ ছিল। দ্বিতীয়টি হ'ল, "রিপোর্ট অফ দি শিডিউল্‌ড্ ট্রাইব্‌স কমিশান", ধেবর কমিশান নামেও এটি পরিচিত। এতে আমি সদস্য ছিলাম। ৭৫০

পৃষ্ঠার এই বিশাল সমীহজাগানো রিপোর্টের এক সংক্ষেপিত সংস্করণ তৈরি করতে বলেন ধেবর। *এ নিউ ডীল ফর ট্রাইবাল ইন্ডিয়া* নামে আমি এক ছোট বই লিখি। সমগ্র ভারতের আদিবাসীর জন্য কী করা যায়, সে বিষয়ে আমার ব্যাপক চিন্তা বিষয়ে জানার যথেষ্ট আগ্রহ যাঁর আছে, তিনি *এ ফিলসফি ফর নেফা*-র সঙ্গে এ বইটিও পড়ে নিলে ভালো করবেন।

শিডিউলড্ ট্রাইব্স কমিশানের রিপোর্টে ধেবর জোর দেন সামাজিক ন্যায়ের উপর। তাই আমরা উন্নয়নের সঙ্গে পুরস্কারের ওপর সমান জোর দিই। এই রিপোর্ট নিয়ে পার্লামেন্টে হাড্ডাহাড্ডি বিতর্ক হয়। অতঃপর এটি গৃহীত হয়। আমি ত্রিশ বছর ধরে এ বিষয়ে যে মতে অবিচল থেকেছি, এতে প্রমাণিত হ'ল যে আমার অবস্থান সঠিক ছিল। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছি বলে আমাকে ক্রমান্বয়ে আক্রমণ করা হ'ত। এখন প্রমাণ হ'ল সে আক্রমণের কোনো ন্যায্যতা ছিল না।

ছয়

আমার 'দর্শন'-এর সমালোচকরাও ছিলেন। রাঁচিতে এক সম্মেলনে উপস্থিত এক ডেভলপমেন্ট কমিশনার কাতরভাবে বললেন, "আদিবাসীদের তো প্রতিভা নেই। তাহ'লে তাদের প্রতিভা বা জিনিয়াস অনুসারে তাদের উন্নয়ন করব কি করে?" এ কথা সত্য, যে যেসব আদিবাসী অধিক আধুনিক হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সংস্কৃতি ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু অন্যেরা তো আছে, তারা আজও ধরে রেখেছে ভালো জাতীয়-চারিত্র্যগুণগুলি। সহানুভূতিশীল ও বুদ্ধিমান অববেক্ষকদের কাছে কিছু কিছু ওরা প্রকাশও করে, যার ভিত্তিতে গড়ে তোলা সম্ভব।

একীকরণের স্বার্থে আরেকটি সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, আমরা যদি আদিবাসীদের তাদের নিজ ভাষা, পোশাক বা সামাজিক সংগঠন ধরে রাখতে দিই, তবে তো ভারতের বাকি অংশ থেকে ওদের পৃথক করেই রাখা-হ'ল। যদি ওদের (অন্যাদের সঙ্গে) এক করে ফেলতে চাই, তবে সে কাজ যথাসম্ভব ঝটপট সেরে ফেলতে হবে। ওদের পালিশ করে নিতে হবে। যাতে ওরা একেবারে অন্যদের মতো হয়ে যায়। এমতো চিন্তায় গণ্ডগোল এখানেই, যে ভারতের জনগণে হাজার বৈচিত্র্য, সংস্কৃতি, ধর্ম বা ভাষার কোনো একটি মাত্র মাত্রা নেই, আদিবাসীদের দিয়ে যা গ্রহণ করাতে পারি। আচরণক্ষেত্রে কি দেখা যায়? যে সব আদিবাসীরা নিজেদের মার্জিত করেছে, তাদের প্রতিবেশীদের মতো একই জীবনধারা গ্রহণ করেছে, তারা আজ ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। ওরা বুঝেছে, যে আত্মপরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে, তাই তা রক্ষার করার জন্য ওরা আজ মরিয়া। বহু নাগা বিদ্রোহী প্রতীচ্যের জীবনধারা গ্রহণ করেছে, পরছে প্রতীচ্যের পোশাক। আসামের পাহাড়ের মানুষজন, যারা এভাবে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে, স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি তাদেরই। এমনটা

হতেই পারে, শেষ অবধি সব আদিবাসী গোষ্ঠীই স্ববৈশিষ্ট্য হারাবে। হারিয়ে যাবে এক একঘেয়ে ইউনিফর্মিটিতে। হয়তো প্রভাবশাসিত হবে মার্কিনি সভ্যতা দ্বারা,— যা দ্রুত ছড়াচ্ছে দুনিয়ায়। কিন্তু সাঙ্গীকরণের স্বার্থে এ প্রক্রিয়ার দ্রুতায়ন আমার মতে নির্বোধিতা। কেননা এ প্রক্রিয়ায় কাজ হয় নি, হবেও না।

চীন কর্তৃক নেফা আক্রমণের ফলে সবাই সীমান্ত নিয়ে ভাবতে শুরু করে। আমাদের যে নীতির ফলে বিশ্বস্ত ও উৎসাহী স্থানীয় জনগণ প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সমর্থন জোগায় সে নীতিকেই তিক্ত ও বেপরোয়া আক্রমণের লক্ষ্য করে তুললেন বহু সমালোচক। নেফার 'ফিলসফি', এমন কি আমাকেও নিন্দামন্দ। এ কয়েক সপ্তাহ ধরে কাগজ খুললে দেখাই যেত তা।

যাঁরা তড়িঘড়ি *এ ফিলসফি ফর নেফা* কে ধিক্কার দেন, তাঁদের একশো জনের মধ্যে একজনও বইটি পড়েছেন বলে মনে হয় না। এ নীতি ব্যর্থ হয়েছে বলে বিশ্বাস করার প্রধান কারণ কী? যে ধরে নেওয়া হ'ল, আমি বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতির সপক্ষে ওকালতি করেছি; আসামের মানুষদের থেকে নেফাকে বিচ্ছিন্ন করার ওপর জোর দিয়েছি; স্বাভাবিকভাবেই, আদিবাসীদের জাদুঘরের প্রদর্শ হিসেবে রাখার প্রাচীন অভিযোগ আবার শোনা গেল; যদিও কেউই বলতে পারলেন না এসব কিভাবে সামরিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করেছে। সাধারণত, আমার সমালোচকরা যেগুলোকে আমার মত বলে বলে থাকেন, বাস্তবে আমি ওগুলোর উল্টো কথা বলেছি। নেফার জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোনো নীতি আমি কখনো সমর্থন করিনি। আমার বইয়ে বহু পাতা জুড়ে তার নিন্দা করেছি। 'দি ইনার লাইন' সিদ্ধান্তের বলে সীমান্ত একটি নিয়ন্ত্রিত এলাকা। অধিকারপ্রাপ্ত লোকজনই সেখানে ঢুকতে পারেন। আমার বই লেখার পঁচাশি বছর আগে এ সব নিয়ম প্রবর্তিত হয়। জানি, আমার বয়স হচ্ছে, তবে আমি অত বুড়ো নই। আসামের জনগণের কথা যদি বলি, ওঁদের প্রতি আমার অপার স্নেহ, বিশাল শ্রদ্ধা। আমার বইয়ে আমি প্রস্তাব রেখেছি, নেফার উন্নয়ন, প্রগতি ও কল্যাণের জন্য রচিত প্রতিটি প্রকল্পকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যে সেগুলি এই আদিবাসীদের সঙ্গে আসামের, তথা সমগ্র ভারতের সাঙ্গীকরণে সহায়ক হয় কি না।

আবার আমাদের পলিসির বহু সমর্থকও ছিলেন। যেমন এই সেদিন নেফা ঘুরে এসে ক্রিস্তোফ ফন্ ফ্যুয়ের-হাইমেনডর্ফ সোৎসাহে লিখেছেন :

> উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ায়, প্রাদেশিক ও রাজ্যসরকারের অবাধ নীতির ফলে শোষকরা, ভূমিঅপহরণকারীরা সুবিধা পেয়ে যায়। কতিপয় কর্তব্যপ্রাণ সরকারি অফিসাররা আদিবাসীদের অধিকারের কথা বলতেন, তেমন শুনত না কেউ। একটি মাত্র অঞ্চলে শোষণ ও বহিরাগতদের আধিপত্য থেকে আদিবাসীরা বেঁচে গেছে। কেননা সেখানে আদিবাসী উন্নয়নের সমস্যাকে সাহস ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হয়েছে। নর্থ-ইস্ট

ফ্রন্টিয়ার এজেন্‌সিতে এমন এক প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা দেশটিকে উন্নয়ন করছে একমাত্র আদিবাসী অধিবাসীদের জন্য। যাঁরা ইদানীংকালে অঞ্চলটি দেখার সুযোগ পেয়েছেন,— বহিরঙ্গে জীবনধারার আধুনিকীকরণ এবং অন্তরঙ্গে আদিবাসী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সুদক্ষ সঙ্গতি দেখে নিশ্চয় মুগ্ধ হয়েছেন। এখানে আদিবাসীরা তাঁদের আত্মসম্মান এবং আনন্দ করে বাঁচা,- কোনটাই হারান নি। তাঁরা এ ও জানেন, যে দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে তাঁরা, তাঁদের সন্তানসন্ততিরা লাভবান হবেন। ভারতের অন্যান্য অংশে বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর অবক্ষয় থেকে যে শিক্ষা মেলে, তা এখানে কাজে লাগানো হয়েছে। *ফিলসফি ফর নেফা* বইটি এমন কাজ দিয়েছে, ভাবলে খুব উৎসাহ পাই।

সাত

দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আদিবাসী, যার মধ্যে নেফার আদিবাসীরা এক ক্ষুদ্র, গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এদের সকলের জন্য আমার যে ধারণা, তার সংক্ষিপ্তসার করা যাক। উন্নয়নের নানামুখী প্রকল্প, যেমন কৃষিতে, সংবাহনে, স্বাস্থ্য পরিষেবায়, যা বাকি ভারতের বিষয়েও প্রযোজ্য, তারই প্রেক্ষিতে, আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পাঁচটি :

১. ওদের জমি নিঃশর্তে ওদেরই থাকবে। বহিরাগতদের কাছে আর আদিবাসী-জমি হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে।

২. ওদের অরণ্যের অধিকার মেনে নিতে হবে। সারা ভারতে অরণ্যঅধিকর্তারা ওদের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন।

৩. অবিলম্বে ঋণজর্জরতার সমস্যার সমাধান করতে হবে। অংশত আইনপ্রণয়ন করে। বাকিটা সমবায় আন্দোলনে খুব জোর দিয়ে। এবং সরকারের কাছ থেকে সহজে ধার নেবার সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪. আদিবাসী এলাকায় শিল্পায়নের সমস্যাকে অবশ্যই অধিক গুরুত্বে বিবেচনা করতে হবে। যেক্ষেত্রে আদিবাসীরা ভূমিচ্যুত, অন্যত্র বসবাস করছে, সেক্ষেত্রে ওদের ক্ষতিপূরণ দানে বুদ্ধি এবং উদারতাযুক্ত উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. দীর্ঘকাল ওদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে। এখন তা বন্ধ হোক। সর্বত্র ওদের স্বাগত জানাতে হবে সস্নেহে। সমানে সমান ব্যবহার করতে হবে। সরকারি চাকরির সকল সুযোগ দিতে হবে।

এ বিষয়গুলির উপর জোর দিচ্ছি, কেননা বিগত দশবছরে এগুলি জঘন্যভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এগুলি সিধা সমস্যা, চোখে পড়েই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমাধানের ইচ্ছা সত্যই থাকলে সমাধানও করা যায়।

তবে আরো পাঁচটি বিষয় আছে, যা জটিলতর।

১. আদিবাসীরা যেন স্বীয় অতীতকে মেনে নিতে পারে। অতীতকে অস্বীকার করে নয়, সে- অতীতেরই এক স্বাভাবিক বিবর্তন রূপে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে দেখে। এ কাজে আমাদের সহায়তা করতে হবে।

২. ওরা নিঃস্ব ভিক্ষাউপজীবী হয়ে গেল; 'আদিবাসী' নামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী তৈরি হল; তারা সরকারের কাছ থেকে সুখসুবিধা আদায় করার জন্য 'পশ্চাৎপদ' নামটি চাইল। এর যে বিপদ,— তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। মাথা না খাটিয়ে দয়াপ্রদর্শন, মাথা খাটিয়ে শোষণ করার মতোই বিপজ্জনক হতে পারে।

৩. আদিবাসীদের মধ্যে হীনমন্যতার বোধ সৃষ্টি করার ব্যাপারটা এড়ানো আবশ্যিক। তার মানে, আমাদের ধ্যানধারণা ওদের উপর চাপিয়ে দেব না। যে সব আইন-অনুশাসন-আচরণবিধি ওরা বোঝে না, মেনে চলতে পারে না, সেগুলো ওদের ওপর চাপালাম, ফলে ওদের অপরাধ বোধ জন্মাল,— এ যেন না করি। ওদের উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কাতুর করা চলবে না। ওদের স্বাভাবিক ধরনধারণ-আচরণ বিষয়ে আমরা যেন ওদের মধ্যে লজ্জাবোধ না জাগাই।

৪. আদিবাসীরা আমাদের সাহায্য করবে, এই সম্ভাবনার উপর জোর দেওয়া উচিত। বর্তমানে জোর দেওয়া হচ্ছে, আমরা ওদের সাহায্য করব, তার উপর, ওদেরকে শেখানো যাক, ওদের নিজ সংস্কৃতি ও শিল্প দুর্মূল্য বস্তু, এবং আমরা তা শ্রদ্ধা করি, আমাদের প্রয়োজনও আছে ওসবের। যখন ওরা বুঝবে, যে দেশকে দেবার মতো সম্পদ ওদেরও আছে, ওরা নিজেদের দেশের অঙ্গ বলে মনে করবে। ওদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য এর গুরুত্ব আছে।

৫. ওরা নিজ স্বাধীনতা, বাঁচার জিজীবিষা যেন না হারায়, সেটা বিনিশ্চিত করার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমি যা বলেছি, সেটাই শেষ কথা :

> 'মন খুলে আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে
> বড় আর কোন আশীর্বাদ পেতে পারে মানুষ?'

তিরিশ বছর আগেই, আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো আমার চিন্তায় নিহিত ছিল। আমার অভিজ্ঞতা যেমন বাড়তে থাকে, সমগ্রভাবে দেশের অবস্থাই পালটে যায়, জোর দেবার জায়গাগুলো বদলে যায়। গোড়ার দিকে আমার ধ্যানধারণা ছিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু তীব্র। আমার চোখে সমস্যাটা ছিল মূলত আধ্যাত্মিক। প্রতিটি দয়ার কাজকে প্রতীকী মনে হ'ত। ক্রমে সময়ের রূঢ় বাস্তবতার কারণে আমি জোর দিতে থাকলাম ওদের রক্ষা করবার প্রয়োজনের উপর। আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন হই আরো অনেক পরে। উত্তর-পূর্ব ভারতে সুরক্ষা আগেই বিনিশ্চিত করা

হয়েছিল। আদিবাসীদের মধ্যে যা ভালো, তা ধ্বংস না করেই আমাদরে জীবনে যা ভালো, তা কেমন করে দেওয়া যাবে, সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অন্তর্দেশীয় রাজীনীতিক বিষয়, এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সমাহার ইদানীং আমাদের চিন্তাধারাকে একীকরণের গুরুত্ব বিষয়ে ভাবিয়েছে। যদিও স্বাধীনতার সময় থেকেই আমরা অনেকে এ বিষয়ে ভাবছিলাম। অবশেষে আমি দেখি এক বিশাল কঠিন মহতী পরিকল্পনা। তার একদিকে থাকবে খাদ্য, স্বাস্থ্য, গতিশীলতা ও জ্ঞানার্জন বিষয়ে প্রকল্প। অপরদিকে থাকবে আদিবাসী সংস্কৃতি বিষয়ে বৃহত্তম অর্থে শ্রদ্ধা ও উৎসাহদান। তার মধ্যে থাকবে ধর্ম, ভাষা, স্বশাস্তি গ্রামীণ সংগঠন, সমাজনীতি। এই দুই লক্ষ্যকে মেলানো; ধ্বংস না করেই উন্নয়ন করা, সহজ কাজ নয়। তবে আমার বিশ্বাস, এটা করা যেতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

চূড়ান্ত উচ্চাশা

'সকল উচ্চাশার শ্রেষ্ঠ পরিণতি হ'ল, স্বগৃহে সুখী হওয়া।'

—স্যামুয়েল জনসন

এক

বিগত নয় বছর আমরা শিলংয়ে আছি। যদিও মাঝেমাঝেই গেছি সফরে, কখনো বা অনেকদিনের জন্য, এখানেই এখন আসল বাড়ি। কুমার, আসাম রাইফেল্‌স্‌-এ ঢুকেছে। ও এখন আমাদের কাছেই আছে। তবে ছোট ছেলেরা সেই বয়সে পৌঁছিয়েছে, যখন ওরা খুব ভালো, বেজায় দুর্দান্ত, এবং অগোছালো।

ছেলেরা পৃথক পৃথক ধর্মে বিশ্বাসী, অন্তত ওরা তাই বলে। সতেরো বছর বয়সে কুমার হয়ে গেল রোমান ক্যাথলিক। স্বমতে কাজ করার বয়স ওর হয়েছিল। কান্তু ঘোষণা করেছে, ও হিন্দু এবং 'গোমাংস খেতে নারাজ।' নকুলের ঘোষণা ও প্যাগান। অশোক 'বৌদ্ধ', কিছু স্তোত্র আবৃত্তি করতে পারে এবং আমাদের গৃহ বেদীতে পুষ্প অর্ঘ্য দেয়। লীলা এবং আমি কোনো বিশেষ ধর্ম মানিনা। তবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার বেশ টান আছে।

লীলা হ'ল বাড়ির কেন্দ্রবিন্দু; ঘরের চাবিকাঠি; আনন্দের ভাণ্ডার; আমাদের সকলের জন্য স্বর্গের শ্রেষ্ঠ উপহার। কংগ্রীভের ভাষায়, ও চাঁদ আর আমি চাঁদের মানুষ। এখনো আমি ওর বিষয়ে কিঞ্চিৎ পাগল। যখন প্রথম ওকে দেখি, তার চেয়ে আজ ওকে অনেক বেশি ভালোবাসি। যাকে আর্থার কোয়েসলার বলেন, অভ্যাসের ফলে অসাড় হয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক পরিণতি, আমাদের ক্ষেত্রে তা খাটে না।

ভারতীয় জীবনে বিবাহ এবং পরিবারই কেন্দ্রবিন্দু। ডক্টর রাধাকৃষ্ণান যেমন বলেছেন, 'সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে প্রচণ্ডভাবে বিচ্ছিন্ন হলে তবেই কেউ আধ্যাত্মিক মুক্তি পেতে পারে— এ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন হিন্দু চিন্তাধারায় কমই মেলে। অপরপক্ষে, নির্দেশই আছে, কর্তব্যবোধ ও জ্ঞানসহ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে, কী তার মূল্য? তা জানতে হবে, এবং এ থেকে যে আনন্দ মেলে, তা গ্রহণ করতে হবে। মানবসত্তার গভীরতা ও বিস্তার, গভীর ধ্যানাবেশ, আবার নির্বাধ বেপরোয়া উচ্ছ্বাস। এসব কিছুর যোগফলই অধ্যাত্মজীবন।

আবার ভারতের কিছু আধ্যাত্মিক নেতারা বিবাহ বিষয়ে হীনমত পোষণ করেন।

একজন বলেন, 'আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যে ভালবাসা তা একেবারে জান্তব।' 'মানুষ আবিষ্কার করে মানবীয় প্রেম অতীব শূন্যগর্ভ।'— 'সাধারণ প্রেম হ'ল শারীরী আকর্ষণ।'— আরেকজন বলেন, 'বিবাহ চিন্তার মধ্যে লালসার অনুপ্রবেশ ঘটা উচিত, এ আমি মনে করি না।' এবং এক তৃতীয়জন, বিশাল সন্ত হিসেবে যাঁর সর্বত্র সম্মান, তিনি বলেন, 'স্ত্রী স্বামীর প্রতি যা অনুভব করে, সেটা ভালবাসা নয়। তার ভালবাসার ভিত্তিতে আছে সে নিজে। স্বামীকে ভালবাসে, কেননা স্বামী তার সম্পত্তি।'

তবু, বিবাহিত জীবনে যৌনতৃপ্তি বন্ধ করা আবশ্যিক নয়। আজ বিবাহে আবেগ দরকার। এত বিয়ে যে ব্যর্থ হয়, তার কারণ এই আবেগের অভাব। সুখের উপকরণ হ'ল শিল্প, কলাকৌশল। অ্যাডভেঞ্চার ও আবেগ। যৌনতা ভালো, খুব রমণীয়। কবিরা এ বিষয়ে অনেক উচ্ছ্বসিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতেও এর সৌন্দর্য ও আনন্দ ফুরোয় নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, শরীরের মিলন যে আনন্দ দেয়, শুধু তাই নয়, — (আমি নিজে তো খুবই আনন্দ পাই), বড় হ'ল, আরেকজনের সঙ্গে নিজেকে মেলানো, নিজ হতে বেরিয়ে অপরে মেশা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'আমাদের নাগালের বাইরে অবস্থিত কিছু, ভালোবাসা তারই প্রমাণ। নাগালের বাইরে কিন্তু তা ভীষণভাবে বেঁচে আছে। আমাদের নিজস্ব সত্তার অনুভূতিকেই তা জাগিয়ে তোলে। ভালোবাসার সঞ্চিত বস্তুর বাস্তবতার ওপর তা উজ্জ্বল আলো ফেলে।'

আমি খুব ভাগ্যমন্ত। আমার স্ত্রী তরুণী, অপরূপা, আমাকে ও নবীন করে রাখে। লীলা যদি আমাকে ওর সম্পত্তি বলে গণ্য করে, আমি খুব রাজি। নিঃস্বার্থ অধিকারের পারস্পরিক অনুভূতি, এক সুখী বিবাহের দুর্মূল্য ঐশ্বর্যগুলির মধ্যে একটি।

ও আমার শস্যক্ষেত্র, ওর হলরেখা বেয়ে চলে
বৃষ্টির মতো, আমার পথ। ওর ছায়ার শস্য
যেন হ্রদ, যেন অশান্ত সাগর— ওর আছে পাহাড়
পালকের চেয়েও অবাক করা, মাছের মতো শক্ত।
ওর খাঁজে ছায়া পড়ে বাগিচার ফলগাছের
যা চাঁদের বৃত্ত ঘিরে পাক খেয়ে জোয়ারের মতো
ঝরে পড়া আপেলের ওপর সঞ্চরমান ঘাসের জাল।

আদিবাসীকে মেয়েকে বিয়ে করেছেন, এমন একজন বলেছিলেন, জাতীয় সংহতির কাজ এগিয়ে নেবার স্বার্থেই তিনি এ কাজ করেছেন। কিছু রাজনীতিক এমতো বিবাহের সপক্ষে এক পলিসির ওকালতি করেন, যাতে আদিবাসীদের বাকি ভারতের কাছে আনা যায়। কোনো তত্ত্বের কারণে নয়, লীলাকে আমি বিয়ে করি ওকে ভালবাসি ব'লে। এমন সব বিয়ে উৎরোয় না, সে তো আমার প্রথম বিয়ের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তবে এ বিয়েতে দুজনেই খুব সুখী হয়েছি। আমাদের কিছু বন্ধুবান্ধব এতে খুব অবাক। কেননা পারিবারিক পটভূমি, শিক্ষাদীক্ষা ও মেজাজে দু'জন দুই

মেরুতে। তবু লীলার মধ্যে পাই নিখাদ বন্ধুত্ব, সাহচর্য। এমন একটি স্ত্রী থাকলে মন্দ হ'ত না, যার সঙ্গে আমি এজরা পাউণ্ডের প্রতীকিয়তা অথবা টয়েন্‌বির ইতিহাসের তত্ত্ব আলোচনা করতে পারতাম। কিন্তু লীলার আনুগত্য, সমবেদনা এবং বুঝবার দুর্লভ ক্ষমতা অনেক বেশি দুর্মূল্য। দুজনের মধ্যে পার্থক্যের কোনো বোধই নেই। কার্যকালে দেখি আমরা সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমান অংশ নিতে পারি। আমার চেয়ে লীলার পক্ষে কাজটা কঠিন। কেননা আমাকে প্রায়ই চলে যেতে হয় খুব উত্তেজনাসঞ্চারী কোনো কাজে। কখনো বা আমি ব্যস্ত থাকি কোনো জরুরি সমস্যা নিয়ে। 'অফিস'টা মাঝে মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু ও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। যা কিছু চলে, তাতে ওর জ্বলন্ত আগ্রহ। স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসা সর্বদাই সন্তানদের মধ্যে কাজ করে চলে। আনন্দ তাকে আবার নতুন করে, উদ্বেগ ও দুঃখ করে শক্তিসঞ্চার। যে 'প্রেমজ বিবাহে' ভালবাসার প্রেরণা জোরালো— পৃথিবীতে পবিত্রতম সুখের দোসর সে বিবাহ।

প্রথমে একটা মুশকিলে পড়ি, অনেকেই ভাবতে পারত না আমরা বৈধ দম্পতি। এমন সুন্দর একটি মেয়ে, মিনি ইমারসনের ভাষায় যে তাকায় বনের এক চকিতা হরিণীর মতো, —উদ্ধৃত কবিতাটিতে অ্যালেক্স কম্‌ফর্ট যার অমন সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, সে আমার মতো উসকোখুসকো, ধসে পড়া, বুড়ো ভালুককে সত্যিই বিয়ে করে কি করে?

অন্যেরা শুধোয় ওকে বিয়ে করলাম কি করে! 'সেক্‌স্' ব'লে ওরা হাত ধুয়ে ফেলে। উত্তরে আমি শুধোই, এই-বা কেমন কথা, যে ঠিক সে-রকম মেয়েদেরই পছন্দ করি, যারা লীলাকে পছন্দ করে? প্রয়াত সার আকবর্ হায়দরীর মেয়ে আমিনা জয়াল তেমন মেয়েদের মধ্যে প্রথম। ও কৌতুকবোধসম্পন্ন, হাসিখুশি, বুঝদার মেয়ে। আমরা ওর চমৎকার ছেলে মেয়ে পিম্পি আর লাড্ডুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। ওর ছোট ছেলে আকবর শোচনীয়ভাবে তিন বছর বয়সে মারা যায়। তার কবর আমাদের বাড়ি থেকে দেখা যায়। ডিভোর্সের পর ও যখন নলিনী জয়ালকে বিয়ে করে, হিন্দুমতে অনুষ্ঠান আমাদের বাড়িতেই হয়। আমি ওর পিতার স্থান নিই। লীলার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন, কোমলপ্রাণ, নরম মানুষ কান্তা ধর; লাবণ্যময়ী, মার্জিত, কৌতুকপ্রিয় পঙ্কজ কাকতি; আর ওঁর মেয়ে কাকু। পঙ্কজের মৃত্যু আমাদের খুব আঘাত দিয়ে গেছে। আসাম রাইফেল্‌সের এক সম্মানিত অফিসারের স্ত্রী পুষ্পা শর্মা 'চাননি' দুগাল,— এঁর স্বামী বার্নার্ড আমার অনেকদিনের বন্ধু; এলি দুয়ারা, উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু নাকতোলা নন; গীতা কৃষ্ণাত্রি এবং অনেক শিলংয়ের গৌরব অনেক সুন্দরী ও গুণবতী খাসি ও লুসাই মহিলা; আরো অনেকে, যাঁদের কথা এ বইয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে।

মানিয়ে নেবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আছে লীলার। সুদূর এক আদিবাসী গ্রাম থেকে প্রায় সোজা চলে আসে শিলংয়ে। আর তিন মাসের মধ্যেই পার্টিতে প্রশংসিত হবার

মতো গৃহকর্ত্রী। যখন অবরে-সবরে কোনো মহামান্যব্যক্তি দেখা করতে আসতেন, আমার চেয়ে অনেক মাথা ঠাণ্ডা থাকত ওর।

তবে বলতে পেরে ভালো লাগছে, অন্তরে ও সেই গ্রামের মেয়েই আছে। সব সময়ে চায় গাছ লাগাতে, জীবজন্তু খুব ভালবাসে। যেমন আমাদের বাচ্চা অ্যালসেশিয়ান রানী। বাড়িতে খুব খাটে, উল বোনার কাজে বেশ দক্ষ হয়েছে। লোকে যেমন বলে, ওর 'গ্রেট ক্যারেক্টার' আছে। খুব দৃঢ়চিত্ত হতে পারে। অধিকাংশ আদিবাসীর মতো হামবড়াই ও ভণিতা ধরে ফেলে। লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে আমি দ্রুত আবেগে উছলে উঠি, তবে ও বেশ বিচক্ষণ— আমার চেয়ে বেশি হুঁশিয়ার। খুবই দয়ালু, — লোকজনের বেলা বেশ কড়া, কিন্তু সামান্য দুঃখ দেখলেই গলে যায়। আমাদের জানাচেনা কারো ভরপেট খাওয়া জোটে নি জানলে, তার ব্যবস্থা না হওয়া অবধি নিজে খেতে পারে না।

দুই

এক রবিবার শিলংয়ে অশোক জন্মায়। ভোর থেকেই লীলার ব্যথা শুরু হয়। তবে ও কিছু বলে নি। বলল, 'রবিবার শিলংয়ে কারো ব্যথা ওঠে না, তাই আমারও ব্যথা উঠতে পারে না।'

আমার মনে হচ্ছিল ও খুব সুস্থ নেই। ওকে শুইয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহের আগে কিছু হবে বলে আমিও ভাবিনি। সৌভাগ্যবশত একটি ভালো মেয়ে গীতা মেহতা (এখন ত্রিবেদী), চা খেতে এল। ও ডাক্তারও বটে। সেটা ভিক্টরের জন্মদিন। ও আমাদের এখানেই ছিল। আমরা একটা চকোলেট কেক আনি। তার উপরে লেখা 'হ্যাপি বার্থডে ভিক্টর।' ফুকন এল। মণিপুরে ও আমার খুব দেখাশোনা করেছিল। ও P.G.W. বিষয়ে অনেক জানে। তারপর গীতা এল অপূর্ব চন্দর সঙ্গে। অপূর্ব একদা বঙ্গের ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশান ছিল, দারুণ মানুষ! সবার উপরে ছিল ফরেস্ট অফিসার, পুরনো দোস্ত। গণপৎ রাই। উপহার এনেছিল কাঁচা কলার এক পেল্লায় কাঁদি।

ফুকন কথা বলছে লর্ড এম্‌সওয়ার্থ'স পিগ' নিয়ে; অপূর্ব বলে যাচ্ছে টি. এস. এলিয়ট বিষয়ে, ভিক্টর প্রতীচ্যের অবক্ষয় নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, গণপৎ বলছে নেফা ভ্রমণকালে সে কিভাবে 'পা দিয়ে পিষে দু'শো সাপ মেরেছে', সবাই একসঙ্গেই কথা বলছে। এর মধ্যে এল গীতা। বলল, অমরা যদি লীলাকে এখনি হাসপাতালে না নিই, তাহ'লে ও ড্রয়িংরুমেই সন্তান প্রসব করবে। আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠি। গীতা হাসপাতালে টেলিফোন করতে চেষ্টা করছে। সেখানে সবাই গেছে চার্চে, কারো করার নেই কিছু। শেষে মিলল এক সিসটারকে। তিনি বললেন, মহিলা কাল এলে হয় না? রবিবার কাজ করতে কেউ পছন্দ করে না।— আমরা ঠিক করলাম রওনা হব।

জিনিস গোছাও। কম্বল খোঁজো, আয়াকে তৈরি হতে বলো, বাচ্চাদের শান্ত করো। আর অপূর্ব দরাজ গলায় অক্লান্ত বকে যাচ্ছে, এখন ডিলাস টমাস বিষয়ে।

অবশেষে লীলা, গীতা, আয়া আর আমি গাড়িতে উঠলাম। ভিক্টর গাড়ি চালাল। গাড়ি ভালো চলে না। বললাম, ভিক্টর হচ্ছে সেই পাইলট, যে এক লজ্ঝড়ে ডাকোটা বিমানে অ্যাটম বোমা নিয়ে যাচ্ছে। শেষ অবধি পৌঁছলাম হাসপাতালে, পেলাম একজন সিস্‌টারকে, চমৎকার একটা ঘর মিলল। লীলাকে বেডে শুইয়ে ডিনার খেতে বাড়ি এলাম। রাত দশটায় ভিক্টর, কুমার আর আমি কম্বল-টম্বল নিয়ে সারারাত জাগব বলে তৈরি হয়ে এলাম। একটা ওয়েটিংরুমে আমরা বসলাম। ভিক্টর পেয়ে গেল হাসপাতালের বাইবেল। বলল, অনেকবার পড়তে চেয়েছে, সুযোগ মেলে নি। আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের অবাক করে রাত ১১.১০-এ ডক্টর হিউস্ শ্রান্ত ক্লান্ত, উসকোখুসকো চেহারায় এসে বললেন, 'ছেলে হয়েছে।' ওঁর তো রবিবারেও ছুটি নেই। কিছুক্ষণ বাদে আমরা লেবাররুমে গেলাম। স্ট্রেচারে শুয়েছিল লীলা। কিছুটা বিধ্বস্ত। স্ট্রেচারটা ওর ওয়ার্ডে আসতে আমিও হাত লাগালাম। বাচ্চাটা খুব চেঁচাচ্ছিল, দেখতেও বেশ। লীলাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে, ও ঝিমোচ্ছিল। 'শুভরাত্রি' বলে আমরা মাঝরাতে বাড়ি ফিরলাম। এ ভাবেই অশোক জীবন শুরু করে।

তিন

দুনিয়ার সব আনন্দময়ী জিনিসের মধ্যে শিশুরা সবার সেরা। আবার তাদের মধ্যে আদিবাসী শিশুদের তুলনা হয় না। জীবন যখন অসহ হয়েছে, শিশুরাই সে জীবনকে সুসহ করেছে। সে মাণ্ডলার গ্রামে গ্রামেই হোক,— সেখানে ওরাই ছিল শ্রেষ্ঠ সঙ্গী,— অথবা সফরের সময়েই হোক,— বা শিলংয়ে স্বগৃহেই হোক। ওরা এমন প্রাণবন্ত, যে আমাদের মনের অন্ধকারকে তুচ্ছ মনে হয়। ওদের সৌন্দর্য, আমাকে জীবনীশক্তি জোগায়। যেহেতু ওরা আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতীক, আমাদের উদ্বেগ ও নিরাশা কেটে যায়। জীবনে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ যা কিছু শিশুরা তার মধ্যে পড়ে।

পাটানগড়ে আমাদের বাড়ি জুড়ে ছিল গোণ্ড্ ও পরধান শিশুরা। আমার ছিল মস্ত বড়ো লেখার টেবিল। সেটা লুকোচুরি ও অন্যান্য খেলার জায়গা ছিল। দিনের যে কোনো সময়ে দেখা যেত, হয় টেবিলের নিচে, নয় টেবিলের ওপরে ওরা খেলছে। আপাত মনে হবে, এক লেখকের পক্ষে এটা বিরক্তিজনক। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর ফলে আমার মনোনিবেশের ক্ষমতা দারুণ বেড়ে গেল।

যখন দেখি কেউ কিছু লিখছে, খুব পা টিপে টিপে ঢুকি, ফিসফিস করে কথা বলি। গ্রামে, অথবা নিজের বাড়িতে আমার বেলা কেউ এমনটি করে নি। বিশাল গণ্ডগোলের মধ্যে মনোনিবেশ করবার ক্ষমতা আমি এমন আয়ত্ত করেছি, যে আমি সর্বাবস্থায় লিখে যেতে পারি। অসুবিধা, বা বিরক্তি হয় না। অবশ্য যখন আমাকে

টেবিল থেকে টেনে তুলে পিঠে দুটি শিশুকে বসিয়ে হামাগুড়ি দিতে হয়, তখনকার কথা আলাদা। প্রথমে আমি ঘোড়া ছিলাম। খানিক মোটা হলে ওরা ঠিক করল, আমি হাতি। কুমার একবার বলেছিল, আমি জলহস্তী।

সফরের সময়ে, সে মধ্যভারতে হোক, বা সীমান্তে, আমার তাঁবুতে সবসময়ে থেকেছে ভিড়। মনে হয়, ওরা ভেতর থেকেই বুঝতে পারে, আমি ওদের দলের লোক। অত্যন্ত চমৎকার কিছু বালক দেখেছি বণ্ডোদের মধ্যে। তেমনটি অন্যত্র সর্বদা দেখা যায় না। এদের বিষয়ে আমি ডক্টর জনসনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলব, 'এ বয়সের বাচ্চা কুকুরদের আমি ভালবাসি।' অন্য শিশুরা এতই আপনজন হয়ে যায়, এমন সহজ, যে আমার মুখ থেকে চুরোটটা তুলে নিত, নিজেরা একটু টানত, হাতে হাতে বন্ধুদেরও টানতে দিত, শেষে আমার মুখে গুঁজে দিত। কোথাও কোথাও, বিশেষ সাওরা গ্রামে, বাচ্চারা খাওয়ায় সময়ে আসত। একেক সময়ে একটু খাবারের জন্যেও লড়াই করতে হত একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে। আমার প্লেটে যা থাকত, সেদিকে হাত বাড়াত, নিজেরাই খাবার তুলে টুলে নিত।

নেফাতে একটি ব্যাপার বড়ই আঘাত দিত। গাঁওবুড়োরা আমার তাঁবু থেকে বাচ্চাদের তাড়িয়ে দিত। ভাবত, সাহেব বিরক্ত হবে। সাধারণত কিছুক্ষণ বোঝাতে হত। তখন ওদের বিশ্বাস হ'ত, সাহেব শিশুসঙ্গ ভালবাসে। আদিবাসীরা নিজেরা শিশুদের খুব ভালবাসে। কতকগুলো স্মৃতি বুক ভেঙে দেয়; কোনো শিশুর অন্ত্যেষ্টি, অথবা একটি শিশু মরছে, অসহায় বসে আছি।

এই বিশাল পরিবার থেকে ফেরা যাক কাছে, আমার সন্তানদের কাছে। সবার বড়ো কুমার। শৈশবে ভারী মিষ্টি ছেলে ছিল। বড় যখন হ'ল, সঙ্গী হিসেবে খুবই ভালো। পায়ে হেঁটে আমার সঙ্গে দুটো লম্বা সফর করেছে। একেবার দু'শো মাইল সফর। তা উত্তর সিয়াং-এ, আবার তিরাপ-এও। বসন্তও আট, আর নয় বছর বয়সে দু'বার আমার সঙ্গে ঘুরেছে। দুরান্তের, সুন্দরী লুসাই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালিয়ে রোমাঞ্চকর সফরে যখন সবাই গেলাম লাংলেহ্-তে নকুল আর অশোকও সঙ্গে ছিল।

ওদের নিয়ে বিমানপথে যাওয়া খুবই মজার। একদিন বড় বড় মেঘ ঘনিয়ে আসছে, আমি শঙ্কিত চোখে চেয়ে আছি। বসন্ত্ বলল, 'ড্যাডি, মেঘগুলো দেবদূতদের মতো দেখতে। ভয় পাবার কিছু নেই।' যখন মেঘের মধ্যে ঢুকে গেলাম, ঠোক্কর খেয়ে প্লেন লাফাচ্ছে। কমলারঙা আলো জ্বল্‌ছে বারবার, ও উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কি মনে হচ্ছে, আমরা কি মাটিতে আছড়ে পড়ব?' পরে নকুলকে জিগ্যেস করলাম, ও ভয় পেয়েছিল কি না। ও বলল, 'ভয় পাব কেন? আমার সীট বেল্‌ট তো আঁটা আছে।'

সত্যিই অমায়িকভাবে গাল দেবার জন্যে ছেলেরা নিজেদের শব্দভাণ্ডার তৈরি করেছে। অশোক সবচেয়ে মৌলিক। প্রশংসনীয় শব্দব্যবহার করে ও বলেছিল, 'তুমি নন্‌সেন্‌স! বেরিয়ে যাও, মোটা ইংরেজ!' যদি ওকে চার আনা না দিই, ও আমাকে

আক্রমণ করে। যখন ওর বয়স তিন বছর, আমার বোন এল্‌ডাইথ এসেছিল। ক'দিন বাদেই কি কারণে যেন অশোক ওর ওপর চটেছে। আর তোড়ে ওর মুখ থেকে হিন্দী খিস্তির বন্যা বেরিয়ে এল।

এলডাইথ বলল, 'মিষ্টি সোনাটা কি বলছে?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ও বলছে, পিসিকে ওর কত ভালো লাগে! পিসি এসেছে বলে ও কি খুশি!

যখন এলডাইথ চলে যায়, নকুল তখন বছর চারেকের। পিসির হাত টিপে বলল, 'খুব ভালো মাংস!'

'এ ফিলসফি অফ লাভ্'-এর ওপর আমার প্যাটেল মেমোরিয়াল লেকচার রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়। অশোক কিছু কিছু শুনেছিল। তারপর ওর নিজস্ব অবদান, 'যখন বড় হব, কোনো সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করব না। তখন শ'য়ে শ'য়ে পুরুষ আমাকে ভালবাসার জন্যে পেছনে দৌড়বে আর বলবে— এসো আমার কাছে এসো। গার্লফ্রেন্ড!'

ছোটদের মধ্যে বসন্ত্ মর্মায়ী এবং স্নেহশীল; নকুল সুবুদ্ধি, কঠোর পরিশ্রমী। স্কুলে খুব জনপ্রিয় আর অসুখে বিসুখে খুব চমৎকার শান্ত থাকে; অশোকের মাথায় নানা আইডিয়া এবং চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধি ধরে।

বসন্তের সর্বদা কিছু না কিছু হয়। যখন ও খুব ছোট, বই বোঝাই এক আলমারি ওর ঘাড়ে পড়ল। ভাগ্যে আলমারিটা একটা টুলের ওপর পড়ে— যদিও ধপধপিয়ে বই পড়ল, ও ভয় পেয়েছিল। তবে চোট লাগে নি। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড দেখার জন্য একবার লীলা ও ছেলেদের নিয়ে আমি দিল্লী যাই। দশলক্ষ মানুষের ভিড়। সব শেষ হতে আমরা বেরিয়ে আসছি। বসন্ত্ ওই ভিড়ে হারিয়ে গেল। ওর বয়স তখন আট। ছেলেধরার ভয় দেখানো গল্প আমরা সমানে শুনেছি। অশোক বলল, ও দেখেছে বসন্ত এক বুড়ী ভিখারিণীর সঙ্গে চলে যাচ্ছে। শুনে আমাদের উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। খুব যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। অসহায় মনে হচ্ছে আমাদের। শান্ত শিলংয়ের এই ছোট্ট শিশু, এই বিশাল নগরীর বিপুল ভিড়ের মধ্যে, — এ ভাবলে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে। নিখোঁজ বাচ্চাদের জন্য অনেক পুলিস ক্যাম্প। সেখানে যাচ্ছি, দেখছি একেকটিতে বিশ-ত্রিশজন ছেলেমেয়ে মায়ের জন্য কাঁদছে। ওদের মুখটা দেখি, না, বসন্ত্ নয়। ক্ষেমলাল রাথী ওর গাড়ি আনল এবং ওর জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠাল। ইনি গণণা করে বললেন, বসন্ত পাঁচ ঘন্টা বাদে ফিরবে। বলতেই হবে, বিশেষ ভরসা পেলাম না। আমরা গাড়িতে দিল্লীর পথে পথে ঘুরছি। ঘন্টায় ঘন্টায় শঙ্কা বাড়ছে। আমাদের এক তরুণ অফিসার তপন কুমার বরুয়া,— সে তখন দিল্লীতে। ওকেই ধরলাম। বসন্ত্‌কে নিয়ে যেবার সফরে বেরোই, ও সঙ্গে ছিল। ও নিজে বেরিয়ে গেল খুঁজতে। ৫.৩০ নাগাদ বেচারি লীলার হিস্টিরিয়া হবার উপক্রম। আমার মনে হয়,

জীবনে কখনো এতো হতাশ বোধ হয় নি। ততক্ষণে আমরা, প্রায় সবাই, এবং রাথীরাও শঙ্কিত, যে ও চুরি গিয়েছে।

আর জ্যোতিষী যেমন বলেছিলেন, মোটামুটি সেই সময়ে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। তপন কুমার, সহাস্যমুখ বসন্ত্‌কে নিয়ে নামল। উদ্বেগের অবসানের ফলে জীবনে প্রথম আমি কেঁদে ফেলি। বসন্ত্‌ নিজের অ্যাডভেঞ্চারে মশগুল। ভিড়ের মধ্যে ঘুরছিল, তেমন ভয়ও পায় নি, ও তো জানত যে আমারা ওকে খুঁজে বের করব। অবশেষে এক ভালো পুলিস ওকে পায়। ওকে বিস্কিট দেয়, নিজের রিভলভার দেখায়। তবে ওই ক'ঘন্টার মানসিক চাপ কাটাতে লীলার অনেকদিন লেগেছিল।

আমার অসুখ হলে বসন্ত্‌ ভারি ব্যস্ত হয়। আমায় সেবা করে, বারবার শুধোয় আমি কেমন আছি। বহু ভারতীয় শিশুর মতো 'গতকাল' এবং 'আগামীকাল'— এর ইংরিজি ও গুলিয়ে ফেলে। হিন্দীতে তো সবই 'কাল'। মাসের পর মাস নিত্যি ও শুধোত, 'ড্যাডি, আগামী কালের চেয়ে ভাল আছো তো?' এতে আমার একটা চমৎকার কল্প-বিজ্ঞানীয় অনুভূতি হ'ত। যেন আমি সময়সীমার বাধাবন্ধের বাইরে চলে গেছি। একদিন হঠাৎ আমার অবস্থা একটু মন্দ হয়। কখনো ভুলব না, তা দেখে ভয়ে বসন্তের আর্ত হাহাকার। দু'গাল ভাসানো চোখের জল। সে উদ্বেগ মুহূর্তে যে ভালবাসা প্রকাশ পায়, তা আমার জীবনের দুর্মূল্যতম অভিজ্ঞতার একটি।

অশোক বাড়ির ব্যবসাদার। চার বছর বয়সেই ও ঘোষণা করেছিল, 'ড্যাডি! আমি টাকা ভালবাসি।' যখন অন্য ছেলেরা সিনেমা যায়, ও প্রায়ই যায় না, এবং তার বদলে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। যদি ওকে ইঞ্জেকশান নিতে হয়, ওকে ফি দিতে হয়। ছোট ছোট দোকান করে, যা নিয়ে ঘোরা যায়, প্রত্যেককে সওদা বেচে। ডাকটিকিট জমায়, যার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা প্রচুর। মেডেলে, অন্তত তার অর্থমূল্যে ওর খুব আগ্রহ, — পরিবারের সকলেরই। ভারত ও ইংল্যান্ডের অ্যাকাডেমিক সোসাইটি থেকে সৌভাগ্যবশত আমি অনেক মেডেল পেয়েছি। আশোকের হিসাব সিধা। আমার 'রিভার্স' বা 'ওয়েলকাম' মেডেলের মতো যদি তা ব্রোঞ্জের হয়, ওর আগ্রহ নেই। ওগুলোর দাম তো সামান্য। কিন্তু সোনার তৈরি হলে তার কথা আলাদা। আমার আছে তিনটি। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির 'রয়' এবং 'এনানডেল' মেডেল; বম্বের এশিয়াটিক সোসাইটির দিব্যি ভারিসারি 'ক্যাম্‌পবেল' মেডেল। আপিস থেকে চিঠি ওজন করার মেশিনের জন্যে দৌড়াদৌড়ি হয়। অশোক ও অন্যরা ওগুলো ওজন করে, আর বর্তমান বাজার মূল্যে ওগুলোর দাম কত, তার হিসেব কষে।

ভালো বাবা হবার মতো জবরদস্ত মানুষ আমি নই। ছেলেদের প্রতি আমার মনোভাব টমাস মোরের মতো। 'টু হিজ সুইটেস্ট চিল্‌ডরেন'-এ তিনি যেমন লিখেছেন :

আমি তোমাদের চুমা দিয়েছি অনেক, বেত মেরেছি কম
যদি কখনো মেরেও থাকি, সে তো ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে।

চার

পরিবারের অন্য যাদের বিষয়ে বলব, তারা আমার নিজের কর্মী। ওদের পেয়েছি, এ মস্ত সৌভাগ্য। আমার স্টেনোগ্রাফার সোমেশ্বর লাহিড়ী, আট বছর ধরে আছে। খুব বিশ্বস্ত ও কর্মদক্ষ। দুই খাসি টাইপিস্ট, হায়ার ল্যান্ড সাইয়েমলিয়েহ্ (এখন পদোন্নতি হয়েছে) এবং লক্হার্ট জাইরোয়া, খুবই ভালো, খুব। আমার ফিল্ড-অ্যাসিস্টান্ট। সুন্দরলাল নর্মদা, ওতো ত্রিশ বছর ধরে আছে। দুই চাপরাশি হরিচরণ আর ভজন আছে পাঁচিশ বছর ধরে। সুন্দরলাল আমার সঙ্গে প্রায় সব সফরেই গেছে। ও খুব দক্ষ ও দড় সংগঠকও বটে। আমার সফরকালে সাধারণ রুটিন হ'ল সুন্দরলাল ও ভজনকে আগে পাঠিয়ে দিই, যাতে ওরা ক্যাম্পটি গুছিয়ে ফেলতে পারে। আমার দ্বিগুণ জোর কদমে হাঁটে ওরা। হরিচরণ সঙ্গে থাকে। ব্রিজ পেরোতে হাত ধরে, খুব চড়া খাড়াই পথে উঠতে টেনে তোলে। ফলে যখন ক্যাম্পে পৌঁছই, একটি ছাউনি তৈরি। আমার জিনিসপত্র কোনো যুবাবাস, বা বাড়িতে গুছিয়ে রাখা, গরম গরম খাবার সর্বদাই তৈরি। অত্যন্ত কঠিন অসুবিধার মধ্যে ওরা কি করে রাঁধে, এত ভালো রাঁধে, এ চিরকাল আমার কাছে এক রহস্য।

হরিচরণ ও ভজন পরধান গোষ্ঠীর আদিবাসী। মাঝে মাঝে মুশকিলে পড়ে ওদের আদিমতর ভাইদের নিয়ে। সফরের সময়ে ছোট্ট রান্নাঘরে ভিড় জমায়, গভীর কুতূহলে সব কিছু নেড়ে চেড়ে দেখে। একবার এক গরমাগরম ঝগড়া হয়। ভজন হ্যাম-এর টিন খুলেছে, কিছু ওয়ান্‌চো জোর দিয়ে বলছে। ওটা মানুষের মাংস। একবার একজন 'উলঙ্গ' বণ্ডো ওর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে। হরিচরণ বলল, 'বাঘ এসে ওদের পাছাগুলো কচকচ করে খাক্!'

সুন্দরলাল আদিবাসী নয়। তবে ওর দৃষ্টিভঙ্গি খুব নরম ও সংবেদনশীল। ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল যাকে বলেছেন, 'আপিসের চুনোপুঁটিদের উদ্ধত হামবড়াই', ওর মুশকিল তাদের নিয়ে। একদা ও পাটানগড়ে, আমি কলকাতায়, ও টেলিগ্রাম পাঠাল, 'পুলিসকে লাথি মেরেছি। এখনি আসুন।' ভিক্টর আর আমি দৌড়ালাম ওকে বাঁচাতে। ভালোই করেছিলাম। লাথি মারাটা খুবই উচিত কাজ হয়েছিল, লোকটার তেমন লাগেও নি। তবে পুলিস তা বুঝবে, এমনটা আশা করা যায় না।

পাঁচ

শিলং-এ এনেছিলাম অনেক ফোটো, বড় বড় বাক্স বোঝাই নিদর্শ। ইচ্ছে, আমার চারদিকে মন-জুড়ানো এক আদিবাসী পরিবেশ গড়ে তুলব। যেমন, অতি চমৎকার সাঁওতালি কাঠখোদাই, যাদুপটুয়া পট, বিহার থেকে; গোণ্ড ও মুরিয়া মুখোশ। প্রথম পর্বের নাগা শিল্প, যা ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। বাড়িটা বড়। ওগুলো রাখার

আলমারি বানিয়েছিলাম। নেফাতে যেমন ঘুরতে থাকলাম, সংগ্রহ বাড়তে থাকল। অবশেষে হয়ে দাঁড়াল খুবই ঠাসাঠাসি, কিন্তু চমৎকার একটা মিউজিয়াম। এটি আমাদের ছোট্ট সংগঠন TWARU-এর সম্পত্তি। পরে এটি সরকারকে দিয়ে দেওয়া হবে। সংগ্রাহকের কাজে আমার যা অ্যাডভেঞ্চার, তা নিয়ে একটা অধ্যায় লেখা যায়, তত জায়গা তো নেই,— প্রতিটি নিদর্শের নিজস্ব গল্প আছে।

বৌদ্ধমূর্তি, মুখোশ, ছবি— কিছু তো আমি সুদূর উত্তর থেকে এনেছিলাম,— এগুলি একটি ঘরে চমৎকার সাজানো হ'ল। একটা কাজ হ'ল, খুব চমৎকার সব মানুষ পরম আগ্রহে এগুলো দেখতে আসতে থাকলেন। প্রথমাগতদের মধ্যে ছিলেন মিঃ নেহরু।

প্রধানমন্ত্রী আসার কয়েকঘন্টা আগেই চলে এল পুলিস ও সি আই ডি। ওদের ঘোর সন্দেহ, ওঁকে কি আদৌ আসতে দেওয়া হবে? আমাদের বাড়ি যে বড় নিরালায়। গাছ ও ঝোপে ঘেরা। ওরা বলল, এ সব গাছ ও ঝোপের আড়ালে থাকতেই পারে কোনো আততায়ী। শেষ অবধি, পঁয়ত্রিশজন সাদাপোশাকি পুলিস বাড়ির ভিতরে ও বাইরে মোতায়েন হ'ল। রান্নাঘরে ওরা। শোবার ঘরে ওরা। লীলা প্রত্যেককে চা আর মিষ্টি খাইয়ে চলল।

মিঃ নেহরু আসার আগে আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল, ওঁকে কি খাদ্য বা পানীয় দেওয়া যায়। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে ওঁর মতামত আমি জানতাম। তাই উত্তেজক কোনো পানীয়ের সপক্ষে ছিলাম। অন্যেরা ভাবলেন, সেটা বাড়াবাড়ি হবে। ফলে আমরা একটি ট্রে-তে রাখলাম এক বোতল ভালো শেরি। ধার করে আনা কয়েকটি ভালো গেলাস, মিউজিয়াম ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে সেটি রাখলাম। একই সঙ্গে ও ঘরের টেবিল রাখলাম ট্রেতে কফি ও পেয়ালা। গভর্নর, মিঃ জয়রামদাস দৌলতরামের সঙ্গে মিঃ নেহরু সব ঘুরে ঘুরে, প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখলেন, অনেক মন্তব্য করলেন, যা আমার কাছে আজও মূল্যবান। নিজে খুব নার্ভাস ছিলাম। সে আমাদের বিখ্যাত অতিথির কারণে নয়, তার কারণ, বাড়ির বাইরে অনামন্ত্রিত মানুষদের ভিড়। ওরা ঢুকতে চেষ্টা করছে, আমার ভয়, ওরা গোলমাল না বাধায়। যখন উপযুক্ত মুহূর্তটি এল, তখন আমি এতই বিব্রত, যে প্রধানমন্ত্রীকে কী দিই, তা ভাবতে পারছি না। সুরা তো নয়ই। বললাম, 'সার, এক পেয়ালা শেরি দিতে পারি?' বিদ্যুৎগতিতে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'না। আমার এক গেলাস কফিতেই চলবে।'

আরেক বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত জি. বি. পন্থ। ইনি আমার সংগ্রহ গভীর আগ্রহে দেখেন এবং এমন কিছু বলেন, যা আমার মূল্যবান সঞ্চয়। একটু অহংকেরে শোনাবে জেনেও তার পুনরাবৃত্তি করছি। উনি বলেন : "ভারতের সর্বত্র জনমনে আদিবাসীদের স্টেটাস উপরে তুলে ধরা ড. এল্যুইনের মহান এক কাজ। উনিই আমাদের জানালেন, ওরা নিছক পশ্চাৎপদ কোনো মানুষ

নয়। ওদের নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতি আছে। ওঁর কাজের কারণে সমগ্র ভারতে (আদিবাসী) নীতি প্রভাবিত হয়েছে।" পণ্ডিত পন্থ বরাবরই আমার প্রতি সদয় ছিলেন। ওঁর জীবনের শেষপর্বে ওঁর সঙ্গে আরো দেখা হয়। ওঁর সঙ্গে স্নেহবন্ধন প্রগাঢ় হয়। ওঁকে জেনেছিলাম, ওঁর জন্য কাজ করার সুযোগ হয়েছিল বলে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

আসামের মুখ্যমন্ত্রীও আসেন। বি.পি. চালিহা নম্র, দয়ার্দ্রচিত্ত মানুষ। আদিবাসীদের জন্য আশ্চর্যকর মমতা। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে, একবার উনি নাগা পর্বতে গেলেন, ঘুরে এলেন। কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা নেন নি। জঙ্গলের গহীনে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে, নাগা সমস্যার গভীরে গিয়ে সব জেনেবুঝে এমন এক রিপোর্ট লেখেন, যা পড়ে সবটা খুব বোঝা যায়। অমন রিপোর্ট আমি আর পড়িনি। ওঁর রাজ্যে আদিবাসীদের মানবিক ও রাজনীতিক সমস্যা সমাধানে উনি কী ম্যাজিক ব্যবহার করেছিলেন, জানতে চেয়েছিলাম একবার। উনি বললেন, 'খানিক বুঝে দেখা, নিখাদ শ্রদ্ধা, প্রচুর স্নেহমমতা। মানব হৃদয়ে এই সত্যি-ম্যাজিক আশ্চর্য কাজ করে।'

ছয়

ক'বছর আগে, এক সপ্তাহ শিলংয়ে আমাদের কাছে থেকে গেলেন আর্থার কোয়েসলার। উনি ভারতভ্রমণে এসেছিলেন। যেহেতু উনি স্বভাবগত ভাবেই এক বিতর্কিত মানুষ, ওঁকে সাংবাদিকরা ধরতে চেষ্টা করেছে, কমিউনিস্টরাও ঠুকেছে, সে যেখানেই গেছেন। একটু শান্তি চাইছিলেন, মনে হয় তা দিতে পেরেছিলাম। যা অপ্রত্যাশিত, উনি এমন প্রশান্তি ও মনোবলের পরিবেশ আনলেন বাড়িতে, যে লীলা বলল, যেন কোনো বড় সাধু ক'দিন থেকে গেলেন। লীলা সহজে প্রভাবিত হবার মেয়ে নয়। আর্থার বিনোবা ভাবে বিষয়ে বলেন, 'বিনোবার শান্তি সঞ্চারণের এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। তা শরীরে অনুভব করা যায়, যেন আঙুল বোলাবার মতো তাঁর উপস্থিতিতে মানুষের মনে হয় সে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।' আর্থার অবশ্যই একেবারে অন্যরকম মানুষ। আমার উপর ওর প্রভাবও অনেকটা অনুরূপ হয়েছিল।

তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে আর্থার ভারত ও জাপানে আসেন। আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, পশ্চিমের অচলাবস্থা এবং জটিল সমস্যাগুলির কোনো উত্তর প্রাচ্যের কাছে কী আছে? প্রতীচ্যের বিপদসঙ্কুলতাকে উনি দেখতে চেয়েছিলেন একটা নতুন অবস্থান থেকে 'এক পৃথক আধ্যাত্মিক অক্ষাংশ' থেকে। ওঁর অনিচ্ছুক সিদ্ধান্ত, ওঁর চরিত্রোচিত ঋজু : 'যোগ, জেন, বা অন্য কোনো এশীয় অতীন্দ্রিয়বাদ-এর কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেবার নেই।' আমার আনন্দ *দি লোটাস অ্যানড্ দি রোবট* উনি আমাকে উৎসর্গ করেন। এ বইয়ে ভারত ভ্রমণের কথা আছে। হয়তো স্বাভাবিকভাবেই

বইটি বহুজনের বিরক্তি উদ্রেক করে, বিশেষত ভারতের গোঁড়া হিন্দুদের, যাঁরা সমালোচনা সইতে পারেন না। অনেক সভাসমিতি ও প্রতিবাদ হয়। আমার সন্দেহ, গৈরিক ছদ্মবেশী কমিউনিস্টদের উস্‌কানিতে এর কিছুটা হয়েছিল।

এ কথা সত্যি, যে আর্থার ভারত এবং তার ধর্ম বিষয়ে অনেক কড়া কথা বলেছেন। তার কিছু তো বলা দরকারই ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকতা মনস্ক ভারতীয়রা তাঁর আগেই এ কথা বলেছেন। হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর্থার যা বলেছেন, তিনশো বছর আগে খ্রীশ্চান ধর্ম বিষয়ে তা বললে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হ'ত নিশ্চয়। কিন্তু সে সময়কে পেছনে ফেলে আমরা তো এগিয়েছি। খ্রিশ্চানধর্ম সবরকম আক্রমণ সহ্য করেছে, টিকেও গেছে। বস্তুত, এ কারণে তা বিকশিত ও উন্নত হয়েছে। একটি বইয়ে অনুরূপ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। তা হ'ল লিউবার 'দি সাইকোলজি অফ রিলিজিয়ান মিস্টিসিজ্‌ম।' খ্রিস্টীয় অতীন্দ্রিয়বাদের পক্ষে এ বই। আর্থারের যোগ বিষয়ক মন্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর, কেননা লিউবার বই অনেক বেশি অধ্যবসায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে লেখা। ফ্রেজারের 'ফোকলোর ইন্ দি ওল্‌ড টেস্‌টামেন্ট'-এর মতো বই, বাইবেলের অনন্য চারিত্র্যকে ধ্বংস করেছে। আর্থার হিন্দুধর্মের বেলা যা করেছেন, তার চেয়ে ফ্রেজারের বই অনেক বেশি ক্ষতিকারক। এ ব্যাপারে কিছু লোকের, জ্ঞানবিস্তার ও সংস্কার পন্থার বিরোধিতাকারী মনোভাব, আমাকে গত শতাব্দীর দুই বৃদ্ধার কথা মনে করিয়ে দেয়। ওঁরা চার্লস ডারউইনের লজ্জাকর থিওরির কথা আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, 'বানর আমাদের পূর্বপুরুষ? আশা করি এটা অসত্য। সত্যি যদি হয়ও, এসো প্রার্থনা করি, একথা চারদিকে সবাই যেন জানতে না পারে।'

দি লোটাস অ্যান্‌ড দি রোবট-এর সব কিছুর সঙ্গে আমি একমত নই। বইটি পেয়ে আর্থারকে লিখি ব্রহ্মচর্য বিষয়ে গান্ধীর পরীক্ষানিরীক্ষা বিষয়ে ওর লেখা একটা ভ্রান্ত ধারণা দেয়। *মাই ডে'জ উইথ গান্ধী* একটি খারাপ বই। আর্থার ওটির ওপর অত্যন্ত বেশি নির্ভর করেছিলেন। ওই একই বিষয়ে *গান্ধী : দি লাস্‌ট ফেজ* বইয়ে প্যারেলাল যে চমৎকার আলোচনা করেছেন, তা আর্থার দেখেছেন বলে মনে হয় না। এ বইয়ে জানা যায় গান্ধী নিজেকে মাতৃরূপে কিভাবে ভেবেছেন, এবং বইটি, গান্ধীর বিখ্যাত পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে কত অন্যরকম বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা করেছে। আর্থার যখন ছিল, বইটি আমার তাকে ছিল। বলতে লজ্জা হয়, বইটির দিকে ওঁর মনোযোগ আকর্ষণ করিনি। তবে আমাদের আলোচনাতেও তো ও প্রসঙ্গ আসে নি।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর্থারের নৈরাশ্যপূর্ণ মূল্যায়ন-এর সঙ্গেও আমি সম্পূর্ণ একমত নই। ও হয়তো পেশাদার লোকদের সাহায্য কিছু বেশি নিয়েছিল, অবশ্য বলা কঠিন, আর কিই-বা করতে পারত! কোনো হিন্দু খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে ইংলন্ডে পড়তে গেলে, তাকেও এক্‌সপার্টদের কাছেই যেতে হত। হিন্দু ও বৌদ্ধ অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে আমি

অনেক শিখেছি। তবে প্রতীচ্যের অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে গেলে আমি অনুরূপ শিখতাম না, এ কথা জোর করে বলতে পারি না।

সবচেয়ে দাগ কেটেছে যা, — সাধারণ, সরল মানুষদের উপর প্রাচ্যের ধর্মগুলি কিভাবে কাজ করেছে, সেটা জানা। বইয়ে যা জেনেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি শিখেছি ওদের কাছে। যেমন, একটি লোককে বলি গুড হ্যানসেনিয়ান। সে এক ভীল, হিন্দুধর্ম নিয়েছিল। সে দীর্ঘ পদযাত্রা করে, ভারতে যাকে বলে 'প্রদক্ষিণ'। পবিত্র নর্মদা নদীর, পশ্চিম ভারতের মোহনা মুখ থেকে, যার এক কূলে পাটানগড়ে আমাদের বাড়ি, সেই উৎস অবধি নদীর দৈর্ঘ্যপথ হেঁটেছিল। সে ছিল কুষ্ঠরোগী। অমরকন্টকে পৌঁছে, নিজের ঘরে যাবার মুখে রোগ এত বেড়ে যায় যে আমাদের আশ্রয়ে থাকল। এই বিকলাঙ্গ, ভীষণভাবে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আদিবাসী সাধুর মধ্যে আমি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতম রূপটি দেখেছি। অত যন্ত্রণা সত্ত্বেও ধীরস্থির, আনন্দময়। মনে পড়ে না কখনো অভিযোগ করেছে। ওর সহ-রোগীদের যথাসাধ্য সাহায্য করত। ওদের মেজাজ বিগড়ালে শান্তি সংস্থাপন করত। ওরা মনখারাপ করলে ওদের মনোভাব লঘু করত। ওর যে চ্যারিটি, সেবাকার্য, সে বীরের মতো। যে বিশ্বাস ও প্রশান্তি নিয়ে ও বাঁচত, তাই নিয়েই ও মরে।

যা বলেছি, আর্থার কোয়েসলারের বইয়ের সব কিছুর সঙ্গে আমি সহমত নই। জানি ও নিজেও তা চায়নি,—কিন্তু এমন এক লেখা, যা মানুষকে ভাবায়, উৎসুক করে, চ্যালেঞ্জ জানায়। তাকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করার বদলে স্বাগত জানানোই তো উচিত। পাস্তেরনাক বিষয়ে মতবিরোধিতা যখন উত্তুঙ্গে, তখন মিঃ নেহেরু বলেছিলেন, 'যা আমাদের মতে অধিকতর ক্ষমতাশালী মত, কোনো বিশিষ্ট লেখক যদি উক্তমতের বিরোধী অন্য মত লেখেন, সে লেখাকে শ্রদ্ধা করা উচিত, তার অবাধ প্রচার হওয়া উচিত।'

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী বন্ধুদের মধ্যে অন্তরঙ্গতম অর্থাৎ জে. এইচ. হাটন। ইনি দীর্ঘকাল গড্‌ফাদার, বা ধর্মপিতা, অর্থাৎ অভিভাবক হয়ে আছেন; স্কলার মিশনারিদের মধ্যে সবার চেয়ে উদারচেতা। এডুইন স্মিথ সাঁহ্‌রোয়াছাপারে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন; সবার ওপরে নাম করতে হয় ক্রিস্তোফ্ ও বেটি ফন্ ফ্যুয়েরে-হাইমেনডর্ফের। ক্রিস্তোফ্ দুর্জয় সাহসী এবং কোনো কাজে লেগে গেলে লেগেই থাকে, নির্ভীক আবিষ্কারক, কি অ-সামান্য ও গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝবার আশ্চর্য ক্ষমতা ওর। ওর পদাঙ্ক অনুসরণেই আমি বণ্ডো-গদাবা অঞ্চল, কোনিয়াক গ্রামে গ্রামে, এবং নেফার উত্তরাঞ্চলে যাই। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে ওর মতো দয়ার্দ্রমন, উদার হাত, খুব বিরল। বেটির চমৎকার তেজস্বিতা এবং প্রাণময় জীবনতৃষ্ণা আছে। দুজনেই ভালোবাসার মতো মানুষ।

ইদানীং শিলংয়ে এসেছেন অটো এবং জুলিয়ানা ক্যাড্‌লেঙ্গভঙ্গি, এবং ওঁদের ছোট্ট

মেয়ে মাগডালেনা। অটো অস্ট্রিয়ার লোক, শিল্পী এবং ফোটোগ্রাফার। জুলিয়ান ইংরেজ। ওরা একটি ল্যান্ডরোভার চেপে দুনিয়া ঘুরছিল। খুব নিজস্ব মৌলিক চারিত্র্যগুণসম্পন্ন, প্রেরণাদায়ী পরিবার। যখন এখানে, অটো আমার জন্যে আমার এক চিন্তা উদ্রেককারী প্রতিকৃতি আঁকে। তা এ বইয়ের জ্যাকেটে দেওয়া হ'ল।

সাত

যদিও গোড়ার দিকে মধ্যভারতে চালাতে হত কষ্ট করে, কেননা প্রায়ই পড়তাম অসুখে,—শিলংয়ে আসার পর থেকে আমার স্বাস্থ্য ভালো থেকেছে। লীলা ও ছেলেদেরও। তবে অসুখ হলে আমরা তা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করি। *লিভ্‌স ফ্রম দি জাঙ্গল* বইয়ে, বম্বের হাসপাতালে তিনমাস থাকার এক রগরগে বর্ণনা দিয়েছি।

ইস্ট আফ্রিকায় আমার রহস্যজনক ব্যথা শুরু হ'ল। নাইরোবিতে এক বিশেষজ্ঞের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে রুটিনমাফিক অবমাননাসূচক পরীক্ষা-টরীক্ষা করলেন। সে কাজ সমাপ্ত হলে এক রিপোর্ট দিলেন। মনে মনে ভাবলাম, রিপোর্টটা খুব অবমাননাসূচক। অন্য সবকিছুর সঙ্গে লেখা ছিল :

'পাকস্থলীটি খুবই অনুপ্রস্থ জাতের। তার শ্লেষা-ঝিল্লিকের ধাঁচ বিশেষত তার তৃতীয় দূরতর অংশে উদ্গত বা পলিপয়েডের মতো দেখা যাচ্ছে।'

সে সময়ে আমি মোটাচ্ছিলাম। আর সেই গঠন বিষয়ে সঙ্কুচিত থাকতাম। তবে এ অবস্থার নাম 'পলিপয়েড' শুনে তৎক্ষণাৎ খাদ্যে নিয়ন্ত্রণ আনলাম। এতে কষ্ট হ'ত খুব। আলেকজান্দার উলকট একদা বলেছেন যে যা-কিছু তাঁর ভালো লাগে, তাই নীতিবহির্ভূত, বে-আইনি, নতুবা দেহের ওজন বাড়ায়।

গলব্লাডারের এক্স-রে করে দেখা গেল, আমার দুটো গলব্লাডার। আমার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তখনি অপারেশন করতে চান। তাড়া লাগালেন, নাইরোবির শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে যেতে এবং কাজটা করাতে। আবিষ্কার করলাম, ও হাসপাতালে, অন্তত তখনো, কালো মানুষদের প্রবেশ নিষেধ। যেখানে আফ্রিকান ও ভারতীয়রা যেতে পারে না সেখানে ভর্তি হতে নারাজ হয়ে সম্ভবত প্রাণটাই বাঁচালাম। পরে শুনেছি অপারেশনি ঝামেলার ছিল। বম্বেতে ফিরে পুরো পনেরোদিন আরো পরীক্ষা করালাম। তবে কিছু বড়ি এবং এক রাগীরাগী খাদ্যতালিকা দিলেন ডাক্তাররা, বললেন অপারেশনটি না করালেই ভালো। গত দশ বছরে দুটো গলব্লাডার আমাকে খুবই কম কষ্ট দিয়েছে। সে সময়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারটি বলেছিলেন মেডিকেল ইতিহাসে মাত্র আটাশটি অনুরূপ জোড়া গলব্লাডারের কথা নথিভুক্ত আছে। আমার এক্স-রে প্লেট ডেভলপ হলে বম্বের হাসপাতালে হইচই পড়ে গিয়েছিল। কিচ্ছুটি না করার বিচক্ষণ পলিসি নিয়ে আমি বোধহয় দুটোকে বাগে এনেছি।

১৯৬১ জুনে ঘটে এক উত্তেজক ব্যাপার,— আমার হৃদ্‌যন্ত্র ব্যবস্থা যথেষ্ট কাজ

করছে না, ঘাটতি পড়ছে। শিলংয়ের মিলিটারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে চমৎকার দক্ষ আর্মি ডাক্তাররা ও নার্সেরা আছেন। দশদিন কাউকে আসতে দেয়নি। ফলে নিজেকে খুব কেউকেটা মনে হ'ত। অবশ্য লীলা আসত, আসতেন নরী রুস্তমজী। কেউ অসুস্থ হলে উনি যেন দেবদূত! দিনে দু'বার ঢুকে যেতেন। সমারসেট ম'মের অধিকাংশ গল্পের বই আনতেন। আশ্চর্য, আমি ওগুলো আগে মোটে পড়িনি।

ছ'মাস আগে রক্তচাপ বেড়ে গেল। ভারতের অন্যতম প্রাচীন ওষুধ 'রাওলফিলা সার্পেন্টিনা' (সর্বগন্ধা) দেওয়া হ'ল। আমার মনে হচ্ছিল, খুব খারাপ অভিনয়ের পর আমি চুপসে গেছি। কিন্তু পরে যে ট্রাংকুলাইজার দেয়, সেগুলো খুব ভাল ছিল।

সেগুলোর প্রতিটির গায়ে কাগজ জড়ানো থাকত, লেখা থাকত, কোনটা কি কাজ করে। একটি, মানসিক এবং হৃদয়াবেগের যন্ত্রণা থেকে বাঁচায়। আরেকটি সারিয়ে দেবে ঋতুস্রাবকালের যন্ত্রণা; সকালে বমির উপসর্গ এবং শয্যামূত্র। তৃতীয়টি আমাকে নির্বিঘ্নে শিশু প্রসব করাবে। আমি অল্পসময়েই দুশ্চিন্তা এবং কিডনি সংক্রান্ত হাইপারটেনশান থেকে সেরে উঠলাম। কিছু ইনজেকশান পাই, ডাক্তার বলেন, ওগুলো আমাকে নতুন মানুষ বানিয়ে দেবে। ওষুধের শিশিতে ছিল তেলে মিশানো 'নরাস্‌ট্রোস্টেনোলিন' এবং 'ফেনিলপ্রোপিওনেট।' এ সব শব্দ শুনলে তো মনে হয়, যে কোন বস্তুকেই এর দ্বারা নতুন মানুষ বানানো চলে। একটি চিরকুট দেখে শঙ্কিত হলাম। তাতে লেখা, 'যে সব লোকের কামশক্তি বেড়ে যাওয়া অভিপ্রেত নয়, এগুলো তাদের নিরাময় করার জন্য।'

ডাক্তার বললেন নিজেকে যেন 'প্রত্যহ এক পেগ জিন' পানের মধ্যে বেঁধে রাখি। জিন হৃদযন্ত্রকে স্ফীত করে, তাতে উপকার আছে। বড় পেগ না ছোট পেগ তা বলতে উনি ভুলে যান। আমিও কিছু বলি নি। বস্তুত, দীর্ঘকাল আমি মদ্যপান খুব কম করি। অ্যালকোহল না খেলে আমার অসুবিধা হয় না। তামাক বড়ই কড়া মনিব। মুশকিল এই, তামাকে আমার 'বিশ্বাস' আছে। তামাক আমাকে মানুষ হিসেবে আরো ভালো করেছে। স্যামুয়েল বিষয়ে আমি সেই গল্পটি পছন্দ করি।

একদা বিশপ ম্যান্‌ভেল ক্রীটন ওঁকে পিটারবরোতে আমন্ত্রণ জানান। যাবেন, কি যাবেন না, এই নিয়ে মনে দোটানা। অভ্যাসমতো ওঁর কেরানি আলফ্রেডকে শুধোলেন। আলফ্রেড বললেন 'স্যার, ওঁর চিঠিটা একবার দেখি।'

বাটলার চিঠিটা দিলেন। আলফ্রেড বললেন, 'স্যার, দেখতে পাচ্ছি এটাতে তামাকের একটা কুচি লেগে আছে। মনে হয়, আপনি যেতে পারেন।'

এ হেন শুভ-পূর্বভাস-এর প্রেরণায় বাটলার, নিজের পোর্টম্যান্টোয় একটি প্রার্থনাপুস্তক ভরলেন। গেলেন বিশপের কাছে এবং খুবই উপভোগ করলেন।

ট্রাইবাল কমিশনের মিটিংয়ে আমি আর জয়পাল সিং একসঙ্গে বসতাম টেবিলের এক কোণে এবং চুরোটের ধোঁয়া ছাড়তাম অন্য ন'জন সদস্যদের দিকে। ওঁরা ধূমপান

করতেন না। কেউ কেউ প্রতিবাদও করতেন। আমাদের চেয়ারম্যান খেবর এ বিষয়ে বরাবরই বেজায় ভালো। একবার কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে একটা কালির দোয়াত বের করে আমাকে এগিয়ে দিলেন ওতে ছাই ফেলার জন্যে। আর আমার মনটি কিনে নিলেন।

তবে আর লঘুতা নয়। সোয়াইৎজার বলেছেন, 'মৃত্যুর চেয়ে মানবজাতির অনেক ভয়ংকর শাসক হ'ল শারীর যন্ত্রণা।' তবু তা একটি পরিবারকে কিছু দিয়ে যায় বইকি। পরিবারটিকে সমবেদনা ও স্নেহের শক্ত বাঁধনে বেঁধে রাখে। এক বছর লীলা পেটে স্টোন হয়ে খুব কষ্ট পায়। আরেক বছর হয় তীব্র বেদনাদায়ক অ্যাপেনডিসাইটিস। ও যখন হাসপাতালে, তখন যেন বুঝলাম আমরা ওকে কত ভালবাসি। আমি নিজে যখন অসুস্থ হই, তখন বুঝি, লীলা আর ছেলেরা আমাকে কত ভালোবাসে। অসুখ হলে তবে বুঝি, ভালোবাসা,—তার সঙ্গে জড়িত যা কিছু ভালো! তা যন্ত্রণাকে সহনীয় করে,—আধ্যাত্মিক উন্নতিকে বিপদমুক্ত করে। আর ভালোবাসা নিজ শক্তিবলে সারিয়েও তোলে।

সঙ্গীতের সারিয়ে তোলার শক্তির অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। অনেকদিন আগে, বম্বের এক হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার ছিল একটি রেকর্ড, বিঠোভেনের 'ফিফ্‌থ সিম্‌ফনি'। বিছানার পাশে রেখে ওটা বারবার বাজাতাম। সঙ্গীতটি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, যে-পৃথিবীতে অমন সৌন্দর্য আছে সেখানে বেঁচে থাকবার প্রেরণা দিয়েছিল। এই সেদিন যখন দাঁতের ব্যথায় ভুগছি, বিঠোভেনের 'পাস্‌তোরাল' সিম্‌ফনি আমার ব্যথা সারিয়ে দিল। সঙ্গীত শোনার আনন্দ যে ব্যথা সারিয়ে দিচ্ছে, তা যেন বুঝতে পারছিলাম।

অনেকবার আদিবাসী চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করেছে। ওদের পন্থাগুলো কিছু অদ্ভুত, কিন্তু ওদের স্নেহ ও উদ্বেগ বোঝা যায়। সর্বদাই তা ভারী সান্ত্বনা দিয়েছে। যত ডাক্তাররা আমাকে দেখেছেন, নাম করে বলা যায় না, তাঁরা সংখ্যায় এতজন, তাঁদের পেশাদারী দক্ষতা ও মানবিক মমতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

দেহের একটি যন্ত্রকে সর্বদা ভেবেছি শক্ত এবং টেকসই, তাকে নিয়েই দ্বিতীয়বারও ঝামেলা হ'ল। থ্রম্বোসিস-এর কৌলীন্য আমি পাই নি। তার চেয়ে নিচু স্তরের, 'মায়োকার্ডিয়াক ইনসাফিসিয়েন্‌সি'। ডাক্তাররা একেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। বলছেন, 'তোমার জীবনকে রাখতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত, বাড়াবাড়ি চলবে না। হতে হবে সাবধান।' এ সব বিশেষণ মনটা বেজায় দমিয়ে দেয়। চার্চ ত্যাগ করা, নাগরিকত্ব বদল করা, এ সব তো ঘটেছে জীবনে। তার চেয়ে এবারে সবচেয়ে বেশি মানসিক সমঝোতা করতে হ'ল।

অসকার ওয়াইল্‌ড্‌ বলেছেন, 'বয়স বাড়ার ট্রাজিডি হ'ল, আমরা বুড়ো হই না। তরুণ থাকি।' কিছুটা যেমন, অসুস্থতার ট্রাজিডি হ'ল, আমরা অসুস্থ নই, দিব্যি সুস্থ।

ওরা বলছে আমি একেবারে ভালো হয়ে যাব, এখনো অনেক কাজ করতে পারব। বস্তুত, হাসপাতাল থেকে বেরোতে না বেরোতে, যখন আমার বিছানায় শুয়ে ট্রাংকুলাইজার খাওয়া ছাড়া কিচ্ছুটি করার কথা নয়, আমি দারুণ জড়িয়ে গেলাম ট্রাইবাল কমিশনের রিপোর্ট, *এ নিউ ডীল ফর ট্রাইবাল ইন্ডিয়া* বইটার একটা জনপ্রিয় সংস্করণ সম্পাদনার কাজে। তবে উঁচু পাহাড়ে উঠে ঘুরতে পারব কিনা, আগের মতো অরণ্যবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ঘোরা যাবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এর চেয়ে কঠিন আঘাত আর হয় না। যা সুদূর, যা একাকী, যা অজানা, তাই তো আমি ভালবেসেছি।

তবু আমাকে এবং হাজারজনকে এটা মেনে নিতে হবে। এর সঙ্গে বসবাস করতে হবে। এ সত্ত্বেও সুখ ও প্রয়োজনীয়তা খুঁজে নিতে হবে, হয়তো এসবের ভিতর দিয়েই। মানুষের প্রকৃত জীবন থাকে অন্তরের অভ্যন্তরে। তা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মানুষ যদি নিজেকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে চলতে শেখে, তাহলে দারিদ্র্য, বা নৈরাশ্য বা অবস্থার পরিবর্তন, তাব কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

অধরা মাধুরী

'আত্মসুখের সংগ্রাম পরিত্যাগ করা, ক্ষণিকের বাসনা মিটাবার সকল আগ্রহ উপেক্ষা করা, চিরন্তনের জন্য জ্বলন্ত আবেগ, এই তো শৃঙ্খলমুক্তি, স্বাধীন মানুষের পূজাপদ্ধতি।'

—বার্ট্রান্ড রাসেল

এক

ষাট বছরের মতো তরুণ বয়সে জীবন, ঈশ্বর এবং চিরন্তনতা বিষয়ে আমার ধারণাগুলির সমাহার উপস্থাপন করাটা ধৃষ্টতা হবে। অবশ্য বলা চলে, এ সব বিষয়ে এতদিনে আমার মন স্থির করে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু জীবনের এমন অধ্যায়েই তো মানুষ শিখতে শুরু করে। এবং আমি এত দ্রুত শিখছি, যে এই শেষ অধ্যায়ে যা বলব, সেটা শেষ কথা না হতেও পারে।

পিছন ফিরে দেখি আমার জীবন, দেখি এই বইয়ে কী লিখলাম। দেখতে পাচ্ছি আমি যদিও ক্লাবে গিয়ে আড্ডাবাজির মানুষ নই, তবু মানুষই আমার কাছে সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। আমার বন্ধুদের কথার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনকাহিনী খুব সহজে বলতে পারি।

সারাজীবনই আমি 'কিছু' বা 'কোনো'র ভালবাসায় নিমজ্জিত। কোনো আদর্শ যা নিয়ে লড়া যায়, কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী, কোনো একজন। যতো আদিবাসী গোষ্ঠীর বিষয়ে জানতে যাই, পরপর প্রতিটির প্রেমে পড়ি। সবশুদ্ধ দেখতে পাই, পৃথিবীটা বড়ই ভালবাসার মতো জায়গা, আর একবার চেনাজানা হয়ে গেলে মানুষ বড়ই ভালোবাসার মতো।

আরো অন্তরঙ্গভাবে বেশ ক'জনকে ভালবেসেছি। যৌনতা বিষয়ে লিখেছি অনেক, খুব বিশদ করেই লিখেছি। আমার বন্ধুদের ক'জন মনে করেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি মুরিয়াদের যৌন জীবন বিষয়ে জেনেছি। বলতে কি, এক সুপরিচিত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী বলেছিলেন, অনুসন্ধানী এবং অনুসন্ধেয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেকার বাধা দূর করতে হলে ওই আদিবাসীদের ভাষা বলতে হবে, ওদের খাদ্য খেতে হবে, ওদের রমণীদের সঙ্গে শয়ন করতে হবে। আমার নিজ অভিজ্ঞতা বলে, অল্প ক'দিনের জন্যে গেলে, ওদের আস্থা অর্জন করতে হলে, আদিবাসী খাদ্য কাজে লাগতে পারে। নইলে এতে হজমশক্তি নষ্টই হয়, আর কিছু হয় না। কোনো আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে

শয়ন করলে, আদিবাসী গোপনকথা জানা যাবে, এ একেবারে ভ্রমাত্মক ধারণা। মেয়েদের সঙ্গে শয়ন কোনো নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা নয়। তেমন করলে ঐতিহ্যবাহী যৌনতা কলাকৌশল বিষয়ে কোনো অন্তর্দৃষ্টি জন্মায় না।

কোথাও অভিযানে গেলে, পেশাদারী গবেষক নিজের বিষয়ে কঠোর সতর্ক থাকবেন। মারিয়া (এদের আমি প্রথম পুরস্কার দেব), কোনিয়াক কুট্টিয়া কোণ্ড, মিশমি এবং আফ্রিকার কাব্‌বাই আদিবাসীদের মধ্যে অদ্ভুত, মনোমাহিনী সুন্দর মেয়ে দেখেছি। তাদের গোষ্ঠীটিকে তারা আমার চোখে আলো করে তুলত। কিন্তু তারিফ করতাম দূর থেকে।

মানুষ প্রায়ই বলে, নগ্নতার চেয়ে আবরণ অনেক উত্তেজক, বার্নার্ড শ-ও তাই বলেছেন। আমি তা মানি না। কাব্‌বাইদের সম্পূর্ণ নগ্নতার সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা আমাকে রোমাঞ্চিত করে। পুরনো দিনে ওরা যেমনটি থাকত, সেই মারিয়া, কোণ্ড ও সাওরাদের অর্ধ-নগ্নতা সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিকতার দিক থেকে ভালো মনে হয়েছিল আমার। রমণীর স্তনকে তো শুধু যৌনতা নয়, করুণার প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। নিঃসংকোচ নিষ্পাপতায় উন্মীলিত বক্ষ দেখে আমি চিরকাল আনন্দ পেয়েছি। তা আমাকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা দেয় নি। আশা করি, হামবড়াই করছি না। আনন্দ পেয়েছি, কেননা তা স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য ও স্বভাবসারল্যের কথা বলে।

মনে হয়, একটি মেয়ের সঙ্গে মিলিত হবার প্রথম অভিজ্ঞতা কোনো পুরুষ ভোলে না। আমার ক্ষেত্রে সেটি কোনো খরিদ করা গোপন মজা ছিল না। দীর্ঘ এক রোমান্টিক প্রেমপর্বের চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি ছিল। প্রেমের প্রতিদান। অরণ্যের প্রেক্ষাপট এবং আমার 'জ্বলন্ত সোনার মতো মেয়েটি' সমান সুন্দর ছিল।

একটি উন্মাদ-করা প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়, যা পরিপূর্ণতা পায় নি। একে মধ্যযুগের চিকিৎসকরা বলেছেন, উন্মাদরোগ; সাময়িক উন্মাদনা বা জলাতঙ্ক, এর সমগোত্রের এক ব্যাধি। এ অভিজ্ঞতায় যন্ত্রণা ও বিস্ময় ছিল সর্বনাশা, ছিল আয়ত্তাতীত। তবু তা জীবনে এমন এক মাত্রা যোগ করে, যেমনটি আমি আগে, বা তারপরে জানি নি। সমস্ত অনুভূতি-ইন্দ্রিয়কে করে খরশান। যা বইয়ে পড়েছি, সে-সব কিছুকে করে সত্য। আমাদের জীবনধারাগুলি ছিল 'সর্বার্থে সমান্তরাল', অথচ শেষ নেই তার, মিলিত হতেও পারে নি।

তাই, যে ভালোবাসা আমাদের বেঁধেছে
কিন্তু নিয়তি ঈর্ষাবশে বাধা দিয়েছে যাকে
তা হ'ল দুই মনের সঙ্গম
গ্রহনক্ষত্রের নিষেধের বিরোধীশক্তি।

কিন্তু এর চেয়ে কম নাটকীয় জাতের প্রেম, কোমল প্রেম, দুর্লভ, যার প্রতিদান

পেয়েছি, তাও জেনেছি মাঝে মাঝে। জীবনের সুন্দরতম মুহূর্ত বলে মানি ও-সব মুহূর্তকে। এতটুকু লজ্জা পাই না। গর্ব হয়, তেমন করে ভালোবাসতে পেরেছিলাম বলে।

আজ বহুবছর ধরে আমার সকল পুরনো প্রেম কেন্দ্রীভূত হয়ে নিবিষ্ট হয়েছে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী'র মধ্যে। তার মধ্যে আমি সব ভালোবাসার সারবত্তা পেয়েছি। ওই সব অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক ভালো এক প্রেমিকে পরিণত করেছে।

বড় ভালোবাসার মানুষদের জন্য যে আবেগ উচ্ছল, প্রেমের বন্ধন, তা থেকে বেরিয়ে গিয়ে, সামলে চলে (বলব না তার উর্ধে গিয়ে) আমি সাধারণভাবে মানুষের জন্যই এক সর্বব্যাপী ভালবাসার খোঁজ পেয়েছি। ভালোবাসাকে আমি গভীর গুরুত্ব দিই,— যৌন প্রেম, আধ্যাত্মিক প্রেম, বিবাদ ও যুদ্ধের পরিবর্ত্য হিসেবে প্রেম। এ অধ্যায়ের শেষে আমি সে কথাই বলব। ভালবাসাই আমাদের সকল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান।

দুই

দুর্ভাগ্যবশত আজও কারো নাগরিকত্ব বদল করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক আইনি কাজটি ছিল পঁচিশ বছরের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতিমাত্র। নিজেকে একীভূত করবার এক তীব্র পিপাসার সমাপ্তি। দেন্যাঁ দ্য রুশমঁ বলেছেন, *ত্র্যাস্ত্রঁ আর অ্যাসিউল্ত*-এর প্রেম হল 'দুটি মানুষ' হবার যন্ত্রণা। এর চূড়ান্ত পরিণাম হয় আলোকের এক অন্তহীন অসীমে ঝাঁপিয়ে পড়া। সেখানে আলাদা করে চেনার মতো আকৃতি, চেহারা, নিয়তি সবই মিলিয়ে যায় : 'অ্যাসিউল্ত আর নেই, ত্র্যাস্ত্রঁ আর নেই। কোনো নামই আমাদের আর বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।' আমি চিরকাল বোধ করেছি এভাবে এক হয়ে যাবার প্রয়োজন, কোনো ভালবাসার মানুষের কোনো ভালবাসার আদিবাসী গোষ্ঠীর, কোনো ভালবাসার দেশের সঙ্গে একীভূত হবার তৃষ্ণা। দর্শকমাত্র হয়ে আমি থাকতে পারি না, আমি জড়িয়ে পড়তে চাই। তাই প্রেমজাত বিবাহে যেমন হয়, ভারতীয় নাগরিক হওয়া আমার কাছে তেমনই এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে আমার সবটুকু সমর্পিত।

হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে আমি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ত্যাগ করিনি। চিরকাল ব্রিটেনকে ভালবেসেছি, তার জন্য গর্ববোধ করেছি। একথা সত্য, যে ত্রিশের দশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে, আরো স্পষ্ট বলতে গেলে, যেভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজ্য চালাত, সে বিষয়ে গভীর উদ্বিগ্ন ছিলাম। গান্ধী, এবং তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তা এখন এক পুরনো কথা। আমি তা আবার তুলতে চাই না। হয়তো, আধুনিক ভারতের সকল প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হ'ল, সে সময়ে যা ঘটেছে, ভারত তাকে যেভাবে ক্ষমা করেছে যেভাবে ভুলে গেছে! কিন্তু সেদিন তো

এ ছিল রূঢ় বাস্তব। কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে, রাষ্ট্র ও চার্চ, দুইয়ের অফিসিয়ালদের ধরনধারণ ছিল নাকতোলা। ফলে স্বদেশীয়দের সঙ্গে সহজ বোধ করাটা আমার কাছে উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার ভারতীয় নাগরিক হওয়া, একটা নেতিবাচক ব্যাপার নয়,— কোনো কিছুর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার কারণেও নয়। যখন গান্ধীর সঙ্গে ছিলাম, উনি আমাকে গ্রহণ করেন। তখনি ভারতবর্ষের প্রেমে পড়ি। পরে ভারতের আদিবাসী মানুষদের জন্য, অনেক বেশি, গভীরতর, —তীব্রতর, বিশেষ ভালবাসা ও আকর্ষণ জন্মায়।

আজ বহুবছর ধরে নিজেকে এক একদা-ইংরেজ ব'লে মনে করি না। যদি কেউ এটা উল্লেখ না করে, অমনটা আমার মনেও হয় না। উল্লেখ করলে আঘাত পেয়ে চমকে উঠি। জানি না আমার ভারতীয় বন্ধুরা আমাকে এ দেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ব'লে মনে করেন কি না। কিন্তু নিজেকে তো মনে হয় ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনটা মনে হয় এতকাল থেকে যে এ বিষয়ে আমার খেয়ালই থাকে না। আমি আছি এখানে, এবং যেমনটি স্বাভাবিক, তেমনই এ ব্যাপারটা। আমাদের পরিবারটি ভারতীয়। ছেলেরা জানে তারা ভারতীয়, এবং দেশের জন্য খুবই গর্বিত। চীনা আক্রমণ কালে একদিন ছোট্ট বসন্ত্ এসে গম্ভীর ভাবে বলল, 'ড্যাডি, তোমার সঙ্গে আমাদের দেশ নিয়ে কথা বলতে চাই।' সেদিন দিল্লীর এক কাগজ আমার বিষয়ে বলেছে, 'ব্রিটেনে জন্ম নেওয়া এক ভারতীয়।' চমৎকার বুঝিয়ে বলেছে।

আমার আগেকার দেশের মানুষজন প্রথমে মনে করত আমি ওদের চেনাজানার যোগ্য নই। স্বাধীনতার পর থেকে ওরা মনে করে আমি একটা 'ঘটনা' বিশেষ। কেন এমন, তা নিয়ে খেদ করা চলে, তবে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মাঝে মাঝে লোকজনকে দেখি, যাঁদের ফেলি বিপদে। কলকাতায় এক দক্ষিণ আফ্রিকান বললেন, 'তোমার মতামত অবশ্যই অ-সাধারণ, একটা জিনিস তো তোমার থেকেই যাবে,— তোমার রক্ত, সাদা রক্ত।' টেক্সাস থেকে আগত এক আমেরিকান, তিনি বর্ণসমস্যা বিষয়ে বাড়াবাড়ি মতো সচেতন, বললেন, কিছুতে এক নিগ্রোকে ছুঁতে পারেন না। বললেন, যত চেষ্টাই করি না কেন, আমি অক্সফোর্ডের একজনই রয়ে গেছি। যাকগে, বিশিষ্ট ব্যক্তি, জন্মসূত্রে ভারতীয়, অনেকে আছেন, যাঁরা আমার চেয়ে অক্স্‌ফোর্ডীয়।

এটাও পরিষ্কার জানাতে চাই, ভারতীয় নাগরিক হয়েছি বলে, ইউরোপের সঙ্গে বাস্তবে কোনো বিচ্ছেদ ঘটে নি। বুঝি, যে আমার সংস্কৃতির শিকড়ের মূল ওখানে প্রোথিত। আমি তেমন অনন্য ইউরোপীয়দের একজন নই, যাঁরা নিজ ভাবনাচিন্তা, জীবনযাপনের মধ্যে হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে হাড়েমজ্জায় গ্রহণ করেছেন। আমি বহু বছর জঙ্গলে নিয়মছাড়া জীবন কাটিয়েছি। সে জায়গা 'ভারতীয়', এ জন্য নয়। আমার ভালো লেগেছে, তাই থেকেছি। আজ যদি ভারতীয় খাদ্য খাই, সেটা লোকদেখানো কিছু নয়। ভাত, কারি, ভারতীয় মিষ্টান্ন পছন্দ করি, তাই খাই। ভারতীয় দর্শন, শিল্প

এবং সাহিত্যচর্চা করে আমি অনেক শিখেছি। একটা নতুন জগতের দরজা খুলে গেছে যেন। কিন্তু অন্তরের গভীরতম গহীনে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভিতটা রয়ে গেছে। এটা ভালো, না মন্দ, তা বলছি না, তবে এটা ঘটনা।

প্রথা মেনে চলা, সব কিছু মেনে নেওয়া, তা থেকে উন্মূলিত আমাকে তুলে এনেছে ভারত। বিচূর্ণ করেছে আমার ধর্ম, এবং কার্যোপযোগী মতো একটি বিশ্বাস দিয়েছে।

ভারত দিয়েছে আমাকে চমৎকার সব বন্ধু—স্কলার, প্রশাসক, সাংবাদিক, কবি, শিল্পী, এবং অসংখ্য ভালো সাধারণ মানুষ। ভারতীয়রা ভারী আন্তরিক। ওরা স্নেহের ডাকে সাড়া দেয়। এদের সঙ্গে সত্বর স্নেহবন্ধন গড়া যায়; সদয়, উদার ও বিবেচক এরা। বহুকাল আগে ভলত্যের অনুরূপ উৎসাহেই ইংল্যান্ডের কথা লিখেছিলেন। তবে বলেছিলেন, 'এমন নয়, যে ইংল্যান্ডে কিছু সংখ্যক বোকা নেই।' ভয়ে ভয়ে বলি, ভারতেও আছে।

সব সত্ত্বেও, ভারত বিষয়ে আমার আশা আরোগ্য-অসাধ্য। তার ক্রুদ্ধ তরুণরা এবং ভগ্নমোহ বৃদ্ধেরা সমালোচনা ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ। এটা সত্যি, যে এখানে কিছু দুর্নীতি এবং প্রচুর অকর্মণ্যতা আছে; আছে প্রচুর কাপট্য। কিন্তু সঞ্চয়ের খাতে কত বেশি না আছে! বিশাল প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে একটি দেশ নিজেকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছে। তারই এক অংশ হওয়া তো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

একদিন নাগাল্যান্ড সফরকালে মোকোকচুং-এর কাছে আও নাগাদের বিশাল গ্রাম উংমাতে যাই। পৌঁছে যা দেখি, তাতে তো ভয়ে শিউরে উঠলাম। সেখানকার মস্ত চার্চের বাইরে নোটিশ ঝুলছে, যে বিকেলে এক প্রার্থনাসভা হবে, ডক্টর এল্যুইন ধর্মোপদেশ প্রচার করবেন। আমাকে আগে বলা হয় নি; কী বলতে পারি তা ভেবে পাচ্ছি না। তাই প্রায় চার হাজার লোকের জমায়েতে প্রচলিত ধর্মের বিষয়ে না বলে, (বলার পক্ষে আমি অযোগ্য বলেই বিবেচিত হতাম) আমি ওদের বললাম, কেন আমি ভারতীয় নাগরিকত্ব নিলাম। কিছু নাগা দলপতি, তাঁদের লোকজনকে বুঝিয়ে থাকেন, তাঁরা ভারতীয় নন, যদিও তাদের অধিকাংশজনই মেনে নিয়েছে যে ওরা ভারতীয়। আমার মনে হয়, একটি শক্তিশালী, স্বাধীন দেশ থেকে যে এসেছে, যেদিন তার মনে হল সে ভারতীয় নাগরিক, সেটিই তার সবচেয়ে গর্বের দিন। ভারতীয় হয়ে সে কত সুখী, ভারতের মানুষের আপনজন হয়ে তার কি আনন্দ, এ কথা জানতে ওদের ভালো লাগবে।

আমি একটি কারণ দেখিয়েছিলাম, যে ভদ্র, সহিষ্ণু ভারতে, কট্টরপন্থীরা থাকা সত্ত্বেও,— পৃথিবীর যে কোনো জায়গার তুলনায় এখানে অনেক স্বাধীনভাবে, অনেক কম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়ে বেশ স্বাধীনভাবে স্বীয় জীবন কাটানো যায়। বিরক্তির কারণ ঘটে। সমাজে বাস করলে তা ঘটবেই। তবে তা এমন দুঃসহ নয়, যে অকারণে

কেউ ভেঙে পড়বে। ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ সেদিন বলেছেন, 'ব্যক্তিমানুষ সত্যানুসন্ধান করবে, সৌন্দর্য খুঁজবে, এজন্য তার মুক্ত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা' আইন পাস করার চেয়ে বেশি জরুরি।

দ্বিতীয়ত ভারতে আছে প্রকৃত অর্থে ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা। একদা নাগাদের মধ্যে খুব বিদ্রোহী প্রচার চলে, যে যারা ক্রিশ্চান তারা স্বধর্মাচরণ করতে পারবে না। হিন্দুত্বের কোনো ব্যাপার ওদের উপর চাপানো হবে। আমি ওদের স্মরণ করিয়ে দিলাম, ভারতের সংবিধান স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়, স্বধর্মে বিশ্বাস ও আচরণে, তা প্রচার ও বিস্তারেও। কোনো ব্যক্তির কোনো ধর্মই না মানার স্বাধীনতাও আছে।

তৃতীয়ত নাগাদের বললাম, এত উষ্ণ আন্তরিকতা ও স্নেহ আছে, এমন আরেকটি দেশ আছে বলে মনে করি না। পরে যা আমার প্যাটেল বক্তৃতায় বিশদায়িত করি। এখানে তারই পূর্বাভাস দিলাম :

> ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখি, তাকে আক্রমণ করছে প্রেম-প্রীতিবিরোধী সব শক্তি। এদিকে ভালবাসারই আধিপত্য ভারতের অধিবিদ্যায়, সমাজপ্রথায়, তার মানুষের স্বভাবে। এ ভালবাসা বিশ্বাস করে প্রাণ মাত্রেই পবিত্র, এর আদর্শ হ'ল অহিংসা, যা কোনো আঘাত হানে না; করুণা, যা সকল জীবকে দয়া করে, মৈত্রী যা ভালবাসা ও দয়ার মধ্য দিয়ে বিকীর্ণ হয়। হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ভালবাসাই ভারতের মানুষকে অন্যদের বিশ্বাস ও প্রথার প্রতি সহিষ্ণু ও উদার করেছে। ভারতের মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে একীভবন ও সঙ্গতির জন্য পিপাসু হতে। ঐতিহ্যগত প্রেম-জাত শক্তি কতদূর পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার উপর আধিপত্য রেখে চলতে পারে, তার উপরেই নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ। ভাষা, জাতি ও প্রথার সকল বৈচিত্র্যকে পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব একমাত্র এই প্রেম দ্বারা।

তিন

আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যই আমার জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের অধিকাংশ জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে। আমি ওদের ওপর যত না প্রভাব বিস্তার করেছি, ওরা আমার ওপর তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। আনন্দের গুরুত্ব, সরলতার গুরুত্ব ওরাই শিখিয়েছে আমাকে। বর্ণ ও ছন্দের প্রতি ওদের আসক্তি আমার মনে প্রত্যক্ষ সাড়া তুলেছে।

এ বইয়ের প্রথমদিকেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যে কোনো সাম্রাজ্যবাদ, বা ঔপনিবেশিকতাবাদের বিষয়ে আমার বিরোধিতা। আমার জীবনকালেই পৃথিবীতে যে পরিবর্তন এসেছে, সে তো চমৎকার। আমার বাবার অধীনস্থ চার্চ অঞ্চল, ছোট্ট

সিয়েরালিওনও আজ স্বায়ত্বশাসনাধিকার পেয়েছে। তবু দীর্ঘ পথ পড়ে আছে এখনো। নিজেদের ধ্যান ধারণা এবং আর্থনীতিক প্রভুত্ব অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা এখনো দেখা যাচ্ছে বড় বড় দেশগুলোর মধ্যে।

যখন অক্সফোর্ডে যাই, তখন থেকেই আমি শান্তিবাদী। মানবজাতির মধ্যে বিতর্কগুলির সমাধান যে হিংসা বা বলপ্রয়োগের পথে হবার নয়,— তাতে আমি দৃঢ়বিশ্বাসী। এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য আদিবাসীঅঞ্চল ক্ষেত্রে। বাকি দেশের সঙ্গে ওদের সাঙ্গীকরণ করতে হলে ভালবাসতে হবে, বুঝতে হবে, নান্য পন্থা। আমাকে ভূতের মতো তাড়া করে ফেরে আফ্রিকার বিষয়ে অন্যায় অবিচার, জোমো কেনিয়াট্টার কারাবাসের স্মৃতি, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যের উৎকট উদগ্রতা।

আদিবাসীদের মধ্যে এসে আমি উপলব্ধি করলাম, যুদ্ধ শুধু জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই নয়, জীবনরক্ষাকারী সম্পদের এক অপচয়ও বটে। শুধু আদিবাসীক্ষেত্রেই এটা বাস্তব হয়ে ওঠে। যখন অত মানুষের জীবনে দারিদ্র, তখন যে মানবশক্তি ও অর্থ ওদের বাঁচাতে পারত, তা যুদ্ধের মতো নির্বোধ কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। এটা সহ্য করা যায় না। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধরা যেমনটি বলেন, সেই মতো বিশ্বের প্রতিটি কোণ ভরে দিতে হবে ভালবাসার কোমল প্রাণোচ্ছলতায়।

প্রতিশোধগ্রহণ ও দণ্ডদানের সমস্যা আদিবাসী পার্বত্যাঞ্চলে তীব্র জরুরি হয়ে ওঠে। বলার অপেক্ষা রাখে না, যে আমি মৃত্যুদণ্ড বিরোধী। যে ভারত, অনেক মানবিক প্রসঙ্গে দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেয়, সেই দেশ আজও প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ করে নি। এতে আমি লজ্জিতই বোধ করি। আত্মহত্যার চেষ্টাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা অর্থহীন ও অন্যায়। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল বলে কারাদণ্ড হয়েছে এমন এক হতদরিদ্র গোণ্ডের কথা মনে পড়ে। সে বলেছিল : 'বউ মরে গেল। ঘরে কোনো খাদ্য নেই। আমার সর্বদেহে যন্ত্রণা। বেঁচে থেকে কী লাভ হ'ত?' আত্মহত্যা করার মতো পরিস্থিতিকে সমাজ যতদিন জীইয়ে রাখবে, ততদিন, যারা ওই পরিস্থিতি থেকে পালাবার চেষ্টা করবে, ন্যায়মতে তাদের শাস্তি দিতে পারে না সমাজ।

দেশের নেতৃস্থানীয় মানুষরা দীর্ঘকাল জেলে কাটিয়েছেন। তবু আজও ভারতে আমরা কারা-সংস্কারে তেমন এগোই নি, এতে আমি বিস্মিত। পুলিসি ব্যবস্থা এবং কারাগার বিষয়ে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত আজও, তা হ'ল দণ্ডদানের বিধান। সমাজের বিধিনিয়ম যারা লঙ্ঘন করে, তাদের বিষয়ে ক্রুদ্ধ সমাজের প্রতিক্রিয়ার ফলে এই শাস্তিদান। অন্যান্যদেশে যাই করা হোক, ভারতে আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী নই, সেটা বলাই যায়।

যখন স্কুলে ছিলাম। যথেষ্ট মারধোর খেয়েছি। মাস্টাররা বেত মারতেন। প্রিফেক্ট্‌রা ওয়াকিং স্টিকের শক্ত হিল দিয়ে মারতেন। খুব ব্যথা পেতাম। যে কালসিটে পড়ত, তা দীর্ঘদিন থেকে যেত, স্নায়ুব্যবস্থা বেজায় চোট খেত। আমার ক্ষেত্রে

মারধোরের ফল খুব খারাপ হয়। একটুতে চমকে উঠতাম, মনে ফুঁসত বিক্ষোভ। বলতে লজ্জা করে, যখন নিজে প্রিফেক্ট হই, নিজেও প্রচুর মারধোর করেছি। স্কুল থেকে শারীর দণ্ড, মারধোর একেবারে তুলে দেওয়া দরকার। বিশেষ করে আদিবাসী এলাকায়। যে কোনো রকম শারীরিক লাঞ্ছনা বিষয়ে ওরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

শিক্ষার বিষয়ে কিছু বলব না, এ বিষয়ে কথা বললে ফুরোবে না। তবে একটা কথা বলব। যে-সব আদ্যিকেলে ধর্মীয় বিশ্বাস মানবজাতি সাধারণত ত্যাগ করেছে, সেগুলো শিশুদের ওপর চাপানো উচিত হবে না। এবং, খুব ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ যে ভুল তা শেখানো ঠিক হবে।

সৌন্দর্য বিষয়ে আদিবাসীরা যে মাত্রায় আমার চোখ খুলে দেয়, আমার প্রিয় শিল্পী গগ্যাঁর ছবিও তেমনটি পারে নি। সৌন্দর্য যৌবনের অঙ্গ। শোষকদের প্রধান অপরাধ, তারা মানুষদের বুড়ো করে দেয়। একবার বিশাল আশাভঙ্গের পর আমি লিখেছিলাম:

> 'এক বিষয়ে ব্যর্থতা, সব বিষয়ে ব্যর্থতা নয়, এবং এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। মূল কথা এই, নৈরাশ্য আমাদের বুড়ো বানিয়ে দেবে, এ যেন না-হ'তে দিই। তরুণ থেকে যাওয়াই সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমাদের প্রকৃত শত্রু অপবাদ নয়, দারিদ্র নয়, দুঃখকষ্ট নয়, কু-অভ্যাসও নয়, সে হ'ল সময়। ভালবাসা সময়ের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে পারে।'

অনেক আদিবাসী, অলৌকিক সৌন্দর্যস্নাত নিসর্গে বাস করে। কিন্তু মোটামুটি তারা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস বানায় না। কিন্তু আমি তার সন্ধানে গেছি সুদূর গ্রামে, ছোট্ট কুটিরে। যেখানে অমন জিনিস মিলবে, এমতো আশা সামান্যই করা যায়। কাজটি সহজ হয়নি। ত্রিশ বছরে অনুসন্ধানের ফলপ্রাপ্তি, হয়তো তেমন বেশি কিছু নয়, তবু কিছু তো।

> সৌন্দর্য এতো দুর্লভ
> এত কমজন পান করে আমার ফোয়ারার জল।

এটা দুঃখজনক, যে ব্রিটিশ শাসনের পরের দিকে ভারত ভাসিয়ে অসুন্দরের ঢেউ বহে যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ, গান্ধীর সক্রিয় বাধাদান, সব সত্ত্বেও বিশাল পরিমাণে শস্তা বিদেশী জিনিস ভারতে আমদানি হয়। হার্বার্ট রীড বলেছেন, পাশ্চাত্য জগৎ, 'একটা বিশাল, সর্বব্যাপী নিম্নরুচির সভ্যতা তৈরি করেছে, যা অসুন্দর।' তার ব্যবসাবাণিজ্যের অর্থনীতি ভারতকে দিয়েছে, 'প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিস তৈরিতে দারিদ্র এবং নিচতার স্থাপত্য বা কাঠামো।' ভারতীয় জীবনধারার কোনো দিকটা বাদ রাখে নি। হারমোনিয়াম ভারতীয় সংগীতকে অসুন্দর করল; পাশ্চাত্য প্রকাশভঙ্গি ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকে যথেষ্ট বিচলিত করল; মিলে প্রস্তুত বস্ত্রাদি ভারতের তাঁত শিল্পকে প্রায় মেরে ফেলল; যেদিন তা পুনরুজ্জীবিত হ'ল, দেখা গেল নিম্নমানের

নকশা, অথবা একেবারেই প্রয়োজনভিত্তিক কাজে লাগার মতো কাপড়। ভারতীয় ঘরদোর হ'ল ব্যালহ্যাম, বা টুটিং বেক্-এর লজিংগুলোর কুৎসিত, নিম্নমানের কপি। প্রাচীন সৌন্দর্য-ঐতিহ্য আত্মগোপন করল। কম্যুনিটি ডেভলপমেন্ট আন্দোলনের পরিণামে ভারতের মফঃস্বলে কুৎসিততম, অনুপযোগী স্থাপত্যে নির্মিত বাড়িঘর, যা কোনদিন ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসকালে দেখা যায় নি। গ্রামে অনেক সরকারি বাড়ি দেখতে পুলিসলাইনের মতো। মাঝে মাঝে তা সাধারণের জন্য নির্মিত শৌচাগারের সদৃশ। উন্নয়নের সদর দপ্তরগুলো তৃতীয়শ্রেণীর উন্মাদ আশ্রমের মতো দেখতে, এটা অনুচিত। বহুক্ষেত্রেই আবাসন নির্মাণ পরিকল্পনায় শিল্পসুষমা বা কল্পনাশক্তি নেই। গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা খুবই কম।

সব কিছুর মধ্যে, সৌন্দর্যকে ভুলে গেলে চলবে না। চিরকাল সৌন্দর্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নবীকৃত হয়। বৃহৎ ব্যবসা বা কুরুচি তাকে পরাস্ত করতে পারে না। সৌন্দর্য এ জগতে সবচেয়ে জরুরি, শেষ অবধি তা জিতবেই। ভারত সেই দেশ যা চিরকাল লাবণ্য ও সৌন্দর্যের আদর্শের পাদপীঠে উৎসর্গিত প্রাণ। ভারতের পার্বত্য মানুষদের জীবনে অনেক সৌন্দর্য। তা ধরে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু আধুনিক জগতে তারা এগিয়ে আসবে। সে অগ্রগতিকে বাধা দেবার চেষ্টা করছি না; ওদের সাহায্য করছি যাতে তারা এই জগৎকে প্রেরণা দিতে পারে।

জোহান্নাইন লেখায় যেমন প্রতিভাত হয়, সেই শেষ সত্য, শেষ বাস্তবতা হ'ল আলেথীয়া। সে আদর্শের প্রতি আমার অনুরক্তি অক্স্ফোর্ড থেকে। গান্ধী, তাঁর যা সত্য, তাই ঈশ্বর, এ বিষয়ে ওঁর যে শিক্ষা, তার মাধ্যমে ওই ধারণার ওপরেই জোর দেন। মানবহিতৈষী হিসেবে আদিবাসীদের মধ্যে আমি সত্য চাইছিলাম। আদিবাসী বিষয়ক সত্যের অবদান আছে আমাদেব মানবজাতি সম্পর্কিত জ্ঞানে। ওদের বিষয়ে যা সত্য তা যেদিন জানা যাবে, একমাত্র সেদিনই ওরা যথাযোগ্য মর্যাদা এবং ন্যায্য ব্যবহার পাবে।

ভারতে, বিশেষত আদিবাসী অঞ্চলে, সৌন্দর্য, এমনকি সত্যেরও প্রধান শত্রু হ'ল গোঁড়ামি। এটা এমন গুরুত্বের, যে এর আলোচনায় ক'পাতা লিখব।

চার

মেজাজে, ইতিহাসে বা ঐতিহ্যে ভারতবর্ষ, এক গোঁড়া, নীতিবাগীশ দেশ নয়। গোঁড়া নীতিবাগীশতা তাকে আক্রমণ করল পাশ্চাত্য থেকে এসে। এ কাজ কিছুটা করেন প্রটেস্টান্ট মিশনারিরা। আমার সন্দেহ, গান্ধী বলতেন না, কিন্তু এদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন। আজ এ দেশে বিরাজ করছে এক আত্মসচেতন, নিজেকে ধার্মিক মনে করে এমন নীতিবাগীশতা। জীবনের বহু নান্দনিক মূল্যবোধকে এ ভেঙে দিয়েছে।

যখন সরল গ্রামীণ মানুষেরা এর সন্ধিত লক্ষ্য হয়েছে, ওসব মানুষের সুখশান্তিকে তা ধ্বংস করেছে।

নীতিবাগীশদের ভুলভ্রান্তির ভিত্তি সম্ভবত এক ভ্রান্ত মূল্যবোধ। জি. কে. চেস্টারটন বলেছেন, 'নীতিবাগীশ সেই ব্যক্তি যে সঠিক ঘৃণা ও ক্রোধ ঢেলে দেয় বেঠিক জায়গায়।' সে চিরকাল অন্যের ভালো করতে চায়, কিছু একটা করে না দেখাতে পারলে তার আনন্দ হয় না।

নীতিবাগীশতাকে সতর্ক লক্ষ্যে কঠোর তপশ্চর্যা থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। নীতিবাগীশ ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অনুভবক্ষমতাকে হত্য করতে, বা ইচ্ছাশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে, অথবা পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিরালায় নিয়ে যেতে চায় না। সে চায়, ক্রেন ব্রিন্টন যা বলেছেন, 'তার পার্থিব কামনাগুলির মধ্যে সেইগুলিকে নির্বাচন করতে, যা তার মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। যেগুলি তা করে না, সেগুলিকে দাবিয়ে রেখে দমন করতে।' সে মনে করে, 'মানুষ যেসব আনন্দে মজে থাকে, হালকা সংগীত, নাচ, জুয়াখেলা, সুন্দর কাপড়চোপড়, মদিরা, নাট্যশালায় গমন, সেসব সেই জাতের আনন্দ যা শয়তান পছন্দ করত।' তাই এগুলি হয়ে গেল নিষিদ্ধ। কিন্তু ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, বা হিন্দু সাধুর মতো সে শরীরকে যন্ত্রণা দেওয়াতে বিশ্বাসী নয়। সে ভালো খেতে, সুখে ঘুমোতে, আরামদায়ক বাড়িতে বাস করতে ভালবাসে। •

ভারত জুড়ে নীতিবাগীশরা একটা ব্যাপার তৈরি করেছে। তা হ'ল মানবদেহের সৌন্দর্যের বিষয়ে আত্মসচেতনতা, এবং সে দেহের তপ্ত, নিশ্বসিত লাবণ্যসুষমা বিষয়ে আতঙ্ক। এর ঝামেলা বিশেষ করে পোহাচ্ছে আদিবাসীরা। আগে ওদের কোনো কৃত্রিম কুণ্ঠা বা সংকোচ ছিল না। ওরা আধাআবরণে, বা নিরাবরণ থেকেই ঘুরে বেড়াত। যখন তা করত, খুব সুন্দর ছিল ওরা। আজ কিছু রাজ্যসরকার নিরন্তর প্রচার চালাচ্ছে, ওদের পোশাক পরতে হবে। তেমন এক সরকার, প্রচুর টাকা মঞ্জুরও করেছেন। তাতে বাস্তারের সাবলীল আদিবাসীদের সাদা কাপড় পরানো হবে। রাজস্থান হল নানা রঙে ঝলমলে। সেখানে এক ফোটোগ্রাফার কিছু ভিল মেয়ের ছবি তোলেন, তারা আবক্ষ নগ্ন। স্থানীয় সরকার, তখনি মেয়েদের জন্যে হাজার হাজার সাদা শাড়ি পাঠালেন। যাতে ওদের লজ্জাকর অর্ধনগ্নতা ঢাকা পড়ে। ফলটা দাঁড়াল, যে মেয়েরা আগে এত সুন্দর ছিল, নিজেদের স্বভাবলাবণ্য এবং রাজস্থানের ঐতিহ্যসম্মত রঙিন কাপড়জামা পরত, আজ ওদের দেখায় হিন্দু বিধবাদের মতো।

নীতিবাগীশতা বিশেষ নজর দিয়েছে সিনেমার দিকে। বয়স্ক মানুষদের যেমন বাস্তববাদী পরিণত-চিন্তার ছবি দেখা উচিত, আজ সরকারি সেন্‌সরশিপ তা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। এক সময়ে সিনেমার পর্দায় কেউ মদ খাচ্ছে তা দেখানো নিষিদ্ধ ছিল। দেখানো হ'ত একটি পার্টি, অতিথিদের হুইস্কি দেওয়া হ'ল; গ্লাসটি ধরে ওরা ঠোঁটের কাছে তুলল। যখন ঠোঁট ও গ্লাসের মিলনের ভয়ংকর মুহূর্তটি আসার

কথা,— তখন পর্দায় ঝিলিক খেলে গেল। দর্শক দেখল, শূন্যগ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখা হচ্ছে।

ভারতীয় সিনেমা এবং শিশুদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া বিষয়ে একটি ক্রুদ্ধ ঘোষণা, 'চুম্বন, আলিঙ্গন এবং অশ্লীল সংলাপ ও গান' পর্দায় আধিপত্য করছে। সিনেমাদর্শকের 'প্রেম করার একশো ঢং' না দেখে উপায় নেই। সিনেমাশিল্পের ব্যাপারে অসংখ্য অজ্ঞ সমালোচনার চরিত্রই এই। এ তো সত্য নয়। সিনেমায় একশো রীতিতে প্রেম করা দেখানো বিষয়ে এই শুধু বলব, 'কামসূত্র'-এর লেখক তাঁর কল্পনাকে টেনে টেনে লম্বা করেও চুরাশিটি প্রক্রিয়ার বেশি ভাবতে পারেন নি।

বই, ফিল্‌ম বা চিত্রশিল্প ক্ষেত্রে সেনসরশিপ নিষ্ফল এবং অবমাননাকর। বিশেষ করে তার সঙ্গে যখন জনসাধারণের রুচিবোধ শিক্ষাদানের ব্যাপারে ঔদাসীন্য যুক্ত থাকে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবহেলিত হয় এসব প্রসঙ্গ,—সুরুচি, সাহিত্য বা নীতিগত জিজ্ঞাসা। অস্বচ্ছ এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে আইন রচনা করে আমরা পার পেয়ে যাই। প্রশিক্ষিত জনমত এ কাজ আরো ভালো ভাবে করতে সক্ষম।

ইদানীং এক নির্বোধ প্রাচরকার্য চলছে অনৈতিক সিনেমা পোস্টার নিয়ে। এটা শুরু হতে না হতে আমি কলকাতা যাই। কয়েকটা নিজে দেখব বলে স্থির করি। বেশ উত্তেজনা লাগছিল। আগ্রহোদ্দীপক কিছু দেখব বলে পথে পথে ঘুরি। আমার মন তো অল্পেই লকলকিয়ে ওঠে। কিছুই দেখলাম না যা আমাকে উত্তেজিত করে। বলতে কি, ভারতীয় সিনেমা পোস্টার খুবই নিরামিষ গোছের। কিন্তু যে সব পোস্টারে নরনারীর প্রেমের কোনো আভাসমাত্র আছে, অত্যুৎসাহী সমাজকর্মীরা সেগুলো ছিঁড়ছিল। কোন দেশে? যে দেশে সিনেমায় চুম্বন দেখানো নিষিদ্ধ।

এক সময়ে খাজুরাহো ও কোনারকের অপরূপ ভাস্কর্য ধ্বংস করার কথাও হয়েছিল। এক বিশিষ্ট কংগ্রেসি গান্ধীর কাছে সত্য সত্যই প্রস্তাব করেন, যে কোনারকের কামোদ্দীপক মূর্তিগুলি হটানো হোক। সে জায়গায় নেতাদের মূর্তি বসানো হোক।

প্রায়ই নীতিবাগীশতার উপর প্রহিবিশানের দায় চাপানো হয়। আমি এ বিষয়ে তেমন নিশ্চিত নই। যদিও এটি চালু করতে নীতিবাগীশরাই সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। প্রহিবিশান বিষয়ে আমার আপত্তি মানুষের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তারই সমান। ইংল্যান্ডে প্রহিবিশন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশপ মেগি যা বলেছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে ঐকমত্য। তিনি বলেন, 'আমাকে যদি বলতে বলা হয়, আমি বলব, ইংল্যান্ড মদবর্জন করার চেয়ে স্বাধীন হওয়া ভালো। স্বাধীনতা থাকলে আমরা ক্রমে ক্রমে মদবর্জন করতে পারব। না থাকলে স্বাধীনতা এবং অপ্রমত্ততা, দুই হারাব।' এই সেদিন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বলেছেন, মিঃ নেহরু

যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি দায়বদ্ধ, তেমনটি দুনিয়াতে আর কেউ আছেন বলে তিনি জানেন না। তাঁর কাছে শুনেছি বলেই, তিনি কখনো ভারতে প্রহিবিশান জারি করবেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।

অবশ্যই সমস্যাটি আমি দেখছি আদিবাসীদের অবস্থান থেকে। আমি যেমন মনে করি হাঁড়িয়া (ভাত থেকে তৈরি মদ) নিষিদ্ধ করা অনুচিত। শুধু তাই নয়, এতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কেননা পুষ্টিকর, ঝাঁঝালো, সুস্বাদু সুপ ব্যতীত হাঁড়িয়া কিছুই নয়। আবার রাজস্ব বহুত বাড়াবার জন্যে সরকার যে মদচোলাইকে মদত দেয়, সে মদ ক্ষতিকারক। আমার ক্ষমতা থাকলে লাইসেন্স প্রাপ্ত চুল্লুর দোকান তুলে দিতাম। কম্যুনিটি ডেভলপমেন্ট মন্ত্রকের এক বিশেষ শাখা রাখতাম, যা হাঁড়িয়া তৈরি করতে শেখাত।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে নীতিবাগীশরা বেজায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন, মেয়েদের করমর্দন করা নিয়ে খুব জলঘোলা করা হ'ল। বলা হ'ল হাতে হাত জড়ানো 'পাণিগ্রহণম্।' বিবাহের প্রতীক। কালকটের এক লেখক লিখলেন, "ভারতের নারীজগৎ, তার পবিত্রতার মাত্রা এত উচ্চে রেখেছে, যে শুধুমাত্র স্বামী, পিতা, বা ভাই এক নারীকে স্পর্শ করতে পারে। ভারতের ঘরে ঘরে, মেয়ে বড় হলে ভাইরাও বোনকে ছোঁয় না। ভারতীয় মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে হাতে হাত জড়ানো বা পুরুষের করমর্দন করা অনুচিত।' এই লেখক আরো বলেছেন, 'কামুক সংগীতের সুর বাজিয়ে, মৃদু আলোয়, অন্য নারীদের কোমর জড়িয়ে আমরা ঘুরে ঘুরে নাচব, সেদিন হয়তো দূরে নেই।'

জাতীয়, বিশেষ কংগ্রেস নেতারা প্রায়ই জনসাধারণকে আবদেন জানান, ভালো হও। ভালোত্ব ব্যাপারটা কী, তা নিয়ে মতবিরোধও আছে। প্রায়ই তাঁরা মেয়েদের বলেন অলঙ্কার ফেলে দিতে। মাঝে মাঝে লিপস্টিক ও সিগারেটের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। প্রহিবিশান বিষয়ে যখন বিতর্ক হয়, কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লিতে কিছু বক্তা, মদের সঙ্গে তামাক বর্জনের কথা বলেছিলেন।

১৯৫০ সালে, একটি পার্লামেন্টারি 'হু ইজ হু' প্রকাশ করা হয়। তাতে এই আত্মসচেতনদের ভালো-করার কিছু দৃষ্টান্ত আছে। 'আমোদপ্রমোদ' ক্ষেত্রে এক এম. পি. লিখছেন, "গরিব ও পদদলিত কৃষকদের সঙ্গে, শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করা, এবং সমবায় প্রচেষ্টায় তাদের জীবন উন্নত করা।' আরেকজন বলেছেন, তাঁর শখ হ'ল, 'সাধারণ মানুষের উন্নতি সাধন।'

নীতিবাগীশতা আমাকে কতটা বিব্রত করবে, তা নিয়ে আমি বিশেষ ভাবিত নই। কিন্তু আদিবাসী ক্ষেত্রে এ এক নিষ্ঠুর, ক্ষয়কারী অনুশাসন।

শিল্পের এক ধূর্ত নপুংসকারী
গান, নাচ ও হৃদয়ের নিষ্পাপ আনন্দক্ষেত্রে এক ক্রুদ্ধ নিষেধ

আমাদের দেহকে করছে কলঙ্কিত, আমাদের জন্য শুধুমাত্র রেখেছে
ভয়ংকর নিবীর্যতা। এ উষ্ণ ধরাতলে।

অনেক মানুষ সমাজের কাছে খুব শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পান। এঁরা সারাজীবন ধরে লুঠ করে চলেছেন আদিবাসীদের যৎসামান্য যা আছে। এঁরা ওদের নিরামিষাশী বানান। ফলে ওদের আহারীয় থেকে এক প্রয়োজনীয় খাদ্য কেড়ে নেন, পরিবর্তে দেন না কিছু। ওদের মধ্যে চালু করেন প্রহিবিশান, বঞ্চিত করেন খুব দরকারি এক টনিকে। ওদের উৎসব ও বিবাহে আগে যে আনন্দধারা বইত, তাও কেড়ে নেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে যে সান্ত্বনা পেত, তাও নিয়ে নেন। ওদের সাদাসিধে স্বাভাবিক বেশভূষা যে অশ্লীল, তা ঘোষণা করে ওদের ওপর চাপিয়ে দেন আর্থনীতিক বোঝা। তরুণ প্রেমের মধুর আনন্দের উপর ছায়া ফেলেন। গরিবদের কাছ থেকে রং, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা হরণ করা, ওদের খোলাখুলি শোষণ করারই সামিল।

আন্তরিক বিশ্বজনীনতায় পৃথিবীকে ভালোবাসায় বিশ্বাসী আমি। তার মানে তো এই নয়, যে আমাকে জেলিফিশ হয়ে যেতে হবে? অপাত্রে দয়া দেখালে, যারা মুখ চেয়ে আছে, তাদের প্রতি বেইমানি করা হয়। যে অভিশাপটা লিখছি। সেটা খাপছাড়া নয়। ওটার প্রধান দোষ, তেমন কাজের হ'ল না।

মিঃ ভেরিয়ার এল্যুইনের সোমবার প্রভাতের অভিশাপ

হে আমার কাব্যলোকের দেবী! মন দাও, শোনো অভিশাপগুলো
আদিবাসীদের শত্রুদের ওপব নেমে আসতে বলছি ওদের
শোনো, আমি আবারও বলছি
কাদের ওপর নামবে আমার অভিশাপ।

নীতিবাগীশ তাত্ত্বিকদের ওপর
যারা সন্দিগ্ধ চোখে দেখে নেহরুর প্রকল্পগুলিকে
পক্ষপাত এবং অজ্ঞতায়
কুয়াশায় যাদের মন ঘোলাটে।

উন্নয়নকারী কর্মীদের ওপর যারা বেজায় চেষ্টা চালাচ্ছে
আদিবাসী রীতিনীতি বদলাতে, উন্নত করতে, তাতে নাক গলাতে
গোমাংস ও বিয়ারপানের অপরাধ থেকে
ওদের বাঁচাতে।

তাদের ওপর যারা জাতিভেদ ও প্রাচীন প্রথার
মরা সনাতনী বেড়াজালে টেনে এনে সামিল করতে চায়
সেইসব মানুষদের, যারা সেদিনও

বাঁচতো স্বাধীনভাবে। স্বপ্ন হেন সুখে।

তাদের, যারা নগ্নতা দেখে শিউরে ওঠে
দেখে, তাচ্ছিল্য জানায়, উঁকি মারে এবং চেষ্টা করে
পবিত্র মানবদেহকে পরাতে
মিলের কাপড়ে, যা গরিবদের কিনতেই হবে।

তাদের ওপর, যারা শর্ট্‌স ও শার্টের ব্যবসা করে
মনে করে গেঞ্জী হ'ল গে' আসল জিনিস
ঝটপট যা নোংরা হয়ে যায়
এরা রাজাকে কুলি বানিয়ে ছাড়বে।

এদের ওপর,— মহাজন, উকিলের টাউট,
দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি লোক, ভূস্বামী,—তারপর
ধূর্ত বেনেদের ওপর, যারা ভালো ও সরল মানুষদের
ঠকিয়ে মোটা হচ্ছে।

পাদ্রীদের ওপর, যারা ছলনা করে যুবকদের নেয় চার্চে
নরকাগ্নির ভয় দেখিয়ে মিথ্যা সন্ত্রাসিত করে
তাদের ওপর যারা শুঁকে শুঁকে খোঁজে
সুখী প্রেম এবং তারুণ্যের কামনা।

তাদের ওপর— যারা গরিবের কান্না কেড়ে নেয়।
হাসি বন্ধ করে দেয়। আনন্দকে নষ্ট করে
নাচ বন্ধ করে দেয়, চুরি করে আদি সঞ্চয় থেকে
সৌন্দর্য, উন্মাদনা এবং উজ্জ্বল রং।

তাদের ওপর,— যারা আদিবাসী শিল্পকে পঙ্কে নামায়
সে সুর, নকশা বা বা ছাঁদ যাই হোকনা কেন,
যারা ভাবগদগদে ধর্মীয় স্তোত্র শোনায়
এবং হারমোনিয়ামে তা বাজায়।

তাদের ওপর— যারা মনে করে নৈতিকতা
বুদ্ধিমত্তার বিকল্প হতে পারে
নিজেদের শুচিতায় নিজেরা গর্বিত হয়ে
নর্দমায় চোখ বিঁধিয়ে দেখে আনন্দ পায়।

প্রতিটি মানুষের ওপর,— যাদের অন্তঃসারশূন্য হৃদয়

কবিতা এবং লাবণ্য শূন্য
ওদের নিজস্ব ভোঁতামিই জানাতে পারে,—
ওদের সকলের ওপর নামুক আমার অভিশাপ।

তবু আমার মনে হয়, নীতিবাগীশতা আসলে হয়তো-বা দয়াবান। আমিই প্রথম লোক, যে *দি বাইগা* বইয়ে একটি ভারতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর যৌনাচার বিষয়ে খুলেমেলে লেখার সাহস দেখাই। *দি মুরিয়া অ্যান্ড হিজ ঘোটুল* বইয়ে আমি আরো খোলামেলা, আরো বিশদ বর্ণনাময়। আমার লোকগীতি ও লোককথা সংকলনে আমি এমন সব গল্প ঢোকাই, যার মনস্তাত্ত্বিক মূল্য অনেক। তবে তা ড্রয়িংরুমে বসে পড়ে শোনানো যাবে না। তবু, শত শত সমালোচনা পেয়েছি এর। অন্যান্য কারণে কিছু তো খুবই প্রশ্নসংকুল। তবে ভারতের কোনো সংবাদপত্র, বা পত্রিকা ওই কারণে সমালোচনা করেছে বলে মনে পড়ে না। যৌনতা বিষয়ে যা লিখেছি, তার কারণে ইংল্যান্ডের কট্টর সনাতনপন্থী ধর্মীয় লোকেরা আমাকে আক্রমণ করেছেন। রাজনীতি নিয়ে লিখেছি তো দক্ষিণ আফ্রিকার সমালোচকরা আক্রমণ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় সমালোচক ও ভারত সরকার যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছেন— আমি যা লিখেছি, এবং আমি যে সব ফোটো আমার নানা বইয়ে ছেপেছি, উভয় ক্ষেত্রেই। এ সবের কিছু কিছু, কঠোর নীতিবাগীশ মাপকাঠিতে যথেষ্ট আপত্তিকর মনে হতেই পারত।

'মটলে'-তে যেমন লিখেছি, নীতিবাগীশতা ভারতে দেশজ নয়। ভারতের মহত্তম মানুষদের মনের ক্ষেত্রে এটি বাইরে থেকে আনা একটি আইডিয়া। আজ এটি এখানে আছে। কেননা এ দেশের মানুষদের এক ক্ষুদ্র অংশের ওপর আধিপত্য করছে,— ওদের মানসিক প্রতিক্রিয়া। যাকে ওরা ভ্রান্তিবশত 'পাশ্চাত্য' প্রমোদ ব'লে মনে করে, এ প্রতিক্রিয়া তার বিরুদ্ধে। ওদের চেয়ে যাদের শিক্ষা উদার, ওদের চেয়ে যারা আধুনিক, তাদের বিষয়ে অবচেতনে এক ঈর্ষাও এর কারণ। এদের বিকৃত কামনাপীড়িত, অশুচি প্রভাব এই সহিষ্ণু, সৌন্দর্যপ্রেমী চিরকালের সুখী দেশের আত্মার উপর অনারোগ্য ক্ষত না হানে, সেটা দেখা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনেরাল বলেছিলেন, 'খাদ্য এবং জ্ঞানের সমান আনন্দও দরকার একটি দেশের।'

পাঁচ

যখন ভাবি যে সব ব্যাপার আমাকে প্রভাবিত করেছে, আমার জীবনকে রূপ দিয়েছে, কবিতাকে দেব প্রথম স্থান। সংগীত, পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা, বিশেষত মোৎসার্ট ও বীঠোভেন, অথবা মন যখন অন্য মেজাজে, তখন স্ত্রাভিন্স্কি আমার সঙ্গে কথা কয়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। আমার জীবনধারা যেমন ছিল, তাতে মৌল চিত্র ও ভাস্কর্য তেমন দেখতে

পাই নি। কবিতার সুবিধা এই, সে তো সঙ্গে নিয়ে চলা যায়। যে সব সফরে যেটুকু না হলে নয়, তার চেয়ে বেশি মালপত্র নেওয়া যায় না,—কয়েকটা পাতলা বই ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। তাই কবিরাই হয়ে রইলেন আমার শিক্ষক। আমার হৃদয়ের গোপন জায়গাগুলি খুঁজে দেখতে ওঁরাই শেখালেন। একটি বাতায়নই খুলে দিলেন, যা দিয়ে আমি আমার আদিবাসীদের আরো পরিষ্কার চোখে দেখতে পাই।

তারপর, প্রথমদিকে ছিল ক্রিশ্চান ধর্মের কয়েকটি দিক। মনে হয় না, তা খুব একটা টিকে আছে।

> তবু পাংশুল ও অগভীর জলের মধ্যে
> আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই কারোকে আঘাত না করা চরণ দুটি।

ক্রিশ্চান ধর্মের যে অংশ নিও-প্লেটোনিক দর্শন, অতীন্দ্রিয় দিকটি প্রতিভাত করে, তা গুরুত্বপূর্ণ হয়েই থাকল। যদি ওঁদের শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ, সংকীর্ণ দিকগুলি উপেক্ষা করতে পারি,— তাহলে কয়েকজন মহান ক্রিশ্চান অতীন্দ্রিয়বাদীর লেখায় অনেক কিছু পাব বলে আজও বিশ্বাস করি। কয়েকজন ক্যাথলিক মডার্নিস্ট-এর কথা ভাবলে আজও আমার হৃদয়ে স্পন্দন জাগে। যেমন, যখন ভাবি পিয়ের তেইলহার্দ দ্য শারদ্যাঁ'র কথা। এশিয়ার নির্জন তৃণভূমিতে একলাটি তিনি,—রুটি বা সুরা নেই,— ঈশ্বরকে নিবেদন করছেন, 'সমগ্র পৃথিবী যে বেদী, সে বেদীতে পৃথিবীর সকল কর্ম ও বেদনা।'

জীবনের পাঁচ বছর ধরে সন্ন্যাসী হতে চেয়েছি, এটা উপলব্ধি না করলে কেউ আমাকে বুঝতে সক্ষম হবেন বলে মনে করি না। আমিও তো নিজেকে বুঝি না। আজও সবচেয়ে ভালবাসি নৈঃশব্দ্য। নৈঃশব্দ্য গ্রামে মেলাও কঠিন। তবে তা পাওয়া যেতে পারে সুউচ্চ পর্বতে। মাঝে মাঝে শিলং-এ আমাদের নিজেদের বাড়িতেই রাতে হয়তো কয়েক মিনিটের অটুট নীরবতা মেলে। আমাকে তা খুব শক্তি দেয়। মনকে তরতাজা করে তোলে। মনোবল থাকলে গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করতাম। সপ্তাহে একটি দিন, একটা কথাও বলতে রাজি হতাম না। কিংবা দিনে অনেকগুলো ঘন্টা কথা কইতাম না, পুণেতে যা করেছি।

'ধর্মীয় জীবন'-এর মূল শপথ হ'ল সংযম, কৃচ্ছ্রতা এবং বাধ্যতা। কখনোই বিশেষ উৎসাহ ছিল না পবিত্র সংযমে। তবে কৃচ্ছ্রতা মনে সাড়া জাগাত এবং বহুবছর এ আদর্শ আমি অনুসরণ করেছি। আজ পারিপার্শ্বিকতার কারণে এ আদর্শ ত্যাগে বাধ্য হয়েছি। তবে বিলাসিতার চেয়ে অনাড়ম্বরতাতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। যা চাইছ, তাই পেয়ে যাচ্ছ, এ যেন বেশ অশ্লীল। জানি, অনেক কিছু বর্জন করে চলতে পারার মধ্যে চিত্তের দৃঢ়তা আছে। বিশ্বাস আছে বাধ্যতায়। অন্তত ব্যাপক অর্থে বিশ্বস্ততায়।

ক্রিশ্চান ধর্মের পরে এলেন গান্ধী। ঠিক সকলের মতোই গান্ধীর শিক্ষা থেকে

সেই আইডিয়াগুলিই নিই, যা মনে ধরে,—বাকিটা বাদ দিই। গান্ধীর মৃত্যুর আগে থেকেই ভারতে গান্ধীর দর্শনকে খারিজ করার কাজ শুরু হয়ে যায়। এটি প্রতীকায়িত হয়ে উঠল, যখন তাঁর শবদেহ অস্ত্রবাহী শকটে রেখে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। গান্ধীবাদের অনেক কিছুই আমি মেনে নিতে পারিনি। বিশেষ তার নীতিবাগীশ ব্যাপারটি। আবার একই সঙ্গে মহান প্রেরণাদাত্রী অনেক কিছুই ছিল। তাঁর সত্য বিষয়ক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু,— প্রেম ও শান্তির নীতি,—নীতিবাগীশতা নয়, তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন প্রচণ্ড আবেদন জাগিয়ে চলে হৃদয়ে। তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতি ভুলব না কখনো। তা ছিল একাধারে উষ্ণ ও জ্যোতিষ্মান; আমি তার যোগ্য ছিলাম না। কিন্তু কি স্নেহ না ঢেলে দেন। গর্ব ও আনন্দের শিহরন জাগে যখনি তাঁর নাম শুনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমি দেখিনি। কিন্তু অক্স্‌ফোর্ডের দিনগুলি থেকেই উনি আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। বলতেই হয়, ওঁর বিখ্যাত 'গীতাঞ্জলি' পড়ে আমি ওঁর প্রতি আকৃষ্ট হইনি। আকৃষ্ট করল উনি কবীরের 'দোহাঁ'র যে অনুবাদ করেন, তাই। আমার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

আমার চরিত্রে বরাবর দুটো দিক আছে। একটি হল বিশ্বত্যাগী। এটি গান্ধীর কাছে ধরা দেয়। অন্যদিকটি যা বিশ্বকে স্বীকার করে নেয়, সেটি পেলাম আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে। সৌন্দর্য, ছন্দ এবং বর্ণে তাঁর যে বিশ্বাস,— ভারতে বহুজন ভালবাসতে ভয় পায়, উনি পান না,— এগুলো আমার হৃদয়ে উৎসাহে সাড়া তুলল। 'যে ভালো করতে চায়, দরজায় ঘা দেয়; যে ভালবাসে তার সামনে দরজাটি খোলাই থাকে।' রবীন্দ্রনাথের সবটুকুই ইতিবাচক, স্বীকৃতিজ্ঞাপক। জীবনকে এক শিল্পকর্ম করে তোলেন তিনি। সাঁওতাল আদিবাসীদের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল, ওদের কাছে প্রেরণা পান তিনি। সত্যি বলতে কি, আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে, কবি ও শিল্পীদের দিয়ে আদিবাসী এলাকা প্রশাসিত, এবং তার পলিসি পরিচালিত করা উচিত।

যে সঙ্কটকালে ভারত স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছিল, সে সময়ে তার নিয়তি পরিচালনা করতে এঁরা দু'জন ছিলেন, এটা ভারতের সৌভাগ্য। গান্ধী মানুষকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধেন এবং তাদের মধ্যে উদ্দীপনা জোগান। তাঁর অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করতে। অহিংস পন্থায় এক বিশাল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করতে তৈরি হওয়ার জন্য তাঁর দৃঢ়, কঠোর বার্তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নান্দনিক ব্যাপারে তিনি দুর্বল ছিলেন। ধর্মীয় কবিতা ছাড়া অন্য কবিতা তেমন পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। শিল্পকলাকে উৎসাহদানে তিনি সামান্যই কাজ করেছেন। হস্তচালিত তাঁতশিল্প, যা দিয়ে তিনি এক সম্পূর্ণ সৌন্দর্য-জগৎ সৃষ্টি করতে পারতেন, তাকে লাগালেন সাদাসিধা কুদর্শন পোশাক বানানোর কাজে। সে পোশাক এখনো ওঁর অনেক অনুগামী পরেন। ভারতের অবস্থা যে কী, তা সবসময়ে মনে জাগিয়ে রাখার জন্য দেশকে তিনি কারাবন্দির পোশাকেই রাখতে চান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না থাকলে ভারত হয়তো অসুন্দর ও বিবর্ণ

হ'তো। সে হয়তো ভুলে যেত পৃথিবীর লাবণ্য, মানুষের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য কবিতা, মানুষ যা বানায়, তার কবিতা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে বিপরীত জগতের। দুজনের সংযুক্তি সমগ্র দেশের জন্য তো বটেই, আমার জন্যও খুব দরকার ছিল। এ কথা সত্যি, যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষার কোনো কোনো দিক আমার কাছে কিছুটা আবছা ঠেকে। যেমন মানবজীবনের সংজ্ঞা, "অসীম দূরত্বের দিকে অবিরাম যাত্রা"। কিন্তু যেখানে তা শ্রেষ্ঠ সেখানে তাঁর লেখা সর্বোচ্চ এবং জ্ঞানগর্ভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজের কদর আমার কাছে আরো বেড়ে যায়, যখন উদয় ও অমলাশঙ্কর তাঁর কবিতা 'সামান্য ক্ষতি'-র নাট্যরূপের এক অসামান্য অনুষ্ঠান করেন। ওঁরা শিলং আসেন। অমলা দেখা করে গেলেন। পরে আমি উদয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। যদিও ওঁদের জানতাম না, অনুভব করলাম তৎক্ষণেই বন্ধুত্বের উপলব্ধি। আমি এটি সদাই খুঁজে ফিরি। তবু বলতে হয়, কমই পাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি একটি ছোট মাস্টারপিস। গ্রামজীবন সম্পর্কে কি উপলব্ধি তাতে। ওঁদের উপস্থাপনও অপূর্ব হয়েছিল। বালক বসন্ত্ পরে আমাকে বলল, 'ড্যাডি, জীবনে যা দেখেছি, এটা তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো।'

আমার ওপর, বিশেষত প্রথম দিকে গান্ধীর প্রভাব যতো হয়, সে বিষয়ে অনেক বলেছি। গত দশকে কিন্তু আমি মিঃ নেহরুর প্রভাবাধীন অনেক বেশি হয়েছি। এর কারণ,—অংশত, এক মহান মানুষ হিসেবে তাঁর কাছে লব্ধ প্রেরণা,—অংশত, আদিবাসীদের বিষয়ে তাঁর পলিসি, আমি মনে করি, আদিবাসীদের ক্ষেত্রে সেই পলিসি একপ্রধান আশা,— অবশ্য ভারতের মানুষ যদি সেদিকে যথেষ্ট নজর দেয়। আমি নিজেকে বলি, আদিবাসীদের জন্য 'মিঃ নেহরুর উপদেশাবলি (প্রচারে) এক মিশনারি।' ইউ. এন. ধেবরও, একবার নিরালায় বলেছিলেন, আমি এ ব্যাপারে একমাত্র মিশনারি।

আমার *দি ফিলসফি ফর নেফা* গ্রন্থের ভূমিকায় মিঃ নেহরু উদারতায়, অতি উদারতায় এ বিষয়ে প্রশ্নটি তুলেছেন। আদিবাসীদের বিষয়ে, তাঁর মতামত গঠনের প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং ভেরিয়ার এল্যুইনের নিজের লেখা পড়ে গড়ে উঠেছে। আমি কোনভাবে ওঁকে প্রভাবিত করেছি, তা বলার চেয়ে বরং ওঁর কাছে আমি শিখেছি, এটা বলাই বেশি যথার্থ হবে।'

অথচ এটা ঘটনা, যে আমার ওপর মিঃ নেহরুর প্রভাব সর্বাধিক। উনি এমনই এক শক্তিসঞ্চারী মানুষ, যে যখনি দেখা হয়, আমার আইডিয়া নতুন প্রাণরসে সমৃদ্ধ হয়। ওঁর মধ্যে মিলিত হয়েছে সত্য ও শান্তির জন্য গান্ধীর কঠোর তপস্যা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, সারা বিশ্বকে গ্রহণের মনোভঙ্গি। গান্ধীর কঠোরতা ও বাস্তববাদিতার সঙ্গে মিলেছে সৌন্দর্য ও শিশুদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উষ্ণ ভালবাসা। আদিবাসীদের বিষয়ে আমাদের ধ্যানধারণায় উনি এনেছেন বিজ্ঞান, মানবিকতা ও

শ্রদ্ধা। আর যে মানুষটি একবার বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর আদিবাসী পলিসির সবটাই একটি শব্দে ব্যক্ত করা যায়,—নম্রতা!' তিনি তো আমার মনপসন্দ্ হবেনই।

মাঝে মাঝে বলা হয় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আমার পক্ষপাত। এটা একেবারে বাজে কথা। হিন্দুধর্মের কিছু কিছু ব্যাপার আদিবাসীদের ক্ষেত্রে খুব ভালো নয়, এ কথা আমি বলেছি। হিন্দু 'সংস্কারবাদী'রা, আদিবাসী সমাজ থেকে যে সব মন্দ জিনিস বাদ দিতে চান, তার চেয়ে অনেক মন্দ জিনিস ওই সমাজে আমদানি করতে চান। মধ্যভারতে আদিবাসীদের হিন্দুভাবাপন্ন করার ফল যেমন। প্রায়ই তা হ'ল জাতিভেদে বিশ্বাস, যে বিশ্বাস প্রাচীন দিনের ব্রাহ্মণদের চেয়েও কঠোর। যে সব জায়গায় আগে বিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে প্রশ্নই ওঠে নি, এখন সেখানে এ প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যাতে তারা 'পাপ' থেকে রক্ষা পেতে পারে, সে জন্য আগের চেয়ে অনেক কম বয়সে ছেলেমেয়েদের বাল্যবিবাহ হচ্ছে। খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে বহু নিষেধাজ্ঞা আমদানি করা হয়েছে। সবচেয়ে যা মন্দ, তা হ'ল, কোনো আদিবাসী অঞ্চলে যখন হিন্দুধর্ম ছড়ায়, দেখা যায় সামাজিক মাপকাঠিতে আদিবাসীরা সবচেয়ে নিচে নেমে গেছে।

কিন্তু এ তো প্রকৃত হিন্দুধর্ম নয়। এ তার প্যারডি। হিন্দু নেতারা প্রাণপণে এটা হটাতে চাইছেন। প্রকৃত হিন্দুধর্মের আছে শক্তি এবং সৌন্দর্য। যারা তা জেনেছে, তারা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছাড়া অন্য কোনো চোখে তাকে দেখবে না। তোমাকে কাছে যেতে হবে। স্বেচ্ছায় অবিশ্বাস দমন করে যেতে হবে, যেমনটি যাও কবিতার কাছে। হিন্দুদের, এমনকি উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদেরও খুব অত্যদ্ভুত আইডিয়া মেনে নেবার ক্ষমতা আছে। তাতে তেমন কিছু এসে যায় না। হিন্দু দর্শন, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও কবিতার মহান সৌধ, এ সব অযৌক্তিক ধারণা ও সংস্কার ছাপিয়ে অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আছে। এ সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা তা থেকে অসামান্য শক্তি পান। আমি নিজে, তাঁদের মাধ্যমে এ থেকে প্রচুর শক্তি পেয়েছি।

একটা ছোট্ট, তুচ্ছ ব্যাপার আছে। ওরা তোমার চেয়ে 'আরো ভালো', এমনটা অনেক হিন্দু মনে করে, তোমাকে ফেলে অস্বস্তিতে। তোমার মনে হয় তুমি বৈষয়িক এবং বিলাসী। ওদের একজন ধূম্রপান করে না। আরেকজন শুধু দুধই খায়, তৃতীয়জন শপথ করেছে, জীবনে নভেল পড়বে না। আমরা যারা এসবই করে থাকি, এবং অনেকেই মাঝে মাঝে বুঝি, হিন্দু বন্ধুটির মনের মতো হওয়া বেশ কঠিন।

বৌদ্ধধর্মের খুব সরল একটি রূপ, ইদানীং আমার জীবনের যেন প্রধান আধ্যাত্মিক প্রভাব হয়ে উঠেছে। এটি প্রথম দেখি সিংহলে, তারপর থাইল্যান্ডে। এর সত্য স্বরূপ খুঁজে পাই উত্তর-পূর্ব পাহাড়গুলির ছোট ছোট কুটিরে। পাই নেফার পাদদেশের পাহাড়ে খাম্পত্তি মন্দিরে মন্দিরে। বৌদ্ধধর্মের যৎসামান্য যা জানি, তা গুরু বা দার্শনিক, এঁদের কাছে পাইনি, পেয়েছি সরল, সাধারণ মানুষের কাছে। কখনো-বা ছোট ছোট, কিছু বা ভেঙেপড়া স্তূপ ও মন্দিরে।

একদিকে আমি বৌদ্ধধর্মের তত ভালো ভক্ত নই। ভালোবাসি জীবন; ভালোবাসি এই ভালো ও দয়াময় বিশ্বকে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐশ্বর্য, সব ভালোবাসি,— চোখ, কান ও জিভকে যা প্রলোভিত করে, স-ব। ভালো খাদ্য, সুন্দর সামগ্রী ও মানুষ, শিশু, অমায়িক বন্ধু, তামাক, সুরা, স-ব। আদর্শ, আইডিয়া ও ব্যক্তিমানুষ, এদের জড়িয়ে আমার যত ভাবাবেগ।

কিন্তু আগেই যা বলেছি, আমার মধ্যে আরেকটা 'আমি' আছে। সে দাম দেয় মানসিক কৃচ্ছ্রতা ও নির্মোহতাকে। দুনিয়ার ভালো ভালো জিনিস ভালোবাসি। আবার ওগুলো না পেলেও দিব্যি চালিয়ে নিই। বস্তুত, সাধারণত সেভাবেই চালাতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এ আমি ক্রমে ক্রমে বুঝেছি, যে বাঁচবার উৎসাহ নিয়ে আমি খুব একটা এগোতে পারব না, যদি না অন্তরে শান্তি থাকে। ক্ষুদ্র, ঈর্ষা, বদমেজাজ, বিশৃঙ্খলা ও আসক্তি,—এ শুধু মানুষের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধ হয় না,— জীবনের ভালো ও সুন্দর জিনিসগুলি উপভোগ করার ক্ষমতাও ধ্বংস করে। সুখ ও সৎ কাজের জন্য অন্তর্শক্তি আবশ্যিক।

যে সময়ে আমি এটা তীব্র উপলব্ধি করছি, যে সব ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পিছটান আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাতে অধীর হয়ে উঠেছি, বৌদ্ধধর্ম পড়তে শুরু করলাম। এর দর্শন বুঝি, তেমন ভান করব না। আরো ভালো এক মানুষ হয়ে পুনর্জন্ম নিলে তো ভালোই হ'ত। সকল পথের শেষে এমন কিছু পাব, যাকে নির্বাণ বলা যায়,—অথবা অন্য মতাদর্শের পথে পয়েন্ট ওমেগায় পৌঁছব,— এমন ইচ্ছা তো আমার অন্তরের অন্তস্থলে আছেই। কিন্তু সে অনেক দূরের পথ। এখনকার মতো আমাকে মেজাজ নিয়ন্ত্রণে আনতে দাও, অন্তত অন্তর থেকে বিরাগ বিসর্জিত হোক।

কোনো তীর্থযাত্রী যদি বাস্তবতার পাহাড়ে উঠতে চায়, চূড়ার উজ্জ্বল, ঝলমলে সৌন্দর্য কল্পনায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চায়,— বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বলে তাকে পাঁচটি বাধা পেরোতে হবে। জগতের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। আঘাত হানার দূষিত ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। মনকে ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। অপরের অনিষ্ট করার ইচ্ছা সরিয়ে মনকে শুদ্ধ করতে হবে। আলসেমি ও দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। সংশয় গ্লানি থেকে মুক্ত হতে হবে। সে 'বিশৃঙ্খলা ও উদ্বেগ বিসর্জন দেবে। অন্তরের অন্তস্থলকে শান্ত, অবিচল রেখে খিটখিটামি ও বিরক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে'— এটা খুব দরকারি। এসব বাস্তববাদী, গোদা কথাগুলি খুবই গোড়ার কথা ব'লে মনে হতে পারে। তবু যখন চেষ্টা করি, তখন বুঝি এমনটি করা কত কঠিন। কত কম এগোতে পেরেছি তা উপলব্ধি করলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। বয়সটা তো যায়। এই পাঁচটি প্রতিবন্ধ অতিক্রম করতে হলে চাই অতন্দ্র প্রহরা, অক্লান্ত প্রয়াস। এর জন্য এক বিশেষ মনোভঙ্গিও দরকার,— এই যে উপলব্ধি, এ জগৎ এক পারাপারের সেতুমাত্র,— জাগতিক ঐশ্বর্য ছায়ার মতো অধরা— অধীর বেগে সুখকে

তাড়া করলে, আমরা হয়তো সুখকে ধ্বংসই করে ফেলব। যে বিশুদ্ধ উপলব্ধি আত্মাকে মুক্তি দেয়, তা সেই শান্তি, সেই তৃপ্তি থেকে আসে, যা এ জগৎ ও জাগতিক থেকে বিচ্ছিন্ন।

কোনো মানুষ মুক্তির পথে এগোবে, এ কাজ সম্ভব করতে পারে, অন্তরের শক্তি গড়ে তোলা, সুরক্ষিত সীমান্ত দুর্গ যেমন, তেমন হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলা বিনম্রতা, সহানুভূতি এবং জগৎব্যাপী ভালবাসা দিয়ে। নিছক বৈরাগ্য দিয়ে তা অর্জন করা যায় না। একে ইতিবাচক হতে হবে, 'যেমন করে তুমি যন্ত্রণা ও দুঃখের বিরুদ্ধে সুরক্ষা গড়ে তোলো,— তেমন করেই মানবজাতির প্রতি কোমলতা ও সহায়তার মনোভাবকে কাজে লাগাও।'

প্রথম প্রতিবন্ধ জয় করা সবচেয়ে কঠিন। দুনিয়া তো চমৎকার জায়গা। সবকিছুকে মনে করব অস্থায়ী, নশ্বর, অথবা মানব সম্বন্ধীয় যা মনোযোগ দেবার অযোগ্য, এমনটি ভাবলে পথটি সোজা হ'ত—কিন্তু সে ভাবে মনকে ধোঁকা দিতে পারি না। তবু এ ধরণী, মানুষ, এর প্রতি মনোভঙ্গিতে কিছু নির্মোহতা আনা সম্ভব।

অন্যান্য প্রতিবন্ধগুলি অনেক সোজা ও সহজ। বিদ্বেষ, বিক্ষোভ, ক্রোধ সরিয়ে যে হৃদয় শুচি হতে পারে, তাতে মুক্তির এক মহান উপলব্ধি জাগে। দুর্বলতা ও অনিশ্চয়তা তো স্পষ্টতই অন্যান্য শত্রু। আমার নিজের বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধ হ'ল, উদ্বেগ, বিরক্তি, কোনো বিষয় নিয়ে ক্ষিপ্ত হওয়া। একশো রকম উদ্বেগ চেপে বসে। বিশেষত যখন যাই সফরে, যখন লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়। অনেক আগে থেকেই, যখন আমাকে সর্বদা সমালোচনা করা হত, অথবা আমাকে বহিষ্কার করা হত, —আমাকে কেউ চায় না, এই মানসিক ক্লেশে আমি খুব ভুগেছি। তাই কোনো নিরুত্তাপ ব্যবহার, যা মোটেই ইচ্ছাপূর্বক করা হচ্ছে না, তার মধ্যেও আমি অনেক কিছু দেখতে পাই, যা আসলে অনস্তিত্ব।

তবে এ সবকিছুই জয় করা যায়, এ আবিষ্কার করা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। আমরা যদি সত্যি তা পেতে চাই, স্বাধীনতা ও আনন্দ আমাদের হাতের মধ্যেই আছে। যারা স্বেচ্ছায় দুঃখবিলাসী, তাদের যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যে দান্তে এক বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। বহু মানুষ দেখেছি, তারা তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা আঁকড়ে পড়ে থাকে, নিজেদের ক্ষয় করে, সুখের সুযোগ হারায়,— অথচ যে স্বাধীনতা তাদেরই, তা গ্রহণ করে না। সরকারি কর্মচারীরা সদাই ভোগে বিক্ষোভে, ওটাই ওদের 'অকুপেশনাল' ব্যাধি। কিন্তু বৌদ্ধরা বলেন, জ্ঞানীজন নিজেকে বন্ধনমুক্ত করবেন। ঈশ্বরের বন্ধন,— তার নিজ ধ্যানধারণা, তার অধিকার, তার সুযোগ সুবিধার বন্ধন।

যখন মুক্তি অর্জন করলেন, পাঁচটি প্রতিবন্ধ সরে গেল পথ থেকে, তখন তীর্থযাত্রী দেখবেন, 'তিনি ঋণমুক্ত, ব্যাধিমুক্ত, কারামুক্ত *এক স্বাধীন মানুষ, খুবই সুরক্ষিত।* এমতো উপলব্ধি হলে আ[illegible]দ উৎসারিত হবে তাঁর চিত্তে, আনন্দ উদ্বেল করবে তাঁকে,

তাঁর সমগ্র দেহ হবে আনন্দে সাবলীল। তেমন হ'লে শান্তির অনুভূতি পূর্ণ করবে তাঁকে। সেই শান্তিতে চির নিমজ্জিত থাকবে তাঁর হৃদয়।'

ছয়

জীবনের অর্থ কী, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে অর্থ যে একটা আছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত। যখন কেউ ভাবে, ব্রহ্মবাদিতা দিয়ে এ অর্থের ব্যাখ্যা করবে,—তখন দেখে যে তারা ঈশ্বরে, বা কোনো বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস রাখতে পারছে না। তারা বিপথে চলে গেছে, বড় বেশি ছাড়তে হয় ওদের,— জীবনের অর্থ বিষয়ে ওদের বিশ্বাস একেবারে ত্যাগ করে। আমি মনে করি না এর প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর আছেন, না নেই,—মৃত্যুর পরে আরেক জীবনের আশা করতে পারি কি না,— এ বিষয়ে আমার তেমন উদ্বেগ নেই। এ সব দুর্বোধ্য ও রহস্যময় ব্যাপারে আমার মতামত লেখার কোনো তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছি না। হাজার হলেও তাঁর অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বর তো আমাদের ভোটের ওপর নির্ভর করছেন না। তিনি হয় আছেন, নয় নেই। তেমনিই হ'ল কোনো ভবিষ্যৎ জীবন আছে, না নেই। আমার তুচ্ছ মতামতে তো তা বদলে যাবে না, এবং ওই অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব আমাকেও বদ্‌লে দেবে না। প্রাচীন দিনে ছিল অন্য ব্যাপার। আমরা বিশ্বাস করতাম, ইহজীবনে যা করব, পর-জীবনে সেই মতো পুরস্কার অথবা শাস্তি পাব, এই নীতি এখন এটি মোটামুটি বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু স্বীয় ধর্মমত যাই হোক, আজ অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষই মনে করেন না যে অদৃশ্য হিসাবরক্ষক, শেষ হিসাবের জন্য আমাদের পাপপুণ্যের হিসাব টুকছেন, এবং যোগ দিচ্ছেন।

আমি নিজে চিন্তন মাধ্যমে এমন শক্তির অস্তিত্ব জেনেছি, যাতে মনে হয়, এই গ্রহে আমাদের ছোট্ট জীবনটুকু শেষ কথা নয়। মানুষী প্রেমের উচ্ছ্বাসে, সৌন্দর্যকে তারিফ করার মধ্যে যা শুভ তাকে মেনে নেওয়াতে, আমাদের সাধারণ জীবনে যা জানতে পারি, তার চেয়ে মহত্তর প্রেম, বৃহত্তর বাস্তবতার আভাস পেয়েছি। আমার মতে এই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, আমাদের ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে অন্য কিছু যে আছে, তার সমর্থনে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি।

পৃথিবীতে জীবনকালের মধ্যে কোনটি হবে লক্ষ্য? আমি যা বলেছি, তা সত্ত্বেও বলি, নিজেদের নিয়েই কাজটি শুরু করতে হবে। আমাদের জীবনকে যা মহত্তম অর্থ দেয়, সে-সব কাজ করার জন্য তৈরি হতেই পারব না, যদি আমাদের খানিকটা আত্মোপলব্ধি না হয়, অন্তরে খানিকটা প্রেম ও শান্তি সঞ্চিত না করা যায়। এই শান্তি ও ভালবাসা পেতে পারি ধর্মের মাধ্যমে ('এই তো সেই' এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে); কবিতা বা শিল্প মাধ্যমে; আনন্দ বা যন্ত্রণা মাধ্যমে। কেমন করে তা পাব, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু এর অন্তত খানিকটা আমাদের পেতেই হবে। আমাদের

অভিজ্ঞতাকে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করতে শিখতেই হবে।

এ প্রসঙ্গে দেখা যাক, আমাদের নিকটতম জগতে মানবিক, মাটি ছোঁয়া স্তরে কী আছে, যা পাওয়া সার্থক?

ঐশ্বর্য বা উচ্চপদ, যদি বা মেলেও, সেখানো তো তার শেষ হয় না। আমার মতো সাধারণ মানুষের যে যে পাওয়ার মতো প্রাপ্তি আছে, তার মধ্যে প্রথমে রাখব, একটি সুখী পরিবার। যে স্ত্রী ও সন্তানেরা তোমাকে প্রতিদানে ভালবাসে, তাদের ভালবাসার চেয়ে বড় পূর্ণতা হয় না। যার গুরুত্ব তোমার কাছে অনেক, তেমন পরিবারে বাস করার চেয়ে বড় নিয়মশৃঙ্খলা অথবা আত্মত্যাগের চ্যালেঞ্জ নেই।

অবশ্যই তেমন কোনো কাজ করতে হবে, যা করার মতো। তাওঅয়াং লামাসেরিতে এক ভিস্তির ছবি আছে। জলদেওয়ার কর্তব্যটি সে এমন বিশ্বস্তভাবে করত, যে আজ সে এক সন্ত্ বলে গণিত হয়। ধর্মীয় পরিভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, সেটা যে কোনো কাজ হতে পারে, যদি পূজা করছ, এ ভাবে করো। সবচেয়ে ভাগ্যবান তারা, যারা কোনো লক্ষ্য খুঁজে পায়। যেমন, আদিবাসী মানুষের প্রকৃত কল্যাণ। এ কাজে চাই সারাজীবন কাজ করে চলা। যদিও এ কাজে থাকে উদ্বেগ আশাভঙ্গ, অপরের প্রতি সহানুভূতি থেকে জাত গভীর দুঃখ।

টি. এস. এলিয়টের 'দি কক্‌টেইল পার্টি'-তে, সিলিয়া অনেকটা আমার অনুরূপ আইডিয়াতেই অনুপ্রাণিত, (অবশ্য আমি প্রেমে অভিশপ্ত হই নি)। আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব, দুটো অরণ্যেরই সম্মুখীন হতে হয় ওকে। রাইলী বলে, হয়তো বা করুণাময়তা পথের নির্দেশ দিতে পারে। সে বলে :

যদি জঙ্গল থেকে বেরোবার পথ খুঁজেও পাই
আমার তো থেকে যাবে সান্ত্বনা-অসাধ্য স্মৃতি
জঙ্গলে যা খুঁজতে গিয়েছিলাম, সেই ঐশ্বর্যের,—
পেলাম না খুঁজে, ওখানে তো ছিল না
হয়তো কোথাও তা নেই; কিন্তু, যদি কোথাও না থাকে
খুঁজে পাইনি বলে কেন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে?

আমিও গিয়েছিলাম ঐশ্বর্যের খোঁজে। প্রেম, সত্য ও সৌন্দর্যের সে এক নিখুঁত কল্পনা-ছবি। তখনো আমি ওভাবেই ভাবতাম। কিন্তু সে ছবি তো একান্ত ধ্যানে মিলবার নয়। করুণা ও মমতায় দ্রব প্রেমের আবেগে কাজ করে তা পেতে হয়। তখন রুগ্ন, দুঃখী ও নিঃস্বজনেদের মধ্যে তা খুঁজলাম। অপরূপ কল্পনা-ছবি পেলাম না। হয়তো দারিদ্রজীর্ণ ধ্যেয় ছবিটির আবিষ্কার আরোই গুরুত্বপূর্ণ। শেষে দেখি, যে মানুষ এত গরিব, এত ভালোবাসার মতো, যে ঈশ্বরকে পিছোতেই হ'ল। যত শোভনই হোক, অক্সফোর্ডের কৃত্রিমতা এবং যতই আদর্শতাড়িত হোক সবরমতির রাজনীতিক

উত্তেজনার তাগিদ, এ সব আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল বাস্তব সত্য। প্রথম থেকেই আমি চেয়েছিলাম এই বাস্তব সত্য।

এ কথা সত্য, যে-ঐশ্বর্য সবাই খোঁজে, তা পাওয়ার জন্য বাস্তবে জঙ্গলে ঢোকার দরকার নেই কোনো। আমাদের মধ্যেই তো আছে স্বর্গ এবং নরক। মানুষকে নিজ আত্মার কঠিন চড়াই ভেঙেই তীর্থে যেতে হবে। আর, মানুষ যেখানেই থাকুক, এ সন্ধান চলতেই থাকবে। অরণ্যে আমি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য পাইনি, হয়তো সেখানে নেই। হয়তো কোথাও নেই।

তবু মনে করি, তেমন ঐশ্বর্য আছে, খোঁজার মতো করে খুঁজলে প্রতি মানুষ তা পেতে পারে।

আমার বিশ্বাস, সে ঐশ্বর্য হ'ল ভালবাসা। তার সকল বৈচিত্র্য নানামুখিতা ও গভীরতা নিয়ে তা শান্তির ভাই ও মিত্র। আমার প্যাটেল লেকচার থেকে আবার বলি:

> প্রেম জ্ঞানকে দীপ্ত করে; সৌন্দর্যকে দেয় অর্থ; প্রেম পবিত্রতার কেন্দ্র; গৃহের প্রিয়তম অতিথি। ঘৃণার অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে প্রেমের গোলাবারুদ অনেক শক্তি ধরে। সঠিক নির্দেশে চালালে ওগুলিকে পরাজিত করতে পারে। ভালবাসা প্রতিটি মানুষকে দেয় মর্যাদা, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা,—অহংকারীর গর্ব ভেঙে দেয়। ত্রাণ করে দুঃখী, অপরাধী ও অবমানিতকে,—দীন হতে দীনজনকে দেয় বেঁচে থাকবার অর্থ ও যৌক্তিকতা। ট্রেহার্ন যেমন বলেছেন, 'এ হ'ল মানাবাত্মার সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও স্বাভাবিক কাজ।' সত্যিই এ কাজ স্বাভাবিক। মানুষ জন্মায়, বেঁচে থাকে, সে মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সংঘাত করার জন্য নয়। অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করে মিলেমিশে থাকার জন্য। প্রকৃতঅর্থে মানবিক হওয়া একেই বলে। বিশ্বজীবনে তার কী ভূমিকা,—ভালোবেসে টেনে এনে যখন তা তাকে উপলব্ধি করানো যায়,—তখন নৈঃসঙ্গের বিচ্ছিন্নকারী শক্তি তাকে শিকার করতে পারে না। তার ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে পড়ে, পৌঁছে যায় সকল বস্তুর সঙ্গে ঐক্যের বোধে। ভালবাসা তাকে ভয় থেকে মুক্ত করে। তাকে দেয় শান্তি। এক কোমল শক্তিতে পূর্ণ করে তার প্রাণ। যে শক্তি পরস্পর-সংঘাতী শক্তিসকলকে একসূত্রে বাঁধে।

ভালবাসা এবং তার নির্দেশিত কর্তব্যসকল হল অরণ্যের প্রকৃত শিক্ষা। আমি আধ্যাত্মিক আলোকদীপ্তি পাইনি। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, পেয়েছিলাম আধ্যাত্মিক সর্বনাশ। তবু আবিষ্কার করেছিলাম সেই সব দাবি, যা জরুরি, যাতে চ্যালেঞ্জ আছে। হৃতদরিদ্র ও শোষিত মানুষের প্রয়োজন ছিল ওদের মধ্যে সেইসব ছোট ছোট মূল্যবোধ ধরে রাখার, যা এক মানবজীবনকে মর্যাদা দেয়। ফিরিয়ে আনার ছিল ওদের

আত্মসম্মান, ওদের যে ভালবাসে কেউ, সেই অনুভব। শান্তি, বিরোধ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি, এজন্য কাজ করা দরকার ছিল। নিজেকে উৎসর্গ করতে হ'লে এর চেয়ে বড় আদর্শ হয় না। প্রয়োজন ছিল সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার, সকল প্রাণীর জন্য, ধ্যানধারণার জন্য। মানব শিশুদের ছোট ছোট আশাআকাঙ্ক্ষার জন্য শ্রদ্ধা। আরেকটি সত্য অরণ্যে উদ্‌ভাসিত হয়। তা হ'ল, 'এক নতুন সমাজ গঠনের জন্য অবিচল ইচ্ছাশক্তির গুরুত্ব। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বাস্তববাদী কাজকর্মের উপায়। সবার ওপরে মনে হয়েছিল, সৌন্দর্য, স্বাধীনতা ও সুখের জন্য— যেখানে তা ছিল তা সংরক্ষণের জন্য, যেখানে তা হারিয়ে গেছে তা ফিরিয়ে আনার জন্য, কাজ করে চলার চেয়ে মহত্তর কোনো অভিব্যক্তি থাকতে পারে না ভালবাসার।

সন্ত বা অতীন্দ্রিয়বাদীরা যে মহাঐশ্বর্য উপলব্ধির কথা বলেন, এসব লক্ষ্যে সিদ্ধকাম হওয়া হয়তো তা নয়। কিন্তু এ জীবনে যতটুকু পারি. ততটুকু যেন অন্তত করি। হয়তো স্বর্গে পৌঁছতে পারব না, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক কাজ করার আছে।

মহাশ্বেতা দেবী (জ. ১৯২৬) 'কল্লোল' যুগের বিখ্যাত লেখক মনীশ ঘটক ('যুবনাশ্ব')-এর কন্যা। শিক্ষা শান্তিনিকেতন ও কলকাতায়। অধ্যাপনা করেছেন প্রথম জীবনে। এখন পুরো সময়ের লেখকজীবন। এই সঙ্গে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, পালামৌ জেলায় জনজাতির মানুষের মধ্যে নানা উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণকর কাজে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী। সাহিত্য অকাদেমি, জ্ঞানপীঠসহ পেয়েছেন আরও বহু সাহিত্য পুরস্কার। পেয়েছেন পদ্মশ্রী এবং ম্যাগসেসে পুরস্কারও।

পৃথ্বীশ সাহার (জ. ১৯৩৮) প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'এডগার স্নো'র চোখে ভারতবর্ষ', 'নারীর শ্রম'। 'মুক্তাক্ষর' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

মূল্য : ১৩০ টাকা

ISBN 81-260-0902-0